রবীন্দ্র-জীবনী

ও

রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক

দ্বিতীয় খণ্ড

সন ১৩১৯—১৩৪৩ সাল

[১৯১২—১৯৩৬]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

১৩৪৩

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী

করকমলে

শান্তিনিকেতন
৩০ আশ্বিন, ১৩৪৩।

প্রভাত

অর্থ কিছু বুঝি নাই কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্রকরা বিচিত্রের নর্ম বাঁশিখানি
যাত্রাপথে। * * *

নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।
এই গীতপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে,—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কর্মময় সৃজনশীল জীবনের ইতিহাস এই খণ্ডে বিবৃত হইল। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামে নাটিকাখানি রচনা করেন; নিজের জীবনে সেই প্রতিশোধ হইল পঞ্চাশোর্ধ্বে, যখন হইতে তাঁহাকে কর্ম সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হয়। প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের জীবনেতিহাস 'শুধুই স্বপন করেছি বপন বাতাসে।' দেশের মধ্যে কবিখ্যাতি ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বাঙলার বাহিরে খুব অস্পষ্টভাবে 'রবিবাবু'র নাম দুই একজনের মুখে শোনা যাইত। তারপর পঞ্চাশের পর বিলাতযাত্রা হইতে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব সুরু; অর্থাৎ কর্মবিমুখ জীবনের প্রতিশোধের পালা। ছিলেন তিনি বাঙলার কবি, হইলেন বিশ্বের কবি; বাঙালীর সমস্যা সমাধান ছিল তাঁহার স্বপ্ন, বিশ্বের সমস্যা পূরণ হইল তাঁহার কাজ; যা ছিল স্বপ্ন, তা লইল মূর্তি কর্মে;—যা ছিল সুরে, তা রূপ লইল রেখায়; স্বপ্ন হইল বাস্তব। গড়িয়া উঠিল বিশ্বভারতী। যে-কর্ম হইতে দূরে ছিলেন যৌবনে, যে-ধর্ম করেন নাই যৌবনে, করিতে হইল সেইসব কাজ বার্ধক্যে; আর সে-কাজের শেষ নাই—তাঁহার উপর কর্ম-দৈত্যের চাহিদারও অন্ত নাই। প্রশ্ন হইতে পারে—কেন কাজ করেন? তার জবাব,—কবি ভাববিলাসী নহেন, জীবনকে অস্বীকার তিনি কোনো দিন করেন নাই,—সেই জন্য এত দায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জীবনের বিচিত্র দাবীকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই; এবং যেটা 'কবিজনোচিত' নয় বলিয়া সাহিত্য-রসিকরা সমালোচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ সেটাকেও অবজ্ঞা করিতে পারেন না, কারণ এই বিচিত্রকে লইয়া মানবজীবন গঠিত, এই আপাতবিরুদ্ধ উপাদান লইয়া মানবের প্রগতি। এই বৈচিত্র্যের সাধনা জীবনে করিয়াছেন বলিয়া কাব্যে তাঁহার ফুটিয়াছে বিচিত্র রস। তাই ধার্মিকরা স্তম্ভিত হন কবিকে নৃত্য করিতে দেখিয়া, অধ্যাপকেরা বিরক্ত হন বিদ্যার্থীর আর্ট সাধনা দেখিয়া, ওস্তাদ ভ্রূকুটি করেন গানের কৌলীন্য রক্ষা হয় না বলিয়া। 'গীতাঞ্জলি' ইংরেজিতে প্রথম

প্রকাশিত হইলে লোকে ভাবিয়াছিল তিনি বুঝি প্রাচীনকালের 'প্রোফেট', ভারতের 'ঋষি'; ঠিক তার উল্টাটা লোককে বুঝাইবার জন্য বাহির করিলেন 'গার্ডনার' 'চিত্রা'; তিনি বলিলেন, 'আমি শুধু এক কবি' বিচিত্রের সাধনা তাঁহার ধর্ম। এই পর্ব সেই বিচিত্রের ইতিহাস।

জীবিত কবি, তারপর রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বহুমুখীন প্রতিভাশালী কবি ও মনীষীর অধুনাতম জীবনেতিহাস লেখা খুব কঠিন; সুতরাং যাহা লিখিয়াছি তাহাকে ইতিহাস বলা যায় না, বলা উচিত ক্রনিকেল। পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার বিচিত্র কর্মময়, কাব্যময় জীবনের ঘটনাগুলি সাজাইয়া দিয়াছি।

ঘটনাগুলি সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়, কারণ আমরা 'জাতে' ঐতিহাসিক নই, আমাদের ধাতে নাই কোনো জিনিষকে ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা। সৌভাগ্যক্রমে রথীন্দ্রনাথ ১৯১২ হইতে কবি সম্বন্ধে যাবতীয় প্রেস কাটিং সংগ্রহ করিয়াছেন; আমাকে প্রায় ৫০।৬০ হাজার কাটিং এক সময়ে গুছাইতে হয়। পঞ্চাশখানি বড় বড় ভল্যুমে এইসব তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমুদ্র মন্থন করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। 'প্রবাসী' 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা' 'মডার্ণ রিভিউ' হইতে কি পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছি তাহা গ্রন্থমধ্যে পাঠক দেখিতে পাইবেন; রামানন্দ বাবু কবি সম্বন্ধে বহু তথ্য তাঁহার পত্রিকা-দ্বয়ে বরাবর প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইবার পর অনেকগুলি বুলেটিনে কবির ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি V. B. Quarterlyর মধ্যে আছে; V. B. Newsএ সংক্ষেপে তাঁহার আধুনিক সমস্ত কাজকর্মের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। কবির পূর্বতন সেক্রেটারী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় কবির সঙ্গে যেসব সফরে গিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন; রাশিয়া ভ্রমণ, পারস্য ভ্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি নিজেও এদেশগুলি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। সুনীতিবাবু তাঁহার 'দ্বীপময় ভারতে' বহু বিস্তারে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা Travel Dairy হিসাবে অতুলনীয়; একটা সময়ের বিস্তৃত বর্ণনা তাঁহার প্রবন্ধাবলী হইতে পাইয়াছি; এ ছাড়াও সিয়াম (Siam) সম্বন্ধে তথ্যগুলি তিনি তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত দিনপঞ্জী হইতে আমাকে দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর যেসব সঙ্গী বিদেশে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের

অনেকেই বেশি কিছু প্রকাশ করেন নাই। চীন জাপান ভ্রমণকালের অত্যন্ত অসম্পূর্ণ প্রেস কাটিং একত্র করা দুইটি বুলেটিন বাহির হইয়াছিল; ব্যক্তিগত-ভাবে সঙ্গীদের কেহ কিছু লেখেন নাই। ১৯২৬ সালে কবি য়ুরোপের অধিকাংশ দেশে যান। রাজসম্মানে তিনি এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে পরিভ্রমণ করেন; দুঃখের বিষয় সে-সম্বন্ধে কোয়াটারলিতে সামান্য অংশ ব্যতীত কিছুই কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার জীবনেতিহাসের একটা প্রকাণ্ড অধ্যায় অসম্পূর্ণভাবে লিখিত হইয়াছে।

কবির পত্রাবলী এখনো সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় নাই; সেগুলি জীবনী রচনার শ্রেষ্ঠ উপাদান; তবে সেগুলি 'সম্পাদিত' হইলে তাহার সাহিত্যরস বৃদ্ধি পায় নিঃসন্দেহে, কিন্তু ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে অনেক তথ্য নিখোঁজ হয়।

রথীন্দ্রনাথ পিতার সহিত কয়েকবার ঘুরিয়াছেন; মাঝে মাঝে তিনি দিনপঞ্জী রাখিয়াছেন, সেগুলি এত সুন্দর যে প্রকাশিত হইলে তাহা কবির জীবনীর বড় রকম উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইবে। দুঃখের বিষয় ধারাবাহিক ভাবে তাহা রচিত হয় নাই। রথীন্দ্রনাথ সেগুলি আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন—সেজন্য তাঁহাকে শুষ্ক ধন্যবাদ দেওয়া নিরর্থক। তাঁহার নিকট নানা ভাবে যে সাহায্য পাইয়াছি, সেজন্য 'কৃতজ্ঞ' এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না। গ্রন্থ রচনায় ছোটখাটো অনেক রকমের সহায়তা অনেকের কাছ হইতে পাইয়াছি; আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, পরে অধ্যাপনাও করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কবির বিদেশ হইতে লিখিত পত্রগুলির কপি করিয়া রাখিয়াছিলেন—সেগুলি বিশ বৎসর পর তিনি আমাকে পাঠাইয়া দেন; সেইসব পত্র হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। 'গুরুদেবে'র প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তাঁহাকে সেই বাল্যকালে এই কার্যে প্রণোদিত করে; দীর্ঘকাল যত্নের সঙ্গে তিনি সেইগুলি রাখিয়া আমাকে পাঠাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট হইতে গুজরাট ও কাথিবাড় ভ্রমণ সম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ পাইয়াছিলাম; কবির সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীমান অনিলকুমার চন্দ মহাশয় আধুনিক যুগের তথ্য দিয়া আমাকে সাহায্য

করিতে কোনো দিন কৃপণতা করেন নাই। বিশ্বভারতীর সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাঁতরা মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; নীরব কর্মী সাহিত্যরসিক শ্রীমান সুধীরচন্দ্র করের নিকট অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছি। শান্তিনিকেতন প্রেসের শ্রীমান হরিপদ পাল প্রুফ দেখা বিষয়ে আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া এবার হয় ত বইতে পূর্ব হইতে ভুল কম থাকিতে পারে।

সর্ব শেষে যাঁহার জীবনচরিত এখানে আখ্যাত হইয়াছে তাঁহার নিকট হইতে আমি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র; কোনো দিন তিনি আমার রচনা দেখেন নাই এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল; গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত মতামতের জন্য সকল দায়িত্ব আমার।

কবির ৭৫ বৎসরের বিস্তৃত জীবনী সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইল; সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ, ইহার মধ্যে ভুলভ্রান্তিগুলি যদি তাঁহারা গ্রন্থকারকে কষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন তবে দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি শুদ্ধ করিয়া লইবার চেষ্টা হইবে; জ্ঞানের জগন্নাথরথ সকলের স্পর্শে আগাইয়া চলে।

সূচী

৩৩। **যোগাযোগ ও শেষের কবিতা** (১৯২৭ অক্টোবর—১৯২৮ জুন। 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা ও সমালোচনা—'তিনপুরুষ' নাম স্থলে 'যোগাযোগ'—'ঋতুরঙ্গ' অভিনয়—নৃত্যের নূতন রূপ—ক্লারা বাট্ শান্তিনিকেতনে—সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা—বিশ্বভারতী সম্মেলনে সাহিত্য আলোচনা—জন্মোৎসবে তুলাদান—হিবার্ট লেকচারের জন্য নিমন্ত্রণ—কবির বিলাত যাত্রা—অসুস্থ হওয়ায় যাওয়া স্থগিত—মাদ্রাস—আদৈর—পঁদেচরি—অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ—কলোম্বো। বঙ্গলুরে আসিয়া 'শেষের কবিতা' শেষ। ৩৪০—৩৫০

৩৪। **মহুয়া** (১৯২৮ জুলাই—১৯২৯ মার্চ) শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তন—অধ্যাপক লেভি আশ্রমে কয়েকদিন—ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী—খৃষ্টীয় জগতের সহিত সম্বন্ধ—মিঃ সু সী-মো—'মহুয়া'। ৩৫১—৩৫৪

৩৫। **কানাডা ভ্রমণ** (১৯২৯ এপ্রিল—জুলাই)—ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন হইতে নিমন্ত্রণ—কানাডার পথে—কানাডায়—বক্তৃতা—'বিশ্রাম ও অবকাশ তত্ত্ব'—শিশু-মন্দিরে বক্তৃতা—আমেরিকা প্রবেশে বাধা—হানই। জাপানে একমাস—ফরাশী হিন্দুচীনে। ৩৫৫—৩৬২।

৩৬। **তপতী** (১৯২৯ জুলাই—১৯৩০ ফেব্রুয়ারী)—শ্রীনিকেতনে 'সীতাযজ্ঞ'—শান্তিনিকেতনে 'বর্ষামঙ্গল' প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্রপরিচয় সভায় বক্তৃতা—'তপতী'—'রাজা ও রাণী' অভিনয়—শচীন সেনের বই সম্বন্ধে মত—জুজুৎসুবীর টাকাগাকি—বড়োদায় বক্তৃতা। ভবানীপুর সাহিত্য সম্মেলনে কবি অনুপস্থিত—মিঃ ও মিসেস এলম্‌হার্স্টের আগমন—শ্রীনিকেতনে লাট সাহেব স্যর জন্ জ্যাকসন। ৩৬৩—৩৬৮

৩৭। **য়ুরোপ যাত্রা** (১৯৩০ মার্চ—সেপ্টেম্বর)—চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত—বিলাতে হিবার্ট বক্তৃতার জন্য যাত্রা—শিক্ষা সম্বন্ধে আশাদেবীকে পত্র—ফ্রান্সে—প্যারীতে চিত্র প্রদর্শনী—লণ্ডনে—ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা—শোলাপুরে 'মার্শাল ল'—বার্মিংহামে বক্তৃতা—হিবার্ট লেকচার—রাধাকৃষ্ণন ও কবির সম্বর্ধনা—লণ্ডনে কোয়েকারদের বার্ষিক সভায় কবি—ভারতীয় রাজনীতির ব্যাখ্যা—Religion of Man—পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের চেষ্টা—এলমহার্স্টের বাড়ী Totnesএ। জারমেনীতে চিত্রপ্রদর্শনী—ডেনমার্কে—জেনেভায়। 'ভানুসিংহের পদাবলী'। ঢাকায় দাঙ্গা। ৩৬৯—৩৮১

৩৮। **রাশিয়ায়** (১৯৩০ সেপ্টেম্বর) সঙ্গে অমিয়চন্দ্র, আরিয়াম, টিম্বার্স ও সৌম্যেন্দ্রনাথ—মস্কো নগরীতে সঙ্ঘকৃষি পরিদর্শন—দেশের সংবাদে উদ্বিগ্ন—গোলটেবিল সম্বন্ধে মত—মহাত্মা ও গোলটেবিল। ৩৮২—৩৮৬

৩৯। **আমেরিকায়** (১৯৩০ অক্টোবর—১৯৩১ ফেব্রুয়ারী)—৮ই অক্টোবর নিউইয়র্ক—বষ্টন—নিউহাভেন—অসুস্থ বলিয়া কলরব।

রবীন্দ্র-জীবনী

দ্বিতীয় খণ্ড

১। ইংলণ্ডে

১৩১৯ সালের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়া স্থির হইয়াছে।

বহুদিন হইতে বিদেশকে দেখিবার ইচ্ছা কবির মনে জাগিতেছে। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি যে একখানি পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার মনের একটা দিকের চিত্র আমরা পূর্বে পাইয়াছি (দ্রঃ রবীন্দ্র-জীবনী প্রথম খণ্ড পৃঃ ৫০৩)। এছাড়াও অন্য কারণ ছিল। তার মধ্যে শারীরিক অসুস্থতাও একটি সে-কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই সময়ে বিলাতে তাঁহার দুই এক জন রসজ্ঞ গুণগ্রাহী কবিকে তাঁহাদের মধ্যে পাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রোদেনষ্টাইন। ইনি ইংলণ্ডের একজন নামজাদা শিল্পী ও মনীষী বলিয়া দেশবিদেশে সুপরিচিত ছিলেন। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় (১৯১২ জানু) ভগিনী নিবেদিতা অনুবাদিত কাবুলিওয়ালা গল্প পাঠ করিয়া তিনি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় মুগ্ধ হন। রবীন্দ্র-নাথের এই শ্রেণীর আরও গল্প আছে কিনা খোঁজ করিবার জন্য তিনি কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে পত্র লেখেন; তিনি অবনীন্দ্রনাথদের জানিতেন। তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি কবিতার অনুবাদ তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। এই কবিতাগুলির অনুবাদ করিয়াছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, শান্তিনিকেতনের

অধ্যাপক ও রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন রসজ্ঞ ক্রিটিক। বৎসর খানেক পূর্বে অজিতকুমার ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তি লইয়া অধ্যয়ন করিবার জন্য অক্সফোর্ড গিয়াছিলেন; সেইখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া সেখানকার ছাত্রদের পড়িয়া শুনাইতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত সেই অনুবাদগুলি পাইয়া রোদেনষ্টাইনের বিস্ময়ের অবধি থাকিল না; তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সেই সময়ে বিলাতে ছিলেন নববিধান সমাজের পুণ্যাত্মা ভাই প্রমথলাল সেন (লালুদাদা) ও দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এই দুইজনের নিকট হইতে রোদেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিলেন। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন ও বলেন যে সেখানে অনেকগুলি রসজ্ঞ হৃদয় তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। বিলাতে যাইবার ইহাও অন্যতম কারণ।

বিলাতে যাইবার পূর্বে কবি কিছুকাল শিলাইদহে ছিলেন; সেই সময়ে বসিয়া বসিয়া অবসরকালে কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করেন,' বিদেশে যাইতেছেন হয়ত কাজে লাগিবে এই ভাবিয়া। সেই সময়ে আর লিখিতেছেন আপন মনে সঙ্গীত, যেগুলি পরে 'গীতিমাল্যে'র মধ্যে সন্নিবেশিত হয়।

ইংরেজিতে কবিতা অনুবাদের এই চেষ্টা যে একদিন তাঁহাকে জগতে এত সম্মান ও সৌভাগ্য আনয়ন করিবে, তাহা তিনি তখন কল্পনাও করেন নাই। ইংরেজি লিখিবার অভ্যাসই ছিল তাঁহার কম; বহুবৎসর পূর্বে যখন গাজীপুরে বাস করিতেন, সেই সময়ে সেখানে মিলিটারী বিভাগের জনৈক উচ্চ কর্মচারী তাঁহার গৃহের সন্নিকটেই বাস করিতেন; তিনি যুবক কবির কাছ হইতে তাঁহার কবিতার অনুবাদ শুনিতেন, তাঁহাকে শোনাইবার জন্য ইংরেজিতে ভাষান্তরের চেষ্টা সেই প্রথম। সে সবের নমুনা নাই। ইংরেজিতে মাঝে মাঝে চিঠি পত্র লিখিতেন এবং আমেরিকার ফেল্‌পস্‌ নামে এক সাহেবকে তিনি যে পত্র লেখেন তাহা পরে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এবার তিনি যেভাবে 'গীতাঞ্জলি' ইংরেজিতে লিখিলেন, তাহাকে অনুবাদ বলিতে পারি না; উহাকে ভাবানুবাদ (translation নয় transvaluation) বলা যায়। যে ভঙ্গীতে লিখিলেন তাহা গদ্য নয়—

ছন্দ শাস্ত্রানুসারে পদ্যও নয়, তবে তাহা যে নূতন ছন্দ একথা কিছুকাল পরে সমগ্র জগৎ স্বীকার করিয়া লইল।

শ'খানেক কবিতা বাছিয়া অনুবাদ করিয়া লইলেন—নাম দিলেন 'গীতাঞ্জলি'। কিন্তু ইহাতে বাঙলা গীতাঞ্জলির সকল কবিতা বা গান নাই; ইহাতে 'গীতাঞ্জলি'র বাছা বাছা গান ছাড়া 'খেয়া', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতির কবিতা আছে। এই কবিতা-চয়ন সাগরপারের বন্ধুদের হাতে দিবার জন্য কবি সমুদ্র পাড়ি দিলেন।

১৩১৯ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে ১৯১২) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রেতিমা দেবী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বাই যাত্রা করিলেন। কবির বয়স তখন ৫১ পূর্ণ হইয়াছে।

বোম্বাই পৌঁছাইয়া তাঁহারা ওয়াট্‌সন্ হোটেলে উঠিলেন; বোম্বাই শহর তাঁহাদের নিকট অপরিচিত। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই হইয়া প্রথমবার বিলাত যান, তখন বয়স ছিল আঠারো (১ম খণ্ড পৃঃ ৮৫)। উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যাশিক্ষা। তারপর উনত্রিশ বৎসর বয়সে পূর্ণ যৌবনকালে কয়েকমাসের জন্য বিলাত যান, সেও এই পথ দিয়া (১ম খণ্ড পৃঃ ২১৭)। সেবার গিয়াছিলেন কেবল খেয়াল বশে, ভ্রমণের নেশায় হয় ত বা। এবারের উদ্দেশ্য অন্য, পূর্বে তাহা বলিয়াছি।

বোম্বাই শহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য তাঁহারা বৈকালে বাহির হইলেন। কবির দৃষ্টি এখন তীক্ষ্ণ, মনীষা গভীর; সামান্য ভ্রমণকালেই তাঁহার চক্ষে কলিকাতার সহিত বোম্বাইএর পার্থক্যটুকু ধরা পড়িল। বোম্বাই শহরে মারাঠি ও পার্শী মেয়েদের অবাধ চলাফেরা তাহাদের স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক গতি দেখিয়া বাঙলাদেশের মেয়েদের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্যের কথা মনে পড়িল। 'নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়।'

'আর একটা জিনিষ বোম্বাই শহরে বড় করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশী লোকদের ধনশালিতা। কত পার্শী, মুসলমান, গুজরাতি বণিকদের নাম এখানকার বড় বড় বাড়ীর গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতার কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে, এইজন্য তাহা বড় ম্লান। জমিদারির সম্পদ বদ্ধ জলের মত—

তাহা কেবলি ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির বিকাশ দেখি না, তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই।' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৪ শক ১৩১৯ সাল, আষাঢ় পৃঃ ৬৬)

বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িল ২৭শে মে ১৯১২ (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)। 'শুক্লপক্ষের শেষ দিকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। যেমন সমুদ্র, তেমনি সমুদ্রের উপরকার রাত্রি।' জাহাজের রেলিং ধরিয়া কবি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই অন্তহীনের সুন্দর মিলনটি দেখিতে লাগিলেন। মন তাঁহার আদর্শবাদে, সৌন্দর্য্যরসে, তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। 'যাত্রার পূর্বপত্রে' তিনি মানসলোকে পাশ্চাত্য জগতের যে মহিমা ও আধ্যাত্মশক্তির কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা যেন জাহাজে উঠিয়া কিয়ৎপরিমাণে ম্লান হইয়াছে। জাহাজের ইংরেজ যাত্রীদের অহর্নিশি আমোদ প্রমোদ, উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। যে-ভাব হইতে তিনি 'যাত্রার পূর্বপত্রে' দেশের দৈন্যের দিকটাতে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহা এখন দূর হইয়া গিয়াছে। দেশ চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়ামাত্রেই তাহার আদর্শ মূর্তি, তাঁহার কল্পলোককে উজ্জ্বল রঙে রাঙাইয়া তোলে। তিনি লিখিতেছেন, "এই জাহাজ যদি ভারতবাসী যাত্রীদের জাহাজ হইত, তাহা হইলে দিনের সমস্ত কাজকর্ম আমোদ আহ্লাদের অত্যন্ত মাঝখানেই দেখিতে পাইতাম মানুষ অসঙ্কোচে অনন্তকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছে। * * এই জন্য ইহাদের (যুরোপীয়দের) জীবনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতার একটি সহজ সুনম্র শ্রী দেখিতে পাই না।" (১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, সমুদ্র পাড়ি, ত-বো-প ১৩১৯ শ্রাবণ)

কিন্তু জাহাজের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ, যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিরাট আয়োজন, সময়নিষ্ঠা, সমস্ত কর্মের মধ্যে অনায়াস-গতি প্রভৃতি কবিকে মুগ্ধ করে, সেই সঙ্গে নিজের দেশবাসীর আরামসুখ দাবী করিবার সাহসের অভাবে দুর্ভোগ ভুগিবার কথা ভাবিয়া তাঁহার মন বিষণ্ণ হয়। 'আমরা কোনোমতে অভাবের সঙ্গে আপোষ করিয়া দিন কাটাই, আমরা কেবলি দুঃখ এবং অসুবিধা বহন করি, কিন্তু দায়িত্ব বহন করিতে চাই না।' (খেলা ও কাজ, ত-বো-প ১৩১৯ ভাদ্র, পৃঃ ১০৪)।

জাহাজে উঠিবার পর হইতে কবি লেখনী গ্রহণ করিয়া পত্রধারা

লিখিতেছেন। এই পত্রগুলিকে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের 'ডায়েরি' বলিতে পারি। জাহাজে উঠিয়া তাঁহার ভয় ছিল সাগর দোলা তাঁহাকে বিব্রত করিবে। কিন্তু 'মহাসাগর কবির কবিত্বটুকুকে ঝাঁকানি দিয়া নিঃশেষ করিয়া দেন নাই। * * ভাবখানা দেখিয়া মনে হইতেছে ভীরুভক্তের উপর এ যাত্রায় তাঁহার সেই অট্টহাস্তের তুমুল পরিহাস প্রয়োগ করিবেন না' (ঐ পৃঃ ৯১)। কবির মন পরিপূর্ণ আনন্দে ভরপুর ; লোহিত সাগরে জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদারুণ গরমে তাঁহার যে কোনো কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ; তিনি আনন্দে গাহিলেন 'প্রাণভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো দাও প্রাণ' (২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, গীতিমাল্য নং ২৮)। ভূমধ্যসাগরের প্রথম ঘাট পোর্ট সৈয়দ। এই দিনই লিখিতেছেন, "কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি ; অনেক দিন হইতে এই চলিবার, এই বাহির হইয়া পড়িবার একটা বেগ আমাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।" "প্রাণ আপনি চায় চলিতে ; সেই তাহার ধর্ম ; না চলিলে সে যে মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে।" (ত-বো-প, ১৩১৯ পৃঃ ৭৯-৮০)।)

রবীন্দ্রনাথ ওভারলাণ্ড যাত্রী ছিলেন, তাই মার্সাইতে নামিয়া ফ্রান্সের ভিতর দিয়া গেলেন। ১৬ই জুন (২রা আষাঢ়) তাঁহারা ডোভার হইয়া লণ্ডন পৌঁছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে-লণ্ডনকে জানিতেন সে-লণ্ডন আর নাই ; ১৮৭৮ সালের বা ১৮৯০ সালের লণ্ডন ও ১৯১২ সালের লণ্ডনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সমস্তই সম্পূর্ণ অপরিচিত। রথীন্দ্রনাথ তিন বৎসর পূর্বে আমেরিকা হইতে ফিরিবার সময়ে লণ্ডনে কয়েক দিন ছিলেন, তখন তাহার বয়স ছিল বিশ মাত্র। বিরাট নগরীর সম্বন্ধে তাঁহারও পরিচয় হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে টমাস্ কুক্ কোম্পানীর উপর আত্মনির্ভর করিয়া লণ্ডনে প্রবেশ করিতে হইল। তাঁহারা প্রথমে উঠিলেন এক হোটেলে। এই যাওয়া-আসার সময় একটি 'টিউব' ট্রেনে রবীন্দ্রনাথের লেখার ব্যাগটি হারাইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে পরদিন তাহা পাওয়া যায়। লণ্ডনের ন্যায় বিপুল শহরে মাটির নীচে বিদ্যুত-চালিত রেলওয়ের একটি অনির্দিষ্ট কামরার মধ্যে একটুকরা চামড়ার ব্যাগ হারাইয়া যাওয়ার পর পুনরায় যে উদ্ধার হইল, ইহা লণ্ডনের শাসন-ব্যবস্থার কম কৃতিত্বের কথা নহে।

কয়েকদিন হোটেলে থাকিবার পর তাঁহারা হ্যাম্পষ্টেড্ হীথ্-এ (Hampstead Heath) ২নং হলফোর্ড রোডে এক বাসা ভাড়া করিলেন। এই পাড়ার কাছে রোদেনষ্টাইনের বাসা। লণ্ডনে আসিয়াই তিনি রোদেনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ; এই মনীষী ও চিত্রশিল্পী তাঁহার Men and Memoires গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি তিনি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। রোদেন্ষ্টাইনের বাসায় ইংলণ্ডের ভাবুকদের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয়। এই ভাবুক সমাজের সহিত সাক্ষাৎ তাঁহার বিদেশযাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। এইখানে আইরিশ কবি ইয়েট্স্, ইংরেজ কবি মেস্ফীলড্, আর্নেষ্ট রিস্, কুমারী সিন্ক্লেয়ার, এভেলিন আণ্ডারহিল্, ট্রেভেলিন্, ফক্স-ষ্ট্রাঙ্ওএস্, এজ্রা পাউণ্ড ও গিন্সাল পরিবারের অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইংলণ্ডের উদারনীতিকদলের তৎকালীন নেতা ও 'নেশন' পত্রিকার অন্যতম পরিচালক নেভিনসনের সঙ্গেও পরিচয় হয়। 'নেশন' পত্রের সম্পাদক মণ্ডলী রবীন্দ্রনাথকে একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। 'নেশন' বিলাতের উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলণ্ডে যেসকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্যায়কে যাঁহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাঁহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বন্ধু, Nation তাঁহাদের বাণী বহন করিবার জন্য নিযুক্ত। 'লণ্ডনে' নামক পত্র-প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে বিষদভাবে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করেন। (প্রবাসী ১৩১৯, ভাদ্র, পৃঃ ৪৭৮-৪৮১)।

রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইংরেজ লেখকদের মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, সে-সম্বন্ধে তাঁহার মত এই পত্রে প্রকাশ পায় ; ভারত ও য়ুরোপের সমাজের পার্থক্য কোথায় সে বিষয়টিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। লণ্ডনের ইংরেজ সমাজের সহিত মিশিয়া তাঁহার দেশের কথা মনে পড়িতেছে। কোথায় তাহার বাধা, কোথায় সে পিছাইয়া আছে ও কেন আছে এইসব কথা মনে জাগিতেছে। তিনি লক্ষ্য করিলেন ইংলণ্ডের সমাজ বাহিরের দিকে একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে আপনাকে সংযত ও শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তাহার সৃষ্টি কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। কেবল

ভারতীয়রাই 'সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া সমাজ ব্যবস্থা চিরকালের মত পাকা করিয়া মৃতদেহের মত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিব' এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়া লইতে নারাজ। আজ য়ুরোপের প্রগতিপরায়ণ সমাজের কাছে আসিয়া সেই কথা আরও তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসও অন্যান্য দেশের মত প্রাকৃতিক নিয়মে গঠিত হইয়াছে ; প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া থাকিলে তাহার মুক্তি নাই একথা তিনি চিরদিনই বলিয়াছেন, আজও সেই কথা 'সমাজভেদ' প্রবন্ধেও বলিলেন। তবে একথাও দেশবাসীকে জানাইলেন 'শিক্ষা করা এবং নকল করা একই কথা নহে। বস্তুত ঠিকভাবে শিক্ষা করিলেই নকলকরার ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।' তিনি আরও বলিলেন যে ইংরেজ সমাজের মধ্যে ভারতীয়রা প্রবেশ করিতে চায় না বলিয়া ইংরেজ জাতির যাহা শ্রেষ্ঠ অবদান তাহা হইতে ইহারা বঞ্চিত। (সমাজভেদ, ত-বো-প ১৩১৯, আশ্বিন)।

লণ্ডনে পৌঁছিবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বহু গুণী ইংরেজের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রোদেনষ্টাইন তাঁহার বন্ধু কবি য়েট্‌স্‌কে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দেন। তিনি সেই পাণ্ডুলিপি কয়েকদিন সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন, 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "I have carried the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway trains, or on the top of omnibuses and in restaurents, and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me.

রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজ সাহিত্যিক মহলে পরিচিত করিবার জন্য য়েট্‌স্‌ ১০ই জুলাই (১৯১২) ট্রোকাডেরো হোটেলে এক সভার আয়োজন করিলেন। ইহার দুই দিন পূর্বে এমার্সন ক্লাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্বর্দ্ধনা হয়। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। কেদারনাথ কয়েক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে আসেন এবং Union of East and West নামে একটি সভা স্থাপন করেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে এই কেদার বাবু সাত বৎসর পূর্বে স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে "ভাণ্ডার" নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৩১২) ও রবীন্দ্রনাথকে তাহার সম্পাদক পদে বরণ করেন।

বিলাতে আসিয়া ভারতের সাহিত্য দর্শন আর্ট সঙ্গীত অভিনয়াদি প্রচার করিবার মানসে তিনি ঐ সভা কয়েকজন সহৃদয় ইংরেজের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কেদার বাবুর উদ্যোগে ৮ই জুলাই (২৪শে আষাঢ় ১৩১৯) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্বর্দ্ধনা হয়।

ট্রোকাডেরো হোটেলের আহূত সভায় য়েট্‌স্ ছিলেন সভাপতি, তিনি রবীন্দ্রনাথকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। সভায় নেভিন্‌সন, এচ্ জি ওএলস্, কেম্ব্রিজের বাঙলার অধ্যাপক জে ডি আণ্ডারসন্, ভারতীয় শিল্পের গুরু হ্যাভেল, আরণল্ড্ প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। য়েট্‌স্ বলিলেন, যে একজন সাহিত্যিকের জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা হইতেছে যে তাঁহার অজানা কোনো প্রতিভার সন্ধান পাওয়া। তাঁহার জীবনে সেটি হইয়াছে বলিয়া তিনি যে আনন্দ পাইয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন। তিনি বলেন "আমার সমসাময়িক এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি জানিনা, যিনি এমন কোনো রচনা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—এই কবিতাগুলির সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। অনুবাদের ভঙ্গী যেমন অনবদ্য তেমনি উহার চিন্তাধারা। য়ুরোপে বহুশতাব্দী ধরিয়া এই রচনা ভঙ্গী সুপরিচিত।

"এই সব কবিতার একটিমাত্র সুর হইতেছে ঈশ্বরের প্রেম। পাশ্চাত্য কোনো সাহিত্যের সহিত তুলনা করিতে গিয়া আমার একমাত্র টমাস্ আ-কেম্পিসের 'খৃষ্টানুকরণ'এর কথা মনে পড়ে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য, কারণ আ-কেম্পিস্ পাপের নিদারুণ চিন্তায় ক্লিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ইহা নাই। আ-কেম্পিসের লেখার মধ্যে দৃশ্য, প্রাকৃতিক জগতের প্রতি প্রেমের কোনো কথা নাই; তাঁহার কঠোর স্বভাবের মধ্যে এই প্রেমের প্রবেশাধিকার হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে ভালবাসেন, তিনি পূজার মালা জপেন না, তিনি পুষ্প জপেন। এই গ্রন্থ অফুরন্ত সৌন্দর্য্যে পূর্ণ।" ইহার পর য়েট্‌স্ পাণ্ডুলিপি হইতে কতকগুলি কবিতা পাঠ করেন।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন, "আমার জীবনের এই মুহূর্তের জন্য আমি বিশেষভাবে গর্ব অনুভব করিতেছি। পূর্বদেশ পূর্বই, পশ্চিমও পশ্চিম (East is east and West is west); কিন্তু উভয় মৈত্রী ও শান্তিতে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইবে। ইহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াই এই মিলন ফলপ্রদ

হইবে; মহামানবের পূজাবেদীর সম্মুখে এই শুভ পরিণয় হইবে।" রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের পর আর্ণলড, রোদেনষ্টাইন ও স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কিছু কিছু বলেন; ষ্টেটসম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ সাহেব রবীন্দ্রনাথের পরিবার সম্বন্ধে সভায় বলিয়াছিলেন।

ইহার পর কবির কাছে নানা স্থান হইতে ভক্তির অর্ঘ্য বহন করিয়া যেসকল পত্র আসিয়াছিল তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রীকবির পত্র উল্লেখযোগ্য। কুমারী র‍্যাডফোর্ড লিখিয়াছিলেন—"যেদিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়ে না যে গতরাত্রে যেমন অনুভব করিয়াছিলাম জীবনে আর কোনো দিন সেরূপ অনুভব করিয়াছি কিনা।" কুমারী সিনক্লেয়ার লিখিয়াছিলেন—"আপনার কবিতাগুলির যে কবিত্ব হিসাবে একটি সম্পূর্ণতা এবং অখণ্ড সৌন্দর্য আছে মাত্র তা নয়—কিন্তু যে-অতীন্দ্রিয় জিনিষ বিদ্যুৎচমকের মত আসে, যাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে—সেই তাহারি একটি চিরন্তন রূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম। * * আপনি একটি পরিপূর্ণ অদ্বৈতবোধে এবং একটি অধ্যাত্ম তত্ত্বদৃষ্টিতে * * সকল খৃষ্টান কবিকেই অতিক্রম করিয়াছেন। খৃষ্টান মিষ্টিসিজম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমায় পরিপূর্ণ; সে যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়—জগতের মায়াবরণ ভেদ করিয়া সে সত্যকে দেখে নাই। সেইজন্য তাহার হৃদয়াবেগ যথেষ্ট নির্মল নয়। তাহার এই অসম্পূর্ণতা আমাকে কোনো দিনই সন্তোষ দেয় নাই। কিন্তু যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি আমি চাই, তাহা গতরাত্রে আপনার কাব্যই আমাকে দিয়াছে। আপনি অতি স্বচ্ছ ইংরেজিতে এমন জিনিষ আনিয়া দিয়াছেন যাহা আমি ইংরেজিতে কেন, কোনো পাশ্চাত্য ভাষায় কোনো দিন দেখিব না ভাবিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছিলাম।" (প্রবাসী ১৩১৯, আশ্বিন পৃঃ ৫৬৫)

লণ্ডনে বাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহস্থালী করা খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার; সেইজন্য তাঁহারা বাসা ছাড়িয়া দিয়া আলফ্রেড প্লেসে ঘর লইলেন। এই সময়ে বিলাতে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ছাত্র ও বন্ধু বাস করিতেছিলেন। শান্তিনিকেতনের কয়েকজন পূর্বতন ছাত্র বিলাতে অধ্যয়নের জন্য ছিলেন। এ ছাড়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, হিন্দুস্থান সমবায়ের সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

---

* য়েটসের বক্তৃতা ও সভার কথা; দ্রষ্টব্য প্রবাসী ১৩১৯ আশ্বিন পৃঃ ৫৬৪।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনবীমার কার্যোপলক্ষ্যে সেখানে ছিলেন; ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র কিছুদিন পূর্বেই বিলাত গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে য়েট্স রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, চণ্ডীচরণ সিংহ, শিক্ষকদের মধ্যে কালীমোহন ঘোষ ও বঙ্কিমচন্দ্র রায় ছিলেন। সোমেন্দ্রচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার জামাতা নগেন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেখানকার কয়েকজন অধ্যাপকের সহিত পত্র ব্যবহারদ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আত্মীয়তাও হইয়াছিল। কালীমোহন বাবু ও দেবল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে, চণ্ডীচরণ গ্লাসগোতে পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন।

লণ্ডনে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন নূতন নূতন বন্ধু লাভ করিতেছেন। এই পরিচিতদের মধ্যে অনেকের সহিত তাঁহার পরিচয় ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল, কিন্তু কয়েকজনের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ইঁহাদের অন্যতম হইতেছেন মহামতি রেভারেণ্ড সি এফ এণ্ড্রুজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াই বুঝিয়াছিলেন যে লোকটি খাঁটি মানুষ, তিনি 'পাদরীর চেয়ে খৃষ্টান বেশি' ('ত-বো-প ১৩১৯ পৌষ পৃঃ ২২১)। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেদিন যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা যে কত সত্য গত চব্বিশ বৎসরের ইতিহাসে তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কেহ বন্ধু নাই, বন্ধুভাগ্যে তাঁহার শনি আছে এই কথা একদিন বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'না এণ্ড্রুজকে যদি আমি কিছু বলি তবে তিনি কখনো না করেন না; বোধহয় তিনিই আমার একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু।' তিনি বিলাত হইতে এণ্ড্রুজ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "এমন মানুষকে কেহ মনে করিতে পারে না যে ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন, ইনি অন্য দলের। ইহাই অত্যন্ত অনুভব করি—ইনি মানুষ—ইনি সত্যকে মঙ্গলকে সকল মানুষের মধ্যে দেখিতে আনন্দবোধ করেন—তাহা খৃষ্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করিয়া ঈর্ষা করেন না।" এই সময়ে এণ্ড্রুজ সাহেব দিল্লির সেণ্ট ষ্টীফেনস কলেজের অধ্যাপক; কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন শুদ্ধচরিত্র বাঙালী খৃষ্টান—সুশীল-কুমার রুদ্র; এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহার অধীন চিরদিন কাজ করিয়াছিলেন।

৭ই আগষ্ট (১৯১২) তারিখে তিনি এক পত্রে লিখিতেছেন, "লণ্ডনের পার্কের মধ্যে খুব একচোট ঘুর খেয়ে কয়েকদিন হ'ল পাড়াগাঁয়ে একটি পাদ্রির বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি।" (প্রবাসী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ ১৯৪)। ষ্টাফোর্ডশায়ারে বাটার্টন গ্রামে এণ্ড্রুজের এক পাদরী বন্ধু ছিলেন; ইনি সিপাহী বিদ্রোহযুগের বিখ্যাত জেনারেল আউট্রামের পুত্র। এইখানে যাইবার উদ্দেশ্য যথার্থ ইংরেজ গ্রাম দেখা। পল্লীগ্রামে পাদরীর সুন্দর জীবনযাত্রা, চাষীদের সহিত তাঁহার মিষ্ট সম্বন্ধ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে মুগ্ধ হন! কিন্তু তিনি কোনো বিষয়কে নানাদিক হইতে বিশ্লেষণ না করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং যেপত্রে তিনি মুগ্ধভাবে প্রশংসা করিতেছেন, সেই পত্রেই পাদরীর খৃষ্টানধর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস ও বিচার লইয়া সমালোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ধর্মমতের এমন সব জিনিষ আছে, যাহা বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন; অথচ সেই মতই দিনের পর দিন প্রচারিত হইতেছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত। গোঁড়ামি ধর্মের সিংহদ্বারকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে বলিয়া মহত্ব প্রবেশলাভ করিতে পারে না। এইরূপে য়ুরোপে যাঁহারা জ্ঞানে প্রাণে হৃদয়ে মহৎ তাঁহারা অনেকেই য়ুরোপে ধর্মতন্ত্রের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। এইখানকার বিষয়ে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি খৃষ্টের মহত্ত্বের সহিত খৃষ্টান্ পাদরীদের সুরের পার্থক্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদরীরা যে পৃথিবীর অপমানিতের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন নাই, এই ক্ষোভ তাঁহার পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। (ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী, ত-বো-প ১৩১৯ পৌষ, পৃঃ ২২৩-২২৪)।

সাহিত্যিকদের সহিত মেলামেশা, ইংরেজিতে নিজ রচনার অনুবাদ করা, পত্রধারা ও প্রবন্ধাবলী লেখায় তাহার দিনগুলি ঠাসা। ইহার মাঝে মাঝে বিলাতের শিক্ষাপ্রণালী দেখিতেছেন, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, বিতর্ক শুনিতেছেন, এবং নিজ দেশের মধ্যে তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। ষ্টাফোর্ডশায়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি গ্লচেষ্টারসায়ারে চ্যাল্‌ফোর্ড নামক স্থানে কয়েকদিন বেড়াইতে যান। এটিও গ্রাম। বাটার্টন, চ্যাল্‌ফোর্ড প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শনের উদ্দেশ্য কেবল বিশ্রামসুখ নহে, বিলাতের চাষীর অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়। বাঙলাদেশের গ্রামের প্রতি তাঁহার কর্তব্যের কথা তিনি ভুলেন নাই।

চ্যালফোর্ড হইতে তিনি 'শিক্ষাবিধি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষার ও বিলাতের শিক্ষার মধ্যে মূলগত ভেদ কোনখানে তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে সমাজের যুগযুগান্তের সংস্কারের বোঝা রহিয়াছে; পশ্চিম হইতে আবার যে শিক্ষা আসিয়াছে তাহাও সংস্কারমুক্ত নহে, উহাও রাজকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ছাঁচে-ঢালা; মোট কথা আমাদের 'সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল ও রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে-পরিমাণ বাঁধিতেছে সে-পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না'—ইহাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত।

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি—অর্থাৎ ১৯১২ সালের, তখনো 'জাতীয়' শিক্ষা লইয়া দেশের মধ্যে স্বদেশীযুগের আন্দোলন একেবারে নির্বাপিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এককালে উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রগতিপরায়ণ মন সে-যুগের সেই অভাবাত্মক জোড়াতালি দেওয়া 'জাতীয়' শিক্ষার সৌধনির্মাণে উৎসাহ হারাইয়াছিল; তাই তিনি লিখিতেছেন, " 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে-শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানাভাবে চালিত হইতেছে তাহাই 'জাতীয়' বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হোক আর বিজাতীয়ের শাসনে হোক যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারি না—তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।" সেইজন্যই তিনি প্রবন্ধের অন্যত্র বলিতেছেন, "যেমন করিয়াই হোক আমাদের দেশের বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীর মুক্ত করিতেই হইবে।" (প্রবাসী ১৩১৯, আশ্বিন পৃঃ ৫৮৭-৫৯০)

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকখানা কপি টাইপ করা হয় এবং তাহাই হাতে হাতে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিককে দেখানো হয়। য়েটস ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিতে রাজি হন ও রোদেনষ্টাইন ঠিক করেন উহা 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' হইতে প্রকাশিত হইবে। কয়েক বৎসর পূর্বে হ্যাভেল, আর্ণলর্ড, রোদেনষ্টাইন প্রভৃতির চেষ্টায় এই সমিতিটি স্থাপিত

হইয়াছিল। ইণ্ডিয়া সোসাইটি হইতে যখন গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল—তখন রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া আমেরিকা চলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হইবার মুখে গ্রন্থখানি সম্বন্ধে যেসব সমালোচনা ইংরেজি কাগজে বাহির হয়, তাহার সবই তিনি আমেরিকায় বসিয়া দেখিতেছিলেন। ইংলণ্ডে তখনো তাঁহার পরিচিত বন্ধুর সংখ্যা খুব অল্প।

'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হইবার পূর্বে উহার টাইপ-কপি ষ্টপফোর্ড ব্রুকের হাতে পড়ে। সেই উপলক্ষ্যে তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স বোধহয় সত্তরের উপর। রবীন্দ্রনাথ ঐ সাহিত্যিক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে তাঁহার 'বিলাতেরচিঠি'তে লিখিয়াছিলেন (প্রবাসী ১৩১৯, কার্ত্তিক)। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—"ইঁহার শরীর মনে বার্ধক্য তাহার জয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য ইঁহার নবীনতা। আমার বার বার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায় তখনই তাহাকে সকলের চেয়ে ভাল দেখা যায়। কেননা সেই যৌবনই সত্যকার জিনিষ।" ষ্টপফোর্ড ব্রুক সম্বন্ধে যে-কথা পঁচিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, সে-কথা আজ তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োজ্য; তাঁহার বার্ধক্যও আজ যৌবন সৌন্দর্যে মণ্ডিত। আর একটি বিষয়ে এই দুই মনিষীর বার্ধক্যে মিল দেখিতেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "ইঁহার ধর্মোপদেশ ও কাব্যসমালোচনা আমি পূর্বেই পড়িয়াছি। সেদিন দেখিলাম, ছবি আঁকাতেও ইঁহার বিলাস। ইঁহার আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঘরের কোণে অনেক জমা হইয়া আছে। এগুলি সব মন হইতে আঁকা। আমার চিত্রশিল্পী বন্ধু এই ছবিগুলি দেখিয়া বিশেষ করিয়া প্রশংসা করিলেন। এ ছবিগুলি যে প্রদর্শনীতে দিবার বা লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহা নহে, ইহা নিতান্তই মনের লীলামাত্র।" রবীন্দ্রনাথের বার্ধক্যেও ছবি আঁকা তাঁহার একটা বড় রকম আনন্দ, তাহা আমরা দেখিব।

ষ্টপফোর্ড ব্রুক তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাকে যে পত্রখানি লেখেন সেখানি আমরা দেখিয়াছি; তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

"I send back the poems. I have read them with more than admiration; with gratitude for their spiritual help, and

for the joy they bring and confirm and for the love of beauty which they deepen and for more than I can tell. I wish I were worthy of them."

সভাসমিতির বাহিরে যখন ঘনিষ্ঠভাবে নানামতের নানা মনিষীর সহিত তাঁহার এইভাবে পরিচয় হইতে লাগিল, তখন তিনি বুঝিলেন ইঁহাদের চিন্তা-ধারা কি ব্যাপক, চিন্তাপদ্ধতি কি দৃঢ়, সহানুভূতি কি গভীর! তাই লিখিতেছেন, "এখানকার মনিষী সম্প্রদায়ের মধ্যে একদলকে দেখিতে পাই যাঁহারা জাতীয় স্বার্থপরতা অপেক্ষা জাতীয় ন্যায়পরতাকেই সমাদর করিয়া থাকেন, তখন বুঝিতে পারি দেহের মধ্যে একদিকে ব্যাধির প্রবেশদ্বারও যেমন খোলা আছে তেমনি আরএক দিকে স্বাস্থ্যতত্ত্বও উদ্যমের সহিত কাজ করিতেছে। যতক্ষণ এই জিনিষটি আছে ততক্ষণ আশা আছে। এই শুভবুদ্ধিটিকে এখানকার ভাবুক লোকেদের অনেকের মধ্যে অনুভব করা যায়।" (প্রবাসী ১৩১৯, কার্তিক পৃঃ ৩)। তিনি আর একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "এদেশের যাঁহারা লেখক যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহাদের সংস্রবে যতই আসিলাম, ততই অনুভব করিতে লাগিলাম ইঁহাদের চিন্তার পথে ভাবের ঠেলাঠেলি অত্যন্ত প্রবল। (ত-বো-প [১৩১৯] ১৮৩৪ শক, কার্তিক পৃঃ ১৫৫)

ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজের সহিত তাঁহার পরিচয় খুব বেশি দিনেরও নয় খুব অন্তরঙ্গও নয় ; ক্ষণকালের দেখাসাক্ষাৎ মাত্র। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া তিনি বিস্মিত হইতেছেন—সেটা ইঁহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই পশ্চিম যে বড় হইয়াছে তাহা কেবল অস্ত্রশস্ত্রে ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নহে ; সে বড় তাহার চিন্তাশীলতায়। বাহিরের কাজের ক্ষেত্রে যেমন হাঁকাহাকি দৌড়াদৌড়ি, চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিই। কত হাজার হাজার লোক যে ঊর্ধ্বশ্বাসে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের চিন্তাধারা ও সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার মন এইসব মনিষীর মনের সহিত যুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল ছিল। সেই সুবিধা তিনি পাইলেন। একথা বলা বাহুল্য তিনিও যেমন তাঁহাদের কথাবার্তায়, ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কবির কথাবার্তা, আভিজাত্য-ব্যবহারে কম মুগ্ধ হন নাই।

ওয়েলস, রোদেনষ্টাইন, লোয়েস, ডিকিন্সন, বার্টারেণ্ড রাসেল প্রভৃতি মনিষীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ওয়েলস প্রায় রবীন্দ্রনাথের বয়সী; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দুই একখানি নভেল ও আমেরিকা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ (Future in America, 1906) পূর্বে পড়িয়াছিলেন। তাহা হইতেই ওয়েলসের তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। পরিচয় হইলে রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হইলেন যখন দেখিলেন 'মানুষটি সজারু জাতীয় নহে। ইঁহার প্রখরতা চিন্তায়, প্রকৃতিতে নয়।' মানুষের প্রতি ওয়েলসের আন্তরিক দরদ আছে ও অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং মানুষের সর্বজনীন উন্নতির প্রতি অনুরাগ আছে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "মানুষ এখানে সর্বদা প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া আছে, মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎসুক্যের অন্ত নাই।" (ঐ পৃঃ ১৫৬) মানুষের প্রতি ঔদাসীন্যের অভাবই ইঁহাদের মন এমন সৃষ্টিশীল হইয়াছে; মানুষের প্রতি ইঁহাদের অন্তরের টান দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদিগের প্রতি এমন আকৃষ্ট হইলেন। "ওয়েলসের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া এইটে বুঝিতে পারিলাম ইঁহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মানুষ; ইঁহাদের চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা তাহা ছুরির তীক্ষ্ণতার মত নহে তাহা সজীব তীক্ষ্ণতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা; তাহার সঙ্গে হৃদয় আছে, জীবন আছে।" (ঐ পৃঃ ১৫৭)

কেম্ব্রিজের কলেজ-ভবনে অধ্যাপক লোয়েস ডিকিন্সনের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ দিন দুই এর জন্য যান। ইনি 'জন চীনাম্যানের পত্র' বইখানির লেখক। সে-বইখানি যখন প্রথম বাহির হয় তখন স্বদেশী যুগের সুরু হইয়াছে। সমস্ত য়ুরোপের চিত্ত যেমন একই সভ্যতাসূত্রের চারিদিকে দানা বাঁধিয়াছে, তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এশিয়া এক সভ্যতার বৃন্তের উপর জাগিয়া উঠিবে এই কল্পনা ও কামনা ভারতবাসীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বইখানির একটি বিস্তৃত সমালোচনা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করেন; তখন তাঁহার ধারণা ছিল এই গ্রন্থের লেখক চীনা। এই বার লেখকের সহিত পরিচয় হওয়ায় তিনি প্রচুর আনন্দ লাভ করিলেন।

বার্টরেণ্ড রাসেল কেম্ব্রিজের অধ্যাপক, তিনিও সেখানে আসিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "ডিকিন্সন ও রাসেলের আলাপের আন্দোলন

আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল। গণিতের তেজে কাহারো মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারো মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে সেইটে আমার কাছে সবচেয়ে সরস লাগিল।" (পৃঃ ১৫৮)

চিত্রশিল্পী রোদেনষ্টাইন কেবল চিত্রকর নহেন, তাঁহার মনও বৃহৎ পট-ভূমির উপর সমস্যা ও সভ্যতাকে বিচার করিত। এইসব বন্ধুলাভ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আনন্দেই ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন।

কবি য়েটস রবীন্দ্রনাথকে বিলাতের সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত করিবার জন্য 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা লিখিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে পরিচিত করিলেন বাঙালী পাঠকের কাছে, কারণ অতি-আধুনিক ও জীবিত ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অনেক সময়ে ইঁহারা ধরা পড়েন না, সুতরাং নিতান্ত রসজ্ঞ ছাড়া তাঁহাদের সম্বন্ধে কাহারও কৌতূহল সাধারণত জাগ্রত হয় না। রবীন্দ্রনাথ য়েটস সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া সুইনবার্ণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বার্ণসের কথা ও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেন। তারপর বলিতেছেন, "এখানকার কাব্য-সাহিত্যের যুগে কবি য়েটস যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন তাহার গোড়াকার কথাটা * * * তাঁহার কবিতা তাঁহার সমসাময়িক কাব্যের প্রতিধ্বনি পন্থায় না গিয়া কবির নিজের হৃদয়কে প্রকাশ করিয়াছে। ঐ যে নিজের হৃদয় বলিলাম ওকথাকে একটু বুঝিয়া লইতে হইবে। হীরার টুক্‌রা যেমন আকাশের আলোককে প্রকাশ করার দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মানুষের হৃদয় কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সত্তায় প্রকাশ পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখনই সে আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়কে প্রতিফলিত করিতে পারে তখনি সেই আলোতে সে প্রকাশ পায় ও সেই আলোকে সে প্রকাশ করে। কবি য়েটসের কাব্যে আয়র্লণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে।" (প্রবাসী ১৩১৯ কার্তিক পৃঃ ৪৫)

য়েটস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও খাটে; সেইজন্যই মনে হয় এই দুই মহাকবি পরস্পরকে এত সহজে ও স্বল্পক্ষণের মধ্যে আত্মীয়বোধে নিকটে টানিয়াছিলেন।

অক্টোবরের (১৯১২) গোড়ায় ‘গীতাঞ্জলি’ ছাপা হইতেছে। ইতিমধ্যে কবি তাঁহার কবিতার একটা দ্বিতীয় ভাগ প্রেসে দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। একখানি পত্রে লিখিতেছেন “অনেকগুলোই তর্জমা করে ফেলেছি। তাতে নানা বিচিত্র রকমের কবিতা থাক্‌বে—খুব হাল্কা থেকে খুব গম্ভীর। ওর মধ্যে ‘ক্ষণিকা’ ‘মাতাল’ কবিতাটা পর্যন্ত দিয়েছি। আমার এই নানা সুরের কবিতাগুলো দেখে এরা আশ্চর্য বোধ করে—আমার এই মনিহারির দোকানে জিনিষ ত কম জমেনি।” এইটি তাঁহার ‘গার্ডনার’; ইণ্ডিয়া সোসাইটি হইতে ‘গীতাঞ্জলি’ প্রকাশিত হইবার একবৎসর পর ১৯১৩ অক্টোবরে ম্যাকমিলানরা এখানি প্রকাশ করেন।

এই সময়ে দেবব্রত মুখোপাধ্যায় কবির ‘ডাকঘর’ (The Post Office) ও কবি স্বয়ং ‘রাজা’র (The King of the Dark Chamber) অনুবাদ করেন। য়েটসকে তিনি দুইখানিরই পাণ্ডুলিপি পড়িতে দেন; য়েটস ‘ডাকঘর’কে আইরিশ থিএটরে অভিনয় করিবার জন্য উৎসুক হন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ‘রাজা’ই তাঁহার ‘সকল লেখার চেয়ে এঁদের ভাল লাগবে।’ একজন ফরাশী কবি এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি প্রুফে কবির ‘গীতাঞ্জলি’র তর্জমা পড়িয়াছিলেন। তিনি কবিকে বলেন, “তোমার মত কবির জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। আমাদের লিরিকে আমরা কেবল accidentalকে নিয়ে বদ্ধ হয়ে আছি, তোমার লেখা দেশকালের অতীত; চল তুমি আমাদের ফ্রান্সে চল সেখানে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে।” (পত্র পাণ্ডুলিপি)

চিরদিন দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথ কোনো কিছুর মধ্যেই বেশি দিন থাকিতে পারেন না। বিলাতের এই হট্টগোল, পার্টি, লঞ্চ, ডিনার, অনুবাদের কাজ ও তাহা লইয়া আলোচনা ও পরামর্শ—এইসব করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং আমেরিকা যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। ১৬ই অক্টোবর (১৯১২) লিখিতেছেন, “কথা ছিল আমার বই বের হয়ে গেলে তারপরে রওনা হব—কিন্তু আমার মন শান্তি চাচ্চে। আমি নিজের লেখা নিজের আলোচনা নিয়ে থাক্‌তে পারচিনে—এখানকার বন্ধন জাল কাটিয়ে আবার একবার মুক্তিলাভ করবার জন্যে সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

আমি শিলাইদহের নির্জনঘরে বসে 'গীতাঞ্জলি'র তর্জমা করছিলুম সে আমার আপন মনের আনন্দে করছিলুম। সেই বিজনতা থেকে একেবারে মানুষের ভিড়ের মাঝখানে এসে পড়েছি—এখন যা কিছু করচি সে ত আনন্দের কাজ নয় সে তাগিদের কাজ। সে আমার বেশি দিন পোষাবে না।"

বিলাতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মন অনুবাদ, গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি নানা ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলেও ভারতের কথা, শান্তিনিকেতনের কথা তাঁহার অন্তরে জাগিতেছে। তিনি একখানা পত্রে লিখিতেছেন, "আমার এ চিঠি যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছবে তখন শিউলি ফুলের গন্ধে তোমাদের বন আমোদিত হয়ে উঠেছে এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত শারদশ্রীর সোনার পদ্মবনের আশ্চর্য শোভা ধরে দেখা দিচ্ছে। আমাদের দেশের আকাশ আমাদের কাজ ভোলায়; আকাশ আপনার সমস্ত জানলা দরজা এমন করে অহোরাত্র খুলে রেখে দিয়েছে যে মন সে নিমন্ত্রণ একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। আমাদের বৈষ্ণব কাব্যে সেইজন্তেই যে-বাঁশি বাজে সে-বাঁশি কুলবধূর কাজ ভুলিয়ে দেয়—সে আমাদের সমস্ত ভালমন্দ থেকে বাহির করে আনে। কিন্তু এমন কথা এদেশের লোকে মুখে আনতেই পারে না—এমনকি ভগবান্ আমাদের ভোলাচ্চেন একথা শুনলে এরা কানে হাত দেয়! কেননা এদের আকাশে এই বাণীর লেশমাত্র নেই। আমাদের আকাশ যে ছুটির আকাশ, এদের আকাশ অপিষের আকাশ। এদের আকাশে ঘণ্টা বাজে, আমাদের আকাশে বাঁশি বাজায়। সেইজন্য এরা বলে জীবন সংগ্রাম, আমরা বলি জীবন লীলা।" (পত্র নং ২)।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা অহর্নিশি জাগিতেছে; সেখানকার ছাত্রেরা কিভাবে থাকিবে সে-সম্বন্ধে পত্রে তিনি অধ্যাপকগণকে উপদেশ দিতেছেন। ছাত্রদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিভাবে হইতে পারে সেই বিষয়ে তাঁহার ভাবনার অন্ত নাই। তিনি লিখিতেছেন, "আমরা যার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছি তাকেই হারিয়ে বসেছি—ঈশ্বর যা আমাদের দিয়ে বসেছেন তা আমাদের তুলে নেবার শক্তি নেই—এই জড়তাটার খোলস ভেঙে ফেলে ছেলেদের মন যাতে ডিমের ভিতর থেকে মুক্ত জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, এখানকার মাটিতে জলেতে আলোতে অবাধে সঞ্চরণ করার অধিকার লাভ করে, এইটে আমি একান্ত মনে কামনা করি। * * বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এবং শিক্ষকদের

সঙ্গে ছাত্রদের হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগই আমাদের বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড় বিশেষত্ব।" (পত্র নং ৩, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১২)

লণ্ডনবাসকালে অক্টোবর মাসের শেষদিকে তিনি কর্ণেল এন পি সিংহের নিকট হইতে স্থরুলের কুঠিবাড়ী ক্রয় করেন। তিনি লিখিতেছেন "রথীকে যে-জিনিষ নিয়ে আলোচনা করতে হবে তার জন্য ঐ বাড়ী ও বাগানের দরকার। * * রথীর জন্য জমি সংগ্রহ করে বাড়ী ও ল্যাবরেটারি তৈয়ারী করতে বিস্তর খরচ পড়বে এবং সে খুব সম্ভব আমার সাধ্যাতীত হবে; এইজন্য আমার আর্থিক দুর্গতি সত্বেও এই বাড়ী কিন্‌তে হলো। রথীকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে আমি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হব। সেই প্রলোভনেই আমি নিতান্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এই একটি কীর্তি করে বসে আছি।" (পত্র নং ৮)। রথীন্দ্রনাথ যাহাতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে যুক্ত হন, একটি বিজ্ঞানাগার খুলিয়া তাহাতে গবেষণা করেন এই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন। পরে আমরা দেখিব স্থরুলের কুঠিতে তিনি সকল প্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন; উত্তর কালে সেই স্থান বিশ্বভারতীর গ্রাম-সংস্কার বিভাগের কেন্দ্র হয়। রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কাজে পরে আত্মনিয়োগও করিয়াছেন।

পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথ অর্শরোগে বহুকাল ভুগিতেছেন, বিলাতে গিয়াও ব্যাধি কমে নাই। পত্রে লিখিতেছেন, "অ্যালোপাথদের মতে এরোগে অস্ত্রাঘাত ছাড়া অন্য পন্থা নেই। তাহলে আমাকে অন্তত একমাস হাসপাতালে শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে। সেটা আমার ভাল লাগ্‌ছে না। তাই ঠিক করেছি আপাতত কিছুদিন আমেরিকার ডাক্তার গ্ঢাশের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাব, তাতে যদি ফল না পাই তখন অস্ত্রচিকিৎসা করালেই হবে।" (পত্র নং ৭, ১৬ অক্টোবর ১৯১২) হোমিওপ্যাথি কবি নিজে খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছেন এবং ঔষধ দেওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দও পাইতেন; এ বিষয়ে হাতযশও ছিল। পূর্বে আমরা বলিয়াছি লণ্ডন তাঁহার আর ভাল লাগিতেছিল না; এমন কি ইণ্ডিয়া সোসাইটি হইতে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হইবার জন্য অপেক্ষাও তিনি করিতে পারিতেছিলেন না; তিনি সপরিবারে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। জুন মাসের মাঝামাঝি হইতে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চারিমাস বিলাতে ছিলেন।

২। মার্কিন রাজ্যে

য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে দুইবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমেরিকায় এই তাঁহার প্রথম যাত্রা। ২৭শে অক্টোবর (১৯১২) তাঁহারা নিউইয়র্ক পৌঁছাইলেন। কিন্তু এ সমুদ্রযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বের সমুদ্রযাত্রা হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। পত্রে লিখিতেছেন, "সমুদ্র যেরকম অশান্ত ছিল এমন আর কখনো আমি দেখিনি। * * এবার আমাদের আটলান্টিকের এই ঝুলনযাত্রা আমরা ইহজীবনে কখনো ভুলতে পারব না।" (পত্র নং ৯) আর একখানি পত্রে বেশ রসাইয়া লিখিতেছেন, "সমুদ্র আমাকে যেন তার ঝুমঝুমি পেয়েছিল—দু'হাতে করে ডাইনে বাঁয়ে নাড়া দিয়েছিল, ভেবেছিল কবির পেটের মধ্যে ত্রিপদী চতুষ্পদী যা কিছু আছে সমস্তয় মিলে একটা হট্টগোল বাধিয়ে তুলবে—কিন্তু উলটে পালটে খানাতল্লাসী করে জঠরের মধ্য থেকে ছন্দোবন্ধের কোনো সন্ধানই যখন পাওয়া গেল না, তখন মহাসমুদ্র আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন।" (প্রবাসী ১৩২০ শ্রাবণ, পৃঃ ৪৬৩; পত্র নং ১০)।

আমেরিকায় নামিয়া তাঁহারা ইলিনয় যাত্রা করেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; সেই সূত্রে ইলিনয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সহিত পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় ও সেই পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র হইতেছে আর্বানা (Urbana)। বাসা করিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ওঠেন অধ্যাপক ক্রকসের বাড়িতে, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী ওঠেন অধ্যাপক সীমুরের বাসায়। তারপর বাসা বাঁধিলেন। "বাড়িটি ছোটখাটো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিভৃত নিরালা। এখানে দাসী'চাকর পাওয়া যায় না,—যারা ঘরের কাজ করে * * তারা ভৃত্য নয়—অনেক ভদ্র গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা এই করে খরচ চালিয়ে দেয়। * * এখানকার অধ্যাপক সীমুরের বাড়িতে একজনও চাকর নেই, তাঁরা স্বামী স্ত্রী মিলে ঘরের সমস্ত ছোট খাটো কাজ আদ্যোপান্ত নিজের হাতে করেন।" (পত্র নং ১১)

আর্বানায় কবির মন বেশ বসিয়াছে। কোথাও কোনো গোলমাল নেই—আকাশ খোলা, আলো অপর্যাপ্ত, অবকাশ অব্যাহত—মাঝে মাঝে ভুলে যান যে আমেরিকায় আসিয়াছেন। মনে করিতেছেন 'কিছুদিন সব রকম লেখা থেকে ছুটি নিয়ে আরামে কেবল কষে বই পড়বেন।' (পত্র নং ১২) অজিত-কুমারকে সেইদিন একখানি পত্র লিখিতেছেন, "অনেক দিন পরে ক্ষুদ্র নিজের সঙ্গ ত্যাগ করে আবার যেন হৃদয়ের মধ্যে ভূমার স্পর্শ উপলব্ধি করচি।"

আর্বানায় তিনি যে নিশ্চিন্ত শান্তি পাবেন আশা করিয়াছিলেন, তাহাও শীঘ্রই ভঙ্গ হইল। সপ্তাহ দুই কাটাইবার পূর্বে স্থানীয় Unitarian বা একেশ্বরবাদীদের এক পাদরী মিঃ ভেইল (Vail) রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের ক্লাবে উপনিষৎ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 'বিশ্ববোধ' নামে তাঁহার বাঙলা প্রবন্ধের একটি ইংরেজি অনুবাদ (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কৃত) তাঁহার কাছে ছিল; সেই লেখাটাই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া Unity Club-এর গির্জায় পাঠ করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অধ্যাপকগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। আমার ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের ভাল লেগে গেল। তার ফল হল এই যে আগামী রবিবারের (১৭ই নভেম্বর ১৯১২) জন্য তাঁরা বলতে অনুরোধ করেছেন। এবারে 'আত্মবোধে'র বিষয়টা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। ইংরেজি লিখ্‌তে আমার বিলম্ব হয়, কষ্ট হয়— তবু প্রতিদিন অল্প অল্প করে লিখে ফেলেছি।' ইতিমধ্যে Wisconsin ও Iowa তাঁকে আহ্বান করিয়াছে; পত্রে লিখিতেছেন, 'যদি যাই তবে নিশ্চয়ই বক্তৃতা করতে বলবে তখন এই প্রবন্ধ দুটো ব্যবহার করতে পারব।' অজিতকুমার যেটা পাঠিয়েছিলেন সেটাকেও বক্তৃতার ছাঁচে ফেলে কাজে লাগাবেন স্থির করিলেন। 'এখানকার বক্তৃতাপিপাসুদের তাড়ায় আমাকে যদি বৃদ্ধ বয়সে ইংরেজি প্রবন্ধ লেখায় প্রবৃত্ত করায়, ইস্কুলে যেটা ফাঁকি দিয়েছি সেইটে যদি সুদে আসলে শোধ করিয়ে নিতে চায় তা হলে বড় মুস্কিল হবে।' (পত্র নং ১৪)

নূতন কাজের বোঝা তাঁহার খুব অপ্রীতিকর হয় নাই; পর পর চারিটি প্রবন্ধ তৈয়ারী করিয়া ফেলিলেন। তিনি লিখিয়াছেন বিলাতে তাঁর সময় যায় পদ্য সাহিত্য তর্জমায়, আমেরিকায় দিন যায় গদ্যসাহিত্য রচনায়। আশ্চর্যের বিষয় আমেরিকায় যে ছয়মাস ছিলেন একটি মাত্র গান ছাড়া কবিতা লেখেন

নাই ; এটা একেবারে গম্ভর যুগ চলিতেছে। এত কাজের মধ্যেও মন যেন খুশী নয়। লিখিতেছেন, "কবে এবং কোনখানে গিয়ে থামতে পারব কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে—মনে হচ্চে এই একটা আবর্তের সৃষ্টি হলো * * অথচ আমার মন চায় ছুটি। আমার কোন মন যে কাজ করে এবং কোন মন যে ছুটি খোঁজে তা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি।" "এমনতর আত্মবিরোধ জগতে বোধ হয় খুব অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়।" (পত্র নং ১৬)*

য়ুনিটেরিয়ানদের Unity Club এ চারি সপ্তাহে চারিটা বক্তৃতা দিলেন—শেষ বক্তৃতা দিলেন ৩রা ডিসেম্বর। দুই একজন শ্রোতা Evil সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলাতে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে পুনরায় লিখিতে সুরু করেন। "ইংরেজি প্রবন্ধ রচনার জাল ক্রমশই আমাকে ঘনিয়ে ধরবার উদ্যোগ করচে।'

১৩১৯ সালের কার্তিকের মাঝামাঝি (Oct 1912) রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি সংস্করণ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইল। পূর্বে বলিয়াছি ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' (Song offerings) বাঙলা 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ নহে ; ইহার মধ্যে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া'র কবিতা আছে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানের যেগুলি শ্রেষ্ঠ সেইগুলি ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হইবামাত্র ইংলণ্ডের সাহিত্য মহলে একটি অভাবনীয় আনন্দ ও উৎসাহ দেখা দিল ; সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো একখানি বই বিদেশীভাষা হইতে রূপান্তরিত হইয়া কোনো দেশে এপর্যন্ত এমনভাবে মানুষের চিত্তকে মথিত করে নাই একথা সমসাময়িক সকল পত্রিকা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা যে কেবল আধ্যাত্মিক কাব্য হিসাবে লোকের মনকে অধিকার করিল, তাহা নহে ; কাব্য হিসাবে অনবদ্য বলিয়া ইহা এমনভাবে আদৃত হইয়াছিল। সমসাময়িক 'টাইমস' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, ইহার সরলতা ইহার প্রধান গুণ, ভাষার আড়ম্বরে ভাব কোথাও আচ্ছন্ন হয় নাই ; ইহার মধ্যে বিদেশী গন্ধ নাই, ইংলণ্ডের কবিরাও এরূপ লিখিতে পারিতেন যদি তাঁহারা সেই ভাব ও আইডিয়া (emotion and idea)-লোকে উঠিতে পারিতেন।

* এইখানে বসিয়া 'শারদোৎসবে'র ইংরেজি তর্জমা করেন। (চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, প্রবাসী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৯৬)।

দর্শন হইতে ধর্মের বিচ্ছেদ আজ য়ুরোপকে যে ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া গিয়াছে, তাহারই অভাব আজ সাহিত্য-জীবনে পরিস্ফুট সে-কথা চিন্তাশীল লেখকরা স্বীকার করিলেন। সেইখানে তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব দেখিলেন, তিনি বিশ্বকে যে সমষ্টির চোখে দেখিয়াছেন তাহাই কাব্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে। (Times Literary Supplement Nov. 7. 1912).

এজরা পাউণ্ড একজন খ্যাত ইংরেজ কবি; তিনি লিখিলেন, ইংরেজি কাব্য এমনকি পৃথিবীর কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রবেশ একটি বিশেষ ঘটনা; তিনি আশা করিয়াছিলেন যে বাঙলাদেশের মনীষার সহিত তাঁহাদের একটি যোগের সূত্রপাত সেইদিন হইল।

মে সিন্‌ক্লেয়ার একজন ইংরেজ বিদুষী ও ঔপন্যাসিক—ইংরেজি সাহিত্যিক মহলে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বেশই। তিনি রোদেনষ্টাইনের বাড়ীতে য়েটস যেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি পড়েন, সেদিন উপস্থিত ছিলেন; তিনি সেদিনকার সন্ধ্যার কথা স্মরণ করিয়া লেখেন, 'রোদেনষ্টাইনের বৈঠকখানাটি সেদিন মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। সুইনবার্ণের কবিতার সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলিলেন যে সুইনবার্ণ হইতেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য অধিক মিষ্ট। শেলির intensity ও subjectivity এবং দার্শনিকত্ব হইতে ইহা সুন্দরতর। তাঁহার মতে কোনো পাশ্চাত্য কবিকে রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা করা যায় না; মিলটন মানুষের হৃদয়ের পক্ষে অত্যন্ত গুরু গম্ভীর; এমনকি ওয়ার্ডসবার্থ নয়, কারণ তিনি অত্যন্ত জটিল ও ponderous। তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে ইংলণ্ডের যাবতীয় মরমিয়া কবিদের সহিত তুলনা করিয়া বলিলেন কাহারও সহিত রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র তুলনা হয় না। (Evening Post N. Y. 24 May 1913.)

Poetry নামক কাগজে বাহির হয়—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বাঙলা হইতে ইংরেজিতে অনূদিত তাঁহার কবিতার প্রকাশ ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে, বিশ্বের কবিতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।" "আন্তরিক গভীর বিশ্বাসের সহিতই আমি এই কথা বলিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের লণ্ডনে আগমন-হেতু পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে সখ্য নিকটতর হইয়া আসিল।"

টাইমস বিলাতের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাগজ। তাহাতে বৎসরের শেষ

দিনে সমস্ত বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনার আলোচনা থাকে। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯১২, যে বার্ষিক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সাহিত্য বিভাগে কবিতা সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল—"কবিতায় এ বৎসরে অনেকেই ভারতীয় ঋষি-কবিই (Indian mystic) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার স্বকৃত অনুবাদগুলিকেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন।" (প্রবাসী ১৩১৯ ফাল্গুন, পৃঃ ৫৪০)।

আমেরিকায় বাসকালে কবিকে রোদেনষ্টাইন এক পত্রে লেখেন, "People have felt your work more than ever I dared to hope and more than you yourself will readily believe. A friend sent the book as a gift to Mrs. Watts, the wife of G. F. Watts, the painter, and she wrote that your book has brought her closer to her great husband (dead now some dozen years) than ever since she lost him."

এ ধরণের কত পত্র যে কবি সে-সময়ে ও পরে ম্যাক্‌মিলান বইখানিকে প্রকাশ করিলে পাইয়াছিলেন তাহার হিসাব নাই।

আমেরিকা থাকিতে রোদেনষ্টাইনের নিকট হইতে খবর পাইলেন যে ম্যাকমিলান কোম্পানী তাঁহার গ্রন্থের প্রকাশক হইতে রাজি হইয়াছে। * এই সংবাদে তিনি বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হন; শান্তিনিকেতনের ব্যয় ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছিল, এবং তাঁহার দেনার অঙ্কও সেইসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিয়াছিল। বিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা যে এই পুস্তক বিক্রয় হইলে কিয়দপরিমাণ দূর হইবে এই ভরসা তাঁহার হইয়াছিল।* *

শান্তিনিকেতনের দুর্বহ ভার দূর করিবার জন্য 'পাঠসঞ্চয়' নামে একখানি গদ্য

---

* এ বিষয়ে Rothenstein লিখছেন—Since only a limited edition of *Gitanjali* had been printed, I wrote to George Macmillan, with a view to his publishing a popular edition of *Gitanjali*, as well as other translations which Tagore had made; Macmillans, after some hesitation, finally published all Tagore's books, to his profit, and their own."—Men and Memories. p. 268

* * রাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র; প্রবাসী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ, ১৯৯।

সঞ্চয় গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য হইতে চয়ন করিয়া সম্পাদিত হয়। আশা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বইটা কোনোখানে 'পাঠ্য'শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন। আমেরিকায় খবর পাইলেন বিশ্ববিদ্যালয় সে-বই পাঠ্যরূপে নির্দেশ করেন নাই। ইহাতে কেহ কেহ ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করিলে কবি তদুত্তরে লিখিলেন, "আমার বই বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুর হল না এতে তোমরা রাগ করচ কেন? যারই বই না মঞ্জুর হত সেই ত বেজার হত এবং মনে করত অবিচার করা হয়েছে। * * হয়ত আমার বইএর ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের প্রবেশগম্য নয়।" এই বই ছাপাতে যে সামান্য খরচ হইয়াছিল, তাহাও বিদ্যালয়ের পক্ষে বহন করা তখন সাধ্যাতীত ছিল। এইসব ছোট খাটো বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার শেষ ছিল না। বিদ্যালয়ের কথা তাঁহার সর্বদাই ধ্যানে জ্ঞানে রহিয়াছে। রথীন্দ্রনাথকে তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিবার জন্য ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল রথীন্দ্রনাথ কিছুকাল ইলিনয়ে অধ্যয়ন করিয়া বিলাতে গিয়া কেম্ব্রিজে যোগদান করিবেন। এ সমস্তের উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে রথীন্দ্রনাথ বেশ রীতিমতভাবে ল্যাবরেটারি খুলে রিসার্চে লেগে যেতে পারেন। (পত্র নং ১৫) রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র ও জামাতা নগেন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য এবং ইচ্ছা ছিল তাঁহারা আসিয়া সেইসব কর্মে ব্রতী হবেন।

খৃষ্টমাসের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আর্বানায় আছেন। খৃষ্টোৎসবের দিন দুই আগে শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের উৎসব। এই উৎসবে তিনি কখনও অনুপস্থিত ছিলেন না; উৎসবের পূর্ব হইতে তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ৭ই পৌষের দিন তিনি আশ্রম হইতে ব্যবধানটি খুবই তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। একখানি পত্রে অজিতকে লিখিতেছেন; "স্বপ্ন দেখলুম, তোমাদের সকাল বেলাকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে—আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌচেছি, কিন্তু কেউ জানে না। তুমি তখন গান গাচ্চ, 'জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী'।" এমনতর সুস্পষ্ট স্বপ্ন তিনি অনেকদিন দেখেন নি। তখনো অন্ধকার যখন বিছানা থেকে উঠে এসে বসলেন। তাঁর শোবার ঘরে একপ্রান্তে কম্বল পেতে তাঁরা পাঁচজনে বসলেন। "তোমাদের ওখানে

তখন হয় ত সন্ধ্যার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। * * ৭ই পৌষের শুভদিন কি আমাকে একেবারে ঠেলে যেতে পারবে? আমার জীবনের মাঝখানে যে তার আসন পাতা হয়ে গিয়েছে। এই দিনটিকে যে আমি স্পর্শমণির মতো আমাদের আশ্রম থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।" (পত্র পাণ্ডুলিপি নং ২৫)

কিছুদিন থেকে তাঁর শরীর ভাল চলিতেছিল না; শান্তিনিকেতন থেকে যেসব খবর পাইতেছিলেন, তাহা আশাপ্রদ নহে; 'পাঠসঞ্চয়' পাঠ্যরূপে মঞ্জুর হয় নাই—সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন খবর আসিল আট হাজার টাকা দিয়া স্কুলের যে বাড়ি কিনিয়াছিলেন, তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তার জবাবে লিখিলেন "লোকসান জিনিষটাকে মর্মের মধ্যে বিঁধিয়ে রক্ত বিষাক্ত করে তোলবার দরকার নেই—যা গেছে তাকে যেতে দাও, যা এসেছে তাকে নিয়ে নাও এবং যেটুকু তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পার সেইটুকুই আদায় করে নাও।" সেইদিন একটা কবিতা লেখেন, কবিতাটা "কে নিবি গো কিনে আমায় কে নিবিগো কিনে?"*

এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখিতেছেন,"লেখা হয়ে গেলে তারপরে চেতনা হল এটা আমারই জীবনের ইতিহাস—আমার জীবন-দেবতা হাস্যমুখে সেইটা লিপিবদ্ধ করেছেন"। জীবনে কি রকম লাভের ব্যবসাটা যে আমি ফেঁদেছি তিনি বিষয়ী লোকের কাছে সেইটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। তোমরা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ, অনেক ঘোরাঘুরির পর শেষকালে নিঃসম্বল খরিদ্দারদের কাছে বিনামূল্যে কি রকম বিক্রিটা হলো।" (জানু ১৯১৩; পত্র নং ২৬)।

জানুয়ারীর (১৯১৩) শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ আর্বানা ত্যাগ করেন। শিকাগো যান; সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল Ideals of the ancient civilization of India। এ ছাড়া য়ুনিটেরিয়ানদের হলে The Problem of Evil সম্বন্ধেও বক্তৃতা ছিল। Dr. Lewis বলিয়াছেন তিনি যখন কবির বক্তৃতা শুনিতেছিলেন তাঁর মনে হইতেছিল তিনি যেন এমার্সনের বক্তৃতা শুনিতেছেন। শিকাগোতে বেশি দিন থাকা হয় নাই, কারণ তাঁহাকে রচেষ্টারে (Rochester, New Hampshire) উদার ধর্মমতীদের এক সভায় আমন্ত্রণ করিয়াছিল। এই সভায় পৃথিবীর নানা স্থান

* গীতিমাল্য নং ৩১। ভুল করে উহা জুলাই ১৯১২তে ইংলণ্ডে রচিত বলিয়া ছাপা আছে।

হইতে মনিষীরা আসিয়াছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অতিথি ছিলেন রুডলফ অয়কেন। অয়কেন জারমেনীর য়েনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক, বহুগ্রন্থের লেখক ; বিশেষভাবে তাঁহার The Problem of Life তাঁহাকে জগতের গুণী সমাজে সুপরিচিত করিয়াছিল। রচেষ্টারে যাইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অয়কেনকে 'গীতাঞ্জলি' একখানি উপহার পাঠাইয়াছিলেন। বৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি পাইয়া তাহা আন্তন্ত পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইয়াছিলেন। অজিতকুমারের সহিত অয়কেনের পত্র ব্যবহার ছিল এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা অজিতবাবুর নিকট হইতে জানিতে পারেন।

২৯এ জানুয়ারী ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ রচেষ্টার পৌছান। সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণে অয়কেনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। "তিনি দুই হাতে আমার হাত ধরে আমাকে খুব সমাদর করে গ্রহণ করলেন—বল্লেন ইণ্ডিয়া ও জারমেনী আমরা এক রাস্তায় চলছি।" ইঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথকে মনে পড়িতেছিল।

পরদিন (৩০এ জানু) রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হয় ; বিষয় Race Conflict ; সময় মাত্র কুড়ি মিনিট—কারণ বক্তা ছিলেন বহু। আমেরিকার Christian Registrar কাগজ বলেন যে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় মহাসভার সমস্ত সুর এক উচ্চ গ্রামে উঠিয়া পড়িয়াছিল। কংগ্রেস মঞ্চে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সাহিত্য-খ্যাতিসম্পন্ন বা অধিকতর উচ্চ ভাবপূর্ণ কথা বলিতে সক্ষম ব্যক্তি আর কেহ ছিল না।*

এই জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলেন, 'মানব ইতিহাসে জাতি সংঘাতের সমস্যা চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে ; সকল বড় সভ্যতার মূলে এই সংঘাত লক্ষ্য গোচর হয়। এইরূপ জাতিগত বৈষম্যগুলিকে যখন গণ্য করিতেই হয় এবং ইহাদের পাশ কাটাইয়া চলিবার যখন কোন উপায় থাকে না, তখন বাধ্য হইয়া মানুষকে এমন একটি ঐক্যসূত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যাহা সকল বিচিত্রতাকে এক করিয়া গাঁথিতে পারিবে। সেই অন্বেষণই যে সত্যের অন্বেষণ—বহুর মধ্যে একের অন্বেষণ, ব্যষ্টির মধ্যে

* প্রবাসী ১৩২০, জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ৭০ ; Modern. Review 1913, June.

সমষ্টির অন্বেষণ।" পূর্বকালে নানা প্রাকৃতিক বাধা, খাদ্যের অভাব, অনুকূল স্থানের অভাব মানুষকে স্বভাবতই সন্দিগ্ধ স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্য প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত 'ঘোরো' রকমের ;—স্বাতন্ত্র্যই তাহার মুখ্য প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে দেখাইলেন কিভাবে ভারতবর্ষ এই জাতি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাট মহাদেশ বিপুল বৈচিত্র্যকে সামঞ্জস্যে বাঁধিতে গিয়া এখানকার চিরন্তন আদর্শ ও অভিপ্রায় যুগে যুগে কিভাবে ভাঙাগড়া সঙ্কোচ ও প্রসারণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার আভাস তিনি এই প্রবন্ধে দেন। তিনি বলিলেন, "আজ যে সুসভ্য মানুষের সম্মুখে এই জাতি সংঘাতের সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবার কথা। বিশ্বমানবের চেতনার মধ্যে মানুষ যে নবজন্ম লাভ করিয়াছে, ইহাই এ যুগের সকলের চেয়ে গর্ব করিবার বিষয়।" "মনুষ্যত্বের মহা আহ্বান যখন সমুচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত, তখন মনুষ্যের উচ্চতর প্রকৃতি কি তাহাতে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে! জানি, শক্তি ও জাতীয় গর্বের মদোন্মত্ত উন্মাদনার উৎসব নিশীথে মানুষ সেই আহ্বানকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, তাহাকে শূন্য ভাবুকতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া ঠেলিয়া দিতে পারে—কিন্তু সেই মত্ততার মধ্যেই,—তাহার সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রতিকূল, তাহার প্রবল আক্রমণ যখন বিচারমূঢ় ও ন্যায়ঘাতী—সেই সময়েই, এই কথাই তাহার মানসপটে সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে যে নিজের অন্তর্নিহিত সর্বোচ্চ সত্যকে আঘাত করা আত্মঘাতের চরমতম রূপ। যখন ব্যূহবদ্ধ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যপরতা, পরজাতি বিদ্বেষ এবং বাণিজ্যের স্বার্থান্বেষণ অত্যন্ত অনাবৃতভাবে তাহার বীভৎসতম রূপ প্রকাশ করে, তখনি মানুষের জানিবার সময় উপস্থিত হয় যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাপকতর বাণিজ্যের আয়োজনে, কিম্বা সামাজিক কোন যন্ত্রবদ্ধ নূতন ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তি নাই। জীবনের গভীরতর রূপান্তর সাধনে, চৈতন্যকে সর্ব বাধা হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তিদানে এবং নরের মধ্যে নারায়ণের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই মানুষের যথার্থ মুক্তি।"

রচেষ্টার হইতে রবীন্দ্রনাথ বষ্টনে যান। বষ্টনের নিকটেই কেমব্রিজ সেখানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে বক্তৃতার জন্য তাঁহার আমন্ত্রণ হয়েছিল। প্রথম বক্তৃতা হয় ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৩। Woods

এখানকার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ; তিনি কবিকে বলেন যে 'আজকাল বিস্তর স্বামী উপাধিধারী অযোগ্য লোক এসে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা তা বক্তৃতা করাতে ভারতবর্ষের প্রতি এ অঞ্চলের লোকের শ্রদ্ধা একেবারে চলে গেছে। তারা শাস্ত্র এবং দর্শন কিছুই পড়েনি, কেবলমাত্র বিবেকানন্দের বুলি উল্টো পাল্টা করে আবৃত্তি করে কোনোমতে কাজ চালিয়ে দিচ্চে।' কবি এখানকার অনেক চিন্তাশীল লোকদের মুখে এদের সম্বন্ধে আলোচনা শুনে বড়ই দুঃখ অনুভব করেন। (পত্র নং ২৯)

আর্বানা থেকে বাহির হইয়া দুই চারিজন লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের মনে অল্প অল্প করিয়া আশা হইতেছে যে হয় ত চেষ্টা করিলে বিদ্যালয়ের আর্থিক অভাব কতকটা দূর হইতে পারে। অর্থ উপার্জনের কথা এই তাঁহার মনে প্রথম হইল এবং যেমন সে-কথা মনে উদয় হইল, অমনি সেই টাকা কিভাবে ব্যয় করিবেন তাহার লম্বা ফর্দও করিয়া ফেলিলেন। "আমার ইচ্ছা ওখানে দুই একজন যোগ্য লোক এক একটি ল্যাবরেটারি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন, তা হলে ক্রমশ আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে।" (পত্র নং ৩০) বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারে গবেষণার কথা তখনো এদেশে তেমনভাবে চিন্তিত হয় নাই। কবি হইয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের মধ্যে বিজ্ঞানের উপযুক্ত স্থান যে নির্দেশ করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার মনীষার অন্যতম প্রমাণ।

ইতিপূর্বে এণ্ড্রুজ সাহেব বিলাত হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ৯ই ফাল্গুন ১৩১৯ (২১ ফেব্রু ১৯১৩) শান্তিনিকেতনে আসেন ; ইহার কিছুকাল পূর্বে পিয়ার্সন আসেন। পিয়ার্সন আসিয়া ঠিক করেন শান্তিনিকেতনে জীবন উৎসর্গ করিবেন। ৩রা ফাল্গুন তারিখের পত্রে কবি লিখিতেছেন, "পিয়ার্সন যে শান্তিনিকেতনে জীবন সমর্পণ করবেন সে-সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ এদের চিত্তের সঙ্গে চরিত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।" (পত্র নং ২৯)

হার্ভার্ডে বক্তৃতাকালের অবসরের মাঝের কয়দিন তিনি নিউইয়র্কে আসিয়া

---

* প্রবাসী ১৩২০, জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ১৯৬-২০১ জাতিসংঘাত ; Modern Review 1913 April এর ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ অজিতকুমার চক্রবর্তী কৃত।

থাকেন। শিকাগোর শ্রীমতী মুডির একটি বাড়ীতে ছিলেন। হার্ভাডে প্রবন্ধপাঠ সম্বন্ধে তাঁহার মনে একটু দ্বিধা ছিল ; বিশেষত ভাষার সম্বন্ধে ; সেটা পরে কেটে যায়। "তবে কথা হচ্ছে, হার্ভাডে এখন যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী কেউ নেই—যাঁরা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার ভার নিয়েছেন, তাঁরা সকলেই ঘোর বিজ্ঞানী * * প্র্যাগমেটিজিমের হাওয়া খুব প্রবলবেগে বইচে—যদিও সে হাওয়া বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুকূল নয়, তবুও তাতে আইডিয়ালিজমকে খুব আঘাত করেছে। দেশের মধ্যে যে ভাবটা অত্যন্ত বেশি প্রবল তারই অনুকূল হাওয়াটা সেখানে স্বাস্থ্যকর নয়। এরা প্রখরভাবে কেজো বলেই আইডিয়ালিজম এদের নিতান্তই আবশ্যক—নইলে এদের কাজের ভিতরকার অর্থ এরা খুঁজে পাবে না।" (পত্র নং ৩১)।

হার্ভাডের বক্তৃতাগুলি শেষ করিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্ক ত্যাগ করিয়া শিকাগো চলিয়া গেলেন। নিউইয়র্কের হট্টগোল তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল ; কিন্তু শিকাগোতে কম কোলাহল নয়। সে যাহাই হোক বোধহয় আমেরিকায় টাকা পাইবার যে কল্পনা মাঝে বিদ্যুতের মত মনে হইয়াছিল, তাহা এখন দূর হইয়াছে। তাই সন্তোষচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "তোমাদের বিদ্যালয়ের ভিত তোমরা টাকা দিয়ে গেঁথে তুলতে চাও। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে নাড়ির যোগ রাখতে পারলে তবেই সত্যকার জীবনে একে বাঁচাতে পারবে—টাকার যোগ নয়। তোমরা সেই গরীবের ধন সেই সহজ আনন্দের পুষ্পমধুতে তোমাদের বিদ্যালয়টিকে ভর্তি করে রাখ। তোমাদের কার্পেট যদি না জোটে মাটির উপর খুসি হয়ে বস—খুসির চেয়ে নরম কার্পেট আর নেই। আমাদের শান্তিনিকেতনের যে কুঠরিতে সম্পত্তির দলিল এবং টাকার থলি আছে, সেইখানেই আমাদের শান্তিঘটে ছিদ্র হয়েছে—সেইখান থেকেই আনন্দ সঞ্চয় শূন্য হয়ে যাচ্চে। * * ধনের কালিমা শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে অশুচি করেছে ; আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ হবে তাকে ধুয়ে শুভ্র করে ফেলা—আমরা সেই সেবকের পদ গ্রহণ করব বলেই আশ্রমে এসেছি—অতএব টাকার চিন্তা ত্যাগ করে পুণ্যতীর্থজলের আয়োজন কর।" (পত্র নং ৩২) এই পত্র লেখেন ১৯১৩ সালের গোড়ায়, তারপর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

এইভাব থেকেই আর একখানি পত্রে রথীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "যেমন

করেই হোক কেবলমাত্র বিষয়ের জালে তাকে (রথীন্দ্রনাথকে) জড়িয়ে পড়তে দেব না। এমন কোনো একটা বড় আইডিয়ার কাছে তাকে আত্মনিবেদন করতে হবে যার সংস্রবে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং ধন সম্পদের মোহ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। অহরহ টাকার থলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে মানুষ আপনার মাহাত্ম্য ভুলে যায়। * * রথীকে তার থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমি এই সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলুম।" (পত্র নং ৩৩)।

স্থরুলের যে-বাড়ী কেনা হইয়াছিল, তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় জানিতে পারিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। রথীন্দ্রনাথের জন্য সেখানে Biological Laboratory করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বাড়ীটিকে বিক্রয়ের জন্য লিখিলেন। "আমার ত মনে হয় যদি কিছু বেশি দামে বিক্রি করা সম্ভব হয়, তাহলে সে টাকাটা বিদ্যালয়ের কাজে লাগাতে পারবে। নিতান্ত যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে আট হাজারেই বিক্রি করে সিংহদের দেনা শোধ করে দিয়ো।" (পত্র নং ৩৩)।

শিকাগো থেকে ১০ই মার্চ (১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ আর্বানায় ফিরিলেন ও সেখানে একমাস বাস করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে রথীন্দ্রনাথের কোর্স আর কয়েকমাসেই শেষ হইত, কিন্তু তাহা হইল না; রবীন্দ্রনাথ বিলাতে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, আমেরিকায় প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে, মন ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকা হইতে চৈত্র মাসের শেষে রওনা হইলেন। "নববর্ষের প্রথম দিন সমুদ্রযাত্রার মাঝখানে এসে দেখা দিল। প্রত্যেক বারে আমার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেছি কিন্তু এবার আমার পথিকের নববর্ষ, পারে যাবার নববর্ষ। * * তাই এবারকার নববর্ষের দিন মনকে বারবার বলিয়ে নিলুম, মন চলতে হবে, * * যদি সামনের মুখে চলবার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দেওয়া যায় তাহলেই মিথ্যার মায়া কাটানো সহজ হবে—তাহলেই, কে কি বলচে, কে কি ভাবচে, কিসে কি হবে এসব কথা ভাবনার একেবারে দরকার হবে না।" (পত্র নং ৩৭)।

লণ্ডনে আসিয়া পুরাতন বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইতিমধ্যে ম্যাকমিলান কর্তৃক 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হওয়ায় উহার খ্যাতি খুবই হইয়াছিল;

পত্রিকাদিতে সমালোচনার অন্ত ছিল না : মোটকথা ১৯১৩ সালের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে 'গীতাঞ্জলি' পড়ে নাই এমন ভদ্র শিক্ষিত লোক ছিল কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার সাহিত্যখ্যাতি সর্বত্র সুপরিচিত।

কিন্তু পশ্চিমে তাঁহার যশোরশ্মি যতই বিকীর্ণ হউক, দেশে তাঁহার সম্বন্ধে একদল লোকে খুবই তীব্র ও বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি কিভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল ও 'সাহিত্য' পত্রিকা তাঁহাকে বহুকাল ধরিয়া পীড়ন করিয়াছিলেন। সে রেশ এখনো মিটে নাই এবং নূতন পুরাতন বহু লেখক এই সময় হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহাকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিবার জন্য অর্থ সামর্থ্য উভয়ই নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন।

নববর্ষের পত্রের মধ্যে তিনি যে লিখিয়াছিলেন, কে কি বলছে, কে কি ভাবচে এসব কথার ভাবনার দরকার হবে না—সেকথা ঠিক নহে—কারণ তিনি ভাবিতেছেন দেখা যায়। বাহিরের আঘাত বা আপ্যায়ন দুইই তাঁহাকে স্পর্শ করে। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ (১৭ই মে ১৯১৩) লণ্ডন হইতে তিনি লিখিতেছেন "তোমাদের সমাজে একটা লড়াইয়ের দিন এসেছে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহসত্বেও আমাকে বোধহয় হার মানতে হবে। তোমরা যখন দস্যুর আক্রমণে পড়েছ, তখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি ভগবান অপহরণ করেছেন—জয়ী হবার গৌরব আর আমার সইবে না, এখন পরাভবের তলায় নেমে মাটির উপরে আসন নেবার সময় এসেছে। হাতের কাজ যা ছিল তা এক রকম চুকিয়েছি—এবার পায়ের কাজ, এখন বিদায়ের রাস্তায় চলতে হবে, ধূলোর উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। অতএব বোঝা হাল্‌কা ক'রে যাত্রা করা যাক—এখন আর পিছু ডেকো না।" (প্রবাসী ১৩৩২ ভাদ্র পৃঃ ১৯৬) এ কথা বলা বাহুল্য এই মনোভাব সাময়িক দুর্বলতার লক্ষণ।

কিছুকাল হইতে বিপিনচন্দ্র পাল বাঙলা সাময়িক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা বস্তুতন্ত্রহীন ; তাঁহার অভিযোগ সত্যকার জগত বা বস্তুর সহিত রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কখনো সৃষ্ট হয় নাই ; তিনি ধনীর পুত্র, জমিদার, বাঙলার পল্লীজীবনের মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা করিতে পারেন নাই।

ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বলিবার অধিকার নাই; কারণ সেখানে তিনি গুরু বরণ করেন নাই। তাঁহার ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা আছে বটে, কিন্তু তিনি অধ্যাত্ম সত্য উপলব্ধির জন্য কেবল স্বানুভূতির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন। শাস্ত্র এবং গুরুর বহিঃপ্রামাণ্যের অপেক্ষা রাখেন না—সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনাকেও বিপিনচন্দ্র বস্তুতন্ত্রহীন বলিয়া আখ্যাত করেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার সময়ে (বঙ্গদর্শন ১৩১৮ চৈত্র)। অজিতকুমার ইহার উত্তর দেন 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্র-হীন'? (প্রবাসী ১৩১৯ আষাঢ়)। সেই হইতে বঙ্গসাহিত্যে এইসব বিষয় লইয়া সমুদ্রমন্থন চলিতেছিল। তাহারই সংবাদে তাঁহার মন সাময়িক-ভাবে বিষাদাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

৩। পুনরায় বিলাতে

লণ্ডনে মাস দেড়েক কাটিয়া গিয়াছে। জুন মাসের (১৯১৩) গোড়া হইতে তাঁহাকে ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা দিতে হয়; শিকাগো ও হার্ভাডে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি মার্জিত ও পরিবর্ধিত করিয়া এইখানে পাঠ করেন। বক্তৃতাগুলি পরে 'সাধনা' (Sadhana) নামে গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এগুলি রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' ও বিশেষভাবে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থমালার মধ্যে প্রকাশিত আধ্যাত্মিক জীবনসম্বন্ধে তাঁহার মত অবলম্বনে পাশ্চাত্য শ্রোতাদের উপযোগী করিয়া নূতনভাবে লিখিত প্রবন্ধ। সমসাময়িক পত্রিকাসমূহ পাঠ করিলে দেখা যায় 'সাধনা'র বক্তৃতাগুলি ইংলণ্ডের সুধীসমাজের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইংলণ্ডে আসিয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সাধনা হইয়াছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে য়ুরোপের সম্মুখে অনাবৃত করা। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া য়ুরোপের যুবপ্রাণের

অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে কোনো দিন নিন্দা করেন নাই। তিনি এই বক্তৃতা দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেন—

১। ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্বন্ধ (The relation of the Individual to the Universe)

২। আত্মবোধ (Soul Consciousness)

৩। পাপ (The Problem of Evil)

৪। আত্মসমস্যা (The Problem of Self)

৫। ভক্তিযোগ (Realisation in Love)

৬। কর্মযোগ (Realisation in Action)

৭। সৌন্দর্যবোধ (Realisation in Beauty)

৮। বিশ্ববোধ (Realisation of the Infinite)

ষষ্ঠ প্রবন্ধটি তাঁহার কর্মযোগ প্রবন্ধের অনুবাদ; সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বিলাতে ছিলেন—তিনি সেটী অনুবাদ করিয়া দেন; রবীন্দ্রনাথের বহুলেখার অনুবাদের জন্য তিনি দায়ী।

'সাধনা'র বক্তৃতার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষিদের উপদেশগুলি ব্যাখ্যা করেন; অবশ্য সে-ব্যাখ্যা কোনো টীকাকারের ব্যাখ্যা নহে; কবি রবীন্দ্রনাথ গভীর মননশক্তিবলে উপনিষদকে যেভাবে আপনার মধ্যে পাইয়াছেন—এই প্রবন্ধগুলিতে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'সাধনা'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন :

"The meaning of the living words that come out of the experiences of great hearts can never be exhausted by any one system of logical interpretations. They have to be endlessly explained by the conmentaries of individual lives, and they gain an added mystery in each revelation." তিনি ভূমিকায় অন্য স্থানে লিখিয়াছেন। "For western scholars the great religious scriptures of India seem to posses merely a retrospective and archaeological interset ; but to us they are of living importance." পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা বেদ উপনিষদের

আলোচনা বহুকাল চলিতেছে; কিন্তু তাহা প্রাত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা, তাহা বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল—তাহা জীবনের সমস্যা সমাধানের সামগ্রী হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে পশ্চিমের নিকট সেইদিক হইতে ব্যাখ্যা করিলেন।

জুন মাসের শেষাশেষি ক্যাক্সটন হলের বক্তৃতাগুলি শেষ হইয়া গেল। চারিদিকে রবীন্দ্রনাথের নাম ঝঙ্কৃত হইতেছে। এদেশেও রবীন্দ্রনাথকে সাহেব মহলে পরিচিত করিবার জন্য এণ্ড্রুজ সাহেব ২৬এ মে (১৯১৩) সিমলায় এক বক্তৃতা করেন; এই বক্তৃতায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিংজ ও লেডী হার্ডিংজ উপস্থিত ছিলেন; বলা বাহুল্য গ্রীষ্মকালের সিমলা পাহাড়ে বহু বড় সাহেবও ছিলেন। এণ্ড্রুজ যখন বিলাতে ছিলেন, তখন 'জীবনস্মৃতি' একখণ্ড জোগাড় করিয়া কোনো এক বাঙালী ছাত্রের সাহায্যে তাহার বিষয়টি জানিয়া নোট করিয়া লন। এই বক্তৃতাটি মডার্ণ রিভ্যু (১৯১৩ জুন ও জুলাই) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; 'জীবনস্মৃতি' হইতে বহু উদ্ধৃতাংশ ইহাতে আছে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ ইহার বহু পরে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। সিমলায় এণ্ড্রুজের বক্তৃতার কথা রবীন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়া লিখিতেছন, "এণ্ড্রুজ সাহেব সিমলাতে এক বক্তৃতা দিয়েছেন শুনেছি কিন্তু কি বলেছেন জানিনে। কিন্তু চারদিকে আমার নিজের নামের এই যে ঢেউ তোলা এ আমার কিছুতেই ভাল লাগচে না। এই নিয়ে আমার নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলচে। * * আমার মনের ভিতরে কেবলি বলচে এ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে কোনো উপায়ে কোথাও পালাতে হবে। অথচ বাইরের দিক থেকে যে মোহ কেটে গেছে তা নয়।" (পত্র নং ৩৭)

এণ্ড্রুজ যখন বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন—তখন তাঁহাকে তাঁহার নিজের জীবনের ভিতরকার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি দুচারটি কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। "কিন্তু তার মধ্যে কোনো অহঙ্কারের সুর ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। বস্তুত আমার জীবনের ইতিহাসের মধ্যে যে দীনতা আছে সে আমি কোনো দিনই ভুলিনে। যেমন করেই আমি নিজেকে দেখি না কেন এটা আমার স্পষ্ট চোখে পড়ে যে আমার মধ্যে ফুল যত ফুটল ফল তত ধরল না। আমার সাধনা কবিত্বলোকে এসে থেমেছে, তার উপরে যেখানে শব্দহীন জ্যোতির্ময় লোক সেখানে

পৌছতে পারে নি। এই কারণে জীবনের সাধনা নিয়ে আমি অহঙ্কার করতে পারিনে। কিন্তু এণ্ড্রুজ সাহেব বোধকরি তাঁর প্রীতির আবেগে আমার পরিমাণ বাড়িয়ে লোকের কাছে ধরেছেন। এতে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করি। য়েটস প্রভৃতি সমালোচকেরা আমাকে সাহিত্যের নিক্তিতে ওজন করে যা বলেছেন তা ভুল হোক সত্য হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না—কেননা যে-জিনিষটা বাইরে এসে পৌচেছে—তার বিচার প্রত্যেকে নিজের বিচারশক্তির দ্বারাই সম্পন্ন করবেন এই হচ্চে প্রথা। কিন্তু আমার ভিতরের কথা আমার অন্তর্যামীই জানেন—সেখানকার খবর দেবার বেলা খুব সাবধানে কথা কওয়া উচিত। সেখানে সকল প্রকার অত্যুক্তিই সর্বতোভাবে পরিহার্য। বরঞ্চ সেখানে খাটো করে কথা কওয়া কর্তব্য। আমি যে কবি * * একথা আমি নিজেই লোককে বলে বেড়িয়েছি—কিন্তু অন্দরে যে আমার বসবার আসন আছে একথা উচ্চারণ করবার জো নেই। আমি কবি কিন্তু গুরু নই * *।" (পত্র নং ৪৪)

জুন মাসের শেষে রবীন্দ্রনাথ Duchess Nursing Home হাসপাতালে আশ্রয় লইলেন; পাঠকের স্মরণ আছে তিনি অর্শরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। হোমিওপ্যাথিতে বিশেষ কিছু হয় নাই। বহু ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজি হইতেছিলেন না; রোদেনষ্টাইনের জিদে তিনি রাজি হইলেন এবং অর্শঅস্ত্রবিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা শুনিয়া নামেমাত্র ফী লইয়া এই অস্ত্রচিকিৎসা করেন। হাসপাতালে প্রায় একমাস ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা নিকট হইতে জানেন, তাঁহারা জানেন তিনি সেবা লইতে কত কুণ্ঠিত; সাধ্যপক্ষে নিজের কষ্টকে অন্যের বোঝা করিয়া তুলিতে চান না। হাসপাতাল বৈকাল বেলায় অতিথি ও দর্শকে ভরিয়া যাইত, ফুলের মালায়, তোড়ায় তাঁহার আসন আচ্ছন্ন হইয়া যাইত।

এই সময়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; বাজারে বহুটাকা দেনা। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিয়া কিছু টাকা পান ও ম্যাকমিলান আগাম কিছু টাকা দেন—সব মিলাইয়া ১৮০০৲ শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়া দেন। একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "১৮০০৲ বোধ হয় পেয়েছ। সমস্ত অপব্যয়ের পথ রুদ্ধ করে যথাসম্ভব আয়ব্যয়ের-সামঞ্জস্য

করতে হবে।” কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে অর্থ কৃচ্ছ্রতা দূর হইল। ‘গীতাঞ্জলি’ ছয় মাসের মধ্যে (জানু—জুলাই) চারটা সংস্করণ হইয়াছিল; তাই কবি আশা করিতেছেন যে-অর্থাগম হইবে তাহা সামান্য নহে। (পত্র নং ৩৯)

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্সনের নিকট হইতে খবর পাইলেন যে তিনি শান্তিনিকেতনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। পিয়ার্সন ছিলেন ইংরেজ বনিয়াদি ঘরের ছেলে, হুগোনট বংশের; অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েট। প্রথমে তিনি কলিকাতা লণ্ডন মিশনারী কলেজে কাজ করিতে আসেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত খৃষ্টানী ও অখৃষ্টানী ভেদাভেদ তাঁহাকে পীড়িত করিতে থাকে ও তিনি সে কার্য ছাড়িয়া দেন। কলিকাতা হইতে তিনি যান দিল্লিতে এক ধনীর পুত্রদের গৃহশিক্ষকরূপে। মাঝে একবার শান্তিনিকেতন আসেন ও অবশেষে সেখানে থাকিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন হইতে তাঁহাকে লিখিলেন, “যিনি আপনার হৃদয়ে এই শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার সম্মতির উপরে আমি কি কথা কহিতে পারি? আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে আপনাকে আমরা পাইব এবং আপনার সঙ্গে একাসনে বসিতে পারিব ইহাতে আমি নিজেকে কৃতার্থবোধ করিতেছি।” (পত্র নং ৪০) দিল্লির কাজকর্ম ছাড়িয়া সম্পূর্ণভাবে এখানকার কাজে যোগদান করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ সাহেব আসিয়া কিছুকাল আশ্রমে বাস করিয়া যান। আজ এণ্ড্রুজ ভারতময় দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ নামে পরিচিত; তখন তিনি সাধারণ খৃষ্টীয় কলেজের অধ্যাপকরূপে স্বল্পসংখ্যক লোকের নিকট পরিচিত ছিলেন; যাঁহারা Renaissance in India নামে তাঁহার গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে উদারনীতিক খৃষ্টান বলিয়া জানিতেন। বাঙলার বাহিরে ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথম তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। ভারতে ইংরেজ ও ইংরেজি-জানা অবাঙালীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করিবার জন্য এণ্ড্রুজ অনেকখানি দায়ী।

বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার গীতলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ হইল; Cheyne Walk এ থাকিবার সময় পর পর কয়দিনে পাঁচ ছয়টি গান রচনা করেন। গানগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞদের নিকট সুপরিচিত।

'তোমারই নাম বলবো'	৮ ভাদ্র ১৩২০	(২৪ আগষ্ট ১৯১৩)
'অসীম ধন ত আছে তোমার'	ঐ	
'এ মনিহার আমায় নাহি সাজে'	ঐ	
'ভোরের বেলা কখন এসে'	৯ ভাদ্র	২৫ আগষ্ট
'প্রাণে খুসির তুফান উঠেচে'	ঐ	
'জীবন যখন ছিল ফুলের মত'	১১ ভাদ্র	২৭ আগষ্ট

শেষ গানটি তিনি রচনা করেন Far Oakridge-এ রোদেনষ্টাইনের বাড়ীতে বসে। সেখানে ২৬শে আগষ্ট যান কয়েক দিনের জন্য। বেশিদিন থাকা সম্ভব হইল না, কারণ তাঁহার মন দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী য়ুরোপ ভ্রমণে গিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ লিভারপুল হইতে ১৯ ভাদ্র ১৩২০ (৪ সেপ, ১৯১৩) City of Lahore জাহাজে উঠিলেন। জাহাজে উঠিবার পূর্বে তাঁহার হস্তে ১৪ই আগষ্টের একখানি দৈনিক 'বেঙ্গলি' পড়ে। সেই কাগজ পাঠে তিনি বর্ধমানের দামোদরের প্রলয়ঙ্করী বন্যার কথা জানিতে পারেন। বিদায়কালে যেসব দর্শনপ্রার্থী সাংবাদিকরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট তিনি অত্যন্ত তীব্রভাবে বলেন যে এই প্রলয়ঙ্করী বন্যা সম্বন্ধে একটি পংক্তিও এ পর্যন্ত কোনো ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত হয় নাই; অথচ জারমান কাগজে বন্যার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ভারতের সংবাদাদি প্রকাশে ইংরেজ কাগজওয়ালাদের কার্পণ্য দেখিয়া তিনি তীব্র মন্তব্য করেন। 'ম্যানচেষ্টার গার্জেন' এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, "We do not deserve his Gitanjali if we de not care about the people to whom he first made those songs in the affecting Bengali rythm."

রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়া দীর্ঘ সমুদ্রপথ দিয়া চলিলেন; পথে কয়েকটি গান রচনা করেন। বিলাতে যে গান রচনা তাঁহাকে পাইয়াছিল বহুদিন পর্যন্ত তাহার রেশ চলে; 'গীতিমাল্য' খানি দেখিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। *

* 'বাজাও আমারে বাজাও'	২৯ ভাদ্র ১৩২০	(১৪ সেপ ১৯১৩)
'ভেলার মত বুকে টানি	৩০ ভাদ্র ১৩২০	(১৫ সেপ ১৯১৩)
'জানি গো দিন যাবে'	২ আশ্বিন ১৩২০	(১৮ সেপ ১৯১৩)
'নয় এ মধুর খেলা'	৩ আশ্বিন ১৩২০	(১৯ সেপ ১৯১৩)

য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া নেপলস বন্দরে রথীন্দ্রনাথরা এই জাহাজ ধরিলেন। ১৮ই আশ্বিন ১৩২০ (৪ অক্টোবর, ১৯১৩) তাঁহারা বোম্বাই পৌঁছাইলেন ও দুই দিন পরে কলিকাতায় আসিলেন। বাঙলা দেশ হইতে মোট প্রবাসকাল ১ বৎসর ৪ মাস ১২ দিন। (২৪শে মে ১৯১২—৬ই অক্টোবর ১৯১৩)।

'গীতাঞ্জলি' ছাড়া কবি আরও কয়েকখানি বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 'গার্ডনার' বইখানিকে তিনি তাঁহার কবিবন্ধু য়েটসকে উৎসর্গ করেন। 'শিশু'র কতকগুলি কবিতা একত্র করিয়া 'ক্রেসেণ্ট মুন' নামে প্রকাশ করেন; বইখানিকে তাঁহার অন্য এক কবিবন্ধু ষ্টার্জ মূরকে উৎসর্গ করেন।

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের অনুবাদের নাম দেন 'Chitra'; এ বইখানি প্রথমে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশ করেন; ইহা তিনি উৎসর্গ করেন আমেরিকার মিসেস্ ভন্ মুডীকে (Mrs. W. Vaughn Moody)।

'ডাকঘরে'র অনুবাদ করেন অক্সফোর্ডের কৃতি ছাত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায়— (The Post Office)। বইখানি প্রথম ছাপা হয় মাত্র ৪০০ কপি, Cuala Press Dundrum এ, ১৯১৪ সালের গোড়ায়। এক বৎসর পূর্বে লণ্ডনে আইরিশ নাট্যকাররা এটি অভিনয় করেন। য়েটস বইখানির ভূমিকা লেখেন (ইংরেজি ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল তাঁহার কাব্যসাহিত্য য়ুরোপে প্রচার করিলেন ও 'সাধনা'য় উপনিষদযুগের তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিলেন তাহা নহে,—তিনি ভারতের মধ্যযুগে সমন্বয় সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধক কবীর সাহেবের কবিতা য়ুরোপে প্রচারে সহায়তা করিলেন। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন কবীরের কতকগুলি দোহা গান কবিতা বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। অজিতকুমার তার অনেকগুলির ইংরেজি করেন ও কবীরের সাধনা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ কবীরের একশটি কবিতা অনুবাদ করেন। মিষ্টিসিজম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী এভেলিন আণ্ডারহিল 'কবীর' বইখানির ভূমিকা লেখেন (Kabir's Poems, India Society, London, 1914)। আণ্ডারহিল ভূমিকার শেষে লিখিতেছেন, "Our most grateful thanks are due to Mr. Ajitkumar Chakravarty for the extremely generous and unselfish manner in which he has placed his work at our disposal."

এইবারেই কবি 'রাজা' নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন; উহা প্রকাশিত হয় The King of the Dark Chamber নামে। এখানি কবির নিজের অনুবাদ।

'গীতাঞ্জলি'র পরই যে দুইখানি বই য়ুরোপের চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা হইতেছে 'রাজা' ও 'ডাকঘর'। নোবেল প্রাইজ পাইবার পর তাঁহার বইগুলি য়ুরোপের সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। য়ুরোপীয় দেশসমূহে 'রাজা' ও 'ডাকঘর' অভিনয় কত জায়গায় যে হইয়াছিল তাহা বলা যায় না।

মোট কথা রবীন্দ্রনাথ এই বৎসরাধিককাল প্রবাস বাস সময়ের মধ্যে এই বইগুলির অনুবাদ করেন এবং বিলাতে থাকিবার সময়ে ও ফিরিবার এক বৎসরের মধ্যে সেগুলি প্রকাশিত হয়।

৪। নোবেল প্রাইজ

৬ই অক্টোবর ১৯১৩ (২০শে আশ্বিন ১৩২০) রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিলেন। এতদিন পরে দেশে ফিরিলেন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সাহিত্যিকদের সহিত দেখা সাক্ষাতে আনন্দে দিন কাটাইবার কথা। কিন্তু বিলাত হইতে আসিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন দেখা যাইতেছে না। বিদ্যালয়ের কথা, পারিবারিক নানা অশান্তির কথা, ছোট খাটো অভাব অভিযোগ, ছোট কথার আলোচনায় তাঁহার মন যেন ক্লান্ত হইয়া উঠিল। বহুকাল বাস্তবের সঙ্গে যোগ ছিল না; বিলাতের বন্ধুবান্ধব মহলে যে আনন্দে দিন্ কাটাইয়াছিলেন তাহা এখানে নাই; কারণ এখানে তাঁহার সহিত লোকের নানা সম্বন্ধ। সেই নানা সম্বন্ধের দায় ও আঘাত তাঁহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিল। তিনি পাঁচদিন পরে এণ্ডুজকে লিখিতেছেন, 'আমার প্রাণ অত্যন্ত নির্জন লাগিতেছে; চারিদিকের

দায়িত্বের বোঝা এতই গুরু যে মনে হয় একজনের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। বিলাতে থাকিতে আমার মন আমার বন্ধুদের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, আমার চিত্তের চিন্তাস্রোত সর্বদাই বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইত। সুতরাং দেশে ফিরিয়া আসিয়া আমি অকস্মাৎ যেন মরুভূমির মধ্যে পড়িয়াছি, এখানে মানুষের চিত্তের সহিত চিত্তের তেমন যোগ নাই; এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহায়হীনভাবে নিজ নিজ সমস্যার সমাধান সাধনা করিতে হয়। কিছুকাল হইতে আমার চিত্ত অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। (Letters to a Friend p. 38)।

সাংসারিক আঘাত যতই গুরু হোক তাহার ঊর্ধ্বে উঠিবার শক্তি রবীন্দ্রনাথের আছে। এক সপ্তাহ পরে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াছেন; আসিয়া বর্তমান শান্তিনিকেতন অতিথিশালায় আছেন। তাঁহার গানের সুর ফিরিয়া আসিয়াছে; মনের অন্ধকার যেন কাটিয়া গেছে। (ঐ পৃ: ৩৯) কয়দিনে পর পর নূতন পাঁচটি গান রচনা করিলেন (গীতিমাল্য, ২৯শে আশ্বিন -৫ই কার্তিক; নং ৪২-৪৬)।

পূজার ছুটির পর বিদ্যালয় খুলিয়াছে; রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আছেন। ১৫ই নভেম্বর (২৯শে কার্তিক) রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও দিনুবাবু মোটর যোগে চৌপাড়ির শালবনে বেড়াতে যাইতেছেন—সন্ধ্যার মুখে খবর আসিল 'নোবেল' প্রাইজ রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন। বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতকার টমসন সাহেব সেদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই সংবাদ আশ্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে খুব আনন্দ উৎসব চলিল।

কলিকাতায় এই সংবাদ প্রথম প্রকাশ করে Empire নামে একখানি সান্ধ্য ইংরেজি কাগজ। It is the first recognition of the indigenous literature of this empire as a world force; it is the first time that an Asiatic has attained distinction at the hands of the Swedish Academies; and this is the first occasion upon which the £ 8,000 prize has been awarded to a poet who writes in a language so entirely foreign to the awarding country is to Sweden.

নোবেল পুরস্কার সুইডেন হইতে প্রদত্ত হয়। নোবেলের পুরা নাম আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল; ইনি ১৮৩৩ অব্দে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্র, জড়বিজ্ঞান ও ইনজিনিয়ারিং বিদ্যা বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন ও বিজ্ঞানের নানা কোঠায় নানা কাজ করেন। ১৮৬৫-৬৬ অব্দে তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। ইহার পর তিনি আমেরিকায় ইহার পেটেণ্ট লইয়া কারখানা খোলেন; অল্পকালের মধ্যে য়ুরোপে ও নানাস্থানে কারখানা স্থাপিত হয়। ১৮৯৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্পত্তির মূল্য বিশ লক্ষ পাউণ্ড। এই টাকার সুদ হইতে তিনি পাঁচটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান; যথা, জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য, শান্তি। প্রত্যেক পুরস্কারের টাকা ৮,০০০ পাউণ্ড; সে-সময়ে ছিল ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

১৩ই নভেম্বর সুইডিশ একাডেমীর বার্ষিক অধিবেশনে এই পুরস্কার ঘোষিত হয়। পৃথিবীময় এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেলে সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল। ম্যাকমিলানরা এই বৎসরের মার্চ মাসে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেই হইতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের যে সমাদর হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব। তারপর এখন নোবেল পুরস্কার প্রদত্ত হইলে লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকিল না। সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় তাহাদের বিস্ময় কিরূপ হইয়াছিল। একখানি কাগজ লিখিলেন, নোবেলের সম্পত্তির অছিরা রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য পুরস্কার দিয়া তাঁহাদের ট্রাষ্টের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। The Nobel Trustee . have never fulfilled their trust more thoroughly than by their award of the Literature prize to Rabindranath Tagore (The Pall Mall, 14 Nov. 1913.)

আর একজন লিখিলেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারা নোবেল প্রাইজ দিয়া তাঁহাদের উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্বে বৃটীশ-ভারতীয় কিপলিং নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। Post নামে নিউইয়র্কের একখানি দৈনিক লিখিলেন যে সাহিত্যে আদর্শবাদের জন্য যে তেরজন সাহিত্যিক পুরস্কার পাইয়াছেন "Kipling is the only one whose work does not really answer to the spirit of the Founder's testament" (N. Y. 15 Nov. 1913). Daily News and Leader নামে

একখানি কাগজও এই দুইজনের মধ্যে তুলনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না ; "But India could not very well express herself through men more different in spirit and craftmanship than the rough soldier of Imperialism and this delicate artist of the most intimate nationalism." (14 Nov. 1913 .) সমসাময়িক এমন একখানি পত্রিকা ছিল না, যাহাতে রবীন্দ্রনাথের বিষয় আলোচনা না হইয়াছিল ; দুই একখানি কাগজ Thomas Hardy ও Anatole Franceকে পুরস্কার দেওয়া হয় নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন।

সুইডিশ একাডেমী নোবেলের পুরস্কারের জন্য লোক নির্বাচন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ তখনো একাডেমীর সভ্যদের হস্তগত হয় নাই ; 'গার্ডনার' মাত্র অক্টোবর মাসে লণ্ডনে বাহির হইয়াছিল, সে-বই পরীক্ষকদের হস্তগত হয় নাই। কেবলমাত্র একখানি বইএর সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব স্বীকার করিলেন। কিন্তু অনেকের ধারণা যে সুইডিশদের মধ্যে কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বর কথা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। জারমেনীর ক্রাউনপ্রিন্স ১৯১১ সালে ভারতে আসেন ; তাঁহার পরে আসেন সুইডেনের রাজকুমার উইলিয়াম ; তিনি জোড়াসাঁকোয় আসিয়া অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশালা দেখেন এবং সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথা জানিতে পারেন। Truth (24. Dec. 1913) বলেন "The Swedes say that Prince William's visit to Calcutta brought about the award of the Nobel Prize to Tagore."

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ইংরেজের কোনো প্রতিষ্ঠান স্বীকার করিবার পূর্বেই একটি স্বাধীন দেশ স্বীকার করিল। রোদেনষ্টাইন লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাতে ছিলেন, তখন Fox Strangways অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একটি সম্মানপূর্ণ উপাধি দানের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু লর্ড কর্জনের সহিত পরামর্শ করিলে তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আরও খ্যাতিমান লোক ভারতবর্ষে আছে। "I wonder who they were ; and I regreted that England had left it to a foreign country to make the first emphatic acknowledgment of his contribution to

Literature." (Men and Memories p 266) রোদেনষ্টাইনের আশ্চর্য লাগিয়াছিল যে যেসব ইংরেজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন ; স্যর জন উডরফ অবনীন্দ্রনাথদের খুব ভাল করিয়া জানিতেন, ভারতের শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, অথচ তিনি কোনো দিন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো কথা রোদেনষ্টাইনকে বলেন নাই—ইহাতে তিনি খুবই আশ্চর্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশ্চর্য হই না, কারণ উডরফ যেসব জিনিষ বিশ্বাস করিতেন, রবীন্দ্র-নাথ সেসব শুধু বিশ্বাস করেন না তাহা নহে, তিনি সেসব বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। যাহাই হৌক ইংলণ্ড তাঁহাকে স্বীকার না করিলেও য়ুরোপ তাঁহাকে অসঙ্কোচে বরমাল্য দান করিল।

বলা বাহুল্য এই সংবাদে দেশের লোক খুবই আনন্দিত হইল,—বাঙালী যে নগণ্য নহে, বাঙালী যে আজ সম্মান পাইল, তাহা প্রত্যেক বাঙালী নিজ গৌরব বলিয়া গ্রহণ করিল। কলিকাতায় যুবমহলে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখা দিল। তাঁহারা শান্তিনিকেতনে আসিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবেন ঠিক করিলেন। ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২০ একখানি স্পেশাল ট্রেনে করিয়া ৫০০ নরনারী শান্তিনিকেতনে আসিলেন। এণ্ড্রুজ সাহেব, অধ্যাপকগণ ও ছাত্রেরা অতিথিদের অভ্যর্থনা করেন ; আশ্রম বিশেষ-ভাবে সাজানো হইয়াছিল।

জষ্টিস্ আশুতোষ চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র বসু, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, রেভারেণ্ড মিলবার্ণ, মৌলভি আবদুল কাসেম, পুরণচাঁদ নাহার, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। সকলেই রবীন্দ্রনাথের এই গৌরবে আত্মগৌরব অনুভব করিতেছিলেন ; নানা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মসম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধিগণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে অবদান সম্বন্ধে ঋণ স্বীকার করিয়া প্রশংসাবাদ করিলেন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে যাহা বলিলেন তাহা আদৌ সময়োচিত হয় নাই এবং আগন্তুকরা মর্মাহত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। তিনি বলেন, তাঁহার সাহিত্যিক জীবনে তিনি চিরদিন দেশের নিকট হইতে বিরুদ্ধতা ও বিরূপতা পাইয়া আসিয়াছেন, আজ

পশ্চিম তাঁহার শক্তিকে স্বীকার করায় তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়াছেন; সেইজন্ত যে সম্মানের পেয়ালা তাঁহারা আনিয়াছেন তাহা তিনি ওষ্ঠের নিকট গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু তাহা পান করিতে অপারক। এই ধরণের উক্তি তিনি পরেও করিয়াছেন।

ডিসেম্বরের (১৯১৩) গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, এণ্ড্রুজ ছিলেন; সে-সময়ে একদিনের জন্য র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব আশ্রম পরিদর্শনের জন্য আসেন। তিনি তখন পার্লামেণ্টের সদস্য, সিবিল সার্বিসের কমিশনের মেম্বররূপে ভারতে আসিয়াছিলেন। আশ্রম খুব ভাল করিয়া তিনি দেখেন, ছেলেদের পরিচালিত সাঁওতাল বিদ্যালয় দেখিয়া তিনি খুবই প্রীত হন এবং ছেলেদের কাছে নিজের জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন ও বলেন এইসব অন্ত্যজদের মধ্য হইতে একদিন শক্তিমান পুরুষ বাহির হইবে (ত-বো-প ১৮৩৫ শক অগ্রহায়ণ-পৌষ পৃঃ ১৮৬-১৮৯)। বিলাতে তিনি পত্রিকায় শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান! (Daily Chronicle, London, 14 Jan., 1914)

শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষ উৎসবের সময় কবি আশ্রমে উপস্থিত; গত বৎসর আমেরিকায় ছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিতেছেন (গীতিমাল্য ৫০, ৫১, ৫২); একটি গভীর আধ্যাত্মিক আনন্দে মন পরিপূর্ণ। উৎসবের দিন তিনি আশ্রমবাসীদের নিকট একটি বড় কথা বলিলেন। ধর্ম এখন তাঁহার কাছে কেবল মাত্র ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম নাই, ইহা তাঁহার কাছে নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বলিলেন, "এ আশ্রম—এখানে কোন দল নেই, সম্প্রদায় নেই। সত্যকে লাভ করবার দ্বারা আমরা তো কোনো নামকে পাই না। যে সত্যের আঘাতে কারাগারের প্রাচীর ভাঙি, তাই দিয়ে তাকে নতুন নাম দিয়ে পুনরায় প্রাচীর গড়ি এবং সেই নামের পূজো সুরু করে দিই। আমাদের এই আশ্রম থেকে কেউ নাম নিয়ে যাবে না। এখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা পাব, সে-দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।" "এখানে আমরা নামের পূজো থেকে আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব—এই জন্যেই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থেকে, যে-কোনো সমাজ থেকে যেই আসুন না কেন, তাঁর

পুণ্য জীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ দেশান্তর হতে, দূর দূরান্তর থেকে যে-কোনো ধর্ম বিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোন সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সঙ্কুচিত না হয়।" (শান্তিনিকেতন ১৭শ খণ্ড, মুক্তির দীক্ষা পৃঃ ১১-১৩) '

এই উপদেশের প্রয়োজন ছিল। এতদিন আশ্রমে অহিন্দুদের প্রবেশের যথেষ্ট বাধা ছিল। একবার একটি মুসলমান ছেলে আসিবে বলিয়া ঠিক হয়; সে কোথায় খাইবে, কোথায় থাকিবে ইত্যাদি লইয়া অধ্যাপকদের মধ্যে এতই আলোচনা হইল যে শেষ পর্যন্ত যে-মীমাংসা হইল, তাহা সমস্যার সমাধান না করিয়া জটিল করিয়া তুলিল। ছাত্ররা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর পংক্তিতে বিভক্ত হইয়া বসিত; এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের মত কখনো জোর করিয়া চালান নাই। এতদিন আশ্রমে জাতিভেদের সমস্যা আসে নাই। আজ যখন এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন তাঁহাদের নিজ সমাজ ত্যাগ করিয়া আশ্রমে আসিলেন, তখনই প্রশ্ন উঠিল, তাঁহাদিগকে কিভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সমস্যা বুঝিয়া নূতনভাবে আশ্রমের আদর্শকে ব্যাখ্যা করিলেন—বিশ্বভারতীর আদর্শের ভূমিকা হইল। এই নামহীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা চিন্তাজগতে কত বড় মুক্তির আহ্বান আনিল তাহার যথার্থ তাৎপর্য খুব কম লোকই বুঝিয়াছেন।

মাঘোৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের কাজ করিলেন। প্রাতের ও সন্ধ্যার উপদেশ গভীর আধ্যাত্মিক আকুতিভরা (উদ্বোধন; ছোট ও বড়; ত-বো-প ১৮৩৫ [১৩২০] ফাল্গুন)। এই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের শেষ দিনে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বেদী গ্রহণ করিয়া আচার্যের কার্য করিলেন। এই প্রথম তিনি সাধারণ সমাজের আচার্য হইলেন; এই লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গোঁড়ারা খুবই বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তরুণদের কাছে তাঁহারা পারিয়া উঠিলেন না। ইতিপূর্বে আদি ব্রাহ্মসমাজে যে-গোঁড়ামি ছিল তাহা তিনি বিলাত যাইবার পূর্বেই ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, এখন সাধারণ সমাজও

তাঁহাদের গোঁড়ামি ভাঙিয়া রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। (১৫ই মাঘ ১৩২০ ; ২৮ জানুয়ারী ১৯১৪)।

২৯শে জানুয়ারী কলিকাতার গবর্মেণ্ট হাউসে এক সভা হয়। লর্ড কারমাইকেল তখন লাট সাহেব। সুইডিশ একাডেমী নোবেল পুরস্কারের যে পদক ও মানপত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহাই কারমাইকেল রবীন্দ্রনাথকে দান করিলেন। লর্ড কারমাইকেল বলিলেন, "আপনি জানেন গত ১০ই ডিসেম্বর ষ্টকহলম নগরীতে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের প্রতিনিধি আপনার হইয়া সুইডেনের মহামান্য রাজাবাহাদুরের নিকট হইতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন ও আপনার কথামত আপনার বিনীত নমস্কার নিবেদন করেন। সেদিন সন্ধ্যাভোজে বৃটীশপ্রতিনিধির নিকট আপনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

লর্ড কারমাইকেল রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন করিয়া নোবেল প্রাইজ প্রদান করিলেন—একটি স্বর্ণপদক সুইডিশ স্বর্ণকারদের আর্টসমন্বিত ও একখানি মানপত্র। (Empire, Jan. 30, 1916)।

রবীন্দ্রনাথ সুইডিশ একাডেমীর নিকট তাঁহার "Grateful appreciation of the breadth of understanding which has brought the distant near and made of a stranger a brother' এই বাণী পাঠান।

অনুষ্ঠানের পর কবি কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন ; কিন্তু তাঁহার শরীর বড়ই ক্লান্ত ; তাই কয়েকদিনের জন্য শিলাইদহে গিয়া বাস করিলেন। কিন্তু সেখানেও বেশি কাল থাকেন নাই ; ১লা মার্চের পূর্বেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন যে, এ কয়দিন নির্জনে থাকিয়া তাঁহার বিশেষ উপকার হইয়াছে। (Letters to a Friend, p 41)।

এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হওয়ায় ও আশ্রমের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা হওয়ায়—এই দুই মহাপ্রাণের কর্মাবলীর সহিত আশ্রমও যেন ক্রমশ যুক্ত হইয়া পড়িতে

লাগিল। ভারতের জাতীয় ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ ১৯১২ সাল হইতে ইংরেজ, বুয়র অধিবাসী ও দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্মেণ্টের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যগ্রহ আন্দোলন চালাইতেছিলেন; এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন, সেখানকার ব্যরিষ্টার মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। ভারতবাসীরা চিরদিন অন্যায়কে অম্লানবদনে সহ্য করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু যখন হইতে অন্যায়কে বাধা দিবার শক্তি তাহারা অর্জন করিল, তখন হইতে প্রশ্ন সম্পূর্ণ পৃথক রূপ গ্রহণ করিল। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্মেণ্টের অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবাদ স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিংজও করিলেন (Modern Review. 1913 Dec. p 638-a)।

এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিবার জন্য এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে এণ্ড্রুজ আশ্রমে আসেন, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও উৎসাহবাণী গ্রহণ করেন ও ছাত্রদের মধ্যে বহির্ভারতের সহিত সহানুভূতির যোগসম্বন্ধ স্থাপন করেন।

এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের আফ্রিকাযাত্রা উপলক্ষ্যে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। বিদায় কালের সভায় পিয়ার্সন ছাত্রদিগকে বলিলেন, "আমি এবং আমার বন্ধুর পক্ষ হইতে একটিমাত্র কথা তোমাদিগকে বলিতেছি যে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে যে শান্তি আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কার্যে আমাদিগকে সাহায্য করিবে।" (ত-বো-প ১৮৩৫ শক পৃঃ ১৯১)। পিয়ার্সন বেশ ভাল বাঙলা জানিতেন। ৩০শে নভেম্বর ১৯১৩ তারিখে তাঁহারা আফ্রিকা যাত্রা করেন ও মার্চ ১৯১৪ তাঁহারা ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। আফ্রিকায় থাকিতে এণ্ড্রুজ সাহেবের জননী বিলাতে মারা যান, তিনি সেখান হইতে বিলাত যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯১৪) এক পত্রে লেখেন, You know our best love was with you, while you were fighting our cause in S. Africa along with Mr. Gandhi and others (Letters to a Friend p 39)

১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে (১৭ই চৈত্র, ১৩২০ ; 31 March, 1914)

মিঃ পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনের স্থায়ী কর্মীরূপে আসিয়া যোগদান করিলেন। পিয়ার্সন চারিশত টাকা মাহিনা পাইতেন; যখন তিনি দিল্লি হইতে চলিয়া আসিবার জন্য মনস্থ করিলেন সুলতান সিং তাঁহাকে বলেন 'টাকার প্রয়োজন হয় আমি দিতেছি, আপনি টাকা দিয়া বোলপুরকে সাহায্য করুন।' কিন্তু পিয়ার্সন আত্মনিয়োগ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব—টাকার মোহ তাঁহাকে দিল্লিতে ধনীগৃহের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর টানিয়া রাখিতে পারিল না। সেইদিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের আদর্শ তাঁহাকে শান্তি দান করিয়াছিল।

কবি চৈত্রমাসেও শান্তিনিকেতনে আছেন সে-কথা বলিয়াছি। ৮ই চৈত্র ১৩২০ শ্রীমতী সরযূবালা দাশগুপ্তার 'বসন্তপ্রয়াণ' গ্রন্থের ভূমিকা লিখিলেন। সরযূবালা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় চিত্তরঞ্জন দাসের এক ভ্রাতার সহিত—নাম বসন্ত। অকালে সেই যুবকের মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার পত্নী 'বসন্ত-প্রয়াণ' নামে এক আক্ষেপপূর্ণ গদ্যকাব্য লেখেন। লেখার মধ্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ছিল, তাহাই রবীন্দ্রনাথকে এই ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত করে; এছাড়া ব্রজেন্দ্রবাবুর কন্যা বলিয়াও তাঁহার খানিকটা দরদ ছিল।

পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে থাকার সময়ে সুরুলের একটি কুঠি বাড়ী ক্রয় করেন। বিলাত হইতে আসিয়া সেই বাড়ীর সংস্কার করেন, প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া স্থানটি বাসোপযোগী হয়। রথীন্দ্রনাথের জন্য ল্যাবোরেটরী লাইব্রেরী সব হইয়াছিল; আমেরিকা হইতে আসিবার পর শিলাইদহতে যে ল্যাবোরেটরী হইয়াছিল, তাহা উঠাইয়া এখানে আনা হইল; বিজলি বাতির ব্যবস্থা হইল; মোট কথা সকল প্রকার সুযোগ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন হইল। ১লা বৈশাখ ১৩২১ গৃহপ্রবেশ উৎসব হয়। বর্তমানে সেইখানে বিশ্বভারতীর গ্রাম-সংস্কার বিভাগের কেন্দ্র হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথকে দিয়া করেন। সেবার উহা কেন ব্যর্থ হইল, সে কারণ যথাস্থানে বলিব।

ইহার কয়েকদিন পরে এণ্ড্রুজ সাহেব শান্তিনিকেতনে আসেন (৬ই

বৈশাখ ১৩২১)। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা রচনা করেন, তাহার প্রথম দুটি লাইন উদ্ধৃত হইল :—

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণ রসধারা
হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।

এই সময়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু আশ্রমে একবার আসেন। রবীন্দ্রনাথ এই তরুণ শিল্পীর যথার্থ সম্মান সেদিন দান করিয়া একটি কবিতায় তাঁহার আগমনকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। কবিতাটির আরম্ভ—

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে ভারত ভারতী-চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে যোগায় নূতন বিত্ত।

উত্তরকালে এই নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর কলাভবনের কর্মীরূপে যোগদান করেন।

বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্বে আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপক মিলিয়া 'অচলায়তন' অভিনয় করিয়াছিলেন। কবি স্বয়ং আচার্যের ভূমিকায় নামেন। পিয়ার্সন শোন্‌পাংশুদের মধ্যে ছিলেন; তাঁহার সেই ভাঙা ভাঙা বাঙলায় 'খেঁসারির ডাল যদি মুখ পর্যন্ত আসে তবে তাকে আর একটু ঠেলে দিই'—সেই কথা কয়টির সুর এখনো কানে বাজিতেছে।

৫। সবুজপত্র

নূতন বৎসরে (১৩২১) সাহিত্যে নব প্রেরণা আসিল। নূতন তাঁহাকে চিরদিনই নবতর আত্মপ্রকাশে সহায়তা করিয়াছে। নূতন বৎসর হইতে শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা স্বল্প কলেবর; চিত্র, বিজ্ঞাপন, পাঁচমেশালী সংবাদ ও আলোচনা বিবর্জিত, নিছক সাহিত্য বিষয়ক

পত্র বলা যাইতে পারে। প্রমথবাবু সাহিত্যিক এবং সেই সাহিত্য সাধনের জন্য তিনি 'সবুজপত্র' প্রকাশ করিলেন। মুখপত্রে চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "স্বদেশের কিম্বা স্বজাতির কোনও একটি অভাব পূরণ করা, কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কর্মও নয়, ধর্মও নয়; সে হচ্ছে কার্যক্ষেত্রের কথা। * * দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়তে পারিনে, গড়তে পারি শুধু সাহিত্য সম্মেলন। * * সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।"

"আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্রমণ্ডিত নবশাখার উপর অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙালী-জাতির সব চেয়ে বড় অভাব তা কতকটা দূর করতে পারব। আমরা যে আমাদের সে-অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি তার প্রমাণ এই যে আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতার দৈন্যকে ঐশ্বর্য ব'লে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে, আলস্যকে ঔদাস্য ব'লে, শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ ব'লে, উপবাসকে উৎসব ব'লে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় ব'লে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্ম-প্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিষ আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারেনা, কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।"

"বাঙলার মন যাতে বেশী ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তা-ধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে।" (সবুজপত্র ১৩২১ বৈশাখ পৃঃ ৩-৫) উপরি উদ্ধৃত অংশের ভাষা প্রমথ বাবুর হইলেও ভাব-যে রবীন্দ্রনাথের সে-কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক-মাত্রেই বুঝিবেন। রবীন্দ্রনাথ চির নবীন, তাঁহার মনের যৌবন বার্ধক্যেও অটুট; তিনি হইলেন এই সবুজ-সংসদের গুরু। তাই তিনি লিখিলেন 'সবুজের অভিযান'—

> "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
> ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
> আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!"

তিনি এই নবীন প্রাণকে নানাভাবে আহ্বান করিলেন, 'আয় দুরন্ত আয়রে আমার কাঁচা,' 'আয় জীবন্ত ·····,' 'আয় অশান্ত......,' 'আয় প্রচণ্ড......,' 'আয় প্রমত্ত······,' 'আয় প্রমুক্ত······,' 'আয়রে অমর আয়রে আমার কাঁচা।'

এই কবিতায় প্রাণের আবেগে যে কথাটি বলিলেন, তাহাই বলিলেন খুব স্পষ্ট ভাষায় 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে (স-প ১৩২১ বৈশাখ পৃঃ ২০)। কিছুকাল পূর্বে স্বদেশীযুগে বাঙলাদেশের মধ্যে যে একটা প্রাণের সাড়া পড়িয়াছিল তাহা বুদ্ধি বিবেচনার সুসঙ্গত অর্থ বাহিয়া চলে নাই, প্রাণ জাগিয়াছিল বলিয়া তাহারা পরামর্শ না লইয়াই সে আপনি চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার পরিবর্তন হইয়াছে। 'সমাজে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ বাঁধি-বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সামাজিক ও সকলপ্রকার বাধা ভাঙিবার কবি ও সাধক; এই 'সবুজপত্রে'র অভিযান হইল এই জীর্ণতাকে ভাঙিবার জন্য। তিনি লিখিলেন, "আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বদ্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধা। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় খাঁচাটাকে ভাঙ, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল; নয় বলিতে হয় ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা ত আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে, কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন; অতএব এই খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা ঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মনঠাণ্ডা থাকে।" তাই কবিতায় লিখিয়াছিলেন "শিকলদেবীর ঐ যে পূজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া?" আমাদের সমাজ প্রাণ-বহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছে। সমাজ মানুষগুলোকে লইয়া একান্ত পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে "দেশের নব যৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তারুণ্যের

জয় হউক! তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হৌক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্য সাধন হইতে থাক।" (পৃঃ ৩১)। তাই 'সবুজের অভিযানে' লিখিয়াছিলেন,

"আনরে টেনে বাঁধা পথের শেষে!
বিবাগী কর অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষ পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে তাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি বিধান যাচা,
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

সেইজন্য বলিয়াছিলাম রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটা নূতন সুর ধ্বনিত হইল এই 'সবুজের অভিযান' হইতে। তাঁহার নিজের মনটা এখন এই সুরে বাঁধা। ২৭শে বৈশাখ ১৩২১ (১০ মে ১৯১৪) শান্তিনিকেতন হইতে এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন—

I wont let you work during the vacation. We must have no particular plans for our holidays. Let us agree to waste them utterly, until laziness proves to be a burden to us. The cultivation of usefulness produces an enormous amount of failure, simply because in our avidity we sow seeds too closely. (Letters p 40). যৌবনে লিখিয়াছিলেন 'ক্ষণিকাতে'—'ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোতে।' এবারও দেখি যৌবনের সেই উচ্ছল চঞ্চলতা যেন কাব্যে মুখরিত হইতেছে; তবে এখন হইতে কবিতার যে পালা সুরু হইল তাহা অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—এই কবিতাগুচ্ছ 'বলাকা' নামে পরিচিত। এই সময়ে যখন তিনি কাজ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তখনই দেখি সব থেকে বেশি কাজ তিনি করিতেছেন। পত্রিকার তাগিদে তিনি পুনরায় গল্প লেখা সুরু করিলেন; বহুকাল পরে ছোট গল্পে হাত দিলেন—প্রথম গল্প 'হালদার

গোষ্ঠী' (স-প, ১৩২১ বৈশাখ)। এই গল্পধারা সমস্ত বৎসর চলিল একের পর এক।

বৈশাখ মাসের শেষে রবীন্দ্রনাথ রামগড় পাহাড়ে বেড়াইতে গেলেন। সঙ্গে প্রতিমাদেবী ও কন্যা মীরাদেবী ছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে অতুলপ্রসাদ সেন আসিয়া জুটিলেন, এণ্ড্রুজ দিল্লী হইতে আসিতে পারিলেন না। এমন সময়ে শান্তিনিকেতনের বদরিকাশ্রমযাত্রীর দল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। বদরিকার দলে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, নেপালবাবু, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও নেপালী ছাত্র নরভূপ রাও।

রামগড়ে পৌঁছিয়া কবির মন প্রথম দিকে বেশ আনন্দেই ছিল, এণ্ড্রুজকে লিখিত পত্র হইতে তা বেশ বুঝা যায়। ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ জুন) মহর্ষির জন্মদিন উপলক্ষ্যে উপাসনা হয়। কিন্তু সেইদিনের পত্রের মধ্যে দেখি রবীন্দ্রনাথের মনে যেন কিসের উৎকণ্ঠা জাগিয়াছে, মনের মধ্যে আধ্যাত্মিক একটা সংগ্রাম দেখা যাইতেছে। মনের মধ্যে স্পষ্ট অমঙ্গলের ছায়া যেন ঘনাইতেছে। এ কিসের বেদনা তাহা কবিও বলিতে পারেন না! পৃথিবীব্যাপী যে অশান্তি, যে বিপ্লব মহাযুদ্ধাকারে দেখা দিবে তাহাই যেন কবি তাঁহার অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে অনুভব করিতেছেন—মনের সংগ্রাম কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। 'বলাকা'য় তিনটি কবিতা রামগড়ে রচিত (৫, ৬, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)। সেগুলির মধ্যে এই আসন্ন অমঙ্গলের আবাহন যেন ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু সমস্তের মধ্যে একটা নির্ভীক উত্তেজনা মনকে মাতাইয়া তোলে। সবুজের জয়যাত্রার এ গান। কিন্তু কঠিন এ যাত্রা—"ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে, চলব ছুটি রৌদ্রছায়ে"—তাই লিখিয়াছেন পত্রে "my feet are bleeding, and I am toiling with panting breath." (Letters p 42).

'সর্বনেশে' কবিতার মধ্যেও সেই ভাব—'জীবন এবার মাতল মরণ বিহারে'। পাঠক Letters to a Friend-এর এই সময়ের কয়খানি পত্র পাঠ করিয়া দেখিবেন।

কিন্তু মনের এই তীব্র বিষাদ বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, ২৩শে মে লিখিতেছেন, "I had been struggling during these last few days in a world where shadows held sway and right proportions

were lost * * * Now I feel that I am emerging once again into the air and light and breathing freely". আরও দুইদিন পরে লিখিতেছেন "My wrestlings with the shadows are over. (Letters 25 May 1914)

মনের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে এখন শান্তভাবে গাহিতেছেন "আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে". "আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে নাচে তোমার প্রাণ'। এই সঙ্গে পাঠক কয়দিন পূর্বের রচিত (২০।২১ মে) গান দুটি পাঠ করুন। (গীতিমাল্য নং ১০৭, ১০৮)*

রামগড় জ্যৈষ্ঠমাসের শেষদিক ত্যাগ করেন; এখনও কবির শরীর বলিষ্ঠ আছে, রামগড় থেকে কাঠগুদাম পর্যন্ত প্রায় ১৬ মাইল পথ অনায়াসে হাঁটিয়া আসিলেন। ফিরিবার পথে লক্ষ্ণৌতে কবি বন্ধু অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে কয়দিন অতিবাহিত করিলেন।

জ্যৈষ্ঠের শেষে বিদ্যালয় খুলিল (১৬ জুন ১৯১৪)। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিলেন ও সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইবার কলিকাতায় বাসকালে 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ' গানটি রচনা করেন (৩ আষাঢ়—গীতিমাল্য)।

---

* রামগড়ে রচিত গান

১।	এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর	৩১ বৈশাখ ১৩২১	(১৪ মে ১৯১৪)
২।	চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে	৩রা জ্যৈষ্ঠ	(১৭ মে)
৩।	গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা	৪ঠা জ্যৈষ্ঠ	(১৮ মে)
৪।	ওরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে	৫ই জ্যৈষ্ঠ	(১৯ মে)
৫।	সন্ধ্যা হলগো ওমা সন্ধ্যা হ'ল বুকে ধর	৬ই জ্যৈষ্ঠ	(২০ মে)
৬।	আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে	৭ই জ্যৈষ্ঠ	(২১ মে)
৭।	এই ত তোমার আলোক ধেনু	১০ই জ্যৈষ্ঠ	(২৪ মে)
৮।	আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে	১৮ই জ্যৈষ্ঠ	(১ জুন)
৯।	আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে	২৫শে জ্যৈষ্ঠ	(৮ জুন)

'বলাকা'র নিম্নলিখিত কবিতা তিনটি ঐখানে রচিত :—

"এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো"	৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ (১৯ মে ১৯১৪)	[স-প শ্রাবণ
"আমরা চলি সমুখ পানে"	৬ই জ্যৈষ্ঠ (২০ মে)	[স-প জ্যৈষ্ঠ]
"তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে"	১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৬ মে)	[স-প আষাঢ়]

আষাঢ়ের প্রথম হইতে এণ্ড্রুজ সাহেব শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন; পাঠকের স্মরণ আছে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া গত চৈত্রমাসে পিয়ার্সন বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করেন, এইবার আসিলেন এণ্ড্রুজ।

'সবুজপত্রে'র তাগিদে কবি নিয়মিত গল্প লিখিতেছেন। জ্যৈষ্ঠমাসে প্রকাশিত হইল 'হৈমন্তী'; হৈমর পিতা সেই সদানন্দ সর্বসহা 'গোরা'র পরেশবাবু; আবার একদিকে তিনি 'জ্যেঠামশায়ে'র অগ্রদূত। "বস্তুত আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন খৃষ্টানও নন, হয় ত বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনো দিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে দেবতা সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দেন নাই।' (স-প ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ১১১)

আষাঢ়ের গোড়ায় কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন; তাঁহার প্রতিভা এই সময়ে সর্বতোমুখী দেখি—যেমন দেখিয়াছিলাম 'বঙ্গদর্শনে'র যুগে। এই সময়ে 'বাঙলা ছন্দ' লইয়া তিনি আলোচনা করিতেছেন; অবশ্য বাহির হইতে তাগিদ আসিয়াছে। জে, ডি, এণ্ডারসন সিবিল সার্বিস হইতে অবসর লইয়া কেমব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা অধ্যাপনা করিতেছেন। তিনি পত্রে ছন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করেন ও তর্ক তোলেন; তাহারই জবাবে রবীন্দ্রনাথ দুইখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। দ্বিতীয় চিঠিখানি ২৮ই আষাঢ় শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত। (স-প ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ; শ্রাবণ)

আষাঢ়ের শেষে শান্তিনিকেতনে (Syria) সিরিয়া হইতে বুস্তানী নামে একজন আরব কবি আসেন আশ্রমে কবিকে দেখিতে। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি', 'গার্ডনার', ক্রেসেণ্ট মুন' ও 'চিত্রা' ইংরেজি হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছিলেন; নিজেও বহু কাব্যের লেখক। তিনি তাঁহার একখানি বইতে লিখিয়া দিয়াছিলেন—

'Gitanjali' is the greatest boon
The 'Gardener' is my name
And in my heart is the 'Crescent Moon'
A 'Chitra' with love I frame'

বুস্তানী শব্দের অর্থ মালি, এই কবির নামও ছিল বুস্তানী (ত-বো-প ১৮৩৬ শক পৃঃ ১০৩)।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি বই ইতিমধ্যে ইংরেজিতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। 'গীতাঞ্জলি' ১৯১৩ মার্চ, 'গার্ডনার' ১৯১৩ অক্টোবর, 'ক্রেসেণ্ট মুন' ১৯১৩, 'চিত্রা' ১৯১৩, 'পোষ্ট অফিস' ১৯১৪ মার্চ, 'দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার' ১৯১৪। এইসব বই অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইতেছে এবং রবীন্দ্রকাব্য লইয়া তখন য়ুরোপে সবিশেষ আলোচনা চলিতেছে। 'গীতাঞ্জলি' ফরাশী ভাষায় অনুবাদ করেন ফ্রান্সের প্রথিতনামা সাহিত্যিক আঁদ্রে গীদ (Andre Gide)। তাঁহার লিখিত ফরাশী 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা বাঙলায় শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী তর্জমা করিয়াছিলেন; 'সবুজপত্রে' (১৩২১ অগ্রহায়ণ) সেটি আছে, কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে পাঠ করিতে পারেন। ফরাশী দেশে রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যখানি সাহিত্যিকদের মনে কি গভীর আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা এই রসজ্ঞের ক্রিটিসিজম হইতে জানা যায়।

'সবুজপত্রে'র লেখা নিয়মিত চলিতেছে। আষাঢ় (১৩২১) মাসে বাহির হইল 'বোষ্টমী'। এটি গল্প বটে, তবে এর অনেকখানিই সত্য ঘটনা; গল্পের মধ্যে যেটা বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবেই আমাদিগকে বলিয়াছেন। তবে বাঙলা সাহিত্যে যে-গল্প লইয়া একটা বেশ গোল সৃষ্টি হয় সেটি হইতেছে 'স্ত্রীর পত্র' (স-প ১৩২১ শ্রাবণ)। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ভাঙিবার যে-সুর তিনি 'বলাকা'র কবিতার মধ্যে ধ্বনিত করিতেছিলেন তাহাই রূপ পাইল এই গল্পে। প্রথম আভাস দেন 'হৈমন্তী'র মধ্যে। হৈমকে তিনি এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে সে সংসারের নিত্যকার অসত্যের সঙ্গে আপোষ করিতে পারে নাই। নারীরও যে একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে এবং সংসারের জন্য সমাজের জন্য অসত্যর সহিত রফা করিয়া থাকা যে নারীর ধর্ম নহে একথা হৈম খুব স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও আভাষ দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল স্পষ্ট করিয়া জানাইল 'আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে।' এই-যে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্য দিয়া অপরূপ নাটকীয় ছাঁদে প্রকাশ করিলেন—তাহাতে প্রাচীনপন্থীরা বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নারীর যে বিশেষ একটা সত্ত্বা আছে একথা স্বীকার করার শিক্ষা সমাজে হয় নি। "আমার মধ্যে যা কিছু মেজবৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা

পছন্দ করনি, চিনতেও পার নি।” “তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত বড় লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান—সেখানে বিধু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুত ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।” নারীর বিদ্রোহ এই গল্পের মধ্যে প্রথম তার ধ্বজা তুলিতেছে; ইহার পর রবীন্দ্রনাথের নানা নাট্য উপন্যাসে বিদ্রোহী নারীর বিচিত্র রূপ দেখিব কিন্তু ইহাই সূচনা। বাঙলার নারীজাগরণের ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিবেন, তাঁহারা ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পটিকে অবহেলা করিতে পারিবেন না। বিপিনচন্দ্র পাল ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় ‘মৃণালের পত্র’, অধ্যাপক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় ‘স্বামীর পত্র’ নামে এই গল্পের জবাব লেখেন। এই সময়ে বাঙলার মনোভাব দুইখানি পত্রিকাতে প্রকাশ পাইতেছিল—‘সবুজপত্রে’ তরুণ বাঙলার প্রগতির সংবাদ ও ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় অতীতের ঐশ্বর্য প্রকাশ ও যাহা কিছু প্রগতিপ্ররায়ণ তাহার সমালোচনা। সেইজন্য ‘নারায়ণে’র সমালোচনার প্রধান লক্ষস্থল ছিল ব্রাহ্মসমাজ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। ‘নারায়ণে’র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস না বলিলে সে-যুগের রবীন্দ্রনাথকে লইয়া দ্বন্দ্বের কথাটা পরিষ্কার বুঝা যাইবে না।

কিছুকাল হইতে দেশের মধ্যে সকল প্রকার উদারনীতি, সামাজিক প্রগতি, ও ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বেশ একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশকে ভালবাসিবার যে-একটা উচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল—তাহাই রূপ লয় দেশের যাহাকিছু ভাল মন্দ তাহাকে নির্বিচারে সমর্থনের মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বহু রচনার মধ্য দিয়া দেশপ্রীতি জাগাইবার জন্য যে-সব উক্তি প্রচার করেন, তাহা নব কলেবরে স্বদেশীযুগে বাঙালীর চিত্তকে মথিত করিয়াছিল। ‘নারায়ণ’ সেই নূতন ধারার মুখপত্র হইল। ‘নারায়ণে’র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। কিছুকাল হইতে সাহিত্য সমাজে একটা কথা উঠিয়াছিল যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। ক্রমে কথাটা আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হইল এবং প্রতিপক্ষ বলিলেন যে আজকাল বাঙলা-দেশে কবিরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা

জনসাধারণের উপযোগী নহে ইত্যাদি (স-প ১৩২১ শ্রাবণ, বাস্তব পৃঃ ২১২)। লেখকরা এই অভিযোগ তুলিয়া আঘাত ও অভিঘাতের পাত্র করিতেন রবীন্দ্রনাথকেই। কাব্যে শ্লীলতা প্রভৃতি আলোচনার পর এইবার সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যে কোনো বস্তু বা বিষয় নাই প্রমাণ করিবার জন্য লাগিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' নাম প্রবন্ধে সাহিত্যে বস্তু বলিতে কি বুঝায় তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মতে সাহিত্যের মধ্যে আসল বস্তু যা লোকে খোঁজে সেটি হইতেছে রস-বস্তু। রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে কিন্তু সমালোচক মাত্রেই মনে করে সেই রসিক। রসের মধ্যে নিত্যতা আছে, কিন্তু বস্তু নিত্য নহে। বাস্তব বিষয়ে কাব্য হইতে পারে, তবে সে সাহিত্য পদবাচ্য হইবে না। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছিলেন যে এই উপন্যাসখানির মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ আছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার কারণ দর্শাইয়া বলিলেন, "লোকমুখে শুনিয়াছি প্রচলিত হিঁদুয়ানির ভাল ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আন্দাজ করিতেছি ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।"

"বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ঙ্কর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্বরচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেন না, তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে।" (স-প ১৩২১ শ্রাবণ পৃঃ ২১৭)

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ ইম্পিরিয়ালিজমের কবিদের কাব্য ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস ও টেনিসনের কাব্যের কথা তুলিয়া বলেন নিত্যরসের গুণে যাহা টিঁকিবার তাহা টিঁকিবে, স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন ধসিয়া পড়িতেছে।

কবির যথার্থ অবলম্বন কি সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন 'অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ'। তাঁহার যথার্থ জোর সেখানে, যেখানে তিনি বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করেন।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের জবাব দেন তরুণ অধ্যাপক রাধাকমল

মুখোপাধ্যায়। কারণ 'প্রবাসী' (১৩২১, আষাঢ়) পত্রিকায় 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনিই প্রথমে বলেন বর্তমানকালের বাংলা দেশের কবিরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন তাহাতে বাস্তবতা নাই। রাধাকমলবাবু একথাটা সাধারণভাবে বলিলেও ইহার ধুয়া আরও প্রাচীন ; ১৩১৮ চৈত্র মাসে বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বস্তুতন্ত্রতাহীন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। রাধাকমলের প্রবন্ধ 'সাহিত্যে বাস্তবতা' (স-প ১৩২১ মাঘ) প্রকাশিত হইলে তাহার জবাব লেখেন প্রমথ চৌধুরী ঐ সংখ্যাতেই।

'বাস্তব' প্রবন্ধের একজায়গায় লোকশিক্ষা ও লোক হিতৈষিনা সম্বন্ধে কথা উঠে। সাহিত্যে বাস্তবতার মোটা অর্থ—সব লোকের বোধগম্য ও লোক কল্যাণের উপযুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি করা। সেখানে কথাটার আলোচনা চাপা পড়িয়া যায়। তাই 'লোকহিত' প্রবন্ধে (স-প ১৩২১ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ভাল করিয়া ব্যাখ্যান দিলেন।

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন দেশের মধ্যে সাধারণের জন্য কাজ করিবার একটা সাময়িক উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল—যে উৎসাহ বরাবর রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রতিবার দেখা দিয়াছে। "লোক সাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তীব্র বিশ্লেষণী মনীষাবলে সমস্ত ব্যাপারটাকে তন্ন তন্ন করিয়া যেন দেখিতে চান ; তাই তিনি লিখিলেন "আমরা লোক-হিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মা-ভিমানের মদ থাকে। আমরা লোক-সাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড় এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।"

"হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। সেইজন্য লোকহিত করায় লোকের বিপদ আছে।" (স-প ১৩২১ ভাদ্র পৃঃ ২৮৮) স্বদেশী আন্দোলনের যুগে হিন্দু মুসলমানের প্রীতির চেষ্টার কথা

উল্লেখ করিয়া বলেন বাঙলার মুসলমান যে বাঙালীর বঙ্গচ্ছেদ ব্যাপদেশে বেদনায় হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই, তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন প্রীতির সম্বন্ধ সৃষ্টি করি নাই, 'বঙ্গচ্ছেদের দিনে হঠাৎ মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল।' লোকসাধারণকে 'সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কমিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি।'

য়ুরোপের জনসাধারণ সত্যই আজ শক্তিমান হইয়াছে, তাহার কারণ সেখানে ধনের অত্যাচারে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। সেখানে জনসাধারণ ভিক্ষা করে না, দাবী করে। সেইজন্য তাহারা দেশের লোকদিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের লোকহিত সাধনের ধর্মবুদ্ধি হঠাৎ একবার চমক খাইয়া উঠে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে। (পৃঃ ২৯৫)

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে কেননা আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। নিজেকে লোক বলিয়া জানেনা, সেইজন্য জানান দিতে পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব, সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। 'বাস্তব' নামক প্রবন্ধে তিনি লোক সাহিত্য সম্বন্ধে যে-কথার আভাস দিয়াছিলেন, তাহাই এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন; লোকসাধারণের জন্য বিশেষভাবে যে লোকসাহিত্য ভদ্রসমাজ সৃষ্টি করিবেন তাহা সাহিত্য পদবাচ্য হইবে না। 'চিরদিন লোক সাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে।' 'দয়ার তাগিদে সৃষ্টি হয় না, অহেতুক আনন্দের জোরেই যাহা কিছু রচনা হইতেছে।' যেখানে 'অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড় আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।' প্রবন্ধের শেষে বলিলেন, আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া

দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরীব মুর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি ; নিম্নতমদের সহিত ন্যায়-ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির পর নহে ; এই নিরন্তর সঙ্কট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তি-শালীকরা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাদের হাতে এমন একটা উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে। সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।" (পৃঃ ৩০১)

সাহিত্য ও আর্টে আদর্শবাদ ও বাস্তবতা কতখানি তাহার আলোচনা করিলেন 'বাস্তব' প্রবন্ধটিতে, কর্ম ও হিতসাধন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিলেন 'লোকহিতে' ; আত্মপ্রকাশ বা সাহিত্য-জগৎ সম্বন্ধে একটিতে, কর্মজগৎ সম্বন্ধে অপরটিতে। কিন্তু ইহাতেও সবকথা বলা হইল না ; এখন এই অন্তর জগৎ ও বহিজগতের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেইটা প্রকাশ করিলেন 'আমার জগৎ' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রদর্শনের মোট কথা এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'। গদ্যে বলিলেন,"আমি আমার চলাফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করিব—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি, তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম করে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত, আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য। আমার অব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।" (স-প ১৩২১ আশ্বিন পৃঃ ৩৬৫। সঞ্চয় পৃঃ ১৩০) এই তিনটি প্রবন্ধ মিলিয়া কবির জীবনাদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। 'গীতালি' ও 'বলাকা'

রামগড় থেকে ফিরিয়া আসিয়া কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। ইতিমধ্যে য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে—তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল। ২০শে শ্রাবণ ১৩২১ (৫ আগষ্ট ১৯১৪) মন্দিরে উপদেশ কালে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাহার মধ্যে ইহার আভাস পাই। তিনি বলিতেছেন,"সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে—কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই আয়োজন চল্‌ছিল। অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। Peace conferenceএ শান্তিস্থাপনের উদ্যোগ চলেছে—তারা কেবলি নানা উপায় উদ্ভাবন ক'রে নানা কৌশলে সেই সময়কে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছে। এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে—সেই পাপই যে মার্‌বে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে।" 'মা মা হিংসী' হইতেছে এই প্রবন্ধের নাম। (ত-বো-প ১৮৩৬ [১৩২১] আশ্বিন-কার্তিক)

'গীতিমাল্যে'র শেষ গান রচনার তারিখ ৪ঠা আষাঢ়—রামগড় হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় লেখা। তারপর মাসাধিক কাল গান দেখি না—শ্রাবণের শেষে 'গীতালি'র গান সুরু হইয়াছে—'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নাম্‌লো।' নূতন গানের ধারার আরম্ভ হইয়াছে; দিনের পর দিন গানের পর গান রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাহা 'গীতালি' খুলিলেই পাঠক দেখিবেন; এটি কবির গানের যুগ।

মাঝে দুই দিনের জন্য কলিকাতা যাইতে হইল,—তার একদিনে লিখিলেন 'বলাকা'র বিখ্যাত কবিতা 'পাড়ি'—"মত্তসাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে" (৫ই ভাদ্র) ও দ্বিতীয় দিন লিখিলেন গান 'আলো যে যায় রে দেখা' (৬ই ভাদ্র)। কলিকাতায় গিয়াছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষে। ১৩২১ সালের ৫ই ভাদ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ত্রিবেদী

মহাশয়ের অভিনন্দন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "কপালে চন্দন দান করিয়া তাঁহার স্বভাবজাত শ্রুতিসুখকর অমৃতবর্ষী মধুর কণ্ঠে এবং কবিত্বপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী মধুর ভাষায় অভিনন্দন পাঠ করিয়া শুনাইলেন।"*

পাঠকের স্মরণ আছে তিন বৎসর পূর্বে (১৪ মাঘ ১৩১৮; ২৮ জানুয়ারি ১৯১২) রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে যে সভা টাউনহলে হয়, তাহাতে রামেন্দ্রসুন্দর অভিনন্দন পাঠ করেন। *

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করিতেন; অথচ উভয় উভয়কে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের মুখে ত্রিবেদী মহাশয় সম্বন্ধে বহুবার অনেক কথা শুনিয়াছি; ত্রিবেদী মহাশয়ের মৃত্যুর পূর্বে কবি তাঁহাকে দেখিতে যান।

কলিকাতায় দুই দিন থাকিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে সুরুলের বাড়ীতে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী বাস করিতেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ গিয়া কিছুকাল সেখানে বাস করিলেন। প্রায়ই বিকালের দিকে গোরুর গাড়ী করিয়া শান্তিনিকেতনে আসিতেন; আজকের পাকা পথ তখন হয় নাই। বেণুকুঞ্জে তখন দিনেন্দ্রনাথ থাকিতেন। সেইখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গানগুলি শিখাইতেন। এই গানের ধারা চলে কার্তিক পর্যন্ত—যখন পুনরায় আবার 'বলাকার' কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। (দ্রষ্টব্য গীতালি ১০৮ নং, ৩রা কার্তিক; বলাকা—'ছবি' ৩রা কার্তিক)।

'গীতালি'র ১০৮টি গান দুই মাসের মধ্যে (৪৬ দিনে) লেখা। সুতরাং বলিতে পারি একটা গানের ঘোরে তিনি ছিলেন এবং বেশির ভাগ দিন কাটিয়াছিল সুরুলে এবং শান্তিনিকেতনে। এই সময়ে 'ভাই ফোঁটা' ও 'শেষের রাত্রি' গল্প দুটি রচিত।

'ভাই ফোঁটা' যে মাসে বাহির হয়, 'লোকহিত' প্রবন্ধটিও সেই মাসেই 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। 'ভাই ফোঁটা' গল্পটির মধ্যে পরের উপকার করার প্রতি যে ঠেসটা দেওয়া আছে তা 'লোকহিতে'র মধ্যেও স্পষ্ট। কয়েকদিন পরে

আশুতোষ রাজপেয়ী, রামসুন্দর ১৩৩০, পৃঃ ১৬৩ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৯৯।

একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "Preaching I must give up, and also trying to take up the role of a beneficient angel to others. I am praying to be lighted from within and not simply to hold a light in my hand." (Letters to a friend p 47) *

ইতিমধ্যে সুরুলে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী উভয়েই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন; ম্যালেরিয়া ধরিল। তাঁহারা যে-আশা লইয়া সেখানে গিয়াছিলেন তাহা অপূর্ণ থাকিল; শান্তিনিকেতনে বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে কিছুকাল কবির মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট বেদনা জাগিতেছিল, যাহা অহেতুকী; সেই অন্ধকার হইতে নিষ্ক্রমণের পর ৪ঠা অক্টোবর (১৭ই আশ্বিন) এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন My period of darknees is over once again. It has been a time of great trouble। বোধহয় মনের এই অবস্থার ছায়া 'শেষের রাত্রি'র মধ্যে পড়িয়াছিল। 'শেষের রাত্রি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। এই গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ Mashi নামে পরিচিত। কবি গল্পটিকে পরে নাটকাকার দান করেন—ইহার নাম 'গৃহ প্রবেশ'।

—————

৭। বাহিরের সহিত যোগ

পূজার ছুটিতে + বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে সুরুলে আছেন। দিন দুই পরে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন ও কয়েকদিন সেখানে থাকেন। ২৩ এ আশ্বিন বুদ্ধগয়া যাত্রা করেন, সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী। বুদ্ধগয়ায় মোহন্তের অতিথি হন। এই সময়ে গয়ায় বিখ্যাত গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহারা

* তুলনীয় 'লেখন' পৃঃ ৩২ ; ভালো করিবার বার বিষম ব্যস্ততা।
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা॥

+ ৭ই আশ্বিন ১৩২১ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)।

রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সম্মান দেখান। প্রভাতবাবুর সহিত কবির এককালে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল; উভয়ের মধ্যে বহু পত্র বিনিময় হয়। গানে গল্পে মজলিসে গয়ায় কয়দিন সকলেরই আনন্দে কাটিয়াছিল।

বুদ্ধগয়ায় বাসকালে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটে। একজন ভদ্রলোক আসিয়া রবীন্দ্রনাথকে বলেন 'বারবরা পাহাড় দেখিতে খুব সুন্দর; আপনাকে সেখানে যাইতে হইবে। পথে আপনার আতিথ্যসৎকার করিবার জন্য বহু লোক প্রস্তুত রহিয়াছে।' লোকটির সঙ্গে ভোরে উঠিয়া কবি ট্রেণযোগে বেলা নামে ষ্টেশনে গেলেন। সেখানে অনেক কষ্টে একখানি পাল্কী যোগাড় করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উহার মধ্যে ঢুকাইয়া লোকটি মহোৎসাহে চলিল; গ্রামের পর গ্রাম যায়, কোথাও কোনো আতিথ্য বা অভ্যর্থনার চিহ্ন নাই; জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'আর একটু আগে সব ব্যবস্থা আছে।' ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিবার পর কবি বিরক্ত হইয়া ফিরিবার জন্য বেহারাদের বলিলেন; ইতিমধ্যে লোকটি কখন সরিয়া পড়িয়াছিল তিনি জানিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ এখন গানের ঘোরে আছেন—তাহা 'গীতালি' খুলিলেই পাঠক দেখিবেন। বেলা ষ্টেশনে বসিয়া লিখিলেন 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে' (নং ৯৫)। পাল্কীপথে লিখিলেন 'জীবন আমার যে অমৃত' (নং ৯৬), 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি' (নং ৯৭)। বেলা হইতে গয়ায় ফিরিবার পথে লিখিলেন, 'পথের সাথী নমি বারম্বার' (নং ৯৮)। পথের দুঃখ, অনাহার তাঁহার গায়ে বিশেষ লাগে নাই, তাহা এই গানের ধারা দেখিলে বুঝা যায়; তিনি ছিলেন অন্তর্লোকে আপনার মধ্যে।

গয়া হইতে কবি গেলেন এলাহাবাদ। উত্তরভারত ভ্রমণ এই প্রথম। সেখানে তাঁহার ভাগ্নেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীর পুত্র সুপ্রকাশের বাসায় ছিলেন প্রায় পনের দিন। এইখানে তাঁহার 'গীতালি'র গানের পালা শেষ হইল (২৯শে আশ্বিন হইতে ৩রা কার্তিক; গীতালি নং ৯৯-১০৮)। এইখানেই আরম্ভ হইল 'বলাকা' কাবতার ধারা—'ছবি' দিয়া সুরু। 'ছবি' লিখিত হয় এলাহাবাদে ৩রা কার্তিক। 'ছবি'র ছন্দ বাঙলা কবিতাকে নূতন পথ দেখাইল, যেমন 'মানসী' ও 'ক্ষণিকা'র ছন্দ বাঙলাকে একদিন নূতন পথ নির্দেশ করিয়াছিল। 'ছন্দ' সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে পারিব না, কিন্তু যাঁহারা

রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন এই 'ছবি' হইতে কাব্যে নূতন পর্যায় সুরু হইল। এইখানেই 'শা-জাহান' কবিতাটি লেখেন (১৫ কার্তিক ১৩২১)।

এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন; ১৮ই কার্তিক (৪ঠা নভেম্বর) শান্তিনিকেতন মন্দিরে পূজাবকাশের পর ছাত্রগণকে উপদেশ দিলেন।* এই উপদেশের মধ্যে তিনি য়ুরোপের ইতিহাসে যে ট্র্যাজেডি যুদ্ধ-আকারে দেখা দিয়াছে সে-সম্বন্ধে বলেন। মানুষের ইতিহাসে উগ্র জাতীয়তাবোধ বা ন্যাশনালিজম মানুষের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তিনি সেদিন বিশেষভাবে সে-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। মানুষের মিলনের তপস্যাকে ভঙ্গ করিবার জন্য 'সয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন ক'রে কত বিরোধ কত আঘাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলচে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ জাতিভেদ ভুল্‌ব। আমাদের দেশে চারিদিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চল্‌চে মানুষকে নষ্ট করবার আয়োজন চল্‌চে—আমরা এই আশ্রমেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব।' কবির ধর্মমত কিভাবে নূতন পথ লইতেছে, তাহা পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিতেছেন।

ইহার পর কয়েকদিনের জন্য রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে কবি দার্জিলিঙে যান। সেখানে উড্‌লাণ্ড হোটেলে ছিলেন; এই সময়ে সেখানে অধ্যাপক ও কবি মনোমোহন ঘোষ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন। একদিন লর্ড কারমাইকেল তাঁহাকে তিব্বতী নাচ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন; লেডি কারমাইকেলও আর একদিন নিমন্ত্রণ করেন। এণ্ড্রুজকে এক পত্রে লিখিতেছেন যে 'আমি চিঠিপত্রের তেপান্তরে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছি (Letters p 48)। দার্জিলিঙে কয়েক দিন মাত্র ছিলেন—১২ই নভেম্বর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে স্থির হইয়া বাস করিলেন না; কয়েকদিনের মধ্যে পুনরায় উত্তর ভারতে বেড়াইতে চলিলেন। এবার প্রথমে যান আগ্রায়। সেখানে আগ্রা কলেজের অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ নাগের বাসায় থাকেন।

* ত-বো-প ১৩২১ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৩৭। সৃষ্টির ক্রিয়া, শান্তিনিকেতন ১৭শ খণ্ড পৃঃ ৬১।

এই সময়ে ‘সবুজপত্রে’ তাঁহার ‘জ্যাঠামশায়’ নামে গল্পটি প্রকাশিত হয় (অগ্রহায়ণ ১৩২১); এবং পর পর চার মাস চারিটি গল্প লিখিয়া এবারকার ছোট গল্প লিখিবার পালা শেষ করেন। এই চারিটি গল্প মিলিয়া একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস হইয়াছে, পরে ইহার নাম দেন ‘চতুরঙ্গ’— ইংরেজিতে অনুবাদ হয় Broken Ties নামে, ফরাসীতে Quatre Voix * বা চারিটি বাণী।

‘জ্যাঠামশায়ে’র চরিত্রের পূর্বাভাস আমরা পাইয়াছি ‘হৈমন্তী’র পিতার মধ্যে। আবার তারই বিকৃত রূপ দেখিয়াছি ‘ভাইফোঁটা’য় সত্যধনের পিতার চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যতগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠদের অন্যতম হইতেছেন জগমোহন। লৌকিক ধর্মাধর্মকে তীব্র কষাঘাত করিবার জন্য যেন জগমোহনের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ যখন আগ্রায় তখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তনের কারণ উদ্ভূত হইল। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৩ সালের প্রথম দিকে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানে তখন মিঃ গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা। ১৯১৪ সালের গোড়ায় তাঁহার সঙ্গে তৎকালীন শাসনকর্তা জেনারেল স্মাটসের একটা সন্ধি হয়। ইহার ফলে ভারতবাসীদের দাবী দাওয়া খানিকটা পরিমাণে তাহারা ফিরিয়া পায়। মিঃ গান্ধী এইসব ব্যাপার বিলাতের ঔপনিবেশিক বিভাগের সহিত আলোচনা করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ভারতে আসিয়া বাস করিবেন স্থির করেন। ট্রান্সভালে তাঁহার একটি বিদ্যালয় ছিল, নাম Pheonix School। তাহাতে প্রবাসী ভারতীয়দের পুত্রেরা ও নিজের পুত্রেরা পড়িত। তিনি তাহাদিগকে কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেন নাই। কঠিন কায়িক পরিশ্রম ও তাহার সঙ্গে পাঠাভ্যাস ছিল তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি। তিনি বিলাত যাত্রা করেন ও বিদ্যালয়টিকে ভারতে পাঠাইয়া দেন। এইসব বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন এণ্ড্রুজ সাহেব। ফিনিক্স স্কুলের ছাত্র অধ্যাপকে প্রায় কুড়ি জন। তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে কয়েকদিন হরিদ্বার গুরুকুলে থাকেন। তারপর

* ইহা ইংরেজি হইতে ফরাসী ভাষায় মাদাম রোলাঁ দ্বারা অনুদিত হয়। রোমাঁ রোলাঁ ভূমিকা লেখেন (১৯২৪)।

আসেন শান্তিনিকেতনে। তাহাদের পঠন পাঠন শিক্ষা শাসন আহার বিহার সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের ছিল ; তথাচ রবীন্দ্রনাথের মনে তাহাদের আহ্বান করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। স্বর্গীয় মগনলাল গান্ধী, শ্রীযুক্ত কোটাল, দত্তাত্রেয় (কাকাজী), রাজঙ্গম, চিন্তামণি শাস্ত্রী প্রভৃতি নানা জাতির লোক এই দলে ছিলেন। আশ্রমে নূতন প্রাণ আসিল। দেবীদাস এখানে ছিলেন, এখনো তিনি আশ্রমের প্রাচীনদের সকলকে স্মরণে রাখিয়াছেন। মহাত্মাজী তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে সবিস্তারেই লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য এণ্ড্রুজের মধ্যস্থতায় এটি ঘটে ; তিনি এযাবৎকাল ভারতের এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে সেতুস্বরূপ কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকরা যখন শান্তিনিকেতনে আসিলেন তখন কবি সেখানে ছিলেন না। নানা আইডিয়া নানা দিক হইতে আশ্রমেতে প্রবেশ করিল। একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

যুদ্ধের সময় বাঙলাদেশের পাটচাষীদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল। পিয়ার্সন সাহেব, কালীমোহনবাবু প্রভৃতি শিক্ষকেরা ছাত্রদের সম্মুখে চাষীদের কথা বর্ণনা করেন এবং কথা হয় ছাত্রেরা কিছু 'ত্যাগ' স্বীকার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবে ও দুর্গতকে সাহায্য করিবে। ছাত্রদের সভায় স্থির হইল যে তাহারা চিনি ও ঘি খাওয়া ত্যাগ করিবে। এই ব্যাপার ঘটে নভেম্বর মাসে— ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' (১৯১৪) কাগজে ইহার কথা প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন আগ্রায়। ৫ই ডিসেম্বর তিনি এণ্ড্রুজকে এক পত্রে ছাত্রদের এই সস্তা ধরণের ত্যাগের নিন্দা করিয়া এক পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন ভাবুকতার দ্বারা দেশ সেবার বিরোধী ; তাই তিনি লিখিলেন "The best form of self-sacrifice for them would be to do some hard work in order to earn money" (Letters p. 50). এই পত্র পাইয়া ছেলেরা একটি ডাঙা জমি কাটিয়া ক্ষেত্র বানায় এবং যে টাকা পায় তাহা পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করে।

আগ্রা হইতে এলাহাবাদে আসিয়া কয়েকদিন সত্যপ্রকাশের বাসায় পুনরায় থাকিলেন ; এইখানে তাঁহার অমর কবিতা 'তাজমহল' ও 'চঞ্চলা' লিখিত। আগ্রায় যে তাজ দেখিয়াছিলেন তাহারই স্বপ্নে লিখিলেন কবিতাটি।

আর সত্যপ্রকাশের বাড়ীর ছাদ হইতে গঙ্গার বিপুল জলরাশি দেখা যাইত—অন্ধকারে সাপের মত সে ধরণীর বক্ষের উপর পড়িয়া আছে—তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন—"হে বিরাট নদী অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি।"

'চঞ্চলা' কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি দার্শনিকতত্ত্ব বেশ স্পষ্ট করিয়া আছে। তাঁহার জীবনে 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এই উক্তি যেমন সত্য, তেমন সত্য তিনি কোনো বন্ধন গ্রহণ করেন নাই—কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক, কি পারিবারিক, কি সাহিত্যিক। যখনই কোনো বস্তু, বিষয়, এমনকি আইডিয়ার প্রতি কোনো আসক্তি বা অনুরাগের স্থায়িত্বের আভাস মাত্র মনে হইয়াছে তখনই সেইটা হইতে মুক্তিলাভই তাঁহার প্রধান কাম্য হইয়া উঠে। 'চঞ্চলা' কবিতাটির মধ্যে সেই সুরটি ধ্বনিতেছে।

সেই নিরাসক্তির কথা সেদিনকার লেখা পত্রেও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

"You must have recognized by this time that I have something elusive in me which eludes myself not less than others. Because of this element in my nature, I have to keep my environments free and open, fully to make room in my life for the Undreamt-of who is expected every moment. Believe me, I have a strong human sympathy, yet I can never enter into such relations with others as may impede the current of my life, which flows through the darkness of solitude beyond my ken. I can love, but I have not that which is termed 'adhesiveness'; or to be more accurate, I have a force acting in me, jealous of all attachments, a force that ever tries to win me for itself, for its own hidden purpose." (Allahabad 18 Dec. 1914. Letters p. 50).

পৌষ উৎসবের পূর্বদিন তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ও যথানিয়ম

৭ই পৌষ মন্দিরে সকালে ও সন্ধ্যায় উপদেশ প্রদান করিলেন (ত-বো-প ১৮৩৬ শক পৃঃ ১৬৭—১৭১)। ১০ই পৌষ খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে তিনি মন্দিরে উপদেশ দান করেন (স-প ১৩২১ পৌষ ৫৯০)। এইসব উপদেশের মধ্যে তিনি বারবার করিয়া য়ুরোপের প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের কথা বলিতেছেন। ক্ষুদ্র জাতীয়তা য়ুরোপকে যেভাবে বিভ্রান্ত করিতেছে তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন "কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত ক'রে তার জাতীয়তাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তুল্‌বে—তা হবে না, ইতিহাস বিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থ দানবের পায়ে এতদিন নরবলির উদ্যোগ করেচে, আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে।" খৃষ্টোৎসবের দিন তিনি এণ্ড্রুজকে

দেখেছিলাম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি
গায়ে তোমার ছড়ায় ধূলা বালি

এই কবিতাটির অনুবাদ করিয়া উপহার দেন—"When mad in their mirth, they raised dust to soil thy robe, O Beautiful, it made my heart sick." (Letters p 52).

'গীতালি'র গানগুলি রচনার পর কার্তিক মাসে 'বলাকা'র দুটি কবিতা লেখেন, মাঝে দুই মাস কবিতা দেখি না ; এলাহাবাদে পৌষ হইতে পুনরায় কবিতার প্রেরণা আসিয়াছে এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায় প্রতিদিনই কবিতা লিখিতেছেন। শান্তিনিকেতন, সুরুল, কলিকাতা, শিলাইদহ পদ্মাতীরে এই কবিতা প্রায়ই লিখিতেছেন ২৭শে মাঘ পর্যন্ত। (বলাকা নং ৮— নং ৩৮)। ইহার সঙ্গে চলিতেছে 'সবুজ পত্রে'র প্রবন্ধ ও গল্প। ইতিমধ্যে কলিকাতার মাঘোৎসবের ডাক আসিয়াছে। পৌষের শেষে তিনি শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতা গেলেন। যথারীতি মাঘোৎসবের কাজ সম্পন্ন করিলেন। কলিকাতায় তাঁহার এক মুহূর্ত বিশ্রাম থাকে না—লোকজনের দেখাশুনার অন্ত নাই। কলিকাতায় সতের দিন ছিলেন একটি মাত্র কবিতা (বলাকা নং ২১) লেখেন। কলিকাতায় তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল ; মনও অত্যন্ত ক্লিষ্ট। তাই ১লা ফেব্রুয়ারী শিলাইদহ চলিয়া গেলেন। শিলাইদহে পৌছানো মাত্র তিনি যেন আপন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন নন্দলাল বসু, মুকুলচন্দ্র দে ও সুরেন্দ্রনাথ কর। মুকুলচন্দ্র তখন আশ্রম ত্যাগ করিয়া অবনীন্দ্রনাথের কাছে

ছবি শিখিতেছেন, নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ তখনো কলিকাতায়—শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁহাদের কোনো সম্বন্ধ তখনো হয় নাই। শিলাইদহে কুটিতে নাই, আছেন হাউস বোটে। সেখানে পৌঁছিবার দুই দিন পরে লিখিতেছেন, "Directly I reached here I came to myself, and am now healed". (Letters p. 55). প্রথম দিন আসিয়াই লিখিয়াছিলেন,"I am same and sound again, and willing to live another hundred years, if critics would spare me." আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এই সময় 'নারায়ণ' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা চালাইতেছিলেন, বোধহয় সেইসব ব্যাপারে কলিকাতায় তাঁহার মন টিকিতেছিল না এবং পদ্মার তীরে আশ্রয় লইয়া যেন তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন মনে হয়।

মনে খুব আনন্দ পাইয়াছেন তা বেশ বোঝা যায়। দশ দিনে 'বলাকা'র বারোটি কবিতা লেখেন। কোনো কোনো দিনে তিন চারটাই লিখিয়াছেন (বলাকা ১৯শে মাঘ ১৩২১—২৭শে মাঘ ; নং ২২-৩৩)।

মাঘের শেষে শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। ১লা ফাল্গুন (১৩ই ফেব্রুয়ারী) বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্বোধন সভায় তিনি বক্তৃতা করিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বক্তাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহারই সারমর্ম 'সবুজ পত্রে' ১৩২১ ফাল্গুন সংখ্যায় কর্মযজ্ঞ'* নামে প্রকাশিত হয়। এই সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ইতিপূর্বে মাঘোৎসবের সময় (১২ মাঘ ১৩২১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর প্রথম সভা হয়। এই সমিতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। এখন পর্যন্ত তিনি এই সভার সম্পাদক আছেন।

পরে ১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ ১৯১৫) রামমোহন লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নতি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তাহার ইংরেজি মর্ম Bengalee দৈনিকে প্রকাশিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'প্রবাসী'র (১৩২২, বৈশাখ) জন্য উহা লিখিয়া দেন—'পল্লীর উন্নতি' নামে।

* 'উদ্বোধন নামে' একখানি পুস্তকে বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হয়। এই সব খবর ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের নিকট হইতে পাইয়াছি।

মাঘের শেষাশেষি কবি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। ৬ই ফাল্গুন তিনি কলিকাতা হইতে যে পত্র লিখিতেছেন তাহাতে গান্ধীজি ও শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ-এর আশ্রমে আগমনের কথা আছে। এই পত্রে আরও জানিতে পারি যে সেই সময়ে একটি রাজপুত ছাত্র আশ্রমে আসে; ছেলেটির নাম অর্জুন শেঠি, বাড়ী জয়পুরে, পিতার নাম প্রতাপ শেঠি, একজন রাজনৈতিক কর্মী। জয়পুর দরবারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া বহু বৎসরের কয়েদের আদেশ হয়। পিতার উপর রাজপুরুষের দৃষ্টি পড়ায় বালকপুত্রটিকেও আশ্রয় দান করিতে সকল লোকের দ্বিধা হয়; রবীন্দ্রনাথ তাহাকে আশ্রমে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি বহুবার নিপীড়িতকে আশ্রয় দিয়াছেন। ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

পাঠকদের স্মরণ আছে অগ্রহায়ণ মাসে মহাত্মা গান্ধী ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে আসে। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিলাত যান, ইহাদের সম্বন্ধে কোনো খবর পান নাই। এণ্ড্রুজ সাহেবের মধ্যস্থতায় তাহারা শান্তিনিকেতনে আসে। গান্ধীজি বোম্বাই আসিয়া সে খবর পাইলেন। গান্ধীজি ও কস্তুরীবাঈ পুত্র ও ছাত্রদের দেখিবার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ (৫ই ফাল্গুন) আশ্রমে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায়, আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এই অতিথিদের যথোচিত সম্মান দেখাইয়াছিলেন; গান্ধীজি 'আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছেন, "The teachers and students overwhelmed me with affection; the reception was a beautiful combination of simplicity, art and love." কিন্তু আশ্রমে দুই একদিন থাকিতেই তিনি টেলিগ্রাম পাইলেন মহামতি গোখ্‌লের মৃত্যু হইয়াছে। বোম্বাই হইতে নামিয়া তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছিলেন; প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ মোচনের জন্য মহামতি গোখ্‌লে বিশেষ শ্রম করিয়াছিলেন। টেলিগ্রাম পাইয়াই গান্ধীজি তাঁহার স্ত্রী ও মগনলাল পুণা চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত এ যাত্রায় গান্ধীজির দেখা হইল না।

১০ই ফাল্গুন (২২শে ফেব্রুয়ারী) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ও সুরুলে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন সৃষ্টিকার্যে ব্যাপ্ত—

বসন্তকালের দিনগুলিকে বৃথায় যাইতে দিবেন না। সুরুলের নির্জন অট্টালিকার ত্রিতলে বসিয়া 'ফাল্গুনী' নাটক লিখিতেছেন। ২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ) উহা শেষ হইলে তিনি আশ্রমবাসীদের নিকট পড়িয়া শোনান।

দুই দিন পরে গান্ধীজি পুণা হইতে আশ্রমে ফিরিলেন। তিনি আশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শর কথা ছাত্রদের নিকট বলিলেন; তাঁহার 'আত্মজীবনী' হইতে আমরা সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদিগের সহিত মিলিয়া গিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। বেতনভোগী পাচকের পরিবর্তে যদি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকেরা নিজেই রান্না করেন তবে ভাল হয়। উহাতে পাকশালার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদিগের হাতে আসে, বিদ্যার্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং নিজে হাতে পাক করিবার ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করে। এইসকল কথা আমি শিক্ষকদিগকে জানাইলাম। দুই একজন শিক্ষক মাথা নাড়িলেন। কাহারও কাহারও এই পরীক্ষা ভাল মনে হইল। বালকদের কাছে তো নূতন জিনিষ হইলেই ভাল লাগে, সেই নীতি অনুসারে ইহা তাহাদেরও ভাল লাগিল। এমনি করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এই বিষয় রবীন্দ্রনাথকে জানাইলে তিনি বলিলেন, শিক্ষকেরা যদি অনুকূল হন তবে এ পরীক্ষা তাঁহার নিজের খুব ভাল লাগিবে। তিনি বিদ্যার্থীদিগকে বলিলেন, ইহাতেই স্বরাজের চাবি রহিয়াছে।" (গান্ধীজীর আত্মকথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২১২)

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ) শান্তিনিকেতনে এখনো সেই দিনটি 'গান্ধী-দিবস' বলিয়া স্মরণ করা হয়। সেদিন ছাত্র ও অধ্যাপকেরা মিলিয়া আশ্রমের যাবতীয় কাজ করেন, এমনকি মেথরের কাজ পর্যন্ত; এই শেষোক্ত কাজে প্রতি বৎসর অগ্রণী থাকেন শিল্পীশ্রেষ্ঠ শিল্পীগুরু নন্দলাল। ১১ই মার্চ গান্ধীজি আশ্রম ত্যাগ করিয়া রেঙ্গুন যাত্রা করেন।

রবীন্দ্রনাথ সুরুলে আছেন; ছাত্রেরা কি করিতেছে তাহা তিনি দেখিতেছেন, তাহাদের কর্মে বা উৎসাহে একদিনের জন্য বাধা দিলেন না; অনেক দূর পর্যন্ত তিনি রশি ছাড়িয়া দেন—এমন কি অন্যায় অমঙ্গলও হইতে গেলে

কোনো বাধা প্রদান করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। কিন্তু পুনরায় যখন রশি ধরেন, তখন খুবই কঠিন করিয়া ধরেন, নির্মম হইতেও তখন তাঁহার বাধে না। অর্থাৎ তিনি দুই চরমের মধ্যে থাকেন—পৃথিবীর পাঁচ জনের মত একূল ওকূল দুই কূল রাখিয়া চলিবার মনোভাব তাঁহার দেখি নাই। একদিন গান্ধীজির সহিত আলোচনা হইতেছিল, আশ্রমে জাতিভেদ রাখা উচিত কিনা তাহা লইয়া। গান্ধীজির মত আশ্রমে সকলে সমানভাবে থাকিবে, আহারে বিহারে কোনো পার্থক্য থাকিবে না। তখন আশ্রমে আহারাগারে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মনেতর বর্গের জন্য পৃথক পংক্তি-ভোজন হইত। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো মত ছিল না। ছাত্রেরা নিজ নিজ অভিভাবকের নির্দেশানুসারে আহার করিত। গান্ধীজি বলিলেন এভাবের পৃথক পংক্তি-ভোজন আশ্রমে থাকা অনুচিত। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, আমি কোনোদিন জোর করি নাই, জোর করিলে তাহারা নিয়ম পালন করিবে বটে, কিন্তু তাহা তাহাদের অন্তরে গাঁথিবে না। যে জিনিষ অন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত না হয়, যাহা বাহিরের চাপে হয় তাহা স্থায়ী ফলপ্রদ হয় না। বলা বাহুল্য গান্ধীজি সেকথা বিশ্বাস করেন না এবং তিনি নিজে আশ্রম স্থাপন করিয়া এই নৈতিক জুলুমে অনেককে কষ্ট দিয়াছিলেন, নিজেও কষ্ট পাইয়াছিলেন। এইখানে কবি ও কর্মীর তফাৎ। ছাত্রেরা যখন আশ্রমের সকলপ্রকার কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে আসিল তিনি সর্বান্তঃকরণে তাহাদের সাধু সঙ্কল্পকে আশীর্বাদ করিলেন। ছাত্র অধ্যাপক সকলে মহা উৎসাহে 'কর্মে' লাগিয়া গেলেন।

২০শে মার্চ ১৯১৫ (৬ই চৈত্র ১৩২১) বাঙলার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও তাঁহার পত্নী লেডি কারমাইকেল শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিতে আসেন। তাঁহার আসিবার পূর্বে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আম্র কুঞ্জে একটি বেদী নির্মিত হয়; উহা এখনো 'কারমাইকেল বেদী' নামে পরিচিত। এই সময়ে মন্দিরের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়; পুরাতন মন্দিরের প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে জুতা ছাতা প্রভৃতি রাখিবার জন্য দুটি ঘর ছিল; সামনে কোরিন্থিয়ান ষ্টাইলে নির্মিত দুই স্তম্ভে 'ব্রহ্মধর্মের বীজ' খোদিত দুই প্রস্তর ফলক ছিল। ঘরদুটি ভাঙিয়া স্তম্ভদুটি নির্মূল করিয়া প্রস্তরখণ্ড দুটি প্রবেশদ্বারে দুই পার্শ্বে স্থাপিত হয়। ছাতিমতলা হইতে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' লেখা একটি পাথরের

খিলান উঠাইয়া আনিয়া 'কারমাইকেল বেদী'র সম্মুখে প্রোথিত হইল। এইসব ভাঙাচোরায় অনেকের আঘাত লাগিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন এসব কোনোটিই পিতৃদেব মহর্ষি করেন নাই, তিনি চোখেও দেখেন নাই। শিল্পের দিক হইতে এই মন্দির ও চতুর্পার্শ্ব অত্যন্ত কদাকার বলিয়া তাঁহার ধারণা। ছাতিমতলায় যে বেদী আছে তাহাতে মহর্ষি কোনো দিন বসেন নাই। সেই সময়কার বড় লোকদের রুচির পরিচয় এইসব কীর্তি; ছাতিমতলাটি বিলাতি টালি দিয়া বাঁধানো। পরেশনাথ পাহাড়ের উপর পরেশনাথের ছয় ফুট পায়ের ছাপও যেমন সত্য, মহর্ষির সাধনার সহিত এই মন্দির ও সংলগ্ন স্থান ও ছাতিমতলার বেদীর সম্বন্ধ তেমনি সত্য। সুতরাং এ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা রবীন্দ্রনাথের কাছে শ্রদ্ধেয় নহে।

২৮শে মার্চ (১৪ই চৈত্র) কবি কলিকাতা বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীতে 'পল্লীর উন্নতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

৩১শে মার্চ (১৭ই চৈত্র) গান্ধীজি রেঙ্গুন হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন ও ৩রা এপ্রিল হরিদ্বারের কুম্ভমেলা দেখিতে সকলকে লইয়া চলিয়া যান।

রবীন্দ্রনাথ সুরুলেই আছেন। আশ্রমে তখন যাদব নামে একটি ছেলের টাইফয়ড। ছাত্রদের ইহাকে সেবা করিতে হইতেছে; রান্নাবান্নার কাজ নিজেরা করিতেছে; 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় হইবে তাহার মহড়া দিতেছে। ছাত্র ও অধ্যাপকের কাহারও বিশ্রাম নাই। ১০ই এপ্রিল যাদবের মৃত্যু হইল। এই ছাত্রটির নামে পিয়ার্সন তাঁহার Santiniketan নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করেন ও উহার উপস্বত্ব আশ্রমের হাসপাতালে দান করেন।

'সবুজপত্রে'র চৈত্রের (১৩২১) সংখ্যায় 'ফাল্গুনী' প্রকাশিত হইল। এপ্রিলের ইষ্টারের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে 'ফাল্গুনী'র অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় নামিলেন। ৺জগদানন্দ রায় 'দাদা', ক্ষিতিমোহন সেন 'চন্দ্রহাস', গ্রন্থকার 'সর্দার', ৺শরৎকুমার রায় 'মাঝি', ৺কালিদাস বসু 'কোটাল', সন্তোষ মিত্র 'ব্রুলু' ৺দিনেন্দ্রনাথ, ৺সন্তোষ মজুমদার, ৺অজিত চক্রবর্ত্তী, অসিত হালদার প্রভৃতি ঘর ছাড়ার দলে নামেন।

চৈত্রমাসে 'সবুজপত্রে' উহা প্রকাশিত হইল। তখন সাহিত্য জগতে উহা তেমন কিছু চঞ্চলতা সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সে হইল পর বৎসর

কলিকাতায় যখন উহা অভিনীত হইল ; সুতরাং 'ফাল্গুনী' সম্বন্ধে আলোচনা সেই সময়ে করা যাইবে। গানের দিক হইতে একটি কথা বলিবার আছে। 'গীতালি'র গানের ধারা শেষ হয় ৩রা কার্তিক, তারপর আরম্ভ হয় 'বলাকা'র কবিতার পালা ; সেও চলে ২৯শে মাঘ পর্যন্ত। পুনরায় ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ হইল 'ফাল্গুনী'র গান রচনা। 'ফাল্গুনী'তে ২৯টি গান আছে এবং সেগুলি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে রচিত।

৮। ঘরে বাইরে

একটা বৃহৎ উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে ছোট গল্পের পালা চলে, সে যেন মহাযজ্ঞের উদ্বোধন। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত শেষ গল্প চারিটি পরে 'চতুরঙ্গ' নামে গ্রন্থাকারে বাহির হয়। এই বইখানিকে উপন্যাস বলা চলে না, আবার ছোট গল্পও বলা যায় না। অনেক সাহিত্যিকের মতে রবীন্দ্রনাথের গল্প ও নভেলের মধ্যে 'চতুরঙ্গ' শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 'জ্যাঠামশায়' যেমন তাঁহার অপরূপ সৃষ্টি, তেমনি জটিল সৃষ্টি 'শচীন' ও 'দামিনী'। 'শ্রীবিলাস'কে দেখিয়া মনে পড়ে 'চোখের বালি'র বেচারা বিহারীকে। 'চতুরঙ্গে'র শেষ গল্প 'শ্রীবিলাস'। ছোটগল্প লেখার পালা শেষ হয় ফাল্গুন মাসে (১৩২১)। বর্ষ শেষ করিলেন 'ফাল্গুনী'র গানে, আনন্দ আবেগের হিল্লোলে। এইবার নববর্ষে (১৩২২) আরম্ভ করিলেন 'ঘরে বাইরে' নামে উপন্যাস। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া এই উপন্যাসটি 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। এ সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কবিতা খুব কম লেখেন, গান আরও কম। তবে গদ্য প্রবন্ধ, বিতর্ক প্রচুর লিখিতেছেন—এ ছাড়া শান্তিনিকেতনে আছেন, সুবিধা পাইলেই মাষ্টারি করিতেন। স্কুল মাষ্টারের উপর তাঁহার খুব রাগ, কিন্তু নিজে যখন মাষ্টারি করেন তখনো পুরোদস্তুর কাজ করেন ও কাজ আদায় করেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, তাঁহার গল্প-সাহিত্যে যে

কয়টি আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্কুল মাষ্টার বা অধ্যাপক।

গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইলে তিনি কোথাও নড়িলেন না, শান্তিনিকেতনে তাঁহার সেই ছোট কুটরী যাহাকে পরে নাম দিয়াছেন 'দেহালি' তাহাতে আছেন। এণ্ড্রুজ দিল্লী হইতে ১০ই মে আন্দাজ শান্তিনিকেতনে ফেরেন। আসিয়া রাত্রে কলেরার মত হয়; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করেন; অবস্থা সঙ্কটজনক হয়। ছুটির সময় লোকজন নাই; দুই একটি ছাত্র তাঁহার সেবা করে। সিউড়ী ও বর্ধমান হইতে ডাক্তার আসে। তিনি এই ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে তাঁহার What I owe to Christ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সেবার কথা বিশেষভাবে তিনি লিখিয়াছেন। এণ্ড্রুজ কলিকাতায় নার্সিং হোমে গিয়া কিছুকাল থাকিলেন, রবীন্দ্রনাথও সেই সময়ে কলিকাতায় যান।

৩রা জুন ১৯১৫ (২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২) সম্রাট বাহাদুর পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে 'স্যর' (Knighthood) উপাধি দান করা হয়। সাহিত্য-সেবার জন্য সাম্রাজ্যের এত বড় সম্মান এ পর্যন্ত কোনো ভারতবাসী ইতিপূর্বে পান নাই। বৃটিশ গবর্মেণ্ট হইতে ইহাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সম্মান।

গ্রীষ্মের ছুটির কিছুটা কলিকাতায় অতিবাহিত করিয়া ৮ই আষাঢ় (২৩শে জুন) রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ফিরিলেন, বিদ্যালয় খুলিয়াছিল (১২ই জুন) ২৯শে জ্যৈষ্ঠ। কবি এই সময়ে শান্তিনিকেতনে সংস্কৃতের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থকে দিয়া বাল্মীকির রামায়ণের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করাইতে ব্যস্ত। ১৯১৫ সালে কবির এই একখানি মাত্র বই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি তাড়াতাড়িতে করা হয় বলিয়া তেমন ভালভাবে সম্পাদিত হয় নাই। সেইজন্য সেখানি সাধারণের নিকট তেমন পরিচিত নহে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন সংস্কৃত রামায়ণ পড়েন, তখন দাগ দিয়া রাখিয়াছিলেন, উহা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদিত হয়।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি একখানি পত্র হইতে জানিতে পারি তাঁহার মনে নানা চিন্তা, নানা কল্পনা খেলিতেছে। পূর্ববঙ্গের আর্থিক দুর্গতি হেতু

ছাত্রসংখ্যা বিদ্যালয়ে হ্রাস পাইতেছে—তাহাতে আর্থিক দিক হইতে বিশেষ ভাবনার কারণ হইয়াছে। কিন্তু এই ভাবনার মধ্যেও তাঁর মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয় নাই। নিজে আবার খোলাপথে চলিবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, একটা ভবঘুরে তাঁহার অন্তরে আশ্রয় লইয়াছে; কিন্তু মুক্তি নাই বলিয়া অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেছেন। নিজের ভিতরে একটা অজানা আবির্ভাবের আশঙ্কা করিতেছেন, যেন পুনরায় একটা নব প্রেরণার সম্মুখীন হইতেছেন। তিনি লিখিতেছেন যে এই তথ্যটি আমার কাছে ক্রমশই স্পষ্ট হইতেছে যে কবিরা কখনো কোনো এক কাজে নিজেদের বাঁধিয়া রাখিবে না। মোটকথা বিদ্যালয়ের পাঁচ রকমের কাজ যাহা হইতে তিনি বৃদ্ধবয়সেও নিজেকে মুক্ত করেন নাই, সেইসব ঝঞ্ঝাট তাঁহাকে ক্লান্ত করে, ক্লিষ্ট করে। কিন্তু মুক্তিও লইতে পারেন না, কারণ যে-বন্ধনে নিজেকে বাঁধিয়াছেন, তাহা হইতে মুক্তির ভরসা কম। (Letters, June 30 1915 p 59-60).

কলিকাতায় চলিয়া গেলেন জুলাইএর গোড়ায়। সমস্ত কাজকর্ম চুকাইয়া দিলেন এমনিভাব চিঠিতে পাই। শান্তিনিকেতনের অনেক জিনিষ তাঁহার ইচ্ছা সত্ত্বেও যথার্থ মূর্তি পরিগ্রহ করিতে পারিতেছে না এ বেদনা তাঁহার চিরদিনের। তাহার প্রধান কারণ যখনই যে-কোনো ভাব মূর্তি লইয়াছে, যখনই তাহার একটা বাস্তব মূর্তি খাড়া হইয়াছে, তখনই কবির চিত্ত আদর্শের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া সায় পায় নাই—এবং সে মূর্তি তিনি নিজেই ভাঙিয়াছেন। "Forms are stupid dumb things that struggle to stand still, until at last they break into pieces." (Letters p 60)। আদর্শের সঙ্গে বাস্তব মিলিতেছে না কিন্তু মিলাইবার জন্য জুলুম তাহাও তিনি করিবেন না। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিরক্ত, অথচ জোর করিয়া কিছু করিবেন না, তিনি লিখিতেছেন—"I donot believe in lecturing or in compelling fellowworkers by coercion ; for all free ideas must work themselves out through freedom. Only a moral tyrant can think that he has the dreadful power to make his thought prevail by means of

subjection. There are men who make idols of their ideas and sacrifice humanity before their altars. But in my worship of the idea I am not a worshipper of Kali "(Letters, July 7th. 1915. Calcutta. p. 60). কিন্তু এ উক্তিকে চরম বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণ নাই; কারণ যখন তাঁহার মনের এই Passive বা নিষ্ক্রিয় ভাব কাটিয়া যায়, এখন তিনি তাঁহার Ideaকে মুক্তি দিবার জন্য কর্মী হন। কিন্তু এই পত্রে অত্যন্ত একটা Pessimism দেখি—তাঁহার সহ-কর্মীরা তাঁহার আদর্শ বা আইডিয়া গ্রহণ না করিয়া Formএর উপর জোর দিয়া চলিতে চাহিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সব চেয়ে ভাল পন্থা হইতেছে দূরে চলিয়া যাওয়া (is to go away, and give my idea a new birth and create new possibilities for it)।

কলিকাতাতেও আরাম পাইলেন না, শিলাইদহে গেলেন, শান্তিনিকেতনের উপর মনের বিরূপতা খুবই তীব্র। ইহার কারণ ছিল। পিয়ার্সন ছিলেন আদর্শবাদী; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাজেআঁটা স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী তাঁহার ভাল লাগে নাই; শান্তিনিকেতনের যে-আদর্শ তিনি মনের চক্ষে দেখিয়া এখানে আসিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সহিত কাথাবার্তায় যাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহার সহিত বাস্তবের পার্থক্য তাঁহাকে পীড়িত করিত। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র না তৈয়ারী করিলেও নয়, সেটা হইতেছে ব্যবহারিক দিক; তাকে অবহেলা করিবার পুরা সাহস এপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের হয় নাই, তাঁহার সহকর্মীরাই তার প্রধান অন্তরায়। বরং দিন দিন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার বাহাদুর তাঁহাদের জাল বিস্তার করিতেছেন এবং কর্তৃপক্ষ সেটা inevitable বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। পিয়ার্সনের পক্ষে এই আপোষ করা কঠিন। এই আদর্শের সহিত বাস্তবের বিরোধেই রবীন্দ্রনাথের মন ক্লান্ত; তাই তিনি আশ্রয় লইলেন শিলাইদহে, সঙ্গে পিয়ার্সন। গত বৎসর মাঘমাসে (১৩২১) তিনি শিলাইদহে গিয়া বাস করেন নাই, তিনি ছিলেন নৌকায় পদ্মার তীরে। সুতরাং প্রজাদের মধ্যে আসিলেন বহু বৎসর পরে।

দিন বারো শিলাইদহে কাটাইলেন (১৬ই জুলাই—২৮শে জুলাই) এই খানে যাইবার আগেই তাঁহার মনে বিদেশ যাইবার কল্পনা চলিতেছিল। এবার

মন ছুটিয়াছে জাপানের দিকে। পরামর্শাদি হইতেছে পিয়ার্সনের সঙ্গে (Letters p 63, July 16. 1915)।

শিলাইদহ হইতে কলিকাতা হইয়া শান্তিনিকেতনে আসিলেন ৯ই আগষ্ট ১৯১৫। ছুটির পূর্বে তিনি মাষ্টারি করিতেছিলেন, সেটা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাই কয়েকদিন পূর্বে লিখিয়াছিলেন, "I am afraid my life at the Asram was at last making me into a teacher which was unsatisfactory for me, because unnatural." (Letters p. 64).

এমন সময়ে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন চলিলেন ফিজিদ্বীপে (১৯ ভাদ্র ১৩২২)। সেখানকার ভারতবাসীদের প্রতি স্থানীয় গবর্মেণ্ট সুবিচার করিতেছেন না—তাহাই স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবার জন্য সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি রওনা হইলেন। তাঁহাদিগকে সমুদ্রপারে যাইতে দেখিয়া কবির মন বাহিরে যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ; তিনি এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন—"You and Pearson * * have left their nest for the passage across the sea ; and I can hardly control my wings." (Sep 23, 1915). মন চঞ্চল হইলেও তিনি ছেলেদের লইয়া আনন্দে 'শারদোৎসবে'র রিহর্শাল দিতেছেন। মাঝে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় যান রামমোহন রায়ের বার্ষিক স্মরণ দিনে (২৭ সেপ্টেম্বর) বক্তৃতা করিতে। এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা অপরিসীম। রামমোহনের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে সেদিনও তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন। (প্রবাসী ১৩২২ কার্তিক : বক্তৃতার মর্ম 'সঞ্জীবনী' হইতে গৃহীত ; ভারতপথিক রামমোহন ১৯৩৪)।

যুদ্ধের সময়ে বিদেশ যাওয়ার এখন অনেক বাধা। কিন্তু মন যখন চলিবার জন্য ব্যস্ত তখন একটা কোথাও যাওয়া চাই। তাই চলিলেন কাশ্মীর—কবিদের কল্পনার স্বর্গ। তাঁহার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী ও কবি সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত। তখন কাশ্মীরে শিক্ষাসচিব ছিলেন পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীনগরে পৌঁছাইয়া লিখিতেছেন, "অভিনন্দন, অভ্যর্থনা আপ্যায়ন চলিতেছে, এখনো কাশ্মীরে আসিয়া পৌঁছাই নাই।" কবি ছিলেন রাজ অতিথি, শ্রীনগরের নীচে বিতস্তা নদীর উপর রাজার একখানি হাউস্‌বোটে। মার্তণ্ডর

সূর্যমন্দির একবার দেখিতে যান ; তা ছাড়া শ্রীনগরের বাহিরে আর কোথায়ও যান নাই।

শ্রীনগর বাসকালে বহুদিন পরে কবিতা লিখিলেন—"আজ প্রভাতের আকাশটি এই শিশির ছলছল" (নং ৩৫), 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' (নং ৩৬ ; কার্তিক, ১৩২২) ; 'বলাকা'র শেষ কবিতা লিখিয়াছিলেন ২১এ চৈত্র ১৩২১ ; তারপর সাতমাস পরে এই কবিতাগুলি লিখিলেন।

এই সময়ে লিখিত আর একটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; "দূর হ'তে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন"। কবিতাটির মধ্যে যুদ্ধের যে বেদনা, যে আশা, সমগ্র জগৎকে সেদিন আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারই ভাব কবি প্রকাশ করেন।

"পুরাণো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,—
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি
তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি॥

কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করিতে দেখিতেছি না। তিনি অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে শিলাইদহে পুনরায় গিয়াছেন। সেখানে বাসকালে 'সবুজপত্রে'র লেখা লিখিতেছেন ; 'বলাকা'র দুইটি কবিতা লেখেন (৩৮, ৩৯ নং)। ১৯১৫ অব্দ মহাকবি সেক্সপীয়রের ত্রিশতবার্ষিকী বৎসর ; সেইজন্য সেক্সপীয়র সোসাইটি একটি জয়ন্তী ভল্যুম প্রকাশ করেন ; তাঁহারা পৃথিবীর সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষীদের রচনা সংগ্রহ করেন। রবীন্দ্রনাথ একটি সনেট্ রচনা করিয়া দেন—"যেদিন উদিলে তুমি বিশ্বকবি" (১৩ অগ্রহায়ণ, ২২)।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসখানি এখনো শেষ হয় নাই ; কিস্তিতে কিস্তিতে 'সবুজপত্রে' বাহির হইতেছে ; ইতিমধ্যেই সাহিত্যিক মধুচক্রে লোষ্ট্রপাত হইয়াছে। মৃদু গুঞ্জন সুরু হইয়াছে ; গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে যে পরিমাণ হুল

লেখকের অঙ্গে বিদ্ধ করা হইয়াছিল, সেকথা তুলিতে গেলে অনেক অপ্রিয় সমালোচনার দায়ে পড়িব। বোধহয় শিলাইদহে থাকিতে তিনি একটি অনামা মহিলার কাছ হইতে 'ঘরে বাইরে' সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন পান। তারই জবাব দেন অগ্রহায়ণের 'সবুজপত্রে'। উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে কেবলমাত্র 'খুসি' মত লিখিয়াছেন এ উত্তর যথেষ্ট নহে। উপমা দিয়া বলিলেন, হরিণের গায়ে দাগ আছে, তার উদ্দেশ্য লোকে বলে 'এই সমস্ত চিহ্নের দ্বারা আলোছায়ার সঙ্গে সে বেমালুম মিশিয়ে থাক্‌তে পারে।' কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হরিণ হয়ত কিছু জানে না। তেমনি লেখক সম্বন্ধে সে কথাটা খাটে। তবে "যেকালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়ত, আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। * * লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে। (পৃঃ ৫২০) আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যেসব রেখাপাত করেছে, 'ঘরে-বাইরে' গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়ছে। কিন্তু এই ছাপের কাজ শিল্পকাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়। (পৃ ৫২১) 'ঘরে-বাইরে' গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালোমন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই রঙীন্ সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের।" (পৃ ৫২২) এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে পরেও একবার আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হইয়াছিল। এখনো 'ঘরে-বাইরে' শেষ হয় নাই।

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি সময় কবি শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন ও ২৪শে অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর ১৯১৫) 'শিক্ষার বাহন' বক্তৃতা করেন (স-প ১৩২২ পৌষ পৃঃ ৫২৯-৫৫৫। পরিচয় পৃঃ ১১০-১৩৩)। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে (১২৯৯) 'শিক্ষার হের-ফের'-এ যে-কথা বলিয়াছিলেন—তাহাই পুনরায় জোরের সহিত নানা যুক্তির বলে বলিলেন—সেটি হইতেছে বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আজ দেশ অনেক আগাইয়া আসিয়াছে, সৌভাগ্যবশত আজ য়ুনির্ভার্সিটি ও কৌন্সিলে সদস্যগণ বাঙলাভাষার জন্য লড়াই করিতেছেন।

পৌষের গোড়ায় কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে কবি ফিরিয়াছেন; উৎসবের কয়দিন পূর্বে কবি আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের কাছে তাঁহার আধুনিক নাটকগুলি সম্বন্ধে ব্যাখ্যান করেন। ৭ই পৌষ যথারীতি উৎসব হয়; উপদেশ বক্তৃতা কোথাও লিখিত আকারে নাই।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনয় করিবার আয়োজন হইল। এই সময়ে বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল; রবীন্দ্রনাথ ঠিক করিলেন যে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপক লইয়া অভিনয় করিয়া যে-টাকা উঠিবে তাহা বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ তহবিলে দান করিবেন। আদিব্রাহ্মসমাজ মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসর গান গাহিবার জন্য ছাত্ররা কলিকাতায় যায়; ঠিক হইল উৎসবের পরই অভিনয় হইবে। কলিকাতায় গিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী'র ভূমিকা স্বরূপ 'বৈরাগ্য সাধন' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিলেন —এই দুইটি একত্র অভিনীত হইল। 'বৈরাগ্য সাধন' ফাল্গুনীর ভূমিকাও বটে, কৈফিয়ৎও বটে। লোকে বোঝে না বলিয়া একটা ধুয়া মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ শুনিতে পান, তখনই তিনি ভুলিয়া যান যে তিনি স্রষ্টা, আর্টিষ্ট; তখন হন তিনি ক্রিটিক; এবং ক্রিটিকরূপে নিজের লেখার নিজেই সমালোচনা, ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিতে আরম্ভ করেন। 'বৈরাগ্যসাধন' লিখিবার পর অন্য নাটকে তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, 'ঋণশোধ' তাহার প্রধান উদাহরণ। 'বৈরাগ্য সাধন' যোগ করায় 'ফাল্গুনী'র সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে কি না তাহা ক্রিটিকরা বিবেচনা করিবেন—তবে চরিতকার হিসাবে আমি বলিতে পারি এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জবাবদিহির ভাব, ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা দেখা দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী'র প্রথমাংশ অর্থাৎ 'বৈরাগ্য সাধনে' কবিশেখরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, সেখানে তিনি তরুণ কবি। অভিনয়ের সময়ে তিনি নিজেই তেতলা থেকে সাজিয়া নামিয়া আসিলেন। মনে আছে সাজঘরের কাছে তাঁহাকে অভিনয়ের পূর্বে দেখিয়া চমকাইয়া গেলাম—এ ত' বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ নয়। সেই সজ্জায় যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন—কয়েক মিনিট ধরিয়া দর্শকদের জয়োচ্ছ্বাস চলিয়াছিল। ত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথ যেন সেদিন দর্শকদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সে কি চঞ্চল জীবন্তমূর্তি! তারপর আসিলেন অন্ধ

বাউলের ভূমিকায়। সে-আবার অন্য মূর্তি! শান্ত সমাহিত স্তব্ধমূর্তি বাউলের 'ধীরে বন্ধু ধীরে' এ গানটি সেদিন যাহারা শুনিয়াছিলেন, এখনো তাঁহাদের কানে তাহা নিশ্চয়ই ধ্বনিত হইতেছে।

'ফাল্গুনী' নাটক অভিনীত হইলে নানা কাগজেপত্রে নানা মতামত প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার অনবদ্য ভাষায় এই নাটিকা সম্বন্ধে স্বল্প কথায় তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁহার জটিল ভাষায় বহুব্যাপক করিয়া 'ফাল্গুনী'র ব্যাখ্যা করিলেন। (প্রবাসী ১৩২২ ফাল্গুন দ্রষ্টব্য)। রামানন্দবাবুর মন্তব্য (ঐ পৃঃ ৪৪৫) উল্লেখযোগ্য। সেসব মতামত উদ্ধৃত করিয়া কোনো লাভ নাই। মোট কথা 'ফাল্গুনী'র অভিনয় নানাদিক হইতে বিচার্য। প্রথমত আর্টের দিক হইতে 'থিএটারে'র সম্মুখে সৌন্দর্যের একটি নূতন আদর্শ তাঁহারা সৃষ্টি করিলেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও সহযোগিতায় যে রঙ্গমঞ্চ সজ্জিত করিয়াছিলেন, সেখানে যে অপরূপ সৌন্দর্যের অবতারণা হইবে তাহা বলা বাহুল্য। 'ফাল্গুনী'র ষ্টেজসজ্জা পরযুগে বাঙলার ষ্টেজকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা অভিনয়ের ইতিহাস লেখকদের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়।

'ফাল্গুনী' বইখানিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয় শিষ্য দিনেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন (১৫ই ফাল্গুন ১৩২২)। উৎসর্গপত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,— "যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমরুর তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্য-কাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মত সমর্পণ করিলাম।"

'ফাল্গুনী' বাঙলা সাহিত্যে, বাঙালীর চিন্তাধারায় নূতন রসসৃষ্টি করিয়াছিল। 'অচলায়তনে'র বেগবান্-প্রাণশক্তি ও অবলীল গতিছন্দ পাঠককে আনন্দ দিলেও হিন্দুসমাজের প্রতি লেখকের যে আঘাত, তাহা এত স্পষ্ট যে তাহার দ্বারা হয়ত উহার কাব্য সৌন্দর্য কিয়দপরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। 'ফাল্গুনী'র মধ্যে একটি গতিশীল প্রাণশক্তির লীলা দেখি। এখানে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকদের প্রতীক্ দাদাকে খাড়া করিয়া কবি যে কিছু ব্যঙ্গ না করিয়াছেন, তাহা বলিতে

পারি না। তবে ইহা সুরে, গানে, রঙে, গতিতে এমনি চঞ্চল যে সে শ্লেষটা তেমনভাবে গায়ে লাগে না।

এক বৎসর পর (১৯১৭) কবি বইখানিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, নাম দেন The Cycle of Spring ; ইংরেজি বইটিও শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন।

মাঘোৎসব ও 'ফাল্গুনী' নাট্য করিয়া কবি কয়েকদিনের জন্য আবার লোকালয় হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। পদ্মার তীর তাঁহার আযৌবন নিরালা বিশ্রামের স্থান, ফাল্গুনের গোড়ার দিকে সেখানে যান। 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা এখানে রচনা করিলেন—"এইক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে" (৭ই ফাল্গুন, ১৩২২) "যে কথা বলিতে চাই, বলা হয় নাই" (৮ই) "তোমারে কি বারে বারে করেছিনু অপমান।" (৮ই)

ফাল্গুনের শেষাশেষি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। 'বলাকা'র শেষের দিকে দুটি কবিতা সেখানে রচিত। বলাকার শেষ কবিতাটি রচিত কলিকাতায় (৯ই বৈশাখ ১৩২৩)—"পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি ওই কেটে গেল।" বলাকার মধ্যে দুই বৎসরের কবিতা আছে—১৫ই বৈশাখ, ১৩২১ হইতে ৯ই বৈশাখ ১৩২৩ পর্যন্ত। এই যুগে পড়ে ছোট গল্পগুলি, 'ফাল্গুনী', 'ঘরে বাইরে'। সমস্তর মধ্যে একটা প্রচণ্ড বেগশীল গতি দেখি ; যাহা কিছু জীর্ণ, যাহা নিরর্থক প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া আছে তাহাকে ভাঙার একটা আনন্দ দেখিতে পাই। কিন্তু সেকথা বলিলে সব বলা হয় না। গতির মধ্যে মহানন্দের স্থিতি আছে, ভাঙার মধ্যে গড়িবার আয়োজন পূর্ণমাত্রায় উপচাইয়া পড়িতেছে।

ফাল্গুন (১৩২২) মাসে 'ঘরে-বাইরে', উপন্যাসটি শেষ হইল—এগার মাস ধারাবাহিকরূপে 'সবুজপত্রে' উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিস্তিতে কিস্তিতে যখন প্রকাশিত হইতেছিল তখনই রবীন্দ্রনাথকে ইহার জন্য সাধারণে জবাবদিহি করিতে হয়। সেই হইতে আক্রমণের অন্ত ছিল না ; সন্দীপ যেসব কথা বলিয়াছেন সেইগুলি রবীন্দ্রনাথের মত ও কথা বলিয়া কোনো কোনো সাপ্তাহিক রবীন্দ্রনাথকে কি লাঞ্ছনা না করিয়াছিলেন ! একটি উপন্যাস বা নাটকের মধ্যে বিচিত্র চরিত্র থাকে, তাহাদের মুখ দিয়া নানা কথা নানা উক্তি লেখক বাহির করেন, সেই উক্তিগুলি যে লেখকের ইহা ভাবিবার কোনো হেতু বুদ্ধিমান

সমালোচক থাকা উচিত নয়। তবে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখ দিয়া 'সীতা' সম্বন্ধে একটা মত বাহির করিয়াছেন, অতএব তাহা রবীন্দ্রনাথেরই মত! আমি জানি একজন তরুণ লেখক স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত অশ্রদ্ধাপূর্ণ কথা যা সন্দীপ বলিয়াছিলেন—তাহাই উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে 'রবীন্দ্রনাথ' লিখিয়া দিয়াছিলেন।

'ঘরে বাইরে' লইয়া বহুকাল রবীন্দ্রনাথকে অরসিক সাহিত্যিকদের হাতে প্রহার খাইতে হইয়াছিল। ইংরেজিতে বইখানি তর্জমা করিয়া পরে প্রকাশ করেন—উহার নাম Home and the World; জার্মান, ফরাশী, ইতালীয় স্প্যানিশ প্রভৃতি য়ুরোপের যাবতীয় ভাষায় ইহার তর্জমা দেখিয়াছি।

উপন্যাস লিখুন, 'ছলিক'ই লিখুন—দেশের নানা অন্দোলন আলোচনা বেদনার সহিত তাঁহার চিত্ত নিত্যই যুক্ত রহিয়াছে। এই সময়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি অত্যন্ত কুশ্রী ঘটনা ঘটে। সেখানকার জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক ছাত্রদের ক্লাসে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে অপমানসূচক কথা বলেন; ছাত্রেরা তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করে ও তাঁহাকে সেই উক্তি প্রত্যাহার করিতে বলে। তিনি তাহা করেন না, ফলে ছাত্রেরা তাঁহাকে প্রহার করে। এই লইয়া কলিকাতায় বেশ একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে নীরব থাকিতে পারিলেন না, বহুদিন তিনি শিক্ষকতা করিয়াছেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও দরদ আছে—তিনি এই বিষয়টি সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিলেন (ছাত্র-শাসনতন্ত্র, স-প ১৩২২ চৈত্র, পৃঃ ৭৪৩-৭৬৪)।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছেলেরা যে-বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধি-কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। মনোরাজ্যে সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে সুরু করিয়াছে। এই সময়ে অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। (পৃঃ ৭৪৫)। "এই বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গাম বাধাইয়া বসে। বিধাতার নিয়মানুসারে বাঙালী ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন একদিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর একদিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে

তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায় সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে।" "অতএব যাদের উচিত ছিল, জেলের দারোগা বা ড্রিলসার্জেণ্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তারাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন, যাঁরা জানেন 'শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা' যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।"

"অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুসি তাই করিবে, আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে?" রবীন্দ্রনাথের মত যে তাহারা ঠিক পথেই চলিবে যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি ছাত্রেরা প্রতিনিয়ত বিদেশী অধ্যাপকের কাছ হইতে দেশের, জাতির, ধর্মের অপমানের কথা শোনে, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই—যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।"

ইংরেজ অধ্যাপক কেবল ছাত্রদের ছাত্র বলিয়া জানেন না, তিনি জানেন তাহাকে 'প্রজা' বলিয়া। নিজেও তিনি কেবলমাত্র অধ্যাপক নহেন, তিনি ইংরেজের রাজশক্তি বহন করিতেছেন—তিনি ইম্পিরিএল সার্ভিসের লোক। (পৃঃ ৭৫০)

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ইংরেজ ও বাঙালীর মধ্যে যে বিরোধ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে সে সম্বন্ধে কথাটা তুলিয়াছিলেন। তিনি বলেন ভারতের ইতিহাসে আর্য দ্রবিড় তুর্কী মুসলমানী যেমন করিয়া গাঁথিয়া গিয়াছে তেমনি করিয়া ইংরেজ আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের ইতিহাস কোনো এক জাতির ইতিহাস নহে—উহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস। ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া লইতেই হইবে। তবে ইংরেজের শাসনও যতক্ষণ কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ মানব সম্বন্ধ না হইবে ততক্ষণ আমাদিগকে শান্তি দিবে, জীবন দিবে না।"

মোট কথা রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দ্বারা গুরু প্রহারকে সমর্থন করেন নাই বটে, কিন্তু উপক্রুত হইয়া ছাত্রেরা যে কাণ্ডটা করিয়াছিল তাহাকে নিন্দা করিয়াও

তাহাদের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক একথা বলিতে পারিলেন না। অপমানকে সহ্য করিবার জন্য তিনি কোনো দিন বাঙালীর ছেলেকে উপদেশ দেন নাই।

এই সময়ে (৪ঠা চৈত্র ১৩২২) শান্তিনিকেতনে বাসকালে লেখেন—"যৌবনরে, তুই কি র'বি সুখের খাঁচাতে ?" মনে হয় বাঙালী যুবকের মনের সংগ্রাম তাঁহাকে নাড়া দিয়াছিল।

'বলাকা'র শেষ কবিতার মধ্যেই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মন চঞ্চল হইয়াছে বাহির হইবার জন্য ;

"ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণপাকে বক্ষেতে আবরি'—
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।"

স্থির হইল জাপান যাইবেন—দেশে আর মন টিঁকিতেছে না—কিছুদিন হইতে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল—শান্তিনিকেতন, শিলাইদহ, কলিকাতা, শ্রীনগর, শান্তিনিকেতন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। এবার বাহির হইলেন সমুদ্রপথে, সঙ্গে চলিলেন পিয়ার্সন, মুকুলচন্দ্র ও এণ্ড্রুজ ; এণ্ড্রুজ জাপান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুকাল হইতে পিয়ার্সনই রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় হইয়াছেন। 'বলাকা' তাঁহাকে উৎসর্গ করেন।

৯। জাপানে

১৩২৩ সালের ২০শে বৈশাখ (৩ মে ১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ, পিয়ার্সন, এণ্ড্রুজ ও মুকুল দে কলিকাতা হইতে জাপানী জাহাজ 'তোষা মারু'তে জাপান যাত্রা করিলেন। বঙ্গোপসাগর দিয়া রবীন্দ্রনাথের যাত্রা এই প্রথম—এই সাগরে

কাল বৈশাখীর রুদ্রখেলার সঙ্গে এবার তাঁহার নিবিড় পরিচয় হইল। ষ্টীমারে বসিয়া ডায়ারি-পত্র লিখিতেছেন। ৭ই মে তাঁহার জন্মদিনে 'বলাকা'র উৎসর্গ পত্রখানি লিখিয়া পিয়ার্সনকে দেন। পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি—পিয়ার্সনের প্রতি তখন তাঁহার প্রীতি কিরূপ নিবিড় ছিল এই কয়েকটি পংক্তি হইতে বুঝা যাইবে :—

"আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপন রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।
ছোটরে কখনো ছোট নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে।
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
তোমারে আদরি' আপনারে করি ধন্য।"

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছাইল। জাহাজ পৌঁছাইবার বহু পূর্বে বিপুল জনতা জাহাজ-ঘাটে আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাইবার পথে রেঙ্গুনে থামিবেন এই খবর পাইয়া সেখানকার ভদ্রলোকেরা মিলিত হইয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করেন। জাহাজ-ঘাটে অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বিরাট মিছিল করিয়া বাসস্থানে লইয়া গেলেন। পথের দুই পার্শ্বে বাঙালী, মাদ্রাজী, গুজরাতী, বর্মীরা কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া; সে এক অপরূপ দৃশ্য। পরদিন জুবিলি হলে জনসভা; মিঃ আবদুল করিম জামাল সভাপতি; তখন জামাল ছিলেন বর্মার মধ্যে ধনীশ্রেষ্ঠ। ব্যারিষ্টার মিঃ উই-ব-থিয়েন বর্মীদের তরফ হইতে, ব্যারিষ্টার নির্মলচন্দ্র সেন (কবি নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র; ইনি ১৩৪১ সালে মারা গিয়াছেন) বাঙালীর তরফ হইতে মানপত্র পাঠ করেন। মানপত্র দুটি বর্মী কারিগরদের দুটি কাস্‌কেটে করিয়া প্রদত্ত হয়; বর্মার রৌপ্যকারিগররা এই শিল্পের জন্য খুবই বিখ্যাত। গবর্ণর স্যর হারফোর্ট বাটলার পত্রের দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। (দ্রঃ প্রবাসী ১৩২৩ বৈশাখ)।

যাকে বলে ইংরেজিতে Sightseeing সে বাতিক রবীন্দ্রনাথের নাই; তবে

যেটুকু চোখে পড়ে তাহা হইতে তিনি অনেকখানি দেখেন। রেঙ্গুনে যে বর্মীরা প্রধান নয় সেটা সহরে ঢুকিয়া চোখে পড়িয়াছে—"রেঙ্গুন সহরটা ব্রহ্মদেশের সহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মত। রেঙ্গুন দেখলুম, কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে কোনো পরিচয় নেই; সেখান থেকে আমার বাঙালী বন্ধুদের আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে কোনো দক্ষিণা আন্‌তে পারি নি।"

সোমবার প্রাতে (৮ই মে) বন্ধুরা রেঙ্গুনের বিখ্যাত শোয়েডেগঙ প্যাগোডা দেখাইতে কবিকে লইয়া যান। রেঙ্গুন সহরটা তাঁহার কাছে একটা এবস্‌ট্রাকশন বস্তু বলিয়া মনে হইতেছিল, যথার্থ বর্মার রূপ যেন তিনি এই মন্দিরে ঢুকিয়াই দেখিতে পাইলেন। কিন্তু মন্দিরের আর্ট তিনি পছন্দ করিতে পারেন নাই। (জাপানযাত্রী পৃঃ ২৭)।

চারিদিন রেঙ্গুনে থাকিয়া ১০মে (২৭ বৈশাখ) জাহাজ পেনাঙ যাত্রা করিল; ১২ই পেনাঙ ও ১৫ই সিঙ্গাপুর জাহাজ পৌঁছাইল। জাহাজের জাপানী কাপ্তেন ও কর্মচারীদের ভদ্রতা কবিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে; তাহাদের কর্মের মধ্যে কোথাও শিথিলতা নাই, কিন্তু বিদেশীযাত্রীর প্রতি ভদ্র হইবার ও তাহাদের কোনো বাধা নাই।

সিঙাপুরে জাহাজ পৌঁছাইলে পিয়ার্সন ও মুকুল সহর দেখিতে গেলেন; কবি ও এণ্ড্রুজ প্রথমে বাহির হন নাই; পরে একজন জাপানী মহিলার অনুরোধে তাঁহারা মোটরে সিঙাপুরে নিকটের রবারক্ষেত্র ও গ্রাম অঞ্চল দেখিয়া আসেন। সিঙাপুরের বন্দর দেখিয়া তাঁর মন ক্লিষ্ট হইতেছিল—তাই গ্রামের ছবি দেখিয়া আসিলেন। (পৃঃ ৫১)

২২ মে জাহাজ হংকঙে পৌঁছিল; সেখানে জাহাজের কাপ্তেন বলিলেন যে সাংহাইতে এই জাহাজের যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি জাপানের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তার পাইয়াছেন যে সাংহাই-এর মালপত্র হংকঙে নামাইয়া জাহাজ সোজা জাপান রওনা হইবে, কারণ সেখানে লোকে কবিকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতেছে।

২৯ মে ১৯১৬ (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩) জাহাজ কোবে বন্দরে পৌঁছিল। কবি গুজরাতী বণিক মোরারজীর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

জাপানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাড়ে তিন মাস—মে মাসের শেষ হইতে সেপ্টেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান আগমন, কিন্তু জাপানে না আসিলেও জাপানে তাঁহার নাম ও কীর্তি যথেষ্ট ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৯০৪-০৫ সালে সানো নামে একজন জাপানী শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শিখাইতেন। রবীন্দ্রনাথ দুইবার বাঙলাদেশে জুজুৎসু শিখাইবার জন্য জাপানী কুস্তীগির লইয়া যান। সানো ছাড়া বৌদ্ধ পর্যটক কাওয়াগাচি যখন ভারত ও তিব্বত ভ্রমণ করেন তখন তাঁহার সহিত কবির পরিচয় হয়। এ ছাড়া সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক কিমুরা জাপানে ছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানিতেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত পরিচয় ছাপাইয়া তাঁহার যশ জাপানে বহু বিস্তৃত হইয়াছিল।

জাপানের দৈনিক কাগজ বোধহয় প্রচারকার্যে আমেরিকান কাগজের সমান—তাহার পাঠক অসংখ্য, লেখক ও রিপোর্টার অগণ্য এবং রিপোর্টার-দের খবর সংগ্রহ করিবার পদ্ধতিও চমৎকার। প্রথমে একদিন কবিকে জাপানের প্রেস এসোসিয়েশন নিমন্ত্রণ করে; পরে আর একদিন জাপানের প্রায় দুই শত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী তাঁহাকে এক পার্টিতে সম্বর্ধনা করেন। বৃদ্ধ কাউন্ট ওকুমা জাপানীভাষায় বক্তৃতা করেন; এই শক্তিমান পুরুষ জাপানের পুনর্জন্মের যুগের অন্যতম নেতা ছিলেন; তিনি ইংরেজি বা য়ুরোপীয়ভাষা জানিতেন না অথচ য়ুরোপীয় সমস্ত রাজনীতি তাঁহার জানা ছিল। কাউণ্ট ওকুমা জাপানীতে বক্তৃতা দিলে রবীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন বাঙলায়, কারণ শ্রোতাদের পক্ষে বাঙলাও যা, ইংরেজিও তাই। অধ্যাপক কিমুরা তাহা জাপানীতে অনুবাদ করিয়া বলেন।

সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে তিনি চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হারার বাড়ী হাকানেতে চলিয়া গেলেন। সেখানেই তিনি এই কয়মাস ছিলেন—মাঝে মাঝে সেখান হইতে বেড়াইতে বা কাজে বাহির হইতেন। হারাসন জাপানের একজন ধনিক, 'কোকো' নামে জাপানী যে আর্ট পত্রিকা বাহির হইত তাহার ছিলেন মালিক। আর্টিষ্ট ও সাহিত্যিকরা তাঁহার কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হন। এইখানে থাকিতে থাকিতে Stray Birds নামে একখানি ইংরেজি বই

ছাপাইবার ব্যবস্থা হয়; কবি ইহাকে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। (The Macmillan & Co. New York, 1916)।

কবি যখন জাপান যান, তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল জাপান দেশের সৌন্দর্য শান্তমনে দেখিবেন ও আমেরিকায় যদি বক্তৃতা-ভ্রমণ (lecture-tour) ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে সেই বক্তৃতাগুলি লিখিবেন। তিনি কতকগুলি বক্তৃতা পথে লেখেন। কিন্তু সব থেকে যে বক্তৃতা এবার বিখ্যাত হয় সে হইতেছে তাঁহার 'ন্যাশনালিজম্' সম্বন্ধে রচনা। জাপানে পৌছিবার পূর্বে ন্যাশনালিজম্ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা লিখিবেন তাহা তিনি ভাবেন নাই। কিন্তু সেখানে যাইবার পর তিনি এমন কতকগুলি বিষয় দেখিলেন ও শুনিলেন, যাহা তাঁহার স্পর্শকাতর কবিচিত্তকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পৃথিবীব্যাপী মহাসমর চলিতেছে। জাপান ইংরেজপক্ষ অবলম্বন করিয়া চীন হইতে জার্মানদের বিতাড়িত করিয়া সিঙটাও অধিকার করিয়াছে। চীন তখন মাত্র চারি বৎসরের নূতন সাধারণ-তন্ত্র, অব্যবস্থা চারিদিকে। জাপান-জার্মানে যুদ্ধের পর চীন জাপানকে জার্মানদের অধিকৃত রাজ্যের বাহিরে যে জাপানী সৈন্য ছাউনী ছিল তাহা সরাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করে। জাপান য়ুরোপের ঘরোয়া যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া চীনের এই ন্যায্য দাবীতে কর্ণপাত করিলই না, বরং ১৯১৫ সালের গোড়ায় চীনপ্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট য়ুন-শি-কাই-এর নিকট ২১ দফা দাবী করিয়া পাঠাইলেন। এই দাবীগুলি যদি পাঠক কোনো চীনা ইতিহাস হইতে পাঠ করেন ত দেখিবেন যে তাহা চীনের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর লজ্জার; অথচ জাপান বেয়নেটের মুখে সেগুলি চীনের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য সকলপ্রকার ব্যবস্থাই করিল। রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়া পূর্ব এশিয়ার এই রাজনৈতিক সমস্যাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন। জাপান যে য়ুরোপীয় যুদ্ধমদ পান করিয়া তাহার গুরুদের ন্যায়ই ভীষণ হইয়া উঠিতেছে তাহা তিনি জাপানে গিয়া খুবই স্পষ্ট হইল। চীনের ন্যায় প্রাচীন জাতির প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিক; তাহার উপর ভারতের ন্যায় সে ত নানা কারণে অসহায় এবং প্রবল প্রতিবেশীর দ্বারা লাঞ্ছিত। এইসব কথা রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করিয়া মনে মনে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ওঠেন এবং হাকোনেতে বসিয়া দুইটি

প্রবন্ধ লেখেন Message of India to Japan ও The spirit of Japan ।* প্রবন্ধ দুটির একটি পাঠ করেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনের শেষে ও দ্বিতীয়টি পাঠ করেন Keio Gijuku বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই মাসের গোড়ায়।

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতাসভায় জাপানের ইংরেজ কবি য়োন্ নোগুচি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা দুটির ও কবির বক্তব্য বিষয়ের সুন্দর একটি সমালোচনা সেই সময়ে লেখেন। (Modern Review 1916 Nov.)

এই দুই বক্তৃতার সারমর্ম প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ জাপান সরকারী-পক্ষের কুদৃষ্টিতে পড়িলেন। এই দুই বক্তৃতার পর তিনি আর কোথাও বক্তৃতার জন্য আহূত হইলেন না; তাঁহার কাছে অতিথি অভ্যাগতের ভিড় কমিয়া গেল এক দণ্ডে কোন্ অদৃশ্য শক্তির গোপন চোখরাঙানীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি লোকের প্রীতি ভালবাসা ম্লান নিষ্প্রভ হইয়া গেল। যখন তিনি জাপান ত্যাগ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন তখন তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য কয়েকজন মাত্র বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, পাব্লিক্ আসিতে পারে নাই।

জাপানে থাকিবার কালে পিয়ার্সনের সহিত পল্ রিশার (Paul Richard) নামে একজন ফরাশী ভাবুকের পরিচয় হয়; পিয়ার্সন তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বেশি আসক্ত হইয়া পড়েন এবং প্রায় গুরুর মত মানিতে লাগিলেন। মুকুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন, সেকথা বলিয়াছি। পিয়ার্সনের ইচ্ছা হইল মুকুল জাপানে থাকিয়া আর্ট শেখে। কিন্তু কবি এই ছেলেমানুষকে জাপানে একা ফেলিয়া যাইতে রাজি হইলেন না; ইহা লইয়া পিয়ার্সনের সহিত কবির একটু মতান্তর হয়। অবশেষে মুকুলকে লইয়াই আমেরিকা যাওয়া স্থির হইল। পল্ রিশার সে সময়ে নিজেকে যতটা সাধু বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, ততটা আধ্যাত্মিক উন্নতি যে তাঁহার হয় নাই তাহা প্রমাণিত হয় পরে। কিন্তু তখনকার মত পিয়ার্সন তাঁহাকে মহাগুরুর মতই মানিতেন। এই পল্ রিশারের পরিত্যক্তা স্ত্রী হইতেছেন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের 'Mother.'

জাপান হইতে আমেরিকায় যাইবার কথা উঠিলে কানাডার ভাঙ্কুভার সহরে

---

* পরে এই দুটি প্রবন্ধ একত্র করিয়া Nationalism in Japan নামে Nationalism গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সেপ্টেম্বর। সবুজপত্র ১৩২৮-২৯ চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যা পৃঃ ৪৭০-৪৮৯ 'জাপানের জাতীয়তা' (রবীন্দ্রনাথের Nationalism in Japan শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ) শ্রীঅমূল্যরতন প্রামাণিক।

নামিবার জন্য এক নিমন্ত্রণ তাঁহার নিকট আসে। তিনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে যতদিন তাঁহার স্বদেশবাসীকে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় অবজ্ঞা ও নির্যাতন করা হইবে ততদিন তিনি তাহাদের মাটি মাড়াইবেন না ; ঐসব জাতির মনের গতি না ফিরিলে তাহারা ভারতবাসীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন না। (প্রবাসী ১৩২৩ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১২০। Toronto Daily Star এ V. Jameson লিখিত সংবাদ হইতে)।

১০। আমেরিকায়

সেপ্টেম্বরের (১৯১৬) গোড়াতে রবীন্দ্রনাথ, পিয়ার্সন ও মুকুলচন্দ্র 'কানাডা-মারু' নামে জাপানী জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিলেন—এই মহাসাগরের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর জাহাজ সিআটল পৌঁছাইল। মিঃ জেমস্ বি পণ্ড্ (J. B. Pond) রবীন্দ্রনাথকে লইতে আসিয়াছিলেন।

এই ভদ্রলোকের পরিচয় দেওয়া দরকার। আমেরিকাতে বক্তৃতা শুনিতে লোকে পয়সা দেয় ; সেইজন্য এইসব বক্তৃতা ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেক ফার্ম আছে। পণ্ড্ 'লিসিয়াম (Pond Lyceum) তাহাদের অন্যতম ও মিঃ পণ্ড তাহার কর্তা। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কণ্ট্রাক্ট হয় যে সেপ্টেম্বর হইতে এপ্রিল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার নানা সহরে বক্তৃতা করিবেন, পণ্ড তাহার যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন—রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার আয়ের অংশ পাইবেন।

সিআটলের নিউ ওয়াশিংটন্ হোটেলে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া

পণ্ডকে বলিলেন, "তুমি আমার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ কর ; তুমি যত বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবে, আমি বক্তৃতা দিব, কিন্তু আমার নিজের কোনো মতলব নাই ; যতই বক্তৃতা হইবে ততই আমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা হইবে। (Los Angeles Times Sep. 18, 1916).

আমেরিকার মাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্বর্ধনা হইল (১৯শে) সান্‌সেট্ ক্লাবের মহিলা সভ্যদের দ্বারা। কবি তাহাদিগকে বলেন যে তিনি আমেরিকার দ্বারে আসিয়া নারীদের নিকট হইতে প্রথম শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য পাইলেন ; ভারতবর্ষে অতিথিকে নারীরাই সমাদর করেন। পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব দূর করিবার এই হইতেছে পথ।

পরদিন তিনি ডাঃ লিল্‌বার্ণ মেরিলের নিমন্ত্রণে মার্সার দ্বীপে জুভেনাইল ইন্‌ড্রাষ্টাইল স্কুল দেখিতে যান ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ছাত্রদের কাছে গল্প করেন।

পণ্ড লিসিয়ামের অন্তর্গত প্রথম বক্তৃতা হইল ২৫ সেপ্টেম্বর সেই সান্‌সেট্ ক্লাবের ঘরে। বক্তৃতা শুনিবার চাহিদা এত হয় যে সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যায় এবং একদিনে দুইবার বক্তৃতা পাঠ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিষয় ছিল The Cult of Nationalism.

ভারতবর্ষ হইতে যখন তিনি বাহির হন তখন ঠিক ছিল অন্য বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন—যেমন Second Birth, The World of Personality, My School, What is Art। ইহার অনেকগুলি জাপানের পথে জাহাজে বসিয়া লেখেন। কিন্তু জাপানে আসিয়া তাঁহার সমস্ত প্ল্যান প্রায় এক প্রকার বদল হইয়া গিয়াছিল। জাপানের রণমোহ ও উদগ্র ন্যাশনালিজিমের কদাকার রূপ দেখিয়া সেইখানে বসিয়া 'জাতীয়তাবাদ' সম্বন্ধেই বক্তৃতা লেখেন ও ঠিক করেন আমেরিকাতে Cult of Nationalism সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। এণ্ড্রুজ সাহেব তখন জাপানে, তাঁহাকে প্রবন্ধ পড়াইয়া শুনাইলে তিনি বার বার বলিলেন, 'তুমি Nation ও State-এর মধ্যে গোল করিতেছ।' রবীন্দ্রনাথ জোর করিয়াই বলেন যে তিনি তাহা করেন নাই, তিনি ন্যাশনালিজমকে আক্রমণ করিতেছেন এবং ভাল করিয়া জানিয়াই করিতেছেন। য়ুরোপে তখন প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে—নেশনে নেশনে আত্মঘাতী মরণযজ্ঞে ব্যাপৃত! য়ুরোপের সমস্ত

মনিষী রণমত্ত গবর্মেণ্টের ভ্রূকুটি কটাক্ষে নির্বাসিত; রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমেরিকায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন 'ন্যাশনালিজম অপদেবতা, ইহার সমক্ষে জীব বলি দিও না।'

তিন বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় আসিয়া প্রায় ছয় মাস ছিলেন; সে-সময়ে তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। তবে হার্ভার্ড,নিউইয়র্ক,শিকাগোতে তিনি 'সাধনা'র বক্তৃতাগুলি করিয়াছিলেন—সে অন্য ভাবধারার সামগ্রী। পরে যখন তাঁহার অন্য বই দুই একখানি করিয়া বাহির হইয়া চলিল, লোকে বুঝিল যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় হইলেও তাঁহার মধ্যে য়ুরোপের চিন্তাধারা স্থান পাইয়াছে, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি-যে প্রাচ্যদেশীয় সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ কাহারও ছিল না।

কিন্তু এবার যে বাণী তিনি বহন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা পূর্ব হইতে পৃথক্। ভারতের সভ্যতার মূলকথা—মৈত্রীর কথা আনিয়াছেন। গতবারও তিনি জাতীয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন; রচেষ্টারে রেস্ কনফ্লিকট বা জাতিসংঘাত সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় তিনি এই অন্ধ জাতীয়তার বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন; তখন জানিতেন না যে পৃথিবীতে যুদ্ধ আসিতেছে; এই দানবীয় যুদ্ধ অন্ধ জাতীয়তা বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশে ফিরিয়া 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের মধ্যেও সেই কথা জোরের সঙ্গে লিখিলেন ও নিখিলেশের মুখ দিয়া প্রচার করিলেন; জাপানে সেই কথা বলিয়া অপ্রিয় হইয়াছিলেন। আজ আমেরিকার সেই অপ্রিয় কথা বলিবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

বক্তৃতার পরদিন Eugene Banks নামে একজন সমালোচক Seattle Post Intelligenceএ লিখিলেন (26 Sep. 1916).—

"Those who dwell in the belief that the Hindu thinker is a suppressed soul who is content to voice the misty dreams, will be well disillusioned if they hear this vigorous logician, seer, prophet. He strikes hard and strikes home in attacking the crass civilization of a goodly position of the earth today. But he is not a pessimist. His vision is of the moral man, not the intellectual giant. And what he sees of the

man, he sees of the nations. The crust of materialism must finally be crushed by its own weight and the great-souled man—the great-souled nation—come forth to live in sanity and beauty."

রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি লইয়া যেরূপ আন্দোলন জাপান আমেরিকা ও য়ুরোপে হইয়াছে, তাহা তাঁহার আর কোনো গদ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে হয় নাই। যুদ্ধের সময়ে বিবদমান 'সভ্য' জগতের সমক্ষে জাতীয়তা-বোধের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সাহসের কথা; দ্রষ্টা না হইলে কেহ ইহা করিতে পারে না।

'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থ পড়িয়া অনেক যুবক যুদ্ধ ত্যাগ করিয়াছিল; ফরাসীদেশে এই বইএর অনুবাদ হয় অনেক পরে; কিন্তু টাইপকরা তর্জমা হাতে হাতে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে ঘুরিত। Max Plowman নামে একজন তেজস্বী ইংরেজ যুবক ১৯১৪ সালে যুদ্ধে যায়; কিন্তু ১৯১৭ সালে 'ন্যাশনালিজম' পাঠ করিয়া তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়; তিনি যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন; সেজন্য তাঁহাকে সমরবিভাগীয় শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা পাঠ করিবার পর তাঁহার মনের ভাব কি হইয়াছিল তিনি লিখিতেছেন; "What to do when the personal application of such words came home to me, I did not know, but what not to do was plain as a pikestaff, and in the moment of that recognition I had ceased from organised war for ever."*

সিআটল ওয়াশিংটন ষ্টেটের প্রধান সহর ও বন্দর। সেখান হইতে পরদিন পোর্টল্যাণ্ড গেলেন; সেখানে ২৭শে সেপ্টেম্বর ড্রামা লীগ-এ (Drama League) বক্তৃতা করেন। এইখান হইতে তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণ সুরু—ইহার পর চারিমাস কেবলই ট্রেন হইতে হোটেল, হোটেল হইতে বক্তৃতামঞ্চে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, বিশ্রাম বা অবসর ছিল না বলিলেই হয়।

* The Aryan Path, 1931 April, p 248 এইরূপ অনেক যুবক আদর্শের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিল।

পোর্টল্যাণ্ড অরিগন (Oregon) ষ্টেটের প্রধান সহর; এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব মনোরম; কাসকেড পর্বতের মধ্যে প্রাচীন অরণ্য ও বিশেষভাবে 'ওয়াশিংটন পার্ক' ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের প্রধানস্থান। পোর্টল্যাণ্ডের বিশিষ্ট লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতার পরদিন তাঁহাদের ষ্টেটের সৌন্দর্য দেখাইয়া আনেন। পার্কে Sacajawea নামে বিরাট লালমানুষের মূর্তি এবং তার পাশে 'শ্বেতমানুষে'র আগমনের যে প্রস্তরমূর্তি খোদিত আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভাল লাগিল। এইখানে প্রেসের জনৈক রিপোর্টার তাঁহাকে আমেরিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। আমেরিকায় যে-লোক এক সপ্তাহ মাত্র আসিয়াছেন, তাঁহার কাছ হইতে তাহারা মত চায়! রবীন্দ্রনাথ মত দেন নাই, তবে বলেন, "আমি যতটুকু দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে মনে হয় তোমরা সর্বদাই পরীক্ষায় ব্যস্ত এবং আশা করিতেছ কলীয়তার দ্বারা সত্যের পথ আবিষ্কার করিবে। কোনো কোনো জিনিষ কলের দ্বারা ভাল তৈয়ারী হয়, কিন্তু যখন জীবনের সম্মুখীন হওয়া যায় তখন কলের কোনো স্থান দেখা যায় না। দিন আসিবে যখন আমেরিকানরা মানেবর চরম আদর্শের জন্য তৃষিত হইবে।" (Portland Telegram 26 Sep. 1916).

৩০শে সেপ্টেম্বর কবি সদলে সানফ্রানসিসকোয় আসিলেন? সানফ্রানসিসকো কালিফোর্নিয়া ষ্টেটের প্রধান সহর ও প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধানতম বন্দর;—এখানে শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত, জাপানী, চীনা ও বহুসহস্র পাঞ্জাবী শ্রমিক ও ছাত্র বাস করে। বক্তৃতার পূর্বে তিনি একজন দর্শনপ্রার্থীকে বলেন—

"Here in the United States you have a great material empire but my idea of a nation is that it should have ideals beyond material ends. You have a worship of organization. Capital organizes, labour organizes, religion organizes—all of your institutions organize. It all makes for endless strife. If there would be more of the fundamental idea of brotherhood and less of organization, I think occidental civilization would be immeasurably the gainer."

সাধারণ আমেরিকান ভারতীয়ের নিকট হইতে এরূপ কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত নয়, তাই একখানি কাগজ ঠাট্টারস্বরে বলিলেন, দেখা যাক্ কবি-দার্শনিক চীন ও ভারতের দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তাঁহার মতকে ব্যাখ্যা করেন। (Sanfrancisco Examiner, 2 Oct., 1916) মোট কথা তাঁহার বিরোধিতা তাঁহার বক্তৃতাদানের সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হইয়াছিল।

সানফ্রানসিসকোয় কলোনিয়েল বলরুমে বক্তৃতা হইল; রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার মধ্যে বৃটীশ শাসনের সমালোচনা হইয়াছিল বলিয়া অনেক আমেরিকান কাগজ বিরক্ত হইয়াছিল। লোকেরও সকল কথা ভাল লাগে নাই—কিন্তু বক্তৃতার পর সভায় বহুক্ষণ শ্রোতারা নীরবে বসিয়াছিলেন, যেন তখনো সম্মোহন কাটে নাই। একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেন, শ্রোতারা যাহাই চিন্তা করুন না কেন, সকলেই বিশেষ মনোযোগের সহিত সব শুনিয়াছিলেন—Their criticism was never the criticism of indifference.

৩রা অক্টোবর আমেরিকাপ্রবাসী জাপানীদের একটি বিশেষ সভায় কবি বক্তৃতা করেন। পরদিন নগরীর বিখ্যাত বোহিমিয়ান ক্লাবে তাঁহার সম্বর্ধনা হয়; সেখানে নগরীর বিখ্যাত আর্টিষ্টরা সমস্ত ঘরটিকে অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শেষ দিনে তিনি কলম্বিয়া থিয়েটারে তাঁহার একটি গল্প (Vision) ও 'রাজা'র অনুবাদ পাঠ করিয়া শোনান। এই সময়ে সেখানে বিখ্যাত বেহালাবাদক Paderewski-র কনসার্ট চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ উহা শুনিতে যান ও কনসার্টের পর দুইজনে বসিয়া বহুক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন। এই সঙ্গীতস্রষ্টার কথা বহুকাল পরেও রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি—সেই আর্টিষ্টের শক্তির কথা বলিতে তিনি বেশ উৎসাহ বোধ করেন।

সানফ্রানসিসকোতে থাকিবার সময় রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া এমন একটা বিশ্রী জিনিষ গড়িয়া উঠিল যাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া দরকার, কারণ তাহার জের বহু বৎসর চলে।

কালিফোর্ণিয়ায় তখন বহু পাঞ্জাবী ও শিখ বিপ্লবীদলভুক্ত ছিল; ইহাদিগকে বলিত 'গদ্‌র' বা 'বিদ্রোহী' দল। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাঞ্জাবের সৈন্যদের মধ্যে কিভাবে বিদ্রোহ জাগাইবার চেষ্টা হয়, কি করিয়া ভারতের

বাহির হইতে সাহায্য আনিবার চেষ্টা হয়—তাহার ইতিহাস জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পাঠকমাত্রই জানেন। এইসব ব্যাপারে কালিফোর্ণিয়ার কতকগুলি ভারতীয় বিশেষভাবে লিপ্ত ছিল। এইখানকার ভারতীয়দের অধিকাংশের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্যই; তবে মোটামুটি তাহারা ধরিয়া লইয়াছিল যে রবীন্দ্রনাথ'ন্যাশনালিজমে'র বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবেন; তিনি ১৯১৫ সালে বৃটীশরাজের নিকট হইতে 'স্যর' উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। 'হিন্দুস্থান গদর' নামে এক পত্রিকায় রামচন্দ্র নামে একজন লেখক রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার এখান সেখান হইতে বাক্য তুলিয়া তাহার কদর্থ করিয়া তীব্রভাষায় এক প্রবন্ধে মতামত প্রকাশ করেন।

৫ই অক্টোবর চারিদিকে গুজব ছড়াইল যে গদর দল রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করিবে। এই কথা শোনামাত্র স্থানীয় পুলিশ ও ডিটেক্‌টিভ রবীন্দ্রনাথের হোটেল ও কলম্বিয়া থিএটরে তাঁহার বক্তৃতার স্থান বিশেষভাবে রক্ষা করিতে লাগিল। বহুশত হিন্দুকে সভায় তাহারা প্রবেশ করিতে দিল না। ইণ্টার-ন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সীর লোকেরা কবিকে সভার পর বাহির করিয়া লইয়া যায় ও হোটেলেও পিছনকার দরজা দিয়া তাঁহার ঘরে পাঠাইয়া দেয়।

এইসব ব্যাপারের মূলে ছিল সামান্য একটা ঘটনা। ষ্টকটন নামে একটি সহর হইতে বিষন সিং মণ্ডু নামে একজন লোক রবীন্দ্রনাথকে সেই সহরে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসিতেছিল। হোটেলের কাছে দুই জন লোক তাহাকে বাধা দেয়; তাহারা চায় না রবীন্দ্রনাথ ষ্টকটনে গিয়া বক্তৃতা করেন। এই মারামারির পর রবীন্দ্রনাথকে হত্যার গুজব রাষ্ট্র হয়।

রামচন্দ্র ইহার জবাবে লেখেন 'আমাদের দলের এইরূপ কোনো অভিসন্ধি নাই। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ, তাঁহার কাজ কাব্য, রাষ্ট্রনীতি নহে। সেইজন্য তাঁহাকে আমরা বিশেষ গ্রাহ্য করি না। তাঁহার ক্ষতি করিলে আমাদেরই আমেরিকায় সর্বনাশ, সেকথা আমরা জানি। পথে মারামারির কারণ এই যে আমরা চাই নাই যে লোকটি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র আপত্তি এই যে বৃটীশের সম্মান তাঁহাকে কিনিয়া ফেলিয়াছে; তিনি বৃটীশ নাইট হইয়া আজ পৃথিবীর

কাছে দেখাইতে চান যে বৃটীশ শাসন ভারতের কত মঙ্গল করিয়াছে; কিন্তু এই অন্তর্জাতিক মহিমা পাইবার পূর্বে তিনি বিদেশীদের বিরুদ্ধে ষাটখানি বই লিখিয়াছিলেন।' (Portland Telegram 21 Oct. 1916)

এইসব ঘটনার পরদিনই কবি Saint Barbara সহরে যান। তিনি সেখানে ডগলাস টুর্ণি (Tourney) কে interview দিয়া বলেন যে 'সানফ্রানসিসকো কাগজে আমাকে হত্যা লইয়া একটা খবর প্রকাশ পায়; আমি তাহার সমস্ত পড়ি নাই।' কাগজে বাহির হয় যে তিনি তাঁহার engagement ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান ইহা তিনি অস্বীকার করেন এবং বলেন তাঁহার প্রোগ্রামের কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই। 'হত্যাসম্বন্ধে যে গুজব উঠিয়াছে সে-সম্বন্ধে আমার দেশবাসীর বুদ্ধির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, এবং আমি আমার সমস্ত কাজ পুলিশের সহায়তা ব্যতীতই করিব। আমি এখানে স্পষ্ট বলিতেছি যে আমাকে হত্যা করিবার কোনো ষড়যন্ত্র হইয়াছিল—তাহা আমি বিশ্বাস করি না।' (Los Angles Examiner 7 Oct. 1916)

একদিন সাণ্টা বারবারা সহরের অন্তপাতী একটি সহরতলীর অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি ক্লাবে 'ন্যাশনালিজম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৭ই অক্টোবর রাত্রে লস্ এঞ্জেলিস সহরে রবীন্দ্রনাথ পৌছাইলেন; এই সহরে পৌছানোর মুহূর্ত হইতে তিনি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি সাংবাদিকগণকে বলেন 'আমেরিকায় আসিয়া আমি কোনো মৌলিক রচনা লিখিতে পারিতেছি না। পাশ্চাত্যরা এই আবহাওয়ার সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে; তাহাতে তাহারা অভ্যস্ত। কিন্তু এই গোলমালে আমি আমার নিজেরই কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পাই না।' মহানগরীগুলি সম্বন্ধে বলেন যে সেগুলি মানুষের ভুলের সৃষ্টি, এবং এমন সময় আসিবে যখন মানুষ সহর হইতে অব্যাহতি লইবে। সহর হইবে আপিসের জন্য; মানুষ প্রকৃতির মাঝে দূরে দূরে বাস করিবে। বর্তমান যানবাহন দূরত্ব দূর করিবে। সহর ব্যবসার খাতিরে মানবজীবনকে পেষণ করিতেছেন। কিন্তু মানুষ ত আর কেবল ব্যবসায়ীই নহে; তারা মানুষ।

৯ই অক্টোবর লস্ এঞ্জেলিসের Cumnock School of Expression এর

তত্ত্বাবধানে Trinity auditorium এ বক্তৃতা হয়। রাজসম্মানে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত হইয়াছিলেন (Los Ang. Times 10 Oct.)। Pasadena নামে একটি সহর লস এঞ্জিলেসের কাছে; সেখানে কয়েক সপ্তাহ হইতে রবীন্দ্রনাথকে সমাদর করিবার জন্য পাবলিক প্রস্তুত হইতেছিল। সাধারণ পাঠাগার ও বইএর দোকানে কয়দিন কবির বইএর অসম্ভব চাহিদা দেখা দিয়াছিল। লস এঞ্জিলিস হইতে পাসাদেনায় আসিয়া তিনি বক্তৃতা করিয়া পুনরায় ফিরিয়া যান। পরদিন কবির নিজ রচনা হইতে কিছু আবৃত্তি করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ আসায় তিনি ট্রিনিটি অডিটোরিয়ামে পাঠ করেন। (Los Ang. Harold, 11 Oct, 16)। লোকে চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাঠ শ্রবণ করে; L. A. Times তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে বলেন, "And the speaker's exquisite English was worth going across the continent to hear." San Diego সহরে এই সময়ে পাখীর প্রদর্শনী হইতেছিল, কবি সেখানে একদিন উপস্থিত হন।

পশ্চিম আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হইল; তিনি সর্বত্র সমাদর যত্ন যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি বিরোধী মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আক্রমণ করিয়া ফিরিতেছিল—তাহাকে উপেক্ষা করা যায় না। Sanfrancisco Call লিখিল, "রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন ভারতের জন্য কি করিয়াছে! আর আমাদের কি দশা হইত যদি আমরা সেই তত্ত্ব জীবনে গ্রহণ করিতাম?

"বৃদ্ধ ভারত কুব্জ, অর্ধভুক্ত, ছিন্নকন্থা-পরিহিত—বোধিদ্রুম তলে বসিয়া আছে, আর অনন্তের চিন্তা করিতেছে! আত্মসমর্পণ খুব বড় গুণ তা সে খৃষ্টানের মধ্যেই হউক আর পৌত্তলিকের কাছে হউক। ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ মন্ত্র প্রচার করুন,—আমরা আমেরিকানরা দৃঢ় সংকল্পকে ভাল বলিয়া সাধন করি।"

L. A. Express আরও বিদ্রূপ করিয়া লিখিল, "যাই হোক অর্থ রোজকার হিসাবেও আমেরিকানদের প্রয়োজন আছে দেখিতেছি। ঠাকুর-মহাশয় তাহাদিগকে তাহাদের ধনের জন্য সমালোচনা করিয়াছেন—কিন্তু সেখানে আসিয়াছেন ত তাহাদের উপার্জিত ধনের কিছু অংশ গ্রহণ

করিতে। * * ধন খুবই হীন পদার্থ, ধনোপার্জন বৃত্তি অত্যন্ত গর্হিত * কিন্তু আমাদের এই সান্ত্বনা যে আমাদের এই তুচ্ছ ধন—যাহা তিনি এতই ঘৃণা করেন তাহাই তাঁহাকে এতদূর টানিয়া আনিয়াছে। তিনি যাহা নিন্দা করেন, তাহাই পাইবার জন্য আসিয়াছেন, এবং এখানে আসিয়া সেই কাজই নিজে করিতেছেন যাহার জন্য এত নিন্দাবাদ।" (১৭ অক্টোবর) এইভাবের সমালোচনাও যথেষ্ট হইয়াছিল।

সান ডিএগো হইতে কবি পশ্চিম আমেরিকা ত্যাগ করিয়া মধ্য দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন ও সলট লেক সিটিতে আসিলেন (১৪ই অক্টোবর)। এই সহরটি উটা (Uttah) ষ্টেটের প্রধান নগরী। এই নগরীতে মরমন (Mormon) নামে এক সম্প্রদায় কর্তৃক গঠিত হয়। তাহাদের ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও নানা সৎকর্ম ও সৎচিন্তায় তাঁহাদের উৎসাহ আছে। এখানেও তিনি ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; কিন্তু লোকে বোধহয় তাঁহার কাছ হইতে হিন্দুরা জীবন সম্বন্ধে কি দার্শনিক মনোভাব পোষণ করে—সে-সম্বন্ধে শুনিতে পাইলে খুশী হইত। কিন্তু এ প্রবন্ধে তিনি যাহা দিয়াছিলেন তাহাতেও তাহারা কম প্রীত হয় নাই। কিন্তু এখানেও তাঁহার মত সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইল।

Salt Lake Tribune লিখিল, "পাশ্চাত্যজাতি ভাবিতেও পারে না যে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক দিক হইতে তাহারা প্রাচ্য সভ্যতা গ্রহণ করিতে পারে। বাহ্যত মনে হয় পশ্চিমের অশান্তি অপেক্ষা অলস প্রাচ্যের শান্তি শ্রেয়।" লেখক ভারতবর্ষ, তিব্বত, চীনের বর্তমান অবস্থা বা প্রাচীন ইতিহাসের কথা তুলিয়া বেশ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন যে ভারতের জাতিভেদ কি ভ্রাতৃস্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত! "স্যর রবীন্দ্রনাথ আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে কেবল দোষ দেখেন নাই আমাদের রাজনীতি সম্বন্ধেও দোষ দেখিয়াছেন। কিন্তু এসব কথার আলোচনায় পৃথিবীর বড় বড় সমস্যার প্রশ্ন উঠিবে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দার্শনিকেরই এইসব আলোচনার সময় ও অবসর আছে।" এই বলিয়া সমালোচক তাঁহার বক্তৃতাকে তাচ্ছিল্য করিতে চেষ্টা করেন।

সলট লেক সিটি হইতে কবি সদলে শিকাগো আসেন; শিকাগো মধ্য-মার্কিন রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র, ইলিনয় ষ্টেটের প্রধান সহর। তিনবৎসর পূর্বে কবি

এইখানে আসিয়া অনেকদিন ছিলেন; এইখানে তিনি Mrs. W. Vaughn Moody-র অতিথি হন; এই মহিলা গত বারও কবিকে তাঁহার গৃহে অতিথি করিয়া রাখেন এবং নানাভাবে কবিকে সাহায্য করেন। শিকাগোকে কেন্দ্র করিয়া কবি কয়েকটি সহর ঘুরিলেন। ২৪ অক্টোবর শিকাগোরে অরচেষ্ট্রা হলে বক্তৃতা হয়।

জাপানে ও আমেরিকায় সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের উৎপাতে কবিকে খুবই বিরক্ত হইতে হইত; পিয়ার্সন এবিষয়ে খুব কড়া ছিলেন এবং কোনো অসাবধানে-বলা-কথা কাগজে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। পরে রিপোর্টারদের কাছে অসাবধানে কথা বলার জন্য তাঁহাকে অনেকবার দুঃখ পাইতে হইয়াছে। অনেক কথা তিনি আধাগম্ভীরভাবে, কখনো বা হাসিতে হাসিতে, কখনো বা বিদ্রূপছলে, কখনো বা খোশগল্পের মেজাজ হইতে বলেন। আগন্তুক ত তাঁহার সে-মনোভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সে ভাবে তিনি যাহা বলিতেছেন সেইটাই বুঝি তাঁহার মত; এবং এই প্রতিযোগিতার বাজারে যে আগে গিয়া কাগজে একজন মহাপুরুষের বাণী বলিয়া একটা কথা প্রচার করিতে পারিবে, কাগজ-ওয়ালাদের কাছ হইতে তার তঙ্কা মিলে প্রচুর। এইজন্য জাপানে ও আমেরিকায় রিপোর্টাররা ছিনে-জোঁকের মত লাগিয়া থাকিত। পিয়ার্সনও খুব হুঁসিয়ার থাকিতেন। জাপানে রিপোর্টাররা তিনি কি খান তা পর্যন্ত ঝি-এর কাছ হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিত। অবশেষে তাহাদের একজন আবিষ্কার করিল যে কুলফী বরফ সম্বন্ধে কবির একটু দুর্বলতা আছে। কাগজে সেইটা রাষ্ট্র হওয়ায় তিনি যেখানে যান সেখানেই লোকে কুলফী বরফ খাইতে দেয়।

সলট্ লেক সিটির হোটেলে একদিন টেলিফোনে ডাক আসিল; পিয়ার্সন রিসিভার ধরিলে লোকটি বলিল যে সে রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে চায়। পিয়ার্সন বলিলেন তিনি কোনো রিপোর্টারকে কবির সহিত এখন দেখা করিতে দিবেন না। লোকটি বলিল যে সে বৃটীশ ভাইস-কন্সাল এবং এখনি কবির সহিত দেখা করা প্রয়োজন। পিয়ার্সন আসিতে বলিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে গিয়া লোকটি বলিতে লাগিল "Your Lordship, Your Lordship ইত্যাদি"। এই কথা শোনামাত্রই পিয়ার্সনের সন্দেহ হইল;

তিনি লোকটিকে বলিলেন, 'মহাশয়, আশ্চর্যের বিষয় বৃটীশ কন্সাল জানেন না যে 'স্যর'কে লর্ডশীপ বলিয়া সম্বোধন করিতে হয় না'—এই বলিয়া লোকটিকে সেখান হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।· শিকাগোতে আসিবার পর এ উৎপাত বাড়ে; কবি স্পষ্টই তাহাদের বলেন, 'আমি হোটেল থেকে হোটেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমার জ্ঞান শ্রোতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ; আমেরিকানদের সম্বন্ধে মতামত দিতে অক্ষম।'

শিকাগো হইতে কবি Iowa ষ্টেট্ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন। ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ কবিকে পূর্বে দেখেন নাই; কবি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও মনোভাব তিনি একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন (Mod. Rev. 1917 Feb.)। ট্রেণে দেখেন কবি George Russellএর সদ্য-প্রকাশিত Imagination and Reveries গ্রন্থখানি পাঠ করিতেছেন। ডাঃ বসু লিখিয়াছেন যে তিন বৎসর পূর্বে যখন কবি এদেশে আসেন, তখন কবির কয়েকজন বন্ধু তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ-সংগ্রহের প্রস্তাব করেন; কবি তখন তাহাতে রাজি হন নাই "He was too patriotic, too proud to take help outside of India." কিন্তু তাঁহার সে মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। এবার আমেরিকায় আসিবার উদ্দেশ্য অর্থ-সংগ্রহ। ডাঃ সুধীন্দ্রনাথকে কবি একখানি পত্রে লেখেন—

"In our country the man who devotes himself to realize his spiritual oneness with all, does not shrink to claim his help from all men; because it amounts to a tacit avowal that he belongs to mankind at large. My institution at Bolpur will accept food from all men and thus renounce the caste for good."

আইওয়া হইতে শিকাগোতে ফিরিয়াছেন; ইতিমধ্যে বিসকনসিন ষ্টেটের প্রধান সহর মিলবৌকি (Milwaukee)-তে কবিকে সম্বর্ধনার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। সেখান হইতে Little Theatre-এর ডিরেক্টর মিসেস এডিথ আডামস্ আসিলেন কবিকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য। সহরে কি উৎসাহ—অন্য সহরে কবিকে যেভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে তাহা হইতে যেন সমাদর কম

না হয় (Mil. Sentinal 21 Oct. '16)। ৪ঠা নভেম্বর মিলবৌকির বৃহৎ Pabest থিএটারে কবির বক্তৃতা হইল—"one of the biggest lecture crowds that has been brought together in Milwaukee for several seasons."

মিলবৌকি হইতে কবি কেণ্টাকি ষ্টেটের প্রধান সহর Louisvilleএ গেলেন ও বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে টেনেসি ষ্টেটের ন্যাশভিলে উপস্থিত হইয়া Vendome Theatreএ বক্তৃতা করিলেন ; পরে তাঁহার হোটেলে নগরীর বহু খ্যাত লোক সমবেত হইয়া কবির নিকট হইতে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহার কথা শোনেন।

দক্ষিণে ন্যাশভিলই শেষ সীমানা। এইবার উত্তরদিকে চলিলেন ; Detroit মিচিগানের প্রধান সহর, শিল্পের প্রকাণ্ড কেন্দ্র। ডেট্রইট্ বণিক ও ব্যবসায়ীদের আড্ডা ; সেখানে তাঁহার ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা খুব কম লোকেই শ্রদ্ধার সহিত শুনিল। কাগজেও অত্যন্ত তীব্রভাবে কবির মতকে আক্রমণ করিতে লাগিল। একজন লেখক Detroit Free Pressএ রবীন্দ্রনাথের মত সম্বন্ধে লিখিলেন, "such sickly saccherine mental poison with which that Tagore would corrupt the minds of the youth of our great United States." আর একটি কাগজ লিখিল রবীন্দ্রনাথের বাণী "utterly opposed to all modern conception." (Det. Journal 14 Nov. '16). সেই কাগজ আরও লিখিল, "জাতীয়তার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে গিয়া আমেরিকানরা যেন কখনো ভুলিয়া না যায় যে পৃথিবীতে জাতীয় ভাব উদ্দীপনার জন্য তাহাদের কার্য অন্য সকল জাতি হইতে পৃথক। আমেরিকান বিপ্লবে আমরা দেখিতে পাই যে একটি জাতি জাতীয়তা বোধ হইতে যুদ্ধ করিতেছে—পৃথিবীতে আর সব যুদ্ধ tribeএর সঙ্গে tribeএর, স্থানীয় বা রাজবংশের সহিত রাজবংশের ; স্বাধীনতার জন্য আমেরিকান সংগ্রাম সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনিতে ভাল, কিন্তু কাজের নয়।" "As an abstract theory the message has much that is attractive and engaging. As a suggestion for practical application it obviously is unsuited for mankind as we know it."

কিন্তু অন্য একদল বেশ ভালভাবেই রবীন্দ্রনাথের বাণীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Detroit Times এর সম্পাদকীয় লেখক লেখেন যে মার্কিন রাজ্যের লোকেরা বুঝিতে আরম্ভ করিতেছে যে তাহাদের বাহিরেও একটা বৃহত্তর পৃথিবী আছে; অন্যান্য দেশেও লোকসমাজে তাহাদের মতই ন্যায় ও সত্যের বোধ আছে; দুর্বল প্রতিবেশীর উপর চড়াও করিয়া তাহাকে লুট করার চেয়েও মানুষের সাধু বৃত্তি আছে; আমরা কেবল জন্তু নই যে বাঁচিবার জন্য কেবলই সংগ্রাম করিতেছি আমরা moral beings with human responsibilities; মোট কথা স্বাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ আদর্শ ছাড়াও মহা মানবের প্রেম বলিয়া একটা জিনিষ আছে। Patriotism is a narrow ideal compared with. the love of human kind. [Quoted by Prof. A. Seymour, Hindusthani Student, Dec. 1916; also Modern Review 1917. April]

১৫ নভেম্বর কবি ক্লেভল্যাণ্ডে আসিয়াছেন। Twentieth Century Club একেবারে ধনীদের প্রাইবেট ক্লাব! কবির নিমন্ত্রণ হয় সেখানে। এই ধনীদের মধ্যে বসিয়া তিনি তাহাদের ধনোন্মত্ততাকে তীব্রভাবে আঘাত করিলেন; তিনি বেশ জোর দিয়া বলিলেন যে মার্কিনরা যথেষ্ট মানবীয় নহে; তাহাদের দেশ লজিং হাউসের দেশ, লোকে সর্বদাই ব্যস্ততা ও গোলমাল লইয়া ব্যস্ত, আর তাহাদের একমাত্র চিন্তা অর্থ উপার্জন। তাহারা সর্বদাই বিনোদনের জন্য লালায়িত, এবং সে বিনোদন বেশ মুখরোচক হওয়া চাই। অবসর মুহূর্তগুলি কেবল আমোদের সন্ধানেই ঘুরিতে ঘুরিতে যায়; লোকেরা সর্বদাই আপনাদিগকে চতুর ও কার্যতৎপর দেখাইবার জন্য ব্যস্ত (smart and clever); ফলে তাহারা উচ্চ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক বিষয়কে লঘুভাবে দেখে। এইসব বলিয়া তিনি বলিলেন, 'তথাচ আমি বিশ্বাস করি যে আমেরিকার ভবিষ্যৎ ইতিহাস উজ্জ্বল— এই দেশ পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনভূমি হইবে। কারণ তোমাদের ইতিহাস য়ুরোপের ইতিহাস হইতে অনেক পবিত্র।' (N. Y. City Mail 16 Nov. '16).

সিআটলে নামিবার ঠিক দুইমাস পরে পথে পথে ঘুরিয়া অবশেষে ১৮ নভেম্বর কবি নিউইয়র্ক পৌঁছাইলেন। সেখানে আসিয়া প্রেস রিপোর্টারদের

বলেন, 'ন্যাশনালিজমের দৌরাত্ম্য পৃথিবীতে বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। আমার মনে হয় তোমরা এখানে সেটি অনুভব কর না; কারণ ইহার সবগুলি উপকার তোমরা পাইতেছ। কিন্তু কোনো জাতিকে বিচার করিতে হইলে সে তাহার organisation হইতে কি লাভ করিতেছে সেদিক হইতে দেখা উচিত নহে, বরং দেখা উচিত যাহারা সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া কোনো উপকার লাভ করিতেছে না, তাহাদের উপর তোমাদের ব্যবহার কিরূপ, তাহার বিচার করিয়া।' এশিয়াটিকদের মার্কিনমুলুকে প্রবেশাধিকার লইয়া কথা উঠে। কবি বলেন, "Your treatment of Asiatics is one of the darkest sides of your national life." জাপানে কবি কতকগুলি জাহাজ কোম্পানীর মালিককে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা টাকা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় যাত্রীদের আমেরিকায় পৌছাইয়া দিতে আপত্তি করে কেন। তাহার জবাবে তাহারা কবিকে বলিয়াছিল বৃটীশ শাসকদের ও কালিফোর্নিয়া গবর্মেণ্টের চাপে তাহারা সাহস করিয়া একাজ করিতে পারে না। বৃটীশ গবর্মেণ্ট খোলাখুলিভাবে কোনো আইন করিতে পারেন না, সেটা বড়ই কুৎসিত দেখায়। (N. Y City Mail 21 Nov. '16.)

নিউইয়র্কে ২১ নভেম্বর কার্ণেগী হলে কবির প্রথম ভাষণ হইল। সাময়িক কাগজে লিখিয়াছিল, এই বক্তৃতাটি 'a memorable day for the city, * * all New York proclaimed that the lecture was one of the most remarkable one, from many standpoints, ever heard in New York (New Haven Courier, 2 Dec. 1916).

পরদিন কবিকে Philadelphia যাইতে হয়; সেখানে সন্ধ্যার পর বালিকাদের Ogonty School এ তাঁহার অনুবাদ হইতে কিছু পাঠ করিয়া শোনাইতে হয়। সেই রাত্রেই নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসেন ও প্রাতে (২৩শে) League of Political Education-এ The World of Personality নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্রুকলিন সহরে তিনি ন্যাশলিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করেন; তাঁহার মতের বিরুদ্ধে এত আলোচনা হইতেছে, অথচ লোকের শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম কিছুমাত্র কমে নাই।

নভেম্বরের শেষাশেষি কবি বষ্টনে আসিয়াছেন। সেখানে মহিলাদের

বিদ্যায়তন Wellesley Collegeএ বক্তৃতা করিলেন; এখানে তিনি নিজ বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর Mount Halyoak College-এ আর্ট সম্বন্ধে বলিলেন। পরদিন জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বলেন Tremont Temple-এ। সেখানে প্রায় তিন হাজার শ্রোতা কবিকে যে অভিনন্দন দেন, তাহা কখনো কোনো বক্তা বোষ্টনে পান নাই ("one of the warmest welcomes ever accorded to a lecturer in Boston" Boston Herald 6 Dec. '16)

বষ্টন হইতে রবীন্দ্রনাথ Yale বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হইলেন। সেখানে বিরাট সভার সমক্ষে কবি তাঁহার 'শিশু'র কবিতাগুলি আবৃত্তি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট Hadley কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, 'We welcome you as one of the seekers of light and truth'; তিনি কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতাব্দী-জয়ন্তীর পদক উপহার দিয়া বলেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় প্রথম দান আসে ভারতবর্ষ হইতে। (Bridgeport Post, 7 Dec. '16).

রাত্রে এলিজাবেথিয়ান্ ক্লাবে ইয়েল সদস্যদের ডিনারে কবিকে তাঁহারা সম্মানিত করেন; সংস্কৃতের অধ্যাপক হপকিন্স কবিকে সংস্কৃতভাষায় অভিনন্দিত করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি নর্দমটনে যান ও স্মিথ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকের সমক্ষে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১১ই ডিসেম্বর Buffalo সহরে The World of Personality সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন।

দুই মাসের উপর পেশাদার কোম্পানীর হাতের বক্তৃতার কলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কবির মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি এইখানে আসিয়া সমস্ত বক্তৃতার কড়ার ইস্তবা দিয়া বলিলেন যে তিনি ফিরিবেন। তিনি Pond Lyceumএর নিকট কড়ার বদ্ধ—এখন সে কড়ার বা contract ভাঙিলে তাঁহাকে বিস্তর ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে—কিন্তু কবির মন যখন একবার বিকল হয়, তখন তাহাকে আর কে নিবৃত্ত করিবে? নিউইয়র্ক হইতে বিদায়ের পূর্বে তিনি ১২ই ডিসেম্বর আমষ্টারডেম থিএটারে বক্তৃতা করিলেন—প্রায় সহস্রাধিক লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া গেল। (N. Y. Times 13 Dec. '16).

পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া পথে পেনসিলভেনিয়া ষ্টেটের প্রধান সহর—

Pittsburghএ ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ক্লেভল্যাণ্ডে তাঁহাকে একবার নামিতে হইল; সেখানে Shakespeare Gardenএ কবিকে নিজ হাতে একটি বৃক্ষ রোপন করিতে হয়; বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল। ফিরিবার পথে শিকাগোতে কয়েকদিন পুনরায় থাকিলেন। সেখানে একদিন তাঁহার কবিতা হইতে তিনি আবৃত্তি করিয়া শ্রোতাদের তৃপ্তি দান করিলেন।

কোলোরেডোর (Colorado) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য জগৎ বিখ্যাত, তা ছাড়া সেখানকার springগুলি সুপরিচিত। কবি ডেনভার হইয়া সেসব স্থান দেখিয়া গেলেন। ফিরিবার পথে Seattleএ গেলেন না, তিনি গেলেন সানফ্রানসিসকোতে। সেখান হইতে কবি, পিয়ার্সন ও মুকুলচন্দ্র ২১ জানুয়ারী (১৯১৭) জাপান যাত্রা করিলেন।

সানফ্রানসিসকোতে তিনি Paul Richard-এর To the Nations নামে একখানি বইএর ভূমিকা লিখিয়া দেন। পূর্বে বলিয়াছি Richard-এর সঙ্গে কবিকে পিয়ার্সন পরিচয় করিয়া দেন। Pond এই বইএর প্রকাশক হন; রবীন্দ্রনাথকে সর্বত্র Pond ঘুরিয়া লইয়া বেড়ান; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যে এই বইএর প্রচারের পক্ষে বিশেষ কাজে লাগিবে তাহা প্রকাশক জানিতেন। নিতান্ত পিয়ার্সনের অনুরোধে পড়িয়া তিনি ভূমিকাটি লেখেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত Hawii দ্বীপের হনলুলুতে তিনি একদিন ছিলেন ও সেখানে বক্তৃতাও করেন। কিন্তু বেশিদিন থাকা হইল না; পিয়ার্সন জাপানে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হন।

জানুয়ারীর শেষে জাপানে আসিয়া পৌঁছিলেন। পিয়ার্সন বলিলেন তিনি পরে যাইবেন। পল রিশার তখন জাপানে। কবি মুকুলচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন মার্চ মাসে।

পিয়ার্সন সেখানে জাপানে থাকিয়া গেলেন; সেইখানে থাকিবার সময় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লেখেন; তাহার ভূমিকা লেখেন পল রিশার। বইখানি পরে ভারতগবর্মেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। ১৯১৭ সালের শেষদিকে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সিঙাপুর হইতে বন্দী করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া অন্তরীণাবদ্ধ করেন।

১১। বিচিত্রা ক্লাব

দশমাস পরে দেশে ফিরিলেন (মে ১৯১৬—মার্চ্চ ১৯১৭)। দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এই কয় মাসে; পরিবারের ও বিদ্যালয়ের মধ্যে বদল দেখিলেন অনেক।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'বিচিত্রা' নামে একটি স্কুল খোলা হয় কয়েক বৎসর পূর্বে। গগনবাবুদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা, রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী, নীলরতন বাবুর মেয়েরা ও আরও দুই চারটি মেয়ে পড়িতেন ও ছবি আঁকিতে শিখিতেন। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, মুকুলচন্দ্র দে ও ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার। এ ছাড়া একজন জাপানী চিত্রকরও কিছুদিন ছিলেন। সাহিত্য শিক্ষাদি দিতেন অজিতবাবু ও যতীন্দ্রবাবু। যতীন্দ্রবাবু বহু বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিতেন। অজিতকুমার বৎসর এক পূর্বে শান্তি-নিকেতন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; অজিতকুমার দশবৎসরের উপর শান্তি-নিকেতনের সেবা করেন; আঠারো বৎসর বয়সে, বি, এ পাশ করিয়া সামান্য বেতন লইয়া কাজে প্রবেশ করেন; তারপর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দীর্ঘকাল কাজ করেন; তাঁহার মত রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, সমালোচক ও ব্যাখ্যাতা এপর্যন্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তিনি কেবল বাহির হইতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের intellectual সমর্থক ছিলেন তাহা নহে, তিনি জীবনে তাহা সাধন করিয়া শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কিন্তু শেষকালে তাঁহাকে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিতে হয়; আর্থিক অসচ্ছলতা হয় ত তার একটি কারণ। সে যাহা হউক অজিতকুমার কলিকাতায় চলিয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই; 'বিচিত্রা'য় তাঁহাকে নিযুক্ত করেন।

গগনবাবু ও অবনীবাবুর চেষ্টায় 'বিচিত্রা'র পাঠশালা ও চিত্রশালা বেশ গড়িয়া উঠিল। রথীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায়—তখন তাঁহার কোনো দরদ শান্তিনিকেতনের জন্য হয় নাই—কলিকাতায় তিনি আছেন; গগনবাবুদের ও

তাঁহারই চেষ্টায় 'বিচিত্রা' ক্লাব ও লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিল; কলিকাতার সাহিত্যিকদের একটি প্রকাণ্ড মিলনভূমি হইল জোড়াসাঁকোর এই 'বিচিত্রা'র বাড়ী।

রবীন্দ্রনাথ জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই প্রতিষ্ঠান দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। জাপান হইতে আসিবার পর এই ক্লাবে একদিন তাঁহার বিশেষ সম্বর্ধনা হয়; শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকেরা দমদমের এক বাগানে একদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভিনন্দিত করেন; এইভাবে আদর আপ্যায়ন চলিল। 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধ গল্প প্রথম বিচিত্রা ক্লাবে পঠিত হয়।

অল্প কয়দিন পরেই শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন ও যথাপূর্ব সাহিত্যিক কাজে লাগিয়া গেলেন; সেখানে বাসকালে 'ভাষার কথা' (স-প ১৩২৩ চৈত্র) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। কিছুকাল হইতে লেখ্য ও কথ্য ভাষা লইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে জোর আলোচনা চলিতেছিল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'সবুজ পত্র' প্রকাশ করিয়া বাঙলা রচনায় 'কথ্যভাষা'য় লেখার রেওয়াজ প্রচলন করেন; বাঙলার সাহিত্য-ইতিহাসে এজন্য তিনি অমর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তখনো প্রবন্ধে বা গল্পে কথ্যভাষা চলতি করেন নাই—তাঁহার গল্প, প্রবন্ধ, সবেতেই standard ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখি। অবশ্য পত্রে তিনি চিরদিন কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—সে যখন তাঁহার বয়স আঠারো তখন হইতে; সেদিক থেকে 'য়ুরোপ প্রবাসীর কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ; 'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশগুলিতেও কথ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখা যায়। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে তিনি প্রমথ চৌধুরীর ভাষাকে সমর্থন করেন, কিন্তু নিজের প্রবন্ধটির ক্রিয়াপদগুলি এখনো লেখ্যভাষার পদানুসরণ করিতেছে। তিনি 'ভাষার কথা'র মধ্যে বলেন যে আলালী ভাষা যখন রচিত হয়, তখন কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনার সময় হয় নাই; আজ সময় হইয়াছে; 'সংস্কৃত-ভাষা যে-অংশে বাঙলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। * * যতদিন বাঙলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না।' এই প্রবন্ধ লিখিত

হয় চলিত ভাষার সমর্থন করিবার জন্য এবং কিছুকাল পরে (সবুজপত্র ১৩২৪, পৌষ) নিজে 'পাত্র ও পাত্রী'তে সব প্রথম চল্‌তি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলেন।

নববর্ষ (১৩২১) শান্তিনিকেতনে কাটাইয়া বৈশাখের মাঝামাঝি পুনরায় কলিকাতায় গেলেন। 'বিচিত্রা' ক্লাবে মহাসমারোহে ২৫শে বৈশাখ জন্মোৎসব করা হইল, কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী ও সমজদার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ হয়।

'সবুজ পত্র' ১৩২৪ সালে চতুর্থ বৎসরে পড়িয়াছে। সম্পাদক মহাশয় গল্পের জন্য তাগিদ করিতেছেন—সুতরাং গল্প লিখিবার জন্য লিখিলেন 'তপস্বিনী'। নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া লেখা গল্প তা পড়িলেই বুঝা যায়; শেষ পর্যন্ত বরদাকান্ত যে অনাথবন্ধু সরকারের মত করিবে তাহা গল্প পড়িতে পড়িতে বুঝা যায়। কিন্তু গল্প লেখার প্রথম বাধাটা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে কল্পনার রাজ্যে নব নব রূপ সৃষ্ট হইতে লাগিল। আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হইল 'পয়লা নম্বর'। যেসব গল্প ও উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ একটা সমস্যা সৃষ্টি করিয়া একটা ট্রাজেডিতে গল্পের উপসংহার করিয়াছেন তাহাদের অন্যতম হইতেছে 'পয়লা নম্বর'। অনিলার ব্যর্থ জীবন ও যৌবনের সামনে সিতাংশু আসিয়াছিল তাহার পৌরুষ লইয়া; তাহাকে উদভ্রান্ত যে করে নাই—তা নয়; তার বাস্তব জীবনের দৈন্য ও ক্ষুণ্ননারী জীবনের আদর্শের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিরোধ সৃষ্টি করিয়া লেখক অকস্মাৎ অনিলাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুপ্ত করিয়া দিলেন; আঘাত রাখিয়া গেল যে বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া তত্ত্বলোকের কুয়াশার মধ্যে আপনার অবাস্তবতাকে চরম বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিল, তাহার বুকে। আর আঘাত দিয়া গেল তাহারও বুকে, যে বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া ভাবলোক হইতে রসের পূজা নিবেদন করিয়াছিল। অনিলাকে তিনি সংসার হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন, কিন্তু কোনো বাস্তবতার মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া নষ্ট করিলেন না। নির্ধাপিত নারী যে বাঙলাদেশে ফণা তুলিতেছে তাহার সাহিত্যিক ইন্ধন রবীন্দ্রনাথের গল্প, একথা হয়ত অস্বীকার করা যাইবে না।

গ্রীষ্মের পর শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। এখন এণ্ড্রুজ দূরে, পিয়ার্সন

জাপানে। ছুটির পর সুরেন্দ্রনাথ কর, গৌরগোপাল ঘোষ আশ্রমের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। ইঁহারা যে আশ্রমের গঠনকার্যে রবীন্দ্রনাথের কত বড় সহায়, তাহা ভিতরের লোক ছাড়া কেহ জানেন না। (২৫শে আষাঢ় ১৩২৪, ৯ জুলাই ১৯১৭ Letters p. 24)।

শ্রাবণের গোড়ায় কবি প্রায় দেড় বৎসর পর শিলাইদহে আসিয়াছেন (Letters p 75)। বেশি দিন থাকিলেন না; পদ্মার গতি বদলাইতে সুরু করিয়াছে, কবি এক পত্রে লিখিতেছেন "My only consolation is that it cannot remain constant for long." বোধহয় এইজন্য পদ্মাকে তিনি এত ভালবাসেন—নিজের মধ্যে যে একটা সচলতা আছে তাহারই প্রতীক যেন এই পদ্মা।

শ্রাবণ মাসে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সম্বর্ধনা করা হয়। এই সম্বর্ধনা সভায় দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন, তাহাতে রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনের একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। (প্রবাসী ১৩২৪ ভাদ্র পৃঃ ৪৩৩)

গল্প লিখিয়া, বিচিত্রার সভায় মজলিশ করিয়া, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ করিয়া যদি দিন কাটাইতে পারিতেন, তবে ত ভালই ছিল। কিন্তু প্রাণে যাঁহার অনন্ত সহানুভূতি, দেশের প্রতি যাঁহার অকৃত্রিম প্রেম—তাঁহার পক্ষে ভারতের রাজনৈতিক আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টার প্রতি উদাসীন থাকা অসম্ভব। বিদেশে তিনি ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে একটি বৎসর পূর্বে কী প্রতিবাদ করিয়া ফিরিয়াছিলেন, ও সেজন্য কী তীব্র উপেক্ষা ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ত আমরা দেখিয়াছি। দেশের লোকও তাঁহার অনতি-জাতীয়তার জন্য কম লাঞ্ছনা করেন নাই। কিন্তু আজ সেই রবীন্দ্রনাথই দেশের অত্যন্ত কঠিন সময়ে রাজনীতির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন—লোকলজ্জা, রাজভয় সব তুচ্ছ করিলেন। ব্যাপারটা একটু বিষদভাবেই বলা দরকার।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসের পর চরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ

করেন। চরমপন্থীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণের দল পথভ্রষ্ট হইয়া রুদ্রপন্থীরূপে দেশকে সশঙ্কিত করিয়া তোলে! ইতিমধ্যে য়ুরোপীয় সমর আরম্ভ হয়। ইংরেজ ভারতবাসীকে সহায়তার জন্য আহ্বান করিলেন; ভারতবাসী ধনপ্রাণ দিয়া সাহায্য করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আশা করিল যে যুদ্ধান্তে তাহাদের রাজনীতির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হইব, কারণ ইংরেজ ঘোষণা করিয়াছে স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ। কংগ্রেসের সকল দল লক্ষ্ণৌতে মিলিত হইল ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে। মুসলমানরাও সেখানে উপস্থিত হন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলিয়া ভারতের ভাবী শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা খসড়া খাড়া করেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৭ জন দেশীয় সদস্য কংগ্রেসের অনুরূপ একটা রাষ্ট্রকাঠামো পেশ করেন। মোট কথা দেশের মধ্যে বেশ একটা রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগিল। মহামতি টিলক ও শ্রীমতী আনি বেশান্ত হোমরুল লীগ্ নামে এক সভা গঠন করিয়া রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য প্রচার কার্য সুরু করেন। কংগ্রেসের তখন কোনো Organisation ছিল না। কিন্তু গবর্মেণ্ট এই আন্দোলনকে সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না; ছাত্রদের উপর রাজনৈতিক সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়া দণ্ডার্হ হইল। শ্রীমতী বেশান্ত জাতীয় বিদ্যালয় খুলিলেন। বেশান্তের এইসব কাজকর্ম মাদ্রাস গবর্মেণ্টের বিবেচনায় রাজদ্রোহসূচক হইল। ফলে ২রা আষাঢ় ১৩২৪ (১৬ জুন ১৯১৭) গবর্মেণ্ট বেশান্ত ও তাঁহার দুই অনুচর—মিঃ ওয়াদিয়া ও অরুন্দলকে অন্তরীণাবদ্ধ করিলেন। ইতিপূর্বে বাঙলা-দেশে বহু যুবক ও কর্মীকে গবর্মেণ্ট অন্তরীণে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বেসান্তের কর্মধারা কংগ্রেসের মতানুযায়ী চলিতেছিল; মাদ্রাস হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অস্থায়ী চীফজাষ্টিস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার প্রভৃতিরা ঘোষণা করিলেন যে বেসান্ত কংগ্রেসের কার্য করিতেছিলেন, কংগ্রেস যদি বে-আইনী পরিষদ বলিয়া ঘোষিত না হইয়া থাকে তবে তাঁহার কার্যাবলীও হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাগজে তিনি তাহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে এই রাজনীতির মধ্যে বেশ জড়াইয়া পড়িতে হয়—তাহা যথাস্থানে দেখিব।

এদিকে রাজনৈতিক কঠোরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; শাসনের বেগ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইতেছে; ভারতীয় জাতীয়তার মুখরতাকে মূক করিবার জন্য সরকারের চেষ্টা ক্রমশই প্রবল হইতেছে। এইসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই শান্তিতে থাকিতে দিতেছে না।

বহুকাল পূর্বে স্বদেশীযুগে তিনি যেমন করিয়া রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়া সুপ্ত বাঙালীর মনকে চেতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এবারে লেখনী গ্রহণ করিয়া লিখিলেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'; এত বড় রাজনৈতিক indictment বহুকাল লেখেন নাই। কিন্তু ইহাকে কেবল রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলিলে ভুল হইবে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমরা যে স্বাধীনতা দাবী করিতেছি এবং যেটা পাওয়া ন্যায্য অধিকার বলিয়া মনে করি, সামাজিক ব্যাপারে সেই স্বাধীনতা আমরা লইতেও চাই না, দিতেও চাই না, এটাও ছিল কবির অভিযোগ। তিনি বলিলেন, "মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথাটা এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।" মানুষ ভুল করিবেই; কিন্তু 'ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে।' ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অথচ ঠিক এই কথাটাই যদি আমাদের সমাজকর্তাদের কাছে বলা যায় তাঁহারা চক্ষু রক্ত বর্ণ করেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ও তীব্র সমালোচনা। তাঁহার বক্তব্য, মূলে মানুষ সত্য হইলে সমাজেও মানুষ সত্য, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়।

ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র মানুষের কাছে এক নয়—ধর্মতন্ত্রের কাছে মানুষ ধর্মকে খাটো করিয়া ফেলে, তাই পৃথিবীতে এত অসত্য পুঞ্জীভূত হয়, আমাদের সমাজেও তাই হইয়াছে। "ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁৎ করিয়া না মানো তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয় চৌদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। * *

ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।" (প্রবাসী ১৩২৪ ভাদ্র, পৃঃ ৫১৫)।

এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া এই কথাই বলিলেন যে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে স্বাধীনতা দাবী করিতেছি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির ক্ষেত্রেও সেই স্বাধীনতা দাও।

এই প্রবন্ধে বৃটীশ রাষ্ট্রনীতির খুবই তীব্র সমালোচনা, শ্রীমতী বেসান্তের অন্তরীণের প্রতিবাদ আছে। প্রবন্ধটির প্রত্যেক ছত্রের মধ্যে এত তেজ ও খাঁটি সত্য কথা আছে—তাহা কি কর্তৃপক্ষ, কি দেশবাসী কাহারও পক্ষে হজম করা কঠিন। আলফ্রেড থিএটারে যখন তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করেন কী জনতা দেখিয়াছিলাম ! রাজনৈতিক সমালোচনাগুলি বেশ গরম গরম ছিল বলিয়া লোকে তাহা বেশ তারিফ করিয়াছিল; কিন্তু দেশের কুপ্রথা, মিথ্যা, জড়তাকে দূর করিবার প্রস্তাব তাহারা সহজেই উপেক্ষা করিতে পারিল, কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, তিনি হিন্দুর আধ্যাত্মিক আচার বিচারের কি বুঝিবেন। হিন্দুর নিষ্ঠা প্রশংসনীয়; কিন্তু কোনো কোনো বিদেশী এদেশে আসিয়া যখন এইসব নিষ্ঠা দেখিয়া ধারাবিগলিত হন, তখন আমাদের নিষ্ঠার দম্ভ শতগুণ বাড়িয়া যায়, কারণ সে তখন সাহেবের সার্টিফিকেট পাইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, এই নিষ্ঠাকে "বাহির হইতে তাঁরা সেই-ভাবেই দেখেন, একজন আর্টিষ্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে,—তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না!" তাই প্রবন্ধ শেষে বলিলেন, "সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলি পুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নব-নব-অধ্যবসায়-শীল আমাদের যৌবন ধর্মকে অভিভূত করিয়াছিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে, তবেই নিত্য সম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব।"

যে উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি এই প্রবন্ধ লেখেন, সেই আনন্দের অবকাশেই লিখিলেন "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।'

সেদিন আলফ্রেড থিএটারের সভায় সভাপতি ছিলেন স্যর ভূপেন্দ্রনাথ বসু। বিচিত্রাক্লাবের গায়কদল গান গাহিলেন, নাটোরের রাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ পাখোয়াজ বাজাইলেন। সমস্ত সভাগৃহে সেদিন ভাবের যে জোয়ার আসিয়াছিল, তাহা স্বদেশীযুগের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

যে মাসে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' লিখিলেন, সেই মাসে 'সবুজপত্রে' বাহির হইল 'সঙ্গীতের মুক্তি' নামক প্রবন্ধ। মুক্তি তিনি কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চাহিতেছেন তাহা নহে, সামাজিক ও ধর্মনীতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার স্বাধীনতার দাবী পুরা; সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সেই মুক্তির দাবী। জাতির ভাবাবেগও প্রাচীন বন্ধনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা। বাঙলার ইতিহাস হইতে তিনি দেখাইলেন বাঙালী চিরদিন শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলে নাই বলিয়া সে নব নব সৃষ্টিলীলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "চৈতন্যর আবির্ভাব বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম যে-হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সঙ্গীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। * * বাঁধন ভাঙিল—সেই বাঁধন বস্তুত প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম।

"এই স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সঙ্গীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিঁকিল না। তখন সঙ্গীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণব-ধর্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদীর কাছে কীর্তন গানের তেমনিই অনাদর ঘটিয়াছে।"

"আমাদের নূতন-জাগরুক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কাটিয়া আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। আমাদের সম্মুখে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদঘাটিত। নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে আমরা চলিব। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড়া পাইয়াছে। এখন আমাদের সঙ্গীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নাই।"

মুক্তির আহ্বান তিনি সঙ্গীতেও দিলেন। প্রবন্ধের মধ্যে সুর, তাল, মাত্রা ছন্দ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে; দুঃখের বিষয় প্রবন্ধটি কোনো গদ্যগ্রন্থের অন্তর্গত হয় নাই। ছন্দ সম্বন্ধে যেকথা আভাসে এখানে বলেন কয়েক মাস পরে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন 'ছন্দ' প্রবন্ধে (সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৪)।

কিন্তু এই ত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রূপটি নয়! 'সঙ্গীতের মুক্তি', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' লিখিতে লিখিতে শান্তিনিকেতনে দেহালির ক্ষুদ্র ঘরটিতে বসিয়া দশবছরের শিশু রাণুকে লিখিতেছেন পত্র * সেখানে তাঁহার আর এক মূর্তি; সেখানে পাই 'শিশু'র কবিকে, 'শিশু ভোলানাথে'র কবিকে। কিন্তু এখানকার শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় তখন খুব উত্তেজনা। ৪ঠা ভাদ্র (২০ আগষ্ট ১৯১৭) ভারতের ভাবী শাসন সম্বন্ধে ভারতসচির মণ্টেগুর ঘোষণা প্রকাশিত হইল, তিনি 'ক্রমশদেয়' স্বরাজের পথে ভারতকে চালনা করিবার জন্য বাণী প্রচার করিলেন। সে বাণী মডারেটদের খুসী করিল; চরমপন্থীদের তৃপ্তি দিল না। তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে আগামী কংগ্রেসের সভানেত্রী হইবেন অন্তরীণাবদ্ধ শ্রীমতী বেসান্ত। মডারেটদের আপত্তি, প্রথমে তিনি বিদেশী, দ্বিতীয়ত তিনি রাজকোপে পড়িয়াছেন; রাজকোপে-পড়া কাহাকেও কংগ্রেসের সভানেত্রী করিলে ইংরেজ রাজপুরুষ, যাঁহারা ভারতকে স্বরাজের পথে চালনা করিবেন, তাঁহাদের শুভদৃষ্টি আর কংগ্রেসের উপর নাও থাকিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা বেসান্তের নাম বাঙলার অভ্যর্থনা সমিতিতে উঠিতে দিতে চাহিলেন না। ১৯০৭ সালের কংগ্রেস ভাঙিয়াছিল এই জোর করিয়া সভাপতি মনোনয়ন লইয়া। এবার স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি এই সভাপতি নির্বাচন লইয়া গোলমালে ভাঙিয়া গেল। কলিকাতায় কি উত্তেজনা! যুবকরা চায় বেসান্তকে তিনি সরকারের অবমাননা পাইয়াছেন বলিয়াই আজ দেশবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধার তিলক দিবে বলিয়া বদ্ধপরিকর।

অভ্যর্থনা সমিতির সভা ভাঙ্গিয়া গেল; অথচ বাঙলার ইচ্ছাকে কে কার্যে পরিণত করিবে? নেতারা ছুটিয়া আসিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, তাঁহাকে

* ভানুসিংহের পত্রাবলী, শান্তিনিকেতন, ৩রা ভাদ্র ১৩২৪; কলিকাতায় ২১ ভাদ্র ১৩২৪।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া যুববাঙলার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ তখন তীব্রভাবে গবর্মেন্টের দমননীতি ও রুদ্র ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে বেসান্তের অন্তরীণের বিরুদ্ধে যখন কলিকাতার টাউনহলে সভা হইবার কথা হয়, তখন গবর্ণর সেখানে প্রতিবাদ সভা করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম জারি করেন তখন রবীন্দ্রনাথই রামমোহন লাইব্রেরীতে প্রথমে ও পরে আলফ্রেড থিএটারে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। (প্রবাসী ১৩২৪ কার্তিক, বিবিধ প্রসঙ্গ পৃঃ ১০৮)।

অভ্যর্থনা সমিতির মধ্যে যখন খুবই গোলমাল চলিতেছে তখন Bengali কাগজে রবীন্দ্রনাথের একপত্র প্রকাশিত হইল (২১ ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। এই পত্রখানি তিনি বিলাতে তাঁহার কোনো বন্ধুকে লিখেন; বেসান্ত অন্তরীণাবদ্ধ হইলে কবি একটি প্রতিবাদলিপি প্রকাশ করেন। তাহাতে বিলাতের কোনো বন্ধু আশ্চর্য হইয়া কবিকে পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার জবাব দেন এবং জবাবখানি 'বেঙ্গলি' কাগজে প্রকাশ করেন।

তখন বাঙলাদেশে বহু যুবক অন্তরীণে আবদ্ধ ছিল। ১৯১৬ সালে উত্তর পশ্চিম ভারতে বিপ্লবীদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, আমেরিকার জার্মানদের সহিত ষড়যন্ত্র প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়ায় সরকার খুবই কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাহার ফলে বহু যুবককে অন্তরীণ বা নজরবন্দী অবস্থায় বাস করিতে হয়। কাগজে বলিতে থাকে যে তাহার ফলে কোনো কোনো যুবক উন্মাদ হইয়া যায়, কেহ কেহ আত্মহত্যা করে। এইসব ঘটনা কাগজে প্রকাশিত হয়। কবির মন এইসব সংবাদে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ওঠে এবং সেই অবস্থায় বিলাতের বন্ধুকে পত্রখানি লেখেন;

"In your letter you seem puzzled at my conduct in sending a message of sympathy to Mrs. Besant, who has been interned for public utterances here. I am afraid compared with yours, our troubles may appear to you too small, but yet sufferings have not lost their keenness for us and moral problems still remain as the gravest of all problems in

all parts of the world. The constant conflict between the growing demand of the educated community of India for a substantial share in the administration of their country, and the spirit of hostility on the part of the Government, has given rise among a considerable number of our young men to methods of violence bred of despair and distrust. This has been met by the Govt. by a thorough policy of repression. In Bengal itself hundreds of men are interned without trial—a great number of them in unhealthy surroundings in jails and in solitary cells, in a few cases driving them to insanity or suicide.* The misery that is carried into numerous households is deep and widespread, the greatest suferers being women with their children who are stricken at heart and rendered helpless.

I do not wish to go into details, but as a general proposition I can safely say that the whole evidence against them is not publicly sifted by a proper tribunal, giving them the opportunity to defend themselves, we are justified in thinking that a large number of those punished are innocent, many of whom were specially selected as victims by secret spies only because they had made themselves generously conspicuous in some noble mania of selfsacrifice. What I consider to be the worst outcome of this irresponsible policy of panic is the spread of the contagion of hatred against everything western in minds which were free from it. In this crisis the only European who shared our sorrow,

* Prefers to the suicide of Sacindra Das Gupta son of a Pleader of Rangpur (প্রবাসী ১৩২৪ কার্ত্তিক পৃঃ ১০৯-১১০)।

incurring the anger and derision of her countrymen, is Mrs Annie Besant. This was what led me to express my grateful admiration for her noble courage in this present time when it is particularly dangerous to be on the side of humanity against blind expediency. Possibly there is such a thing as political exigency, just as there may be a place for utter ruthlessness in war, but as a man, I pay my homage to those who have faith in ideals and therefore are willing to take all other risks except that of weakening the foundation of moral responsibility." (The Bengalee, Sep. 7, 1917)

সেইদিনই তাঁহার মনের আর একটি ছবি পাই রাহুকে যে পত্র লিখিতেছেন তাহা হইতে (২১ ভাদ্র ; ভানুসিংহের পত্র পৃঃ ৪)। তখনই বিচিত্রায় চলিতেছে 'ডাকঘর' নাটিকার রিহার্শাল।

৮ই সেপ্টেম্বর (২৩ ভাদ্র) মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি বাঙলার নেতারা কবির কাছে উপস্থিত হইলেন ; দীর্ঘ আলোচনা কথাবার্তা চলিল। কবি ১৩ই সেপ্টেম্বর মতিলাল ঘোষকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইতে রাজি আছেন, যদি সে-পদ সত্যই খালি হইয়া থাকে, আর যদি নিখিল কংগ্রেস কমিটি আগামী কংগ্রেস কলিকাতায় হইবার প্রস্তাবে রাজি থাকেন এবং শ্রীমতী বেসান্তকে সভানেত্রী মনোনীত করেন। নিখিল রাষ্ট্রসমিতির অনুমোদন না আসা পর্যন্ত তাঁহারা নাম ব্যবহার করিবেন না। (The Amrita Bazar Patrika. 13 Sept, 1917)। সুখের বিষয় এই দলাদলি বেশিদিন চলিল না—প্রবীণদল বেসান্তকে সভানেত্রী করিতে রাজি হইলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পদ ত্যাগ করিলেন (১৫ আশ্বিন, ৩০ সেপ)।

১৮ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর অভ্যর্থনা সভার রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের সভাপতিত্বে শ্রীমতী বেসান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী করিয়া নির্বাচন করা হইল।

প্রবাসী এই উপলক্ষ্যে লিখিয়াছিলেন, "এই দলাদলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-

নাথ ঠাকুর আপনার মান-অপমানের কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান না দিয়া অতি সহজে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া যেরূপ মহানুভবতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার মত মানবপ্রেমিক ও দেশভক্তের উপযুক্ত হইয়াছে।”

এইসব হাঙ্গামা চুকিল তখন হইল ‘ডাকঘরে’র অভিনয়। বিচিত্রার দ্বিতল গৃহে অভিনয়। তখন বিচিত্রায় আছেন নন্দলাল বসু, অসিত হালদার। গগনবাবু লইলেন মাধবের অংশ, অবনীবাবু কবিরাজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর্দা; অমলের অংশ গ্রহণ করে আশামুকুল নামে একটি ছাত্র; পরে শান্তিনিকেতনে ছাত্র হইয়া আসে, সে এখন শিলং-এ ডাক্তার। অভিনয় দুইদিন হয়; একদিন হয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী ও সম্ভ্রান্তদের জন্য।

আশ্বিনের মাঝামাঝি সময় বেসান্ত অন্তরীণ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এদিকে শোনা গেল ভারত সচিব মণ্টেগু শীঘ্রই ভারতে আসিতেছেন; তিনি ২০শে আগষ্ট পার্লামেণ্টে ভারতের ভাবী শাসন সংস্কার সম্বন্ধে যে ঘোষণা করেন, সেইসব বিষয়ে বড়লাট ও ভারতীয় নেতাদেরও (বিশিষ্ট রাজপুরুষ) মতামত জানিবার জন্য আসিতেছেন। বেসান্তকে মুক্তি দিবার সময় বড়লাট তাঁহার কাছ হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন যে ভারতসচিবের ভ্রমণকালে কোনো প্রকার আন্দোলন তিনি করিবেন না। যাহাই হউক তিনি মুক্তি পাইয়া কলিকাতায় আসেন ও একদিন রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎও করেন।

কলিকাতায় থাকিলে নানাকাজে কবির অহ্বান আসে। ১৫ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসুর বার্ষিক স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন।* এই মহাত্মাকে কবি যে কত শ্রদ্ধা করিতেন তাহা ‘জীবন স্মৃতি’ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

ইহারই কয়েকদিন পরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু বার্ষিকী। ২৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ এই স্মৃতি-সভায় সভাপতিত্ব করেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ তর্কভূষণ বক্তৃতা করেন ও অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটির সারমর্ম সাময়িক

* ‘সঞ্জীবনী’তে তাঁহার বক্তৃতার চুম্বক প্রদত্ত হয়। (দ্রঃ—প্রবাসী, ১৩২৪, কার্তিক, পৃঃ ১১৬ অজিতবাবুর বক্তৃতা, প্রবাসী ১৩২৪, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১১৬)

'তত্ত্বকৌমুদী' ও 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হয়। (দ্রঃ প্রবাসী, ১৩২৪ কার্তিক, পৃঃ ১১৪-১১৫)। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতার শেষে বলেন,—"পৃথিবীর কোন জাতি হীনতার মধ্যে চিরকাল থাকিবে না। বাঙালীর নিরাশার কারণ নাই। বাঙালীর গৃহে রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি বাঙালীর ভবিষ্যৎ গৌরব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। * * বঙ্গের ভবিষ্যৎ গৌরব তখনকার গভীর অন্ধকারের মধ্যেই রামমোহন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙালীকে বিশ্বের রাজপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙালীর কোনো নিরাশার কোন আশঙ্কার কারণ নাই, বাঙালী বৃহৎ মনুষ্যত্বের পথে যাত্রা করিয়াছে।"

১৬ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর) শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভার সভাপতি হইবার জন্য আহ্বান আসিল। * বক্তৃতাটি লিখিত হয় নাই। 'সঞ্জীবনী' কাগজে উহার ভাব কতক প্রকাশিত হয়। (দ্রঃ প্রবাসী ১৩২৪, কার্তিক, পৃঃ ১০৬);

এই সভায় রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেন তাহা আজও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলিয়া কয়েকছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমাদের দেশের অসংখ্য লোক অশিক্ষিত, তাহাদের উন্নতির জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্তব্য—এই আলোচনা এখন আর নূতন নহে।

"এ কথা মনে করিয়াও আমার লজ্জা হয় যে, গোখলে যখন অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন এই বঙ্গদেশ হইতেই তাহার প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। এই দেশে কোন কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, ছোটলোকেরা যদি বিদ্যাশিক্ষা করে, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথায়? * * পূর্বে আমাদের দেশে ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এখনকার মত ব্যবধান ছিল না। তখন এমন সকল আয়োজন ছিল যাহা দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞানধর্মমূলক কথা আপনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। উহার ফলে, পাশ্চাত্য দেশে ধনী-দরিদ্রের যে প্রভেদ, পণ্ডিতে-মূর্খে যে প্রভেদ রহিয়াছে, আমাদের দেশে তেমন প্রভেদ

* 2/1 A, Antony Bagan Lane-এ বিদ্যালয় ছিল।

কখনও হইতে পারে নাই। এখন ক্রমশ সেই প্রভেদ বাড়িতেছে। * * ইহার কুফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। পল্লীবাসী কৃষকেরা আমাদিগকে বিশ্বাস করে না। * * ইহা এক ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূচনা করে। * * বৈষম্য হইতে বিপ্লবের সৃষ্টি। * * এই ব্যবধান দূর করিবার উপায় শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।"

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব ঘুচিলেও আগুনের ধোঁয়া যেমন শীঘ্র যায় না, তেমনি কথা, শলা, পরামর্শ, উপদেশ প্রভৃতির শেষ আর হয় না। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আছেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে জড়িত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণ বারবার যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে—এই কি কবির ধর্ম! এই কথা যেন তাঁহাকে অহর্নিশি বিদ্ধ করিতেছে। নিজের মনের সঙ্গে মতের দ্বন্দ্ব চলিতেছে; তাই লিখিলেন 'আমার ধর্ম'।

সাধারণত ধর্ম বলিতে লোকে যে জিনিস বোঝে রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে 'ধর্ম'কে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার অন্তরাত্মা কাব্যের মধ্য দিয়া কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কি প্রেরণায় তাঁহার চিত্তবীণা এতাবৎকাল ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিশেষ কোনো ধর্মমতের গণ্ডীর মধ্যে নামাঙ্কিত করিবার চেষ্টা হয়—তাহারই বিরুদ্ধে তিনি বলিতে চান। (সবুজপত্র ৪র্থ বর্ষ, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা)।

আরও কিছুকাল পরে 'মানবের ধর্ম' বলিয়া তিনি যে মত প্রচার করিবেন, 'আমার ধর্ম' তাহারই কাব্য-রূপ; Religion of Man তাহার দার্শনিক রূপ।

কলিকাতার আবর্ত হইতে মুক্তি পাইতেছেন না; 'বিচিত্রা'র নানা রকমের আলোচনা, উত্তেজনা তাঁহাকে খুবই ব্যস্ত রাখিয়াছে; বাহিরের রাজনৈতিক আন্দোলনও তাঁহাকে কম উদ্ব্যস্ত করিতেছে না; খুব খারাপ লাগিলে নিশ্চয়ই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেন। রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া দেশ মধ্যে খুবই আলোচনা চলিতেছে—মণ্টেগু আসিতেছেন, তিনি কি দিবেন তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনার অন্ত নাই। সভা সমিতি প্রতিষ্ঠান সমূহ মেমোরিয়াল ও অভিনন্দন পত্রের খশড়া করিতে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর এই অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, 'ছোট ও বড়' নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিলেন কার্তিকের মাঝামাঝি সময়ে। (দ্রঃ প্রবাসী ১৩২৪, অগ্রঃ পৃঃ ১২১-১৩৪)।

এই প্রবন্ধে ভারতের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার কথা আলোচিত হয়; দেশের মধ্যে যে একদল লোক ভারতসচিবের 'ঘোষণা' পাঠ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহাদিগকে সাবধান করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে উল্লসিত হইবার বিশেষ কারণ নাই; কারণ ভারতের শাসনকার্যটা চালাইতেছে যে-ইংরেজ তারা বণিক বা আমলাজাতীয়। কোনো প্রকার আইডিয়ালের ধার তারা ধারে না। ভারতসচিব যা দিতে চান তার অনেকখানি এই ছোট ইংরেজের হাতের মধ্য দিয়া আসিতে গিয়া নষ্ট হইয়া আসিবে। সুতরাং খুব আশান্বিত হইবার কারণ নাই। মণ্টেগুর আসিবার কিছু পূর্বে এই সময়ে হিন্দুমুসলমান বিরোধ অকস্মাৎ বিহারে দেখা দিয়াছিল; এ ছাড়া অন্তরায়িতদের উপর অত্যাচার কাহিনী কাগজে পত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হইতেছিল, প্রেস আইন তখনো এত কড়া হয় নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কেন বাধে ও যুবকরা কেন পথভ্রষ্ট হইতেছে রবীন্দ্রনাথ তাহার সুন্দর বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে দিয়াছেন। শচীন্দ্র দাসগুপ্তের আত্মহত্যা তাঁহাকে খুবই বিচলিত করিয়াছিল; প্রবন্ধে একাধিকবার তিনি তাহার বেদনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মানুষের বড় আদর্শকে বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে সে আদর্শ বড় ইংরেজের মধ্যেও আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। আমাদের মধ্যে যে বড় সত্য বড় সাধনা বড় ত্যাগ তাহার দ্বারাই আমরা জয়ী হই।

"আমরা যদি ছোট হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোট হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোট ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোট শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন যে মারিতে পারিবে তাহার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে-মানুষ তার পরাভব হইবে, দুঃখ পায় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব। * * এই মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে। পূর্ব পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের উপর হইবে না। * * দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন।" এখানে অহিংসার কথাই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন। গান্ধীজির সে আন্দোলন এখনো দূরে।

ভারতসচিব মণ্টেগু অকস্মাৎ আসিলেন। একদিন 'বিচিত্রা'য় কবি তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন; বিচিত্রায় সঙ্গীতাদির দ্বারা তাঁহার আপ্যায়ন হয়।

পৌষের গোড়ায় কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন উৎসবের জন্য। উৎসব করিয়াই তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতার যাইতে হয়; কংগ্রেসের উদ্বোধন দিনে তিনি India's Prayer পাঠ করিলেন। ১৯১৭ সালের (৩৩-তম) কলিকাতার কংগ্রেস নানাকারণে স্মরণীয় হইয়াছে; এই সভায় সভানেত্রী শ্রীমতী বেশান্ত; এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্তরায়িত আলিভ্রাতাদের বৃদ্ধা জননী। তখন লীগ ও কংগ্রেস পৃথক সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করে নাই এবং লোকে ভারত স্বরাজের আকাশকুসুম এই আপাত মিলনের মধ্যে দেখিতেছিল।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের পর কবি India's Prayer আবৃত্তি করিলেন, পাণ্ডেলের প্রত্যেকটি কোণ হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। (Modern Review 1918 Jan. p 98).

কংগ্রেসের পর শ্রীমতী বেশান্ত কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন; এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যর রাসবিহারী ঘোষ প্রেসিডেণ্ট ও স্যর রবীন্দ্রনাথ চান্‌সেলার হইলেন। তাঁহাদের কল্পনা ছিল ইহার টেক্‌নলজিকাল বিভাগ কলিকাতায় ন্যাশনাল কাউন্সিলের সঙ্গে একযোগে করিবেন, বোম্বাইতে ইহার কমার্সিয়াল বিভাগ হইবে, মদনপল্লীতে (মাদ্রাজ) কৃষি বিভাগ ও কাশীতে নারীবিভাগ খোলা হইবে। (New India 16 Jan. 1918)। মদনপল্লীতে কলেজ ছাড়া এই স্কীমের কিছুই অন্যত্র কার্যে পরিণত হয় নাই! অন্যবারের জাতীয় বিদ্যালয়ের আন্দোলনও যেমন জাতীয় আন্দোলনের সহিত লোপ পাইয়াছিল, এবারও তাই হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে এই আন্দোলন সমগ্র শিক্ষা বিষয়টাকেই পুনরায় গভীরভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ দিল; তিনি শান্তিনিকেতনকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন; সেকথা যথাস্থানে বলিব।

এই শীতকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য যে কমিশন আসিয়াছিল তাহার মেম্বার স্যর মাইকেল সাডলার প্রমুখ সদস্যগণ শান্তিনিকেতন যান। কবির সহিত তাঁহাদের যে আলোচনা হয়, তাহার সারমর্ম কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়।

"It is Sir Rabindranath's conviction that, while English should be skilfully and thoroughly taught as a second language, the chief medium of instruction in schools (and even in colleges up to the stage of the University degree) should be the mother tongue. * * He holds that the essential things in the culture of the West should be conveyed to the whole Bengali people by means of a widely diffused education, but that this can only be done through a wider use of the vernacular in the schools. Education should aim at developing the characteristic gifts of the people, especially its love of recited poetry and of the spoken tale, its talent for music, its (too neglected) aptitude for expression through the work of the hand, its power of imagination, its quickness of emotional response. At the same time, education should endeavour to correct the defects of the national temperament, to supply what is wanting in it, to fortify what is weak, and not least to give training in the habit of steady co-operation with others, in the alert use of opportunities for social betterment, in the practice of methods of organisation for the collective good.

"For these reasons, in his own school at Bolpur, he gives the central place to studies which can best be pursued in the mother tongue ; makes full educational use of music and of dramatic representation, of immagination in narrative and of manual work ; of social service among less fortunate neighbours and of responsible self-government in the life of the school community itself. For the achievement of these aims he feels that, if the right place is found for it, there is

strong need for British influence in Indian education. And he speaks with gratitude of the help which he has had from English teachers in his own school, but he would refuse such help at all costs, as being educationally harmful, where lack of sympathy prevented a true human relation between the English teacher and his Bengali pupils."

(Calcutta University Commission 1917-1919, Report, Vol I. pp 226-228)

কংগ্রেসের গোলমাল, মণ্টেগুর আগমন ও অভিনন্দন, স্যাডলার কমিশন, রাজনৈতিক শলাপরামর্শ প্রভৃতি নানা কাজকর্মে কবিকে কলিকাতায় প্রায়ই থাকিতে হইতেছে, মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসিতেছেন। মাঘোৎসবের সময় কবি কলিকাতায় উপাসনা করিলেন। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া 'অচলায়তন' নাটকটিকে সংক্ষিপ্তাকারে 'গুরু' নাম দিয়া লিখিলেন, (১লা ফাল্গুন ১৩২৪) পুরাতন নাটক ভাঙ্গিয়া নূতন নাম দিয়া গ্রন্থ সৃষ্টি এই প্রথম; ইহার পর তিনি অনেক বইকে নূতন করিয়া লিখিয়াছেন।

পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প 'পাত্র ও পাত্রী' 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়; শেষ গল্প বলিতেছি কারণ ইহার পর আট বৎসর আর কোনো গল্প লেখেন নাই; 'তোতাকাহিনী' মাঘমাসে বাহির হয় সেটিকে আমরা গল্প বলিতে পারি না—সেটিকে একটা রাজনৈতিক satire বলিলেও বলা যায়; ভারতীয়দের তোতার প্রাণ কমিশন কমিটির তদারকের চোটে শেষ হইয়া গিয়াছে এ ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

মণ্টেগু আসিলেন, চলিয়া গেলেন—কিন্তু ভারতীয়দের দুঃখের অবসান হইল না। পিয়ার্সনকে ৬ মার্চ ১৯১৮ (২২ ফাল্গুন ১৩২৪) লিখিত পত্রের মধ্যে দেশের দুরবস্থার কথা অল্প কয়েক ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—

"Each one of us in this unfortunate country is looked upon with suspicion * * Humiliation follows us at every step and in each good work we try to do" (Letters p 75).

পিয়ার্সন জাপানে; আমেরিকা থেকে কবির সঙ্গে ফিরিয়া তিনি

(ফেব্রুয়ারী ১৯১৭) জাপানেই আছেন। পত্রখানি কবি লেখেন কলিকাতা হইতে : কয়দিন পরেই শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন ও ১০ মার্চ (২৬ ফাল্গুন) পিয়ার্সনের একখানি পত্রের জবাব লিখিতেছেন। পিয়ার্সন পল রিশার-এর সঙ্গে তখনো আছেন, কিন্তু কবিকে যে-পত্র দেন ও কবি তাঁহাকে যে-উত্তর দেন তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় তিনি যে-আধ্যাত্মিক শান্তির সন্ধান করিতেছিলেন, তাহা পাইতেছেন না। পিয়ার্সনকে লিখিত পত্রখানি খুবই সুন্দর, আধ্যাত্মিক নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর ইহাতে আছে। (Letters p. 76).

চৈত্র (১৩২৪) মাসের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন— 'ছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধের শেষ দিকে সুর, তাল, লয় প্রভৃতি বিষয় আলোচনার প্রসঙ্গে ছন্দের কথা আসে ; সেই ছন্দ সম্বন্ধে এইবার পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন ; ছন্দ সম্বন্ধে পরেও বলিয়াছেন কিন্তু ইহাতেই সব কথার ভূমিকা হইয়া গিয়াছিল।

রথীন্দ্রনাথ এই সময়ে শিলাইদহের জমিদারিতে ; কবির সঙ্গে কলিকাতায় আছেন জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ সাহেব। এণ্ড্রুজ অল্পদিন হইল দ্বিতীয়বার ফিজি দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ;—কবিকে আসিয়া বলেন অস্ট্রেলিয়ায় তাঁহাকে যাইতে হইবে, সেখানে লোকে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব। কবির মন এইসব সামান্য কথায় উত্তেজিত হয়, তিনি মনে করেন সেখানে তাঁহার যাবার প্রয়োজন আছে। রথীন্দ্রনাথকে ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল ১৯১৮) কলিকাতায় আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইল ; তিনি আসিয়া দেখেন বিদেশে যাইবার সব আয়োজন প্রায় ঠিক—সঙ্গে যাইবেন নগেন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ ; রথীন্দ্রনাথের যাইবার কথা তখন হয় নাই।

এইসব ব্যবস্থা করিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে আসিয়া বর্ষশেষ ও নববর্ষের (১৩২৫) উৎসব করিলেন।

১২। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা

বিদ্যালয় বন্ধ হওয়া পর্যন্ত আশ্রমে থাকিলেন না, মন বিদেশ যাইবার কল্পনায় চঞ্চল। ২রা বৈশাখ (১৩২৫) কলিকাতায় ফিরিয়া রানুকে এক পত্রে লিখিতেছেন "পাখীরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপার চ'লে যায়। আমি হচ্চি সেই জাতের পাখী। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চ'ড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেবো ব'লে আয়োজন করছি। * * অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ সেরে নিয়ে তারপরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম ক'রে বসবো।" (ভানুসিংহের পত্রাবলী পৃঃ ৯)।

এই সময় কাব্যের এক নূতন ধারা সুরু হইয়াছে—'পলাতকা'র পালা। গদ্যে গল্প বলা শেষ হইয়াছে, তাই যেন মন পদ্যে গল্প বলিতেছে—কবির মন গল্প বলা চাই। ১৯২৫ সালের 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্রে' 'পলাতকা' ছাড়া বিশেষ কিছু রচনা নাই। 'পলাতকা'র কবিতাগুলি ১৩২৪-২৫-এর চৈত্র-বৈশাখের মধ্যে লেখা। বাঙলা সাহিত্যেই এই ধরণে গল্প বলার রেওয়াজ রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত করিলেন।

রাজনৈতিক আবহাওয়া দেশে একটুও শান্ত হয় নাই। মণ্টেগু ১৯১৮ সালের গোড়াতেই দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন; দেশবাসীকে তিনি একটিও আশ্বাসবাণী দিয়া যান নাই; তিনি অভিনন্দন পত্র শুনিয়াছিলেন, ভদ্রতা যে পরিমাণ উত্তর দাবী করে, তাহাই মাত্র করিতেন। এদিকে য়ুরোপীয় যুদ্ধের ব্যাপারে সাম্রাজ্যের সহায়তা লাভের জন্য প্রধান সচিব সকলকে আহ্বান করিলেন; দিল্লিতে War Conference বসিবে এপ্রিলের শেষাশেষি (বৈশাখের মাঝ ২৩ এপ্রিল, ১০ বৈশাখ)। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, কামিনী-কুমার চন্দ, প্রভৃতি দিল্লির কন্ফারেন্সে যাইবার আগে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন, খাপার্দে আসিয়াছিলেন। কবির সহিত পরামর্শ করা তাঁহারা

যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ২৫শে বৈশাখ (৬ই মে) কবির ৫৭ তম জন্মোৎসব বিচিত্রায় সম্পন্ন হইল। সেই রাত্রে এণ্ড্রুজ সাহেব দিল্লি হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাইবার সুখস্বপ্ন অকস্মাৎ আঘাত পাইল। ৯ই মে ১৯১৮ মিঃ এণ্ড্রুজ গবর্মেণ্ট হাউসে লাট সাহেবের প্রাইবেট সেক্রেটারী মিঃ গুরলের (Gourlay) সহিত কর্মোপলক্ষে দেখা করিতে যান। সেই সময়ে কথা প্রসঙ্গে গুরলে বলেন, সানফ্রানসিসকোতে বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কতকগুলি ভারতীয় যুবকের বিচার চলিতেছে; তাহাদের কাগজপত্রের মধ্য হইতে জানা গিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পাঠক পূর্বেই দেখিয়াছেন ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে কালিফোর্নিয়ায় একবার কবিকে হত্যা করিবার এক গুজব রাষ্ট্র হয়। গুরলে বলেন, কবির বিরুদ্ধে গুজব যে ১৯১৬ সালে তিনি যে জাপান হইয়া আমেরিকা যান তাহা জার্মানদের অর্থ সাহায্য পাইয়া। পিয়ার্সন আমেরিকার কাগজপত্রে যেসব আপত্তিকর প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন, সেগুলি গুরলে এণ্ড্রুজকে দেখান।

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার এইসব মিথ্যা অভিযোগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ও সেখানে যাওয়া স্থগিত করিয়া প্যাসেজ রদ করিয়া দিলেন।

১১ই মে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ করিয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে একপত্র লিখিলেন ও তাহার এক প্রতিলিপি বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন; এ ছাড়া তিনি আমেরিকান কন্সালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কন্সাল তাঁহাকে বলিলেন 'আমেরিকানরা তাঁহার সম্বন্ধে এই অভিযোগ মোটেই seriously লইবে না; আমেরিকায় যাইতে তাঁহার বাধা নাই, লোকে তাঁহাকে পূর্বের ন্যায়ই সমাদর করিয়া গ্রহণ করিবে।'

মনের এই অবস্থা একদিকে। জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা মৃত্যুশয্যায়; তাঁহাকে প্রতিদিন দেখিতে যাইতেছেন। ১২ই মে খবর আসিল পেকিং-এ পিয়ার্সনকে ইংরেজ পুলিশ বন্দী করিয়াছে। পিয়ার্সন প্রায় দেড় বৎসর জাপানে ও চীনে আছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি একখানি

পুস্তিকা লেখেন—জুলাই ১৯১৭। বইখানি জাপান হইতে প্রকাশিত হয়। এই বইখানির মধ্যে নিশ্চয়ই ভারত গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে অত্যন্ত অন্যায় অভিযোগ ছিল—যেজন্য গবর্মেণ্টকে বাধ্য হইয়া উহাকে 'নিষিদ্ধ' পুস্তক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

পিয়ার্সনের বন্ধনের খবর পাইয়া সেই রাত্রে এণ্ড্রুজ সিমলায় চলিয়া গেলেন। ১৯শে মে এণ্ড্রুজ ফিরিয়া আসিলেন। বড়লাট পিয়ার্সনের উপর মোটেই সদয় নহেন, তবে রবীন্দ্রনাথের নাম আমেরিকার মামলার সহিত যুক্ত বলিয়া তিনি কিছুই জানিতেন না। গুরলে সাহেব ও বাঙলা গবর্মেণ্ট কি করিয়া এই সংবাদ পাইলেন তাহা আমরা জানি না।

ইতিমধ্যে ১৬ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু হইল। তিনি প্রতিদিন কন্যাকে দুপুর বেলায় দেখিতে যাইতেন। মৃত্যুর দিনেও তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন—এমন সময়ে খবর আসিল মৃত্যু হইয়াছে। আর গেলেন না। বিকালে 'বিচিত্রা'য় গিয়া দেখি কবি অন্যদিনের ন্যায়ই স্বাভাবিকভাবে সকলের সঙ্গে গল্প গুজব করিতেছেন।

এই সময়ে রাণু নামে মেয়েটি তার পিতা মাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসে। ছোট্ট মেয়ে কবিকে ছেলেমানুষী চিঠি লিখিয়া তাঁর মনকে অধিকার করে; একদিন তার সঙ্গে কবি দেখা করিলেন। ইহাকে যেসব পত্র লেখেন তাহাই 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মেয়েটি কবিকে 'ভানুদাদা' বলিত। বালিকাটি কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন অধ্যাপক শ্রীফণীভূষণ অধিকারীর কন্যা; ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বিদুষী আশা দেবী কয়েক বৎসর শান্তিনিকেতন রেকটরের কাজ করেন।

কবি 'পলাতকা'র দুই একটি কবিতা ছাড়া বিশেষ কিছু নূতন কাজ করিতেছেন না; তবে ইংরেজিতে এটা সেটা অনুবাদ করিতেছেন; 'মুকট' এই সময়ে অনুবাদ করিলেন, এণ্ড্রুজ স্কুলপাঠ্য একটা গল্পের সংগ্রহ সম্পাদন করিলেন; কবি 'শারদোৎসব' নাটিকাটি তর্জমা করিলেন (২৬ মে ১৯১৮)। কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকায় বাসকালে ইহার প্রথম খশড়া করেন।

রথীন্দ্রনাথ সর্বদাই পিতাকে আরামে রাখিবার জন্য ব্যগ্র; তিনি ঠিক করিলেন গ্রীষ্মকালটা হিমালয় পাহাড়ে বিশ্রামের জন্য পিতাকে লইয়া যাইবেন।

তিনধরিয়ায় বাসা লওয়া হইয়াছে। গরম কাপড়ের বাক্স পেঁটরা চলিয়া গেল; ট্রেণ বিকালে। বেলা এগারটার সময় কবির খেয়াল হইল শান্তিনিকেতনে যাইবেন—এণ্ড্রুজকে লইয়া চলিয়া আসিলেন বোলপুর। কোথাও যাওয়া সম্বন্ধে কবির মন স্থির করিতে অনেক সময় লাগে; রথীন্দ্রনাথকে এজন্য অনেক সময়ে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। একই দিনে কোথায় যাওয়া সম্বন্ধে তিনবার গাড়ীর বন্দোবস্ত করা ও নাকোচকরার গল্প শুনিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এণ্ড্রুজ বোলপুর গেলেন ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে ১৯১৮)।

কলিকাতায় থাকিবার সময় 'তোতা কাহিনী'র একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন; অনুবাদটি Thacker Spinkকে দিয়া ছাপান হয়; বইখানিতে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর চিত্র আছে। বহুকাল পরে ১৯৩৪ সালে Asia পত্রিকায় এই গল্পটি ছবি সমেত পুনরায় বাহির হয়।

দারুণ গ্রীষ্ম—জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময়ে শান্তিনিকেতনে আসিয়া 'দেহালি' ভবনে উঠিলেন; বহুমাস এইবার সেখানে থাকিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিল, আষাঢ়ের গোড়ায়; কবি ও এণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে আছেন।

পূজাবকাশের ছুটি পর্যন্ত (১৮ই আশ্বিন ৫ অক্টোবর ১৯১৮) চারিমাস কবি শান্তিনিকেতনে রীতিমত স্কুল মাষ্টারী করিতেছেন; সকালে তিন পর্ব ক্লাস লন ও তার জন্য পড়া তৈয়ারী করেন। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গীটা কিরূপ ছিল সংক্ষেপে বলিতেছি। Ruskinএর Selection থেকে কতকগুলি অংশ লইয়াছেন। প্রথমে ছেলেদের বাঙলায় ছোট একটা বাক্য দিয়া তাকে অনুবাদ করিতে দেন; তারপর সেই ধরণের আর একটা বাক্য; এই রকম অনেকগুলি বাক্য ছেলেদের দ্বারা মুখে মুখে করাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, clause, phrase জুড়িয়া জুড়িয়া বাড়াইয়া চলেন, ছেলে ধরিতে পারে না যে ক্রমশই সে বড় বড় বাক্য বানাইয়া চলিয়াছে। শেষকালে বইএর বাক্যটা তর্জমা করিতে দেন—তখন সেটা ছাত্রর কাছে আদৌ শক্ত ঠেকে না। সেই বাক্যটা হল তার বই এর পাঠ্য। এইভাবে Arnoldএর Sohrab & Rustom তৈরী করিয়া তুলিতেন; তারপর কবিতাটা যখন পড়িয়া যান, তখন তাদের বোঝা কঠিন হয় না।

গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে অনেকগুলি গুজরাতি ছাত্র আসিয়াছে। বিদেশী ছাত্রকে কিভাবে বাঙলা পড়াইতে হইবে, তাহার পদ্ধতি কবি নিজে দেখাইয়া দিতেছেন। ছেলেদের জন্য 'অনুবাদ চর্চা' নামে বইটার পত্তন করিতেছেন; নিজের লেখার ইংরেজি তর্জমা করিতেছেন—কাজের অন্ত নহে। ১৬ই ভাদ্র লিখিতেছেন, "এখানকার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ পড়ে গেছে। পড়াশুনা কাজকর্ম যেন নূতন জোর পেয়েছে; সেইজন্য ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেছে। আমি-যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেলুম না, এখানে থেকে গেলুম, তা'র পুরস্কার পেয়েছি। * * আমি 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ইংরেজিতে তর্জমা করেছি; এণ্ড্রুজ সে-টা পড়ে খুব হেসেছেন, আর খুব লাফালাফি করেছেন।" আর একদিন লিখিতেছেন "আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পুরাতন পড়ার দিন। আজ সন্তোষের হাতে তাদের ভার এইজন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুইভাগ আমার ছুটি।" বিদ্যালয়ের কাজে খাটিতেছেন—এখন কবি পুরাদস্তুর স্কুল মাষ্টার। সেই সময়কার তাঁর মনের ভাব ও জীবনযাত্রার একটি ছবি আর একখানি পত্রে পাই;—

"আমি চুপচাপ করে বসে থাকি তা মনে করো না। আমার কাজ চলছে। সকালে * * তিন ক্লাসের পড়ানো আছে। তারপরে স্নান করে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখবার থাকে চিঠি লিখি। তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি করে রাখি। তারপর সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ ব'সে থাকি—কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুনতে আসে। তারপরে অন্ধকার হয়ে আসে—তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়—দিনুর ঘর (দ্বারিক) থেকে ছেলেদের গলা শুনতে পাই—তারা গান শেখে—তারপরে গান বন্ধ হয়ে যায়। তখন আদ্যবিভাগের ছেলেদের ঘর থেকে হারমোনিয়াম এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠতে থাকে। ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দুই একটা আলো চলতে দেখতে পাই। তারপর সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশ জোড়া তারার আলো। তারপরে বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে আসে, তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তারপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্বদিকের দরজার সম্মুখে আকাশের

অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হয়ে আসে, দুটো একটা শালিখপাখী উসখুস করে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটার সময় আম্রবিভাগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে, অমনি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্বাদ করে।" (ভানুসিংহের পত্রাবলী, ১২ই শ্রাবণ ১৩২৫ ; পৃঃ ১৪-১৫)।

শান্তিনিকেতনে এই সময়ে কলিকাতা, ঝরিয়া-প্রবাসী বহু ধনী গুজরাতির ছেলে পড়িতে আসে ; শান্তিনিকেতন যে উহার বাঙলার গণ্ডি ভেদ করিয়া বাহিরের ছাত্রদের আহ্বান করিতেছে, এই ব্যাপারটি কবির মনে খুব বড় করিয়া একদিন নাড়া দিল। পূজাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্বে তিনি একদিন এণ্ড্রুজ ও রথীন্দ্রনাথকে বলিলেন, শান্তিনিকেতনকে ভারতীয়দের শিক্ষা কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে ; এখানে ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্র আসিবে এবং যথার্থ জাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করিবে। বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্ররা নিজ নিজ আচার ব্যবহার নিজেরা পালন করিবে, কিন্তু একত্র শিশুকাল হইতে থাকিয়া একটি জাতীয় আদর্শ চর্চা করিবে। বোলপুরের বিদ্যালয় প্রাদেশিক থাকিবে না—সম্প্রদায়িক হইবে না।

বিদ্যালয় বন্ধ হইল ১৮ আশ্বিন (৫ অক্টোবর ১৯১৮) ; রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গেলেন ২১শে, সঙ্গে এণ্ড্রুজ ও রথীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনকে একটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মনে কল্পনা জাগিতেছে—বিশ্বভারতীর প্রথম কল্পনা এইভাবে উদয় হইল।

* রথীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ডায়েরী'তে লিখিতেছেন, (8 Oct. 1918) Just before coming down (to Calcutta) while talking with me and Mr. Andrews father got excited over the idea of making the Bolpur Institution a truly representative Indian education colony, where boys from all the provinces of India would come together to get an education and culture that is national and at the sametime modern. The different colonies of boys would keep to their own peculiar customs and manners where they donot conflict with our national ideals, and they would thus get a training from their childhood to respect each other inspite of outward differences. Bolpur institution should not be sectarian or provincial."

পরদিন কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কলিকাতাস্থ অনেকগুলি গুজরাতি ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসেন। তাঁহাদের নিকট তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নবতম আদর্শ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন; শান্তিনিকেতন ভারতীয় নানা জাতির মিলনভূমি হইবে, এই আদর্শ সকলকেই উৎসাহিত করিল। কেশবজী নামে একজন ভদ্রলোক টেকনিক্যাল বিভাগ খুলিবার জন্য পাঁচশত টাকা সেইদিন দিলেন। বাহির হইতে বিদ্যালয়ের জন্য সাধারণের কাছ হইতে টাকা লওয়া এই প্রথম।

কলিকাতায় দিন তিন চার থাকিবার পর রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ যাইবেন ঠিক করিলেন (১২ অক্টোবর, ২৫ আশ্বিন ১৩২৫)। সঙ্গে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর, সঙ্গীতাধ্যাপক ভীমরাও শাস্ত্রী।

কিন্তু মাদ্রাজ পর্যন্ত যাওয়া হইল না; পথের মধ্যে ট্রেণ গেল বিগড়াইয়া। কবি বিরক্ত হইয়া মাদ্রাজ যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিয়া পিঠাপুরমে নামিলেন। পিঠাপুরমের রাজা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইলেন। কবি কয়দিন পিঠাপুরমে থাকিয়া বিখ্যাত বীণকর সঙ্গমেশ্বরের সঙ্গীত শুনিলেন ও ভীমরাওকে বীণ শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। পরে পিঠাপুরমের রাজা তাঁহার বীণকরকে কয়েকমাস শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার এই মাদ্রাজ যাত্রা সম্বন্ধে একখানি পত্র 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র মধ্যে আছে (পৃঃ ৬৪-৬৫)। লিখিতেছেন,—"কল্য শনিবার মধ্যাহ্নে (২রা কার্ত্তিক, ১৯ অক্টোবর) হাওড়ায় ফিরে এলুম। যে শনিবার একদা তার কৌতুকহাস্য গোপন ক'রে আমাকে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিলো সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তা'র নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রচণ্ড ক'রে তুললে।"

মাদ্রাজে না গিয়াছিলেন ভালই হইয়াছিল, শুনিয়াছি সেবার সেখানে লোকে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে নাই। মাদ্রাজ কোনোদিনই তেমনভাবে কবির বাণীতে সাড়া দেয় নাই, যদিও তাঁহার কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনুকূল সমালোচনা সেখান হইতেই হইয়াছে সব থেকে প্রচুর।

পিঠাপুরম হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় থাকিলেন না, পরদিনই শান্তি-

নিকেতনে চলিয়া আসিয়াছিলেন (২০ অক্টোবর)। তখন বিদ্যালয় বন্ধ—বিদ্যালয় খুলিবে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। কবি মাঝে মাঝে রাথুকে হ্রস্ব দীর্ঘ লঘু গম্ভীর পত্র লিখিতেছেন, আর করিতেছেন 'অনুবাদ চর্চা'র জন্য তর্জমা। এ ছাড়া পত্রের জবাব দেওয়ার কাজ আছে, তখন তাঁহার কোনো সেক্রেটারী ছিল না।

৯ই অগ্রহায়ণ লিখিতেছেন, 'এখনও তাঁহার কাজের ভিড় কিছুই কমেনি' বিদ্যালয় খুলিয়াছে, কবির "স্কুল মাষ্টারি ফের সুরু হ'লো। * * আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েছি। * * * পাড়ার সমস্ত খবর রাখবার সময় আমি পাইনে, আমি কখনও আমার সেই কোণের ডেস্কে কখনও বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট করে কলম চালিয়ে দিনযাপন করছি। সামনেকার খাতা পত্রের বাইরে যে-একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তা'র প্রতি ভালো ক'রে চোখ তুলে যে দেখা, সে আর দিনের আলো থাকতে ঘ'টে উঠছে না। * * সন্ধ্যার পর * * আজকাল ফের আবার দুটি একটি করে গান জ'মচে।"

'গীতালি' প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩২১ সালে—তার শেষ গান লেখেন ৩রা কার্তিক; ১৩২১এর ফাল্গুন মাসে লেখেন ফাল্গুনীর ২৯টি গান। ১৩২২, ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫এর ভাদ্র মাস পর্যন্ত যে পঞ্চাশটি গান রচনা করেন তাহা ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে 'গীত পঞ্চাশিকা' নামে প্রকাশিত হয়। গানের সঙ্গে স্বরলিপি বাহির হয়। এ বই শান্তিনিকেতন প্রেসে ছাপা হয়। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায়, তখন লিনকলন সহরের অধিবাসীরা শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জন্য একটি ছোট প্রিণ্টিং প্রেস ও ট্রেডল মেসিন উপহার দান করে। সেই হইতে শান্তিনিকেতনে প্রেসের সূত্রপাত। যাক সেকথা। 'গীত পঞ্চাশিকা' প্রকাশিত (আশ্বিন, ১৩২৫) হইবার পর হইতে কয়েকমাস গান রচনা করেন নাই। অগ্রহায়ণ হইতে পুনরায় গানের সুর আসিয়াছে—এইবার যে গানগুলি লেখেন, সেগুলি 'গীত-বীথিকা'য় প্রকাশিত হয় (বৈশাখ, ১৩২৬)।

'গীত-বীথিকা'য় ২০টি গান আছে; সে-গানের অনেকগুলি বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে মণিমাল্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। 'মাটির প্রদীপখানি' 'আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে', 'তোমারি ঝরণা তলায়' 'গানের ভিতর দিয়া যখন' ইত্যাদি গান রবীন্দ্রসঙ্গীত আমোদীর সুপরিচিত।

পৌষ উৎসবে (১৩২৫) কবি শান্তিনিকেতনে আছেন ; কলিকাতা হইতে বহুলোক সমাগম হইয়াছে ; দেহালির সামনে যে বাড়ীতে আজকাল কলেজের ছেলেরা থাকে সেটাতে মেয়েরা আসিয়া থাকিল। ৯ই পৌষ স্থানীয় মেয়েরা একটি 'আনন্দবাজার' করেন ; তার সুন্দর একটি বর্ণনা 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র মধ্যে আছে। উৎসবের পর আশ্রমে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিল, সেবার পৃথিবী-ব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জার বৎসর। আশ্রমে সুকেশী দেবীর মৃত্যু হইল—ইনি দ্বিজেন্দ্র-নাথের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী, আশ্রম বালকদের জননীর ন্যায় ছিলেন। প্রতিমাদেবী মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য অজিতকুমার ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গিয়াছেন। নানা দিক থেকে মনের মধ্যে নানারূপ আন্দোলনের ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে, কিন্তু মনের কোনো বিক্ষোভ রাণুর কাছে লিখিত পত্রে দেখি না। ১৯শে পৌষ (ভানু-পত্র পৃঃ ৮৬-৮৮) যে পত্রখানি লিখিতেছেন তাহার মধ্যে মনের কোনো সংগ্রাম নাই যেন কিছুই হয় নাই এমনিভাবেই পত্রখানি লিখিতেছেন, মাঝখানে কয়েক লাইন গানও লিখেছেন—সে গানের নমুনা—

"হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নিসা !
(আমার) গাড়ি হ'লো উল্টো মতি,
কোথায় হবে আমার গতি—
খুঁজে আমি পাই না দিশা !
সারে গামা পাধা নিসা !"

কিন্তু মন চাইচে বাহির হবার জন্য। সুযোগও মিলিল—মৈসুর হইতে আসিল কবির নিমন্ত্রণ।

৮ই পৌষ ১৩২৫ (২২ ডিসেম্বর ১৯১৮) সমারোহ সহকারে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় ; বর্তমান টেনিসকোর্ট যেখানে হইয়াছে সেইখানে ভিত্তি স্থাপন হইল—নানাজাতি ও ধর্মের লোক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেন। বহু গুজরাতি কয়েক সহস্র টাকা দেন বিশ্বভারতী গৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য। সেই টাকা দিয়া অন্য জায়গায় ঘর হয় ; সেই ঘরটি বর্তমানে শিশুরা থাকে।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপনা আরম্ভ হয় গ্রীষ্মাবকাশের পর ১৩২৬ আষাঢ় মাস হইতে সেকথা যথাস্থানে বলিব।

১৩। মৈসুর ভ্রমণ

রায় বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী মৈসুর রাজ্যের দেওয়ান। বাঙ্গালুরের নাট্যনিকেতন বা ড্রামাটিক এসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন প্রেসিডেণ্ট। এই এসোসিয়েশন হইতে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ আসিল। বাহিরে যাইবার তাঁর দুইটি প্রয়োজন ছিল, এক শান্তিনিকেতন হইতে কেবলমাত্র বাহির হইয়া কোথায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় হইতেছে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে নূতন কথা ভাবিতেছেন তাহার ব্যাখ্যান করা। রাণুকে লিখিতেছেন ১৯শে পৌষ তারিখে "পরশু চল্লাম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায়, মদনপল্লীতে। ফিরতে বোধহয় জানুয়ারী কাবার হ'য়ে ফেব্রুয়ারী সুরু হবে। ("ভানু-পত্র পৃঃ ৮৮) ১০ই জানুয়ারী ১৯১৯ রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালুরে পৌছিলেন, সঙ্গে আছেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। পরে এণ্ড্রুজ আসেন গোয়া হইতে ও নগেন্দ্র গাঙ্গুলী আসেন হায়দ্রাবাদ হইতে—তখন নগেন্দ্রনাথ সেখানে সরকারী কাজ করেন, সপরিবারে থাকেন।

চারু শিল্পের উৎসব উপলক্ষে প্রকাণ্ড পাণ্ডেল নির্মিত হইয়াছিল। ১২ই উদ্বোধন। রবীন্দ্রনাথকে লইয়া দেওয়ান বাহাদুর মণ্ডপে উপস্থিত হইলে বিপুল উল্লাসে জনমণ্ডলী কবিকে সম্বর্ধনা করিল। মানপত্রখানি একটি মূল্যবান্ আধারে তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। কবি বক্তৃতা করিতে উঠিলে মাথার উপর বিজলীর সাহায্যে গোলাপের কুঁড়ির ন্যায় আলো জ্বলিয়া উঠিল ও পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। কবি Message of the Forest নামে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 'তপোবন' প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই এখন ক্রমশই মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে।

পর দিন সন্ধ্যায় তিনি ঐ পাণ্ডেলে আর একটি বক্তৃতায় প্রাচ্য বিদ্যায়তনের আদর্শের কথা ব্যক্ত করিলেন—বিশ্বভারতীর আদর্শ ধীরে ধীরে মনের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে। ১৪ই বাঙ্গালুরের সমস্ত বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা কবিকে সম্বর্ধনা করে। মৈসুর রাজ্যে বাস কালে কবি সেখানকার প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প অতি যত্ন সহকারে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

২০শে জানুয়ারী কবি মৈসুর নগরী যান; সেখানে ছাত্রগণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করে ও ৫০০ টাকার তোড়া শান্তিনিকেতনের জন্য দান করে। অপরাহ্ণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ও তাহাদের নিকট 'লক্ষীর পরীক্ষা'র তর্জমা পড়িয়া শোনান।

এই মৈশূর ভ্রমণ সম্বন্ধে কবির নিজের মত কি তাহা আমরা ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারি।

"বাঙ্গালোর সহরে এবং মৈসুর রাজধানীতে কিছুকাল কাটাইয়া মনে একটি তৃপ্তি পাইয়াছি। আমার তৃপ্তির প্রধান কারণ এই যে সেখানে আমাদের ভারতবর্ষের চিরদিনের যে একটি আকৃতি এবং প্রকৃতি সেটা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অথচ সেই ভারতীয়তা বর্ত্তমান কালের সংস্পর্শকে দূরে ঠেকাইয়া কৃপণের গর্ভনিহিত ধনের মত নিজেকে ব্যর্থ করিয়া রাখে নাই। * * মৈসুর পরকে লইতে গিয়া আপনাকে লোপ করিয়া দেয় নাই অথবা আপনাকে রাখিতে গিয়া পরকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয় নাই। সেখানে য়ুরোপের সম্পদকে গ্রহণ করা হইতেছে, অথচ যে গ্রহণ করিতেছে সে স্বয়ং ভারতবর্ষই।"

"আমাদের দেশে বর্তমানে দুই রকমের ভীরুতা দেখা যায়। কাহারও ভীরুতা দেশী প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে, কাহারো ভীরুতা য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে। যাঁহারা এই দুই ভীরুতাকেই অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারই ভারতবর্ষকে বাঁচাইবেন। মৈসুরের রাজাসন এই দুই ভারতকেই ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।"

কিন্তু কবি মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন; ইহার মধ্যে আপন কিছুই নাই, ইহা একেবারেই নকল। মৈসুরের ন্যায় স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইটকাট, তাহার চৌকি টেবিল, তাহার পুঁথিপত্র, তাহার বিষয় ও আশয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ নিতান্তই সঙ্কুচিত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে দেখিয়া কবি খুবই ক্ষুণ্ণ হইলেন। কবির মনে তখন ভারতের তপোবনে ভারতের সংস্কৃতি সাধনের কেন্দ্রের কথা জাগিতেছে; তাই লিখিলেন "বিদ্যাগারের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি এই আস্থার অভাব, এই সম্মানের অভাব যে কিরূপ গভীরভাবে আমাদের মনকে আত্ম-অবিশ্বাসের মধ্যে চিরদিনের মত মজ্জিত করিয়া দিতেছে

সে-কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার পর্যন্ত শক্তি আমরা হারাইয়াছি।” (শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ বৈশাখ, মৈসুরের কথা)

মৈসুর হইতে কবি সদল উটির পাহাড়ে বিশ্রামের জন্য যান ও সেখানে ২১শে জানুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত থাকেন।

সেখান হইতে কইম্বটোর আসিলে তাঁহার সহিত এণ্ড্রুজ ও নগেন্দ্রগাঙ্গুলী যোগ দেন। ইঁহাদের গন্তব্য পালঘাট; ওলবকোট জংসন হইতে ভারতীয় স্কাউট দল তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া পালঘাটে লইয়া গেল। সেখানে কবি Message of the Forest সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন।

পরদিন এণ্ড্রুজ সাহেবের সহিত বাসেল মিশন হলে পালঘাটের ছাত্রদের দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হইলেন। সেই দিন প্রাতে কলপথি নামক স্থানে স্থানীয় সংস্কৃত বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ও সালেম যাত্রা করেন।

সালেমে (৯ই ফেব্রুয়ারী) ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র (Centre of Indian Culture) নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এইখানে ছাত্রসভা ও সাহিত্যসভা মিলিয়া কবিকে সুন্দর একটি রৌপ্যমণ্ডিত পাত্রে মানপাত্র দান করেন। সভার পর তিনি সেখানকার সাহিত্যসভায় যান ও সেখানে ‘কর্ণ-কুন্তী সংবাদ’এর অনুবাদ পাঠ করেন।

সেই দিন রাত্রে সালেম ত্যাগ করিয়া পরদিন প্রাতে ত্রিচিনপল্লীতে উপস্থিত হইলেন; সন্ধ্যার সময় কবির সম্বর্ধনা হইল ও তিনি Message of the Forest প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এইখান হইতে শ্রীরঙ্গপট্টনে বিখ্যাত নৌকা উৎসব দেখিতে যান। প্রত্যেক স্থানে কবি নূতন নূতন দৃশ্য, নূতন নূতন সৌন্দর্য দেখিয়া চলিয়াছেন।

পরদিন (১১ই) যান কুম্ভকোনমে। স্থানীয় কলেজের ছাত্র ও অধ্যক্ষ Statham কবিকে অভ্যর্থনা করে। সন্ধ্যায় কলেজ হলে The Spirituality in the Popular Religion in India সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কুম্ভকোনম হইতে তাঞ্জোর যাত্রা করেন ১২ই তারিখে। পথের ধারে একটি ষ্টেশনে স্থানীয় লোকে কবিকে মানপত্র দান করে ও প্রাচীন বৈদিক রীতি অনুসারে পূর্ণকুম্ভ দান করে। তাঞ্জোরে তিনি রাওবাহাদুর কন্দ্যায়ারের বাসায় থাকেন। এখানে অনেকগুলি ক্লাব ও প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করেন

এবং বেসান্ত লজে স্থানীয় মহিলাদের সহিত দেখা করেন। সরকারী ট্রেনিং কলেজে তিনি Message of the Forest পড়েন। ছাত্রেরা কবির রচিত 'চিত্রা'র কয়েকটি দৃশ্য ও 'শকুন্তলা' অভিনয় করে।

পরদিন (১৩ই) কবি ষ্টীমারযোগে ত্রিচিনপল্লীতে ফিরিয়া গেলেন ও সেই সন্ধ্যায় দ্বিতীয় বক্তৃতা করিয়া পরদিন মত্বুরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মত্বুরাতে (১৪ই) আমেরিকান কলেজ হলে বিরাট জনতার সম্মুখে তিনি Message of the Forest পাঠ করিলেন। সেই রাত্রে তাঁহার জ্বর মত হইল; এই মাসাধিক কালের পরিশ্রম শরীরকে খুবই ক্লান্ত করিয়াছে। মাদুরায় তিনি দেওয়ান গণপতের অতিথি ছিলেন—এক সপ্তাহ কোনো পাবলিক কাজে যোগ না দিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী তিনি 'The Spirit of Popular Religion in India' সম্বন্ধে ও পরদিন 'Education in India' নামে বক্তৃতা করিলেন; শেষোক্ত বক্তৃতায় তিনি তাঁহার কল্পিত বিদ্যায়তনের কথা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন। এইখানে টিকিট বিক্রয় করিয়া ১৫৭৫৲ টাকা হইয়াছিল।

সেখান হইতে কবি ও এণ্ড্রুজ মেল-বোট যোগে মদনপল্লী গমন করেন; সেখানে তাঁহারা থিওজফিষ্টদের অলকট বাংলোএ আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদনপল্লীতে সপ্তাহ খানেক থাকিলেন ও সেখানকার স্কুল কলেজ প্রভৃতি দেখিলেন; আনন্দে দিনগুলি কাটিতে লাগিল। কিন্তু ইহার পর মাদ্রাজ যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালুরে ফিরিয়া গেলেন। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি সেটি হইতেছে বিচিত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগ। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে য়ুরোপীয় মহাসমর শেষ হইয়া গিয়াছে— ইংরেজ ও তাহার মিতারা জয়ী হইয়াছেন; ভারতীয়রা এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল এবং যুদ্ধান্তে নেতারা আশা করিয়া আছেন যে ভারতের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে মোটা রকম পরিবর্তন হইবে। রাজনৈতিকদের মধ্যে এইসব ব্যাপার লইয়া খুবই আন্দোলন চলিতেছিল; রবীন্দ্রনাথ এইসব দলের কোন্ কোন্ কোঠাতে পড়িবেন তাহা লইয়া দলপতিদের ও তাঁহাদের চেলাদের মধ্যে মতানৈক্য হইতেছিল। মাদ্রাজে এই সময়ে তাহা লইয়া খুবই আলোচনা চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতবাসীদের বিরুদ্ধতার বোধহয়

একটি কারণও ছিল। সেই সময়ে ভারতবর্ষময় পাটেলের অন্তর্জাতিবিবাহ লইয়া আলোচনা চলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অসবর্ণ বিবাহকে আন্তরিক অনুমোদন করেন। মাদ্রাজে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণদের আধিপত্য অসীম; তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিতে যে-বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, সমাজনীতিতে তাহার বিপরীত বুদ্ধি প্রয়োগ করার মধ্যে কোনোরূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পান না। কিন্তু যথার্থ বিরোধ চলিতেছিল ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে। কবির সামাজিক মতের জন্য তাঁহারা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কবি মদনপল্লীতে থাকিতে থাকিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মাদ্রাজে একটা বিরুদ্ধতা রহিয়াছে। বাঙ্গালুরে আসিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়া দিলেন (৪ঠা মার্চ ১৯১৯)। তিনি বলিলেন "আমি কোনো রাজনৈতিক দলের লোক নই। দেশবাসীর কাছে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা বর্তমানের কথা নহে, তাহা রাজনৈতিক অশান্তির কথা নহে। আমি কখনো অনিচ্ছুক হাতের কাছ হইতে দানভিক্ষার পক্ষপাতী নই; দাতার নিকট হইতে ভিক্ষা পাইব কি পাইব না এই অনিশ্চয়তার দোলায় আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব হয়। সেইজন্য আমি বরাবর নিজের চেষ্টায় যে সামান্য কাজ হয় তাহাই গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী।' তাঁহার পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

I take this opportunity of making it clear to all that I do not belong to any political party whatever, and that what I have to say to my countrymen is not of the present moment or of the prevailing political unrest. I have never felt any attraction for devising means to build the machinery for extracting favours from unwilling hands, thus perpetuating the cult of moral servitude and making our people live in the most unhealthy mental atmosphere of continual alternation of hope and despair. It has ever been my endeavour to find out how to develop the power in ourselves by which we can truly earn the gratitude of all mankind and win our

place as those who give out of their abundance and do not solely rely upon the doles of half-hearted charity.

৮ই মার্চ মৈসুর মিথিক সোসাইটিতে (Mythic Society) যুবরাজের সভাপতিত্বে কবি Folk Religion of India বা বাউল সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। যুবরাজ বক্তৃতাশেষে বলিলেন, আজকের বক্তৃতা হইতে দুটি জিনিষ শিখিলাম; একটি হইতেছে আমরা দেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ; আমাদের লোকসাহিত্য আলোচনার প্রয়োজন। দ্বিতীয় হইতেছে কোনো জাত বা সম্প্রদায় নীচ নহে।

মৈসুর সরকার হইতে গ্রন্থাদি উপহার পাইলেন কিন্তু শান্তিনিকেতনের সাহায্যকল্পে এক পয়সা তখনো পাইলেন না, পরেও পান নাই।

দুইদিন পরে কবি মাদ্রাজে আসিলেন। সেখানে হাইকোর্টের উকিল রঙ্গস্বামী আয়ারের গৃহে উঠিলেন। মাদ্রাজে আসিবার উদ্দেশ্য বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির চানসেলাররূপে তিনি বক্তৃতা দিবেন। য়ুনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার জর্জ অরুনডেল বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। তিনি এখানে Education, Message of the Forest ও The Spirit of Popular Religion in India এই তিনটি বক্তৃতা করিলেন (১০, ১১, ১২ মার্চ)।

১৩ই আর্য গণসভায় 'ললিতঙ্গী' নামে এক ভক্তিমূলক তামিল নাটক অভিনীত হয় ও তথায় কবির অভিনন্দন হয়। এছাড়া কয়েকটি কলেজে তিনি তাঁহার কাব্যর তর্জমা পাঠ করেন—'গান্ধারীর আবেদন'এর অনুবাদ (Mother's Prayer) এই সময়ে বোধহয় লেখেন। খৃষ্টান কলেজে এইটি পড়িয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

স্থির ছিল যে কবি কয়েকদিন মাদ্রাজে থাকিবেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার শরীর খুব খারাপ হইয়া গেল; তখন সমস্ত engagement রদ করিয়া ১৪ই মার্চ (৩০ ফাল্গুন, ১৩২৫) কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কবি কি পরিমাণ ঘুরিয়াছিলেন, তাহার তালিকা উপরে আমরা ইচ্ছা করিয়া দিয়াছি; কবির শ্রমশক্তি দেখাইবার জন্য উহা প্রদত্ত হইয়াছে।

চৈত্রের প্রথমেই মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। এতকাল তিনি

কলিকাতায় তাঁহার বিদ্যায়তন সম্বন্ধে কোনো পাবলিক বক্তৃতা দেন নাই। ২৭শে মার্চ (১৩ চৈত্র) এমপায়ার থিএটারে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজিতে বক্তৃতা করিলেন; এই বক্তৃতায় দর্শনী দিয়া শ্রোতাদের আসিতে হয়। বাঙলাদেশে প্রবন্ধ শুনিবার জন্য দর্শনীদান প্রথা রবীন্দ্রনাথই বোধহয় প্রবর্তন করেন। মাদ্রাজে তিনি ইতিপূর্বেই এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ প্রথা বিলাত ও আমেরিকা হইতে আমদানী।

এক সপ্তাহ পর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে Message of the Forest প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মোট কথা এই দুইটি প্রবন্ধে তিনি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁহার তৎসাময়িক ধারণা ব্যক্ত করেন। আমরা নিম্নে কবির নিজ লিখিত সংক্ষিপ্ত মর্মটুকু উদ্ধৃত করিলাম। (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬, বৈশাখ)।

"আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্য অনেক সহরে পাঠ করিয়াছি। বিষয়টি এত বড় যে আমাদের এই ছোট পত্রপুটে তাহা ধরিবে না। সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মটুকু এখানে বলি।

মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের

বড় বড় শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ ভারতবর্ষের যে-মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে-মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙ্গুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয় —নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত-সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে যে-শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মত গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদ-শালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। "বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষী-দিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরাণীগিরি ওকালতী ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি কুমারের চাক ঘুরিতেছে

সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মত পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র তাহার কৃষিতত্ত্ব তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বললাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি "বিশ্বভারতী" নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

কলিকাতায় শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজি দুইটি বক্তৃতা দিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। লেখায় মন আসিয়াছে—তিনমাস প্রচার কার্য করিয়াছেন—কবিমন নিজের মধ্যে ফিরিতে চাহিতেছে। গান আসিতেছে ; মনে সুর লাগিতেছে। এমন সময় 'শান্তিনিকেতন' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশের কথা উঠিল, পত্রিকাখানি 'আশ্রমসম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের জন্য' প্রকাশিত হইবে। ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সংখ্যার সূচনায় কবি লিখিলেন, "এই কাগজে আমরা যাহা কিছু বলিব তাহা কেবলমাত্র আমাদের আশ্রমের ছাত্র ও আত্মীয়দিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিব। * * আমাদের আলাপ ঘরের লোকের আলাপ।" চারি পৃষ্ঠা ফুলস্ক্যাপ কাগজখানির প্রায় সবটাই কবির লেখা—সূচনা, গান 'পাখী আমার নীড়ের পাখী', নববর্ষ, মৈসুরের কথা, তথ্যসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ইংরেজি শিক্ষা।

এই সময়ে সাহিত্যে একটি নূতন জিনিষ সৃষ্টি করিতেছেন—সেটিকে বলা যাইতে পারে, গদ্যপদ্য—কথিকা নামে বাহির হয়—পরে 'লিপিকা' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। কয়েকদিন পূর্বে 'স্বর্গমর্ত্য' নামে একটি নাটক লেখেন (সবুজপত্র ১৩২৫ ফাল্গুন-চৈত্র-সংখ্যা)। কয়েক পৃষ্ঠায় এই একাঙ্ক নাটিকাটিতে

কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের যেদিন সম্বন্ধ লোপ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে 'মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ' দেওয়া বন্ধ করেছে, এবং 'দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র' ধরা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। পৃথিবীর কাছে স্বর্গের যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি বাঁচিতে পারে না। তাই ইন্দ্র চলিলেন পৃথিবীতে জন্ম লইতে।

মানুষের অলস ভাবলোক দেবতার স্বর্গের ন্যায়ই ব্যর্থ, মানুষ সার্থক হয় ভাবজগৎ হইতে নামিয়া যখন সে কঠিন মাটির কর্মজগতে আসে। এই ভাব ও কর্মের মধ্যে যখন সত্য সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়—তখনই তাহাকে বলা যায় সত্যযুগ। কবির মনে বিশ্বভারতীর আইডিয়া ঘুরিতেছে, তাহাকে তিনি মূর্তি দিবেন—ভাবলোকের স্বর্গের সঙ্গে কর্মজগতের মর্তের যোগস্থাপন করিবেন।

'মুক্তির ইতিহাস' কথিকাটির মধ্যে যে শ্লেষ আছে, তাহা পাঠক পড়িলেই বুঝিবেন; মানুষকে মানুষ অধীন করে, তা'কে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধে, আইন করিয়া মুখ বন্ধ করে; কিন্তু তবু তার প্রাণ স্বাধীন হবার জন্য ঘোড়ার মত বৃথায় দেওয়ালে লাথি ছোড়ে। তার স্বাধীন হবার জন্য চীৎকার লোকের কাণে খারাপ লাগে, কারণ তাহারা বলে সে ত' পরম আরামে আছে! তারপর যে-স্বাধীনতা এই অধীন মানবকে প্রবল জাতিরা দেন, তাহা এত সঙ্কীর্ণ যে তাহা পা-বাঁধা ঘোড়ার মত; তখন তাহারা বলেন এ দায় বিষম দায়, বলিয়া বেড়ান Whiteman's burden। ভারতবর্ষের সেই সমস্যা সেদিন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এ কাথিকাগুলি অর্থমূলক; নিছক সাহিত্যরসের অনুভবে লিখিত রচনাগুলি এইবার আসিতেছে।

১৪। রাজনৈতিক অশান্তি

মণ্টেগু চেমসফোর্ড প্রতিবেদন যে সময়ে প্রকাশিত হয় (৮ই জুলাই ১৯১৮), অর্থাৎ প্রায় দশমাস পূর্বে, প্রায় ঠিক সেই সময়েই এক কমিটি বসে ভারতের বিপ্লবীদের ইতিহাস অনুসন্ধান ও তাহা নিবারণের উপায় আবিষ্কার

করিয়া রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য ; এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট হন বিলাতের জজ রৌলট, তদনুসারে ইহা রৌলট কমিটি নামে সুপরিচিত। এই কমিটি মুষ্টিমেয় বিপথগামী যুবকের কয়েকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার ইতিহাসকে প্রকাণ্ড করিয়া চিত্রিত করেন ও সমগ্র ভারতের সাধারণ ফৌজদারী আইনকে চাপা দিয়া নূতন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন। মণ্টেগুর রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া পার্লামেণ্ট নূতন কনষ্টিটিউশন বা রাষ্ট্রকাঠামো গড়িবেন, তাহাতে স্বরাজ্যশাসনের অধিকার দেওয়া হইবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঘোড়ার মত তার দুই পা বাঁধা হাঁটার চাল দেখিয়া দূরে স্বর্গলোকের নিয়ন্তাতা ভাবিলেন এইটাই বুঝি ওর স্বাভাবিক চাল। ব্রহ্মা বলিলেন, 'ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে।' সময়োপযোগী রৌলট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে বিলাতের লোকে এদেশ সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, অকৃতজ্ঞতার জন্য বিরক্ত হইলেন। স্বাধীনতার যেটুকু আশা ভরসা ছিল তাহা প্রায় লোপ করিয়া দিয়া তাহাকে পুনরায় আস্তাবলে পাঠাইলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছোট বড়' প্রবন্ধর বক্তব্য সার্থক হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইল।

দেশময় রৌলট কমিটির প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে লোক প্রতিবাদ করিতেছে ; মডার্ণ রিভিউ ইতিহাস হইতে দেখাইলেন যে এই বিল যদি একটে (act) পরিণত হয় তবে পূর্ব যুগের ইনকুইজিশন বা ষ্টার চেম্বারের সহিত ইহার কোনো পার্থক্য থাকিবে না। বিংশ শতাব্দীতে মানুষকে এভাবে বাঁধা সকল প্রকার আইন অননুমোদিত। দেশের উপর দিয়া প্রবল আন্দোলনের ঝড় চলিতে লাগিল। সাময়িক পত্রিকা দেখিলেই লোকের মেজাজ বুঝা যাইবে। তখনো প্রেস আইন আজকের মত কড়া হয় নাই ; তাই লোকে সমালোচনাটাও কিয়দ পরিমাণে করিতে পাইত। মনোব্যথা লঘু করিবার ঐ একটি মাত্র safety valve তখনো খোলা ছিল।

গান্ধীজি এই সময়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে এই বিল আইনরূপে পাশ হইলে তিনি 'সত্যগ্রহ' আন্দোলন করিবেন ইত্যাদি। কিন্তু সত্যগ্রহ আন্দোলন সেই গ্রহণ করিতে পারে যাহার অন্তঃকরণে হিংসা দ্বেষ নাই। ১৯১৯ সালে লোকে এই অহিংস আন্দোলন—যাহার মূল কথা হইতেছে আঘাত পাওয়া, আঘাত না দেওয়া—সেই মন্ত্রে অভ্যস্ত হয় নাই।

যাহাই হউক দেশময় এই লইয়া প্রচার চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলন লক্ষ্য করিতেছিলেন—তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের বাহিরে দাঁড়াইয়া এই প্রবাহের কোন্ খানে কি আবর্ত আছে তাহা যেন দ্রষ্টার ন্যায় দেখিতে পাইলেন। ২৯শে চৈত্র ১৩২৫ (১২ই এপ্রিল ১৯১৯) শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে যে পত্রখানি লেখেন তাহা ১৬ই এপ্রিল Indian Daily Newsএ প্রকাশিত হয়। আমরা পরিশিষ্টে পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়াছি।

গান্ধীজি ইতিপূর্ব্বে চম্পারণে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালনা করিয়াছিলেন। এইবার এই বিরাট অভিযানের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাণী প্রেরণ করিলেন। কবি দিব্যচক্ষে ইহার মধ্যে বিপদ কোথায় তাহা মহাত্মাজীকে দেখাইয়া দিলেন।

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবে জালিনবালাবাগের যে সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাহার কোনো খবর কোনো কাগজে বাহির হয় নাই।

কবিও কোনো খবর পান নাই। ১৭ই বৈশাখ ১৩২৬ প্রমথচৌধুরী মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিতেছেন 'সবুজপত্র' সম্বন্ধে; বাঙলার যুবকদের মন থেকে জরার আক্রমণ রোধ করিবার কথা লিখিতেছেন; কিন্তু তিনি এখন 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিবেন না। কারণ লিখিতেছেন—"এখন দিন শেষে আমার মনিবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েছে। আমার মনিব এসেছেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শান্তি অল্প, শাস্তি যথেষ্ট, কিন্তু ছুট্টি একটুও নেই। সেই জন্যে এখান থেকে আমি তোমাদের জয় কামনা করি * *। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েছি।" (স-প, ১৩২৬ চৈ)।

কবি তাই লিখিতেছেন 'ইংরেজি শিক্ষা' কেমন করিয়া দিতে হইবে, কি ভাবে 'তথ্য সংগ্রহ' করিতে হইবে ইত্যাদি। আর মাঝে মাঝে গান ও কথিকা লিখিতেছেন। বিদ্যালয় বন্ধ হয় ২৮শে বৈশাখ, তৎপূর্বে 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় হইল; কবির ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হয়।

বিদ্যালয় বন্ধ; চারিদিক নিস্তব্ধ। কবি দেহালির উপরের ছোট খুপরিটির পশ্চিমে জানলার কাছে পিঠ দিয়া লিখিতেছেন।

* মন্দিরের উপদেশ :—১লা বৈশাখ নববর্ষ (বৈশাখ); ১০ই বৈশাখ বুধবার শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের উপদেশে মন্ত্র (আষাঢ়); ১৯শে বৈশাখ, শীল গ্রহণ (আশ্বিন-কার্ত্তিক) শান্তিনিকেতন ১৩২৬।

মন বেশ হালকা—রাণুকে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) যে চিঠিখানি লিখিতেছেন তাহা হইতে জানিতে পারি পাঞ্জাবের খবর তখনও পান নাই। পরদিন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখিতেছেন তাহাতে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' সম্বন্ধে তাঁহার টীকা ও অধ্যয়নফল জানাবেন লিখিতেছেন। (প্রবাসী ১৩৩২, পৌষ পৃঃ ৩০৬)। এই দিনই 'বাতায়নিকের পত্র'গুলি শেষ করেন (প্রবাসী ১৩২৬, আষাঢ়, পৃঃ ২২১-২৩৫)। এই গুচ্ছে পাঁচখানি পত্র আছে ; পত্রগুলি কাহারও উদ্দেশ্তে লেখা নয়। লেখক নিজেই লিখিতেছেন, "অন্তের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্তের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে? সেটা কেবল এই বাতায়নটুকুতেই। কিন্তু নিজের মধ্যে সে কার সঙ্গে কথা কয়?" (ঐ পৃঃ ২২১)। পাঁচখানি পত্রে কবি বিচিত্র বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, যেমন শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিতেছেন, "একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয় গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভব গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।"

"এই বড় দুঃসময়ে কামনা করি শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয় করব না, ভক্তিও করব না—তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব।" (ঐ পৃঃ ২২৫)। আর একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "এই বাতায়নে এসে বসেছি, অমনি দেখি আমাদের আঙিনা থেকে উঠছে দুর্বলের কান্না ; সেই দুর্বলের কান্নায় আমাদের সমস্ত আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। আজকের দিনে, দুর্বল যত ভয়ঙ্কর দুর্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর কোনো দিনই ছিল না। বিজ্ঞানের কৃপায় আজ বাহুবল নিদারুণ দুর্জয়।" যুদ্ধের পর Peace Conference চলিতেছে, সে-সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "আর কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে আসছে ; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টিসৎকার হল না, মন বদল হয়নি। কলিযুগের সেই সিংহাসনটা আজ কোনখানে? লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনো মতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাই নে। সেইজন্মেই অতিবড় বলিষ্ঠেরও ভয়, কি জানি যদি দৈবাৎ

এখন বা সুদূর কালেও একটুখানিও লোকসান হয়। যেখানে লোকসান কোনোমতেই সইবে না, সেখানে আইনের দোহাই, ধর্মের দোহাই মিথ্যে।" (পৃঃ ২২৬)।

নানা চিন্তা এই পত্রগুলির মধ্যে দেখিতে পাই ; ছুটির মধ্যে নিজ'নে, নিজের মনের নিজের কথা চলিতেছে। গ্রীষ্মকে কবি ভয় করেন না, সেটা স্বচক্ষে দেখা ; বলেন যে আমি গ্রীষ্মকালে জন্মেছি, তাই সূর্যের সঙ্গে আমার মিতালি। রাণুকে লিখিতেছেন, "আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করিনে ; এই দুপুরে দেখবে, ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ কিন্তু আমার ঘরের সব দরজা জানলা খোলা। তপ্ত হাওয়া হু-হু ক'রে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া ঘ্রাণ ক'রে যাচ্ছে।" (পৃঃ ৯২) পত্রটা লিখিতেছেন ৮ই জ্যৈষ্ঠ। বোলপুরের গ্রীষ্মের কথা যিনি জানেন, তিনি ইহার মর্ম বুঝিবেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের অনাচারের কাহিনী তাঁহার কানে পৌঁছিল ; এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। তিনি দেশের এই নিদারুণ অপমানের দিনে নীরব থাকিতে পারিলেন না। ৮ই জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) রাণুকে দারুণ গ্রীষ্মের কথা বলিয়া পরে লিখিতেছেন, "আকাশের এই প্রতাপ আমি এক-রকম সইতে পারি কিন্তু মর্তের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধহয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হ'চ্ছে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। তাই কত শত বৎসর ধ'রে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইছে কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয়নি।" (ভানুসিংহের পত্রাবলী পৃঃ ৯৩)।

১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) কবি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন ; কয়দিন নিজের মনের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা ও অপমাননা বোধ করিতে লাগিলেন, রাত্রে ভাল নিদ্রা হইত না। ৩০শে মে তিনি তাঁহার নাইটহুড ত্যাগ করিয়া একপত্র লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে লিখিয়া পাঠাইলেন—১লা জুনের কাগজেও সেই পত্র প্রকাশিত হইল। ভারতবর্ষের লোক সর্বপ্রথম জানিল যে পাঞ্জাবে এমন একটা ভীষণ কাণ্ড হইয়াছে। মাসাধিক কাল পাঞ্জাবের কোনো সংবাদ কাগজে পত্রে

বাহির হয় নাই—'মার্শাল' ল' অনুসারে সমস্ত পাবলিসিটি ছিল বন্ধ। কবিই প্রথম জানাইয়া দিলেন সেখানে কি হইয়াছে—এবং সেই অনাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি তাঁহার 'স্যর' উপাধি প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজন কাহারও সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন নাই, তবে ২৮এ মে প্রাতে তিনি রামানন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান; তাঁহাকে হয় ত এবিষয়ে বলিয়াছিলেন। আমরা পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised Governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our

sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised a into dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongrnous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of my knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration." Yours faithfully Rabindranath Tagore.

এই পত্র প্রকাশিত হইলে সাময়িক পত্রিকায় নানাবিধ মন্তব্য ও সমালোচনা বাহির হইল। Indian Daily News (June 3, 1919) লিখিলেন যে কবির কাজ হঠকারিতাপূর্ণ কিন্তু ইহাও লিখিলেন—"Rabindranath's abrogation of his Knighthood coupled with the challange he has flung at the authorities, is a far more serious step

than the surrender of his Knighthood by Dr. Subrahmaniya Iyer of Madras," এলাহাবাদের Independent (June 4) লিখিলেন, "Tagore's letter is remarkable in more ways than one, but perhaps is nothing more so than in its complete fidelity to the national sentiment of all his fellow countrymen at the present hour."

দেশী অনেক কাগজেই কবির কাজের প্রশংসা করিলেন, কোনো কোনো কাগজ বলিলেন কবির এই উপাধি গ্রহণ করাই ভুল হইয়াছিল ; গোখলে, মালাবারীকে গবর্মেণ্ট উপাধি ভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই ; কবিরও তাহাই উচিত ছিল ; তবে তিনি এখন উহা ত্যাগ করায় তাহারা সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল।

বিলাতের কাগজের মধ্যে Daily Herald লিখিল কবি প্রো-জার্মান বা এণ্টি-বৃটীশ নহেন ; ভারতীয় নেতারা যে উপাধির খাতিরে তাহাদের জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিবে না, তাহা রবীন্দ্রনাথের পত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। Manchester Guardian কবির পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া লিখিলেন যে, কবি যেসব কথা বলিয়াছেন সে-সম্বন্ধে অবিলম্বে ভারত-সরকারের তদন্ত করা প্রয়োজন। The East Anglican Times সেই কথাই লিখিয়া বলিলেন ; আমরা যদি এখনি তাহা না করি, তবে 'We are a disgraced people'.

স্যর হাসান ইমাম ২রা জুন পাটনা হইতে টেলিগ্রাম করিলেন। Have just read your letter to Viceroy. Country will be not merely qualified but grateful for your noble protest in defence of her rights. Your action is as we expected. Please accept my most loving homage. Hassan Imam.

সেইদিনই রাণুকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন ; "তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখো, আমি ভাবলুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেছি—আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। * * আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা

জ'মে উঠেছিল, তা'রই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে—তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছিনে,—তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করচি"। (ভানুসিংহের পত্রাবলী পৃঃ ৯৪)

১৫। বিশ্বভারতীর প্রথম পর্ব

আষাঢ়ের প্রথমদিনে কবি কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতন ফিরিয়াছেন। ১৬ই জুন, বা ৯ই আষাঢ়, বিদ্যালয় খুলিল তার এক সপ্তাহ পরে বিশ্বভারতীর কাজ স্বরু হইল; তবে এ বিশ্বভারতী formal নয়; সে হয় আড়াই বৎসর পরে। বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হইল ১৮ই আষাঢ় ১৩২৬ (৩ জুলাই ১৯১৯)। বিশ্বভারতী এই নামটি কবি ব্যবহার করিয়াছিলেন শান্তিনিকেতন পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৩২৬, বৈশাখ) সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি।

স্থির হইল কবি ও এণ্ড্রুজ সাহিত্য পড়াইবেন; মহাস্থবির ধর্মাধার রাজগুরু বৌদ্ধদর্শন, বিধুশেখর ভট্টাচার্য সংস্কৃত ও পালি, কপিলেশ্বর মিশ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ, ক্ষিতিমোহন সেন হিন্দি সাহিত্যে মধ্যযুগের ধর্ম, রথীন্দ্রনাথ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

মহারাষ্ট্র দেশীয় পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলা গানের অধ্যাপনাভার লইলেন।

চিত্রশিল্প স্বরু হইল। ইতিপূর্বে সুরেন্দ্রনাথ কর আসিয়াছিলেন, তিনি স্কুলের ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিখাইতেন; এইবার আসিলেন নন্দলাল বসু। তিনি আসাতে এই বিভাগটি গড়িয়া উঠিল এবং আরও কয়েক মাস পরে আসিলেন অসিতকুমার হালদার। শান্তিনিকেতন 'কলাভবনে'র পত্তন হইল।

তখন স্বল্প আয়োজন; বাহিরে তেমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল না—ঘরের কাগজ শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল। কবির মূল কথা ছিল যেসব অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে আছেন তাঁহারা জ্ঞানালোচনা করিবেন, তাঁহারা জ্ঞানের এক একটি বিষয় লইবেন, তাঁহার কেবল স্কুলমাষ্টার হইবেন না তাঁহারা নিজেরাও বিদ্যা অর্জন করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের এই নূতন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল? সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় বর্তমান বিদ্যাশিক্ষার উপর লোকের যে একটা বীতরাগ আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ চারিদিকে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াস—সকলেই একটা নূতনতর আদর্শ খুঁজিতেছেন। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধমমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না, তাই নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। (অসন্তোষের কারণ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ)।

এই যে ভরসার অভাব, আত্মনির্ভরশূন্যতা. ইহার কারণও কবি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার মত এতকাল ধরিয়া আমরা যে বিদ্যা আহরণ করিয়াছি, তাহা বাহির হইতে পাইয়াছি, ভিতর হইতে কিছুই জাগে নাই। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে বহন করিয়া চলিলাম।” কিন্তু আমাদের বুদ্ধি-কৃশতা ও নির্জীবতা আমাদের প্রকৃতিগত নহে, তাহার প্রমাণ দেশের বর্তমান মনীষীরা ও প্রাচীনকালের স্রষ্টারা। দীর্ঘকাল ইংরেজি স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াও আমরা বর্তমানে কোনো বিষয়ে যে মৌলিকত্ব (Originality) দেখাইতে পারিতেছি না তাহার কারণ “বিদ্যাটা যেখান হইতে ধার করা, বুদ্ধিটাও সেইখান হইতে ধার করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাইনা। একজন ফরাসী বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে, তার কারণ যে ফরাসী-বিদ্যা তাহার নিজের

সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে ; এইজন্য নিজের হিসাব মত সে মূল্য দেয় এবং কোনটা লইবে কোনটা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিণ্য কিছুতেই থাকিতে পারেনা।" (বিদ্যার যাচাই, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ আষাঢ়)

বিশ্বভারতীর আদর্শ তখন কি ছিল তা কবি তাঁহার The Message of the Forest এ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ; এই সময়ে সেইটাকে বদলাইয়া The Centre of Indian Culture নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

আশ্রমে অনেকগুলি গুজরাতি ছাত্র আসিল, গুরুপল্লীর পত্তন হইল, ছোটোখাটো কারখানা ঘর হইল, ছাপাখানা ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। এবার ছুটির পর আশ্রমে বিজলিবাতি হইল। বিজলিবাতি হওয়ায় লোকে আশ্রমের আশ্রমত্ব নষ্ট হইল বলিয়া আশঙ্কিত হইয়া উঠিল। প্রাচীনের প্রতি কবির অশ্রদ্ধা নাই, তাই বলিয়া তিনি নূতনকেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, বিজ্ঞানকে তিনি চিরদিনই সম্মান দিয়াছেন। সুতরাং বিদেশী ডিটজ্ লণ্ঠন ও ডিটমার আলো যদি আশ্রমের আশ্রমত্ব নষ্ট করিয়া না থাকে, তবে ডাইনামো-এঞ্জিন ও বিজলিবাতি কেমন করিয়া আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করিবে—ইহা কবির বুদ্ধির অগম্য হইল। তিনি বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিলেন। কোনো প্রকার বিদ্যাকেই তিনি একঘরে করিয়া রাখিবার বিরোধী।

বিশ্বভারতীর কাজ সুরু হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহার রূপটি ক্রমশই পরিস্ফুট হইতেছে—মননের দ্বারা কল্পনার দ্বারা। তিনি লিখিতেছেন "পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে, জাতিগত বিদ্যা-স্বাতন্ত্রকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে, সেই সমবায়ে যে-বিদ্যা যোগ দিবে না, যে-বিদ্যা কৌলিন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।"

"অতএব আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড় কেন্দ্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রম-বিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হবেই।

"তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত সম্বন্ধ নির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে।

"বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্ত গঙ্গোত্রী হইতে উদ্ভব। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আসিয়াছে, সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে।

"অতএব আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

"সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।" (বিদ্যাসমবায়, শান্তিনিকেতন, ১৩২৬, আশ্বিন-কার্তিক)।

বিশ্বভারতী আরম্ভ করিয়া কবি স্বয়ং শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা সুরু করিলেন। তিনি প্রতিদিন ইংরেজ কবি Browningএর কাব্য পড়াইতেন; এণ্ড্রুজ অন্যান্য ইংরেজ লেখকদের লেখা সম্বন্ধে, রথীন্দ্রনাথ Genetics, বিধুশেখর শাস্ত্রী হিন্দুদর্শন, শ্রীযুক্ত ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির নামক একজন সিংহলী ভিক্ষু বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। মহাস্থবিরের বক্তৃতায় আমরা প্রথমে অনেকেই গিয়াছিলাম, কিন্তু দিন যতই যায়, শ্রোতার সংখ্যা ততই ক্ষীণ হইতে থাকিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখিলাম কবি নিশ্চল হইয়া বসিয়া তাঁহার সেই জটিল তত্ত্ব শ্রবণ করিতেছেন; অবশ্য বিধুশেখর শাস্ত্রী থাকিতেন। মহাস্থবির যে ভাষায় কথা বলিতেন তাহা না বাংলা না হিন্দী, এবং বিষয়

যাহা আলোচনা করিতেন তাহাও শ্রুতিসুখকর ও সহজবোধগম্য ছিল না, কিন্তু কবির যে ধৈর্য ও জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহা দেখিয়াছি তাহা বড় বড় জ্ঞানবীরকে লজ্জিত করিত।

এই সময়ে কবি বাংলা প্রতিশব্দ লইয়া ও শব্দের ও বাক্যের যথাযথ অনুবাদ লইয়া বিশেষ আলোচনায় ব্যাপৃত হন। তাঁহার সেইসব আলোচনা শান্তিনিকেতনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষাতত্ত্বের প্রতি তাঁহার টান চিরদিনের; কেবল রসের দিক দিয়া তিনি যে ভাষার সাধনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার গঠনের দিক দিয়া তিনি বাংলাভাষাকে যাহা দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। ১৯২৮ সালে তাঁহাকে দেখিয়াছি Monier-Williams-এর সংস্কৃত অভিধান লইয়া তাহার আরম্ভ হইতে শেষপর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া পারিভাষিক শব্দ বাহির করিতেছেন। এই শব্দ-সংগ্রহ পরে 'সাহিত্য পরিষদ 'পত্রিকা'য় (১৩৩৬) প্রকাশিত হয়।

আষাঢ় হইতে আশ্বিনের প্রায় সবটাই কবি শান্তিনিকেতনে থাকেন; বিদ্যালয় পূজার জন্য বন্ধ হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ (৮ই আশ্বিন ১৩২৬)। অবকাশের পূর্বে আশ্রমের 'শারদোৎসব' নাটক অভিনীত হইল; কবি স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নামিলেন। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় এই শারদোৎসব সম্বন্ধে একটা ব্যাখ্যা লিখিয়া দেন। শারদোৎসবকে 'ঋণশোধ' নাম দিয়া বৎসরখানেক পরে প্রকাশিত করেন, তারই ভূমিকা পাই এই ব্যাখ্যানে। কবি লিখিতেছেন, "শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণশোধ করিতেছে। রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনি মনে হইল, শারদোৎ-সবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই ক্ষেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই:—প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃত শক্তি পাইয়াছে সেইটাকে বাহিরে নানারূপে নানারসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভাল করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।" * * "উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের

পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে। দুঃখই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সহিত ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুশ্রীতা।"

'ঋণশোধ' বইখানিতে গোড়ারদিকে সম্রাট বিজয়াদিত্যর সভা আছে; ভূমিকায় এখানে বলিয়াছেন যে সম্রাট চলিলেন রাজসন্ন্যাসীবেশে, সঙ্গে চলিলেন শেখর কবি। এই 'শেখর' কবিই 'কবিশেখর' রূপে 'ফাল্গুনী'তে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিশ্বভারতীর কাজ করা ছাড়া মাঝে মাঝে গান রচনা করিতেছেন। অন্য লেখার মধ্যে এখন সব থেকে বেশি ঝোঁক অনুবাদচর্চার উপর, অর্থাৎ কিভাবে ইংরেজি হইতে বাঙলায় অনুবাদ করা যায়, নূতন শব্দ সৃষ্টি করা যায় তাই লইয়া আলোচনা।

অভিনয়ের (৬ আশ্বিন) পর কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে থাকিয়া কবি কলিকাতা রওনা হইলেন (২২ আশ্বিন)। কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্বে একটি হাস্যকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কবির নিজের ভাষায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিই :—

"এসে শুনি হাওড়ার ব্রিজ খুলে দিয়েছে। নৌকায় গঙ্গা পার হ'তে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেছে—ডিঙ্গি নৌকো ঘাট থেকে তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা ক'রে তুলে নিয়ে চললো। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস ক'রে প'ড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গা মৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হ'য়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁছানো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছে ক'রে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি—ভীষ্মজননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তা'র শোধ তুললেন।"

কলিকাতা হইতে পর দিন (১০ অক্টোবর) কবি শিলং পাহাড়ে রওনা হইলেন; রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, দিনেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী কমলাদেবী সঙ্গে। পথে নানা দুর্যোগ ঘটে তার সুন্দর বর্ণনা লিখেছেন রানুকে এক পত্রে। (ভানুসিংহের পত্রাবলী পৃঃ ১০৩)।

* ভানুসিংহের পত্র পৃঃ ১০৩, আশ্বিন পূর্ণিমা (১৩২৬)

শিলংএ তাঁহারা Brooksideএ ছিলেন। সেখানে একমাস বাস করেন।

২৩ কার্তিক বিদ্যালয় খুলিল; কবি শিলং হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহার পুরাতন 'দেহালি' ভবনে উঠিলেন না। তাঁহার জন্য দুইখানি মাটির ঘর শান্তিনিকেতন উত্তরে ডাঙ্গার মাঠে নির্মিত হইয়াছিল। সেই ঘরের এখন সামান্যই চিহ্ন আছে ; যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন—সেখানে হইয়াছে কোনার্ক। তখন কবির খেয়ালে হয় মাটির বাড়ী, খড়ের চাল, দরজা হইবে চাটাই-এর—কাঠের ফ্রেমে বাঁধা। খুব একটা সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবেন—এই ইচ্ছা। দেহালিতে আড়ম্বর করিবার স্থান ছিল না, নূতন মাটির ঘরও হইল তদনুরূপ। কিন্তু পরে সেই মাটির বাড়ীর ধীরে ধীরে বদল সুরু হইল, আজ এখানে স্নানের ঘর, কাল বসিবার ঘর ইত্যাদি বাড়িতেই চলিল। আস্তে আস্তে একদিন তার খড়ের চালের বদলে কংক্রীট হইল। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে তার আশে পাশে সুরু হইল উত্তরায়ণ। কবি এক বাড়ীতে বেশিদিন থাকিতে পারেন না—তাঁহার কবিচিত্ত কিছুদিন একভাবে একস্থানে থাকিতেই হাঁপাইয়া ওঠে।

এবার পূজার পর বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হইলে কবি একটি নূতন বাণী ঘোষণা করিলেন; পূর্বে নানা জাতি ও ধর্মের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সমবায় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এবার বলিলেন 'কলাবিদ্যা' সম্বন্ধে। শিক্ষায়তনে কলাবিদ্যা—চিত্র ও সঙ্গীত—যে ছাত্রর বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের জন্য অত্যাবশ্যক একথা এদেশে তখনো স্বীকৃত হয় নাই।

"মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিষ জাতিবিশেষে যাহার তারতম্য আছে কিন্তু প্রকার ভেদ নাই। যুক্তির নিয়ম সকলদেশেই সমান; যে সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সর্বত্র এক। * * বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিতেছে তাহা সর্বত্র এক হইবেই।"

কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই আর থাকাই শ্রেয়। এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যে ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায়

এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান নাই। কলাবিদ্যা শিক্ষার বিরুদ্ধে দেশের লোকের যুক্তি যে ইহা জাতিকে দুর্বল করে। ইহা যে কত ভুল তাহাই উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন যে পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে "ললিতকলা শিক্ষা দ্বারা তাহার পৌরুষ খর্ব হইতেছে এমন প্রমাণ হয় না।" তিনি জার্মানদের সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা ও জাপানীদের চেরিফুলের ভালবাসা কথা উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন, "আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দ প্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনী-শক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়। * * যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে-জাতি কাজ করিতেও ভোলে। * * আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে ভয় করে, সৌন্দর্য্যভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে।" তাই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন, "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সঙ্কল্প হউক।" *

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সুরেন্দ্রনাথ কর বৎসর খানেক পূর্বেই আসিয়াছিলেন, নন্দলাল বসু বিশ্বভারতী আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এবার আসিলেন অসিতকুমার হালদার।

সঙ্গীতকলার জন্য দিনেন্দ্র ও ভীমরাওশাস্ত্রী ছিলেন এছাড়া বিষ্ণুপুরের রাধিকা গোঁসাই-এর ভাই নকুলেশ্বর গোঁসাই আসিলেন। এইবার সঙ্গীতকলার সহিত নৃত্যকলার আয়োজন হইল ; ত্রিপুরা হইতে দুইজন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক আশ্রমে আসিলেন ; ছাত্ররা তাঁহাদের নিকট নৃত্যের প্রথম পাঠ গ্রহণ করিল (১৩২৬ অগ্রহায়ণ)। উত্তরকালে বাঙলাদেশে নৃত্যের যে নূতন রূপ আসিল তাহার প্রথম আয়োজন এইভাবে সুরু হইল।

পূজার পর কবি 'উত্তরায়ণে' মাঠের বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় সাহিত্যের ক্লাস লইতেছেন ; হুইট্‌ম্যান, জাপানী কবিতা, ব্রাউনিং প্রভৃতি পড়াইয়া

* ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৬, বুধবার মন্দিরের উপদেশ। শা-পত্রিকা পৌষ। ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬ উপদেশ শা-পঃ ১৩২৭ বৈশাখ। ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬ পত্র শ্রীফণিভূষণ অধিকারীর স্ত্রীর ভ্রাতৃবিয়োগে পত্র। শা-পত্রিকা ১৩২৬ পৌষ।

শোনাইতেছেন। মাঝে মাঝে Personality পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। এছাড়া মন্দিরের উপদেশ দান, নূতন কবিতা ও গান রচনা, পত্রলেখন প্রভৃতি কাজ আছে। বাহিরের পত্রিকাদিতে এ সময়ে কবির লেখা খুবই কম; নূতন কিছু সৃষ্টি হইতেছে না—তাই একবার শারদোৎসব ভাঙিয়া 'ঋণশোধ' করিলেন, আবার কিছুকাল পরে 'রাজা' ভাঙিয়া 'অরূপরতন' করিলেন। তবে গান লেখেন যখনই একা থাকেন—বাহিরের উপদ্রব পৌঁছায় না, যখন গানের সুর প্রাণে লাগে।

এমন সময়ে কবি কয়েকদিনের জন্য সিলেট যান। ২০ অগ্রহায়ণ (৬ ডিসেম্বর ১৯১৯) তিনি শ্রীহট্ট কলেজ হস্টেলে ছাত্রদের আহ্বানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটির সার মর্ম শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (১৩২৬ পৌষ) প্রকাশিত হয়।

পৌষ উৎসব মহাসমারোহে হইল। রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন। ৮ই পৌষ প্রাক্তন ছাত্রদের সভা, তাহারা ডাঃ চুণীলাল বাবুকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল। উৎসবে বহু পুরাতন ছাত্র আসিয়াছিলেন। তাহাদের নিজেদের বাড়ি হইয়াছে আনন্দ উৎসব খুব জমিল। (দ্রঃ শা-পঃ ১৩২৬ ফাল্গুন)

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার কবি মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় গেলেন না, ১১ই মাঘ তিনি শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিলেন। (দ্রঃ ঐ ১১ই মাঘের উপদেশ)

এই মাঘমাসে (১৩২৬) কবি 'অরূপরতন' বইখানি লেখেন। বইখানি 'রাজা'র অভিনয় সংস্করণ; বইখানিতে ৪০টি গান আছে, অনেকগুলিই নূতন। 'রাজা'তে গান সামান্য কয়েকটি ছিল। কবি ভূমিকায় রাজার মূল কথাটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কেবল 'কথিকা'র গল্প চলিতেছে; কবির গল্প বলা চাই তাই কথার ছবি আঁকিয়া গল্প বলিতেছেন। বাঙলা ভাষায় এও একটি নূতন ষ্টাইল যা তিনি দিলেন। ইহার পর এই ষ্টাইলে অনেকে লিখিয়াছেন।

তাঁহার দিনগুলি এইসময় কি ভাবে কাটিতেছে তাহা শান্তিনিকেতন পত্রিকার সংবাদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম: "কবি এখন প্রায়ই দিনই সন্ধ্যাবেলা

ছেলেদের ঘরে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে নিত্য নূতন খেলা করেন। ভোর বেলা যায় তাঁর ক্লাস পড়াইতে, দুপুর যায় শান্তিনিকেতন পত্রিকার লেখা লেখিয়া এবং ক্লাস পড়াইয়া, সন্ধ্যাবেলা যায় ছেলেদের সঙ্গে গল্প ও খেলা করিয়া। এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও সময় আশ্রমের কাজে ঢালিয়া দিতেছেন।" (১৩২৬ চৈত্র পৃঃ ৮)।

এইবার তিন মাসের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি হইল; বিদ্যালয় ১২ চৈত্র বন্ধ হইল। নববর্ষের সময় কবি প্রায় বৎসরই আশ্রমে থাকেন। এবার তাঁহার আহ্বান আসিল গুজরাট হইতে। আমাদাবাদ হইতে মহাত্মা গান্ধী ইষ্টার ছুটিতে গুজরাট সাহিত্য পরিষদের সাম্বৎসরিক সভায় উপস্থিত থাকিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া কবি, এণ্ড্রুজ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও ক্ষিতিমোহন সেনকে সঙ্গে লইয়া (২৯ মার্চ ১৯২০) গুজরাট যাত্রা করিলেন।

৩১এ মার্চ বোম্বাই পৌঁছিয়া সেই রাত্রেই আমাদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২রা এপ্রিল গুজরাট সাহিত্য পরিষদের সভা; মধ্যাহ্নে কবি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সেই দিন রাত্রে কবি মহাত্মাজীর সাবরমতী আশ্রমে বাস করেন ও পরদিন প্রাতে (৩রা) সেখানে উপাসনা করেন। আমাদাবাদে তাঁহারা ছিলেন আম্বালাল সারাভাই-এর বাড়ীতে। সহরের বিচিত্র অনুষ্ঠানে তাঁহাকে যোগ দিতে হইতেছে; আমাদাবাদে পাঁচ দিন থাকিয়া ৬ই এপ্রিল কাথিবাড়ের অন্যতম রাজ্য ভাবনগর যাত্রা করেন; রাজা কবির সম্বর্ধনার জন্য সবিশেষ ব্যবস্থা করেন। পরদিন সন্ধ্যায় লিমডি পৌঁছান। লিমডির রাজা বিশ্বভারতীর অধ্যাপকগণের স্বাস্থ্য নিবাসের জন্য দশ হাজার টাকা দান করেন।

৮ই কবি সদলে আমাদাবাদে ফিরিয়া আসেন ও পরদিন নদিয়াদ যান; সেখানে সন্ধ্যায় বক্তৃতা ছিল। সেইদিন কবি বোম্বাই যাত্রা করিলেন, ক্ষিতিমোহন বাবু ও সন্তোষবাবু পরে তাঁহার সহিত গিয়া সুরাটে মিলিত হন। বোম্বাইতে কবি ছিলেন প্রায় আট দিন। সেখান হইতে বড়োদায় আসেন ও ১৮ হইতে ২০এ পর্যন্ত থাকেন। এখানে বিচিত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়—নারীসভা সহচরী সম্মিলন, অন্ত্যজসভা ইত্যাদি। ২১এ আসিলেন সুরাতে; সেখানে তিন দিন থাকেন ও তারপর আমাদাবাদ যান।

গুজরাট হইতে ৩ মে ১৯২০ (২০ বৈশাখ ১৩২৭) কবি কলিকাতায় ফিরিলেন। বহু দিন শান্তিনিকেতনের একঘেয়ে কাজ করিয়া কবির মন ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিল—সেকথা তিনি মুখে কবুল না করিলেও আমরা জানি এক ধরণের কাজ—তা সে যতই ভাল হউক, তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণের নেশায় পাইয়াছে—তাই চলিলেন সুদূরে। দূর—যা কিছু অপরিচিত—তাই তাঁহাকে চিরদিন আকর্ষণ করে, কিন্তু দূর যতই নিকটে আসে এবং পুরাণো-নিকট দূর হইতে থাকে, তখন আবার সেই পুরাণো-দূর মধুর হইয়া ওঠে।

১৬। য়ুরোপে

কলিকাতা হইতে কবি রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ১১ই মে ১৯২০ (২৭শে বৈশাখ ১৩২৭) য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। বোম্বাই পৌঁছিলেন দু দিন পরে। সেখানে ধনী পারসিক বোমানজির বাড়িতে একলে দুই দিন থাকিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত স্যর জমসেদজি পেটিট ও স্যর ষ্ট্যানলি রীড দেখা করিতে আসেন। রীড অমৃতসহরের অনাচার সম্বন্ধে Times of Indiaতে সমগ্র এংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু সেই যে কবির সঙ্গে পশ্চিম ভারতে গিয়াছিলেন, সেই হইতে সেখানে থাকিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইতে তাঁহার বহু পরিচিত গুজরাতি পরিবার আছে। বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তোলার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, তবে এ সময়ে বোম্বাইতে বিশেষ কিছু হয় নাই বলিয়া শুনিয়াছি।

বোম্বাইতে গিয়াই কবির মন গৃহের দিকে টানিতেছে, তিনি এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন, I feel that we are not likely to be long in Europe. কয়দিন পরে জাহাজ হইতেও লিখিতেছেন "My mind is constantly

soaring back to my own place in Santiniketan. I feel almost certain that my stay in Europe this time will be surprisingly short (Letters from Aboard. p. 1-2) কিন্তু এইবার বেশ দীর্ঘকালই য়ুরোপে কাটে।

বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িল ১৫ই মে ১৯২০। জাহাজে বেশ ভিড়—অনেক ধনী এবার সহযাত্রী, আলবারের মহারাজা, মহামান্য আগা খাঁ, স্যর করিমভাই, স্যর জমসেদজী জিজিভাই, জামসাহেব রণজিৎ সিং ইত্যাদি। আগা খাঁ কবিকে মাঝে মাঝে হাফিজ হইতে আবৃত্তি করিয়া শোনান, কবির খুব ভাল লাগে। কবি অবসর পাইলেই ডেকে বসিয়া 'শান্তিনিকেতন' উপদেশ মালা হইতে তর্জমা করেন; এই তর্জমা পরে Thought Relics নামে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁর 'ছিন্নপত্রে'র অনুবাদ যাহা Modern Review তে বাহির হইয়াছিল, সেগুলি কাটাছাটা করিতেছেন—বিলাতে গিয়া সেগুলি Glimpses of Bengal নামে প্রকাশিত হয়।

এইসব লেখার কাজ ছাড়া জাহাজে উঠিয়া তিনি পত্রধারা লিখিতেছেন। মনের মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরিতেছে; তার অনেকখানি রাজনৈতিক ব্যাপার সংক্রান্ত। জালিয়ানাবাগের অনাচার তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গবর্মেণ্ট বসাইয়াছিলেন। এই কমিটি 'হাণ্টার কমিটি' নামে পরিচিত; ইতিপূর্বে কংগ্রেস হইতেও একটি কমিটি স্বাধীনভাবে তদন্ত করে। হাণ্টার কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়াতে লোকে দেখিল যে কংগ্রেস হইতে নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট হইতে এই সরকারী রিপোর্টের অনেক তফাৎ; লোকে যেসব প্রতিকার আশা করিয়াছিল, তাহা তদনুরূপ হইল না; মোট কথা লোকের মেজাজ এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর আবার একটু উত্তেজিত হইয়াছিল। কবির মনেও যে এইসকল জাগিতেছিল তাহার আভাস সাময়িক পত্রধারা হইতে পাই। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ (২৮ মে ১৯২০) ভূমধ্যসাগর হইতে লিখিত একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"কিসের জন্য যাচ্চি সেকথাও মাঝে মাঝে ভাবি। বেড়াবার জন্যে না সে আমি জানি, আর কিসের জন্য সে আমি স্পষ্ট জানিনে। কেবল একটা কথা মনে আসে সেটি হচ্ছে এই :—মন্থনে দুধের থেকে নবনী বিচ্ছিন্ন হয়ে

আসে ; য়ুরোপে লোকসমুদ্রে যে মন্থন হয়েছে তাতে সেখানকার যাঁরা মনীষী যাঁরা ভাবুক তাঁরা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নেই। বোধহয় আজকের দিনে তাঁদের দেখ্‌তে পাওয়া সহজ। শুধু চোখে দেখ্‌তে পাওয়া নয়—আজ তাঁরা সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চিন্তা করচেন সেই চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যাবে। একথা মনে করা ভুল তাঁদের ভাবনায় ভারতবর্ষের ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। সর্বমানবের সমস্যার যাঁরা সমাধান না করবেন তাঁরা নিজের দেশের সমস্যার কোনো কিনারা করতে পারবেন না। কোনো জাতি যখন বড় রকমের দুঃখ পায়, তখন একথা বুঝতে হবে সেই দুঃখের মূলে সর্বমানবের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ আছে। স্থানীয় পলিটিক্সের ছিন্নতায় তালি লাগিয়ে এ দুঃখের প্রতিকার হতে পারবে না। আমরা দীর্ঘকাল ধরে যে দুঃখ বহন করচি তার কারণটাকে সঙ্কীর্ণ ও আকস্মিক করে দেখ্‌চি বলেই মনে ভাবচি মণ্টেগু ডাক্তারের হাতে এর ওষুধ আছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সভামঞ্চে রেজোল্যুশনের পটি লাগিয়ে ভারতের মর্মান্তিক ক্ষতগুলির আরোগ্য ঘট্‌বে।” (শান্তিনিকেতন পত্রিকা ২য় বর্ষ, ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ৯৬)।

অধিকাংশ যাত্রী মার্সাই বন্দরে নামিয়া গেলেন কবি জাহাজে থাকিলেন ; জিবরালটার ঘুরিয়া জাহাজ চলিল।

৫ই জুন ১৯২০ প্লিমউথে জাহাজ ভিড়িল। পিয়ার্সনকে রথীন্দ্রনাথ পূর্বে কেব্‌ল্‌ করিয়াছিলেন, তিনি জাহাজঘাটে আসিয়াছেন। পিয়ার্সনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হইল প্রায় তিন বৎসর পরে। আমেরিকা হইতে ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ফিরিয়া আসিয়া পিয়ার্সন জাপানে থাকিয়া যান ; তারপর ১৯১৮ সালের মে মাসে তাঁকে পেকিঙে বন্দী করিয়া বিলাতে চালান দেওয়া হয় ও সেখানে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয় অর্থাৎ ইংলণ্ডের বাহিরে যাইতে পারিবেন না এই শাস্তি হয়।

লণ্ডন পৌঁছাইলে রোদেনষ্টাইন আসিয়া তাঁহাদের সমাদর করিয়া কেনসিঙটন প্যালেস মানশন নামে একটি ভাল হোটেলে লইয়া গেলেন। পিয়ার্সন কবির সেক্রেটারীরূপে থাকিয়া গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন এ সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেলে অভ্যাগত আগন্তুক দর্শক, বন্ধুরা দলে দলে আসিতে লাগিলেন। ১৭ই জুন কবি লিখিতেছেন “The

fury of social engagements is on me"। এবার কিন্তু কবির বন্ধু-বান্ধবরা খুব যে আত্মীয়তা দেখাইতেছেন তাহা নয়। তার কারণ আমাদের অবিদিত নাই ; এক বৎসর পূর্বে তিনি সম্রাটের প্রদত্ত নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করায় বিলাতে বেশ একটু শোরগোল পড়িয়াছিল। রাজকীয় সম্মান প্রত্যাখ্যান করা তাঁহাদের চক্ষে একটা বড় রকমের অপরাধ।

লণ্ডনে পৌঁছিবার পরদিন রোদেনষ্টাইন আসিলেন দেখা করিতে ; কথাবার্তা সুরু হইল, আলোচনার বিষয়—আর্টিষ্ট ও লেখকশ্রেণীর মনীষীরা গবর্মেণ্টের দুর্বলতা, তাহার শোষণনীতি ও লোভের কথা জানিয়াও তাহার সহিত সহযোগিতা করিবে কি না। বোধহয় তর্কটা সুরু হয় কবির নাইটহুড ত্যাগ লইয়া। রোদেনষ্টাইন সহযোগিতার পক্ষপাতী ; কিন্তু কবি বলিলেন যে আর্টিষ্টদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই একমাত্র কাম্য ; কোনো বিশেষ মতের দাসত্ব করা তাহাদের মানসিক উন্নতির অন্তরায় সুতরাং কোনো একটা আইডিয়াকে সমর্থন করিতেই হইবে এরূপ তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

রোদেনষ্টাইন কথাটা অন্যভাবে ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংযমের মধ্যে আর্টিষ্টদের ব্যক্তিত্বর বিকাশ পায়, কারণ তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে আর্টের বিষয় বস্তুর জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না ; মধ্য যুগের ইতালীয় শিল্পীরা ধর্মের প্রেরণায় শিল্পসৃষ্টি করিয়াছিল। বর্তমানে স্বাধীনতার ফল যে ভাল হয় নাই তাহার প্রমাণ ফ্যাচারিষ্ট প্রভৃতি নানা আর্টিষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

রোদেনষ্টাইনের বাড়ীতে কবি প্রায়ই যাইতেন, সেখানে বিখ্যাত পর্যটক ও জীবজন্তু প্রেমিক হাডসন, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থকর্তা ফক্স-ষ্ট্রাংওয়েজ, কানিংহাম-গ্রেহাম প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইত। একদিন কবির নিকট সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মিঃ রোএরিখ্ ও তাঁহার দুই পুত্রকে পরিচিত করিবার জন্য আনিলেন (১৭ জুন)। তখন রোএরিখ্-এর নাম কেহ জানে না। তাঁহাদের ছবি দেখিয়া কবি খুবই মুগ্ধ হইলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিতেছেন, "ইঁহাদের কৌলিক সরলতা ও স্বাভাবিক ব্যবহারনীতি খুবই চিত্তাকর্ষক * * * পিতা ইঁহাদের কয়েকখানি ছবি বোলপুরে পাঠাইতে চান ; নন্দলাল বাবুরা খুশী হইবেন।"

১৯ জুন রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড গেলেন, সঙ্গে ছিলেন কেদার দাশগুপ্ত; সেখানে ছাত্রদের কাছে Message of the Forest নামে প্রবন্ধটি পড়িলেন। কথা ছিল রাজকবি বরার্ট ব্রিজেস এই সভায় সভাপতি হইবেন; কিন্তু শেষকালে তিনি অস্বীকৃত হইলেন; ইহার কারণ সকলেই বুঝিতে পারিল। রবীন্দ্রনাথ 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করায় ইংরেজদের সমাজে অপাংক্তেয় হইয়াছেন। অক্সফোর্ডে তাঁহার সহিত কর্ণেল লরেন্সের দেখা হয়; এই লরেন্স যুদ্ধের সময় আরবদের মধ্যে যেসব কাজ করেন তাহা ইতিহাস-বিখ্যাত হইয়াছে। এই ইংরেজ যুবকের সহিত কথাবার্তা বলিয়া কবির খুব ভাল লাগিয়াছিল। কথায় কথায় তিনি কবিকে বলেন যে তিনি আরবদের মধ্যে আর মুখ দেখাইতে পারিবেন না, কারণ তাহাদের প্রতি ব্যবহার আদৌ ভাল হয় নাই। তিনি আরবদের যেভাবে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা কাজে পরিণত হয় নাই।

অক্সফোর্ডে একদিন থাকিয়াই ফিরিয়া আসেন, বুঝিলেন অনেক পুরাতন বন্ধুই এখন বিমুখ। কয়েকদিনের জন্য রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীকে লইয়া কেমব্রিজে গেলেন। সেখানে আণ্ডারসন, লৌস্ ডিকিসসন ও কেইনিস-এর সহিত দেখা হয়।

২৪জুন কেদার দাশগুপ্তের ইসট এনড ওএসট সোসাইটির উদ্যোগে কাক্সটন হলে একটি সভায় কবির সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। মণ্টেগুর ভূতপূর্ব্ব আণ্ডার-সেক্রেটারী চার্লস রবার্ট সভাপতি হন—ইনি মণ্টেগুর সঙ্গে ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। Miss Tubbs কবির চারিটি ইংরেজি গান গাহিলেন; এই উৎসবের জন্য বিনিয়ন (Laurence Biniyon) রচিত একটি কবিতা বিখ্যাত গায়িকা Sybil Thorndyke গান করিলেন। কবি যথোপযুক্ত উত্তর দান করেন। (শান্তিনিকেতন পত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩২৭, শ্রাবণ, পৃঃ ৩-৪)

স্যর ভূপেন্দ্রনাথ বসু তখন বিলাতে; তিনি সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া ভারতের রাজনৈতিক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি কথাগুলি এমন আন্তরিকতার সহিত বলিয়াছিলেন যে, এই বিশেষ অনুষ্ঠান সময়েও সেটি অসঙ্গত শোনায় নাই। সভায় আলবার, ঝালবার, আর্নেষ্ট রিহস, গিলবার্ট মারে, বিনিয়ন্, স্যর কে. জি, গুপ্ত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন 'শেকসপীয়ার হাটে' Y. M. C. A. কবির এক বক্তৃতা ব্যবস্থা করেন ; বিষয় ছিল The Centre of India Culture। এই সভার পূর্বে চার্লস্ রবার্ট প্রদত্ত একটি লাঞ্চপার্টিতে কবির সঙ্গে লর্ড সিসিল-এর দেখা হয়। কবি তাঁহাকে একান্তে পাইয়া ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিলেন ; এই আলোচনার কারণ এই সময়ে পার্লামেণ্টে 'হাণ্টার কমিটি'র প্রতিবেদন সম্বন্ধে আলোচনা হইবে বলিয়া কথা চলিতেছিল। সিসিল বলিলেন যে তিনি ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তবে ইংরেজ ভারতে স্বল্পসংখ্যক, সুতরাং তাহাদের নিরাপদ জীবনের জন্য আমাদের হস্তে যে কোন শক্তি আছে তাহা প্রয়োগ করা উচিত। কবি জবাবে বলেন যে সংখ্যা-লঘিষ্টতার জন্য যদি এমনসব অনাচার সংঘটিত হয়, তবে ভবিষ্যতে উভয় জাতির মধ্যে মিলনের পথ ভয়াবহ। সিসিল কবির সঙ্গে তর্ক করিলেন না। কবির যাহা বলিবার তিনি বলিয়া গেলে তিনি চলিয়া গেলেন।

গিলবার্ট মারে (G. Murray) ভারতের দুরবস্থার কথা শুনিয়া কবিকে বলেন যে, তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কবি বলেন ইংলণ্ডের মনীষীরা—যাঁহারা মনে করেন ভারতবাসীদের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে তাঁহারা একখানি প্রতিবাদ লিখিয়া প্রেরণ করুন।

জুনমাসের শেষ দিকে কবি পিয়ার্সনকে লইয়া পিটার্সফিলড নামক স্থানে বেড়াইতে যান : ৫ই জুলাই ফিরিয়া আসিলেন। সামাজিক সভা ও ভোজের অন্ত নাই। ৯ই জুলাই রোদেনষ্টাইন একটি পার্টি দেন ; সেখানে দিলীপ রায় ছিলেন, গান করেন ; কবিও গান করিলেন ; একটি হাঙগেরিয়ান মেয়ে খুব ভাল বেহালা বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিল। য়েটসের সঙ্গে এইবার এইখানে প্রথম দেখা হইল। বোমানজির সঙ্গেও সকলের পরিচয় হইল। তার পূর্বের সন্ধ্যায় পার্লামেণ্টে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট লইয়া আলোচনা হইয়া গিয়াছে ; তাঁহার মন খুব উত্তেজিত। হাউস্ অব কমন্সে মণ্টেগুর বিরুদ্ধে মনোভাব খুব তীব্র। ভারতের প্রতি মণ্টেগুর সহানুভূতি আছে এইটা কেহ বরদস্ত করিতে পারিতেছে না। কবি মণ্টেগুকে চিঠিতে তাঁহার ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দিয়া লেখেন।

লণ্ডনে আসিয়াই রবীন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়া অফিসে গিয়া মণ্টেগু ও লর্ড সিংহের

সহিত সাক্ষাৎ করেন ও মণ্টেগুকে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন। তিনি বলেন ভারতবাসী জেনারেল ডায়রকে শাস্তি দিবার জন্ম উদ্‌গ্রীব নহে, তাহারা জানিতে চায় যে বৃটিশ নেশন এই কাজটি নীতিবিগর্হিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন। যন্ত্রচালিত গবর্মেণ্টের ব্যবহারে ভারতীয়রা পীড়িত। মণ্টেগু বলেন যে তিনি একা কিছু করিতে বা বলিতে অক্ষম, তবে এই পর্যন্ত তিনি আশ্বাস দিতে পারেন যে ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ নিদারুণ ঘটনা না ঘটে তাঁহার জন্য যেসব আভ্যন্তরিণ ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা তিনি করিবেন। (Diary June 17, 1920)

কয়দিন পরে লর্ড সিংহ ও স্যর কে, জি, গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসেন ; কথা প্রসঙ্গে স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন যে পার্লামেণ্টের আলোচনায় পাঞ্জাবের কোনো সুরাহার আশা নাই। কবির মত এবং সে মতে লর্ড সিংহ সায় দিয়া বলিলেন যে পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল এবং লোকে যেভাবে অপমান সহ্য করিয়াছিল, তাহা বাঙলায় কখনো সম্ভব হইত না। বাঙলায় প্রতিবাদ হইতই। ভারতবর্ষে কিছুকাল হইতে জালিয়ানাবাগে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাব চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সাময়িক 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় এসম্বন্ধে যে-মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের মত জানি বলিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পাঞ্জাবের যে অমানুষিক অত্যাচার ঘটিয়াছে তাহার বিচার চলিতেছে। আমরা রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে সে-সম্বন্ধে কোনো কথা বলিব না। আমরা শাসনকর্তাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। ধর্মনীতির দিক হইতে এই ব্যাপারের বিচারকালে আমাদের স্বদেশীয়দের চরিত্র আলোচনা করাই কর্তব্য। যে ঘটনা কেবলমাত্র দুঃখকর তাহার দ্বারা কাহারও অবমাননা হয় না; কিন্তু মানুষের প্রতি পশুর মত আচরণ করা সম্ভবপর হইলে সেই লজ্জা দুঃখকে ছাড়াইয়া উঠে। পাঞ্জাবের ব্যাপারে আমাদের পক্ষে সেই লজ্জার কারণ ঘটিয়াছে। ইহাই বুঝিতেছি যে আমাদের চরিত্রের এমন গভীরতর হীনতা ঘটিয়াছে যে আমাদের প্রতি শুদ্ধমাত্র দুঃখ প্রয়োগ করা নহে আমাদের মনুষ্যত্বের অসম্মান করা সহজসাধ্য হইয়াছে, ইহা আমাদের নিজেদের আন্তরিক দুর্গতির কারণ।

"'পীড়ন যতই কঠিন হউক সহিব, কিন্তু আত্মাবমাননা কিছুতেই সহিব না'—পাঞ্জাবে এইরূপ পৌরুষের বাণী শুনিবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন তাহা শুনিলাম না, তখন সর্বাগ্রে আপনাদিগকেই ধিক্কার দিতে হইবে। এই কারণেই আমরা বলি কোনও চিহ্নের দ্বারা পাঞ্জাবের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করা আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে। বীরত্বই স্মরণের বিষয়, কাপুরুষতা নৈব নৈব চ। নিরস্ত্র নিঃসহায়ের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষতা, সেই অত্যাচার দীনভাবে বহন করাও কাপুরুষতা, কেননা কর্তব্যের গৌরবে বুক পাতিয়া অস্ত্র গ্রহণ করায়, মাথা তুলিয়া দুঃখ স্বীকার করায় পরাভব নাই। যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোনও পক্ষেই বীর্যের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না সেখানে কোন কথাটা সমারোহপূর্বক স্মরণ করিয়া রাখিব? আমাদের রাজ-পুরুষেরা কানপুরে ও কলিকাতায় দুষ্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদেরই অনুকরণ করিব? এই অনুকরণ চেষ্টাতেই কি আমাদের যথার্থ পরাভব নাই।" (২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ৬৫—৬৬)।

যাক্—বিলাতে এই সব আলোচনা লর্ডসিংহ প্রভৃতির সহিত চলিত। অমৃতসহরের ব্যাপার লইয়া তাঁহার মন যে খুবই নাড়া দিয়াছিল তাহা ২২ জুলাই এণ্ড্রুজকে লিখিত এক পত্র হইতে খুব স্পষ্ট জানা যায়। বিলাতের পার্লামেন্টে এই বিষয় আলোচনা এমনভাবে হইল যাহাতে রবীন্দ্রনাথের মনে শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিল না; তিনি এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন, "It shows that no outrage, however monostrous, committed against us by agents of this Government, can arouse feelings of indignation in the hearts of those from whom our Governors are chosen.........the late events have conclusively proved that our true salvation was in our own hands; that a nation's greatness can never find its foundation in halfhearted concessions of contemptuous niggardliness". (Letters to a Friend July 22, 1920).

বিলাতে তখন অনেক ভারতীয় ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলে মিলিয়া প্রধানমন্ত্রী লয়েড্ জর্জকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের

মনে তখন সব থেকে যে কথাটি জাগিতেছিল সেইটি ব্যক্ত হইয়াছে—পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন। অমৃতসহরে দুর্ঘটনার পর এই এক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে মনোভাব ক্রমশই অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করিতেছিল, তাহা যে-কোনো দেশের পক্ষেই মঙ্গলকর নহে—সেই কথা তাঁহারা এই পত্রে ব্যক্ত করেন। এই সময়ে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের কার্যকাল শেষ হইয়া আসিতেছিল এবং নূতন বড়লাট নিয়োগ লইয়া অনেক গবেষণা চলিতেছিল ; এই পত্র শেষে পত্রলেখকগণ মণ্টেগুর নাম লাটপদের উপযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের মণ্টেগু সম্বন্ধে যে-একটু দুর্বলতা ছিল তাহা আমরা জানিতে পারি। পার্লামেণ্টে হাণ্টার কমিটির রিপোর্টের প্রতি-আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ মণ্টেগুকে একখানি পত্র লেখেন। বোমান্‌জী তখনই বলেন যে ভারতবর্ষে এখানকার তর্ক বিতর্কের আসল ব্যাপারটা লোকে ঠিক বুঝিবে না। (দ্রঃ রথীন্দ্রনাথের ডায়েরী)। ফলে ঠিক হইলও তাই। মডার্ণ রিভিউতে (Sep. 1920 পৃঃ ৩৩৮) এই পত্রখানি প্রকাশিত হয় ; সম্পাদক মন্তব্য করেন। সেপ্টেম্বরের স্পেশাল কংগ্রেসে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের এই ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করেন। (The Servant, Sep. 1920) তাঁহাদের আশঙ্কা ঠিকই হইয়াছিল।

১০ জুলাই ১৯২০ (২৬ আষাঢ় ১৩২৭) রবীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবী ও পিয়ার্সনের সহিত ব্রিষ্টলে যান। সেখানে প্রফেসর লিওনার্ড তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করেন,এই অধ্যাপক সস্ত্রীক কিছুদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। সেখানে Cliftonএর বোর্ডিং-স্কুলের ছাত্রীরা কবির 'রাজা' নাট্যের ইংরেজি তর্জমাখানি অভিনয় করে। অভিনয়ের পর কবি কতকগুলি কবিতা পাঠ করিয়া শোনান। (সবিশেষ বিবরণ, দ্রষ্টব্য শান্তিনিকেতন পত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩২৭ শ্রাবণ, আশ্রম সংবাদ পৃঃ ৫)।

সেইদিন বৈকালে কবি ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি মন্দির দেখিতে যান।

ব্রিষ্টল হইতে ফিরিয়া আসিলে পূর্বোলিখিত বেহালাবাদিকা হাঙগেরিয়ান্ মেয়েটি কবিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মেয়েটি বলিয়াছিলেন যে তাঁর জীবনের

বড় একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল কবিকে বেহালা শোনান। তাঁর বেহালা শুনিয়া কবিও খুব প্রীত হন এবং তাঁর মধ্যবর্তিতায় কবির সহিত অনেক সঙ্গীতাচার্যের পরিচয় হয়। য়ুরোপীয় সঙ্গীত ভাল করিয়া শুনিবার সুযোগ তিনি পাইলেন।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত আয়ার্লণ্ডের কর্মীশ্রেষ্ঠ স্যর হোরেস্ প্লাঙ্কেট্-এর সাক্ষাৎ হয়। স্যর হোরেস্ বহুকাল হইতে আয়র্লণ্ডের পল্লীসংস্কার কার্যে ব্রতী; তিনি আদর্শবাদীও বটে, কর্মীও বটে। তিনি কবিকে বলেন 'আমরা প্রথম প্রথম আয়র্লণ্ডে অনেক ভুল করিয়াছি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি ব্যর্থতাই আমাদিগকে নূতন অভিজ্ঞতা দান করিয়াছিল।' এই মনীষী ও কর্মীর সহিত কবির সাক্ষাৎকার হওয়ায় পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার কর্ম ইচ্ছা বিশেষভাবে শক্তিলাভ করিল।

এদিকে ইংলণ্ডের মানসিক আব্‌হাওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত রুদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে; তাই ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া য়ুরোপের অন্য কোনো দেশে যাইবার জন্য মতলব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিতে পাই। কবি বিদেশ যাইবেন এই কথা রাষ্ট্র হইলে একটি মহিলা তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলেন যে তিনি য়ুরোপের বহুভাষা জানেন, কবির তিনি একজন মহা ভক্ত ও য়ুরোপে ভ্রমণকালে কবির সেক্রেটারীর কাজ করিতে তিনি ইচ্ছুক। কবি মহিলাটির শক্তি ও প্রতিভা দেখিয়া প্রথমে খুবই আশ্চর্যান্বিত হন। রবীন্দ্রনাথ সুইডেনে যাইবার মতলব করিতেছিলেন ও এই মহিলাটি নিজেকে সুইড বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই সকলের সন্দেহ হইল যে মহিলাটি একজন 'স্পাই'। ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই কবি সুইডেন যাওয়ার মতলব ছাড়িয়া দিলেন। পরে জানা যায় এই মহিলা যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে আসেন জার্মানদের চর হইয়া; ধরা পড়িয়া কয়েদ খাটেন; পরে বৃটীশ পক্ষের চরের কাজে নিযুক্ত হন ও যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে আসেন।

জুলাই মাসের শেষটা 'কোথায় যাইবেন' সেই মতলব করিতে করিতে কাটিয়া গেল। স্কান্দানেভিয়াতে যাওয়ার জন্য ষ্টীমারের টিকিট পর্যন্ত কেনা হইয়াছিল—

১লা আগষ্ট পর্যন্ত সেখানেই যাওয়াই ঠিক ছিল ; ইতিমধ্যে সেই মহিলাটি সম্বন্ধে সকল কথা জানা গেলে সব প্লান বদলাইয়া দিলেন। ৪ঠা আগষ্ট এণ্ড্রুজকে এই সংবাদ দিয়া পত্র দিতেছেন—"I am sure you are ready to ascribe this to the inconsistancy of my mind." কিন্তু আসল কথা সেই উপদ্রবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য। পিয়ার্সন ইংলণ্ডে থাকিলেন ; রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স যাত্রা করিলেন।

১৭। ফ্রান্সে ও হল্যাণ্ডে

সেখানে গিয়া এণ্ড্রুজকে লিখিলেন,—"Your Parliament debates about Dyerism in the Punjab and other symptoms of the arrogant spirit of contempt and callousness about India have deeply aggrieved me and it was with a feeling of relief that I left England." (Letters from Abroad, p 4).

৬ই আগষ্ট ১৯২০ কবি প্যারী পৌঁছিলেন। প্যারী সহর অপরিচিত ; দিল্লি সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্রের পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমার তখন ফ্রান্সে। তিনি ইঁহাদের খুব সাহায্য করেন। প্যারীতে তখন ছুটি ; বিশিষ্ট লোকেরা সবই নগরী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন শুনিয়া প্যারীর বিখ্যাত ধনী M. Kahn কবিকে তাঁহার Autour du Monde এ থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা ৮ই আগষ্ট (২৩ শ্রাবণ ১৩২৭) প্যারীর সহরতল্লীতে কাহ্ন-এর অতিথিশালায় যান। এই কাহ্ন সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা দরকার, কারণ এই লোকটি কবিকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন ও বিশেষ সমাদরে তাঁহাকে

রাখিয়াছিলেন। সাময়িক একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"পারিসে Autour du Monde বলে একটা সমিতি আছে। গুরুদেব এসেছেন খবর পেতেই তার কর্তারা সমিতির বাড়িতে এসে থাকবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। এই সমিতি ব্যাপারটা সবটাই M. Kahn নামে একটি ভদ্রলোকের মাথা থেকে বেরিয়েছে এবং তাঁর টাকায় চলছে। কতকটা যেন 'বিচিত্রা'। এই লোকটি প্রায় চল্লিশ বছর আগে ৩০৲ টাকা মাইনের একটি চাকরী নিয়ে পারিসে এসেছিলেন। তার থেকে এখন তিনি এখনকার প্রধান ক্রোড়পতি।* এদেশে এঁর মত ধনী আর বোধ হয় কেউ নেই। তিনি অবিবাহিত, নিরামিষাসী ; অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও নিজে এক ছেঁড়া কাপড় পরে, একটি ছোট্ট বাড়িতে নেহাৎ গরীবের মত থাকেন। নিজের সম্বন্ধে এত মিতব্যয়ী, কিন্তু তাঁর দানের সীমা নেই। * * তিনি নিজে একটি ছোট বাড়ীতে থাকেন, কিন্তু আশে পাশে প্রায় দশ পনেরটা বাড়ী সবগুলি তাঁর। তার প্রত্যেকটিতে একটি না একটি প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের যে বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন সেটা একটা ক্লাবের মত, তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাকে দেশবিদেশের লোকদের একটা মিলনক্ষেত্র করা। * *, অতিথিসেবার ব্যবস্থা খুব ভাল, পশ্চিমে এরকম দেখা যায় না। যা হোক এই বাড়ীতে যে দেশবিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে থাকতে পারেন এবং মিশতে পারেন কেবল তাহাই নয়, Autour du Monde এর উদ্দেশ্য ও কর্মণ্যতা আরো বিস্তৃত। প্রত্যেক দেশ থেকে দুজন চারজন করে লোককে তাঁরা টাকা দিয়ে এক বছরের জন্য পৃথিবী ঘুরতে পাঠিয়ে দেন। * * Lowes Dickinson এই বৃত্তি নিয়ে ভারতবর্ষ, চীন জাপান প্রভৃতি দেশ গিয়েছিলেন।" (শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৭ ভাদ্র)।

কাহ্‌ন জাতিতে ইহুদি ; কিন্তু কোনো ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্বেষ নাই, নিজে যুক্তি-বাদী। পৃথিবীর খবর তাঁর কর্ম্মচারীরা index করে রাখেন ; চিন্তাজগতের, অর্থজগতের, রাজনীতিক ক্ষেত্রের সমস্ত খবর তাঁহার নিযুক্ত পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন

* ১৯৩৫ সালে শুনিলাম মিঃ কাহ্‌ন দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন !

করিতেছেন, গ্রথিত করিতেছেন ও নানা বুলেটিনে প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার বিপুল অর্থের ইহাই ব্যবহার।

কবি বেশ আরামেই আছেন, লণ্ডনের গোলমাল বৃষ্টি বাদল নাই; বাড়ীর পিছনে প্রকাণ্ড বাগান, "তার কোথাও কৃত্রিম পাহাড় পর্বতের দেশ—পাইনের জঙ্গল, কোথাও উপত্যকার মধ্যে নীচু জলা জমি—পদ্মপুকুর, কোথাও কৃত্রিম চীন জাপানী মুলুক—ছোট ছোট ঝরণা, বাঁকাচোরা গাছপালা, আবার কোথাও ফরাসী ফল-বাগিচা।" এই সৌন্দর্যের মধ্যে কবি আনন্দে আছেন।

ক্রমে প্যারী হইতে দুই এক জন লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন; তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি। লেভি সাহেব ছিলেন ভারতীয় ভাষা ও ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ; সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতী, মধ্যএসিয়ার লুপ্ত ভাষা হইতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা তাঁহাকে অমর করিয়াছে।

লেভির সহিত পরিচয় হওয়ায় কবির যে খুবই ভাল লাগিয়াছিল তাহা তাঁহার একখানি পত্র হইতে জানিতে পারি। "He is a great scholar, but his philology has not been able to wither his soul. His mind has the translucent simplicity of greatness and his heart is overflowing with trustful generosity which never acknowledges disillusionment. His students come to love the subject he teaches them, because they love him. I realise clearly when I meet these great teachers that only through the medium of personality can truth be communicated to men. This fundamental principle of education we must realise in Santiniketan." (Letters from Abroad 1924, p. 13).

Autour du Monde-এ আসিবার দুই দিন পরে কবির সহিত অধ্যাপক Le Brun সাক্ষাৎ করিতে আসেন; ইনি কবির 'গার্ডনার' কবিতাগুচ্ছ ফরাশী কবিতায় অনুবাদ করেন। সঙ্গে তাঁহার নব পরিণীতা স্ত্রী ছিলেন; অধ্যাপক গল্প করেন যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনাকালে তাঁহাদের প্রণয় হয়।

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি কাহ্‌ন তাঁহার অতিথিদের লইয়া মোটরযোগে ফ্রান্সের উত্তরের যুদ্ধক্ষেত্র দেখাইতে লইয়া যান ; রথীন্দ্রনাথ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন যে সমস্ত দিনই প্রায় তাঁরা মোটরে চলিয়াছেন, কোথায়ও প্রাণের চিহ্ন নাই—গাছপালা কঙ্কালের ন্যায় খাড়া আছে—বাড়ী ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত, জন-মানব নাই বলিলেই চলে, চারিদিকে গভীর ট্রেঞ্চ্ বা খদ ! এ দৃশ্য দেখিয়া রাত্রে তাঁহারা ফিরিলেন ; কবির রাত্রে ভাল ঘুম হইল না—মানুষ কি বীভৎস কাণ্ড করিতে পারে ইহার চাক্ষুস জ্ঞান তাঁর হইল।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবার পর দিন (১৯ আগষ্ট) কাহ্‌ন বের্গ্‌সঁ (Bergson) -কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। বের্গ্‌সঁ ইংরেজি বলিতে পারেন, সুতরাং কবির সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্তা হইল। সুধীর রুদ্র উপস্থিত ছিলেন, উভয়ের কথোপকথনের সারমর্ম তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (Mod. Rev.1921 Jan p 28)। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্তা দীর্ঘকাল ধরিয়া হয় নাই ; তবুও বের্গসঁ কবির অনেক তত্ত্ব স্বীকার করেন বলিলেন ; তবে তিনি বলিলেন যে য়ুরোপীয় মন বেশী precise, আর ভারতীয় মন বেশী intuitive। তাহার কারণও তিনি দর্শাইলেন : তিনি বলিলেন যে য়ুরোপীয়কে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়া তাহাকে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে অত্যধিক জ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। বস্তুজগতের প্রতি অত্যন্ত মনঃসংযোগ প্রয়োজন, সেইজন্য precisionএর উদ্ভব। "কিন্তু আপনি আপনার Sadhana ও Personality গ্রন্থদ্বয়ে যে তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রকৃত intuition হইতে ; এইদিকে ভারতীয়দের মনীষা বিশেষভাবে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে।"

Autour du Mondeএ ৮ই হইতে ২৫এ আগষ্ট পর্যন্ত থাকিয়া কবি দক্ষিণ ফ্রান্সে সপ্তাহ খানেকের জন্য বেড়াইতে যান। দক্ষিণ ফ্রান্স সম্বন্ধে তাঁহার একটা মহা আকর্ষণ আছে—ঠাট্টা করিয়া কতবার বলিয়াছেন 'সেখানে গিয়া বাস করিব।' তিনি এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন, "এখানকার দৃশ্য অতি মনোরম ; কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য এখন তাঁহার কি কাজে লাগিবে যাহার কাপড় চোপড়ে সমস্ত বাকস পথে হারাইয়া গিয়াছে।" ব্যাপারটা এই—ভুলক্রমে তাঁহাদের মালপত্র অন্য গাড়ীতে উঠিয়া যায়—পরে সে সব পান। পত্রখানি কৌতুকে পূর্ণ।

প্যারীতে যে কয়জন লোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাদের

সহিত কথাবার্তা কহিয়া কবি তৃপ্ত। কিন্তু য়ুনিভার্সিটি বা পাবলিক তাঁহাকে কোন অভ্যর্থনা করে নাই; লেভি প্রভৃতির উদ্যোগে ম্যুজে গিমে (Musee Guimet) তে একটা ভোজ হয়: সেটা এমন কিছু নয়; ফরাসীদের এই ঠাণ্ডা ভাবের একটা কারণ ছিল; তাহারা রবীন্দ্রনাথের Nationalism বইখানিকে আদৌ পছন্দ করিতে পারে নাই। বইখানি তখনো ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয় নাই। তবে বইখানির অংশবিশেষের টাইপকরা সাধারণ লোকের মধ্যে কপি তর্জমা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এমনকি যুদ্ধের ট্রেঞ্চেও ফরাসী সৈন্যরা এইরূপ টাইপ কপি পাঠ করিত। ফরাসী গবর্মেণ্ট সেসব কথা নিশ্চয়ই জানিতেন, তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহাদের উৎসাহ প্রথমটা প্রকাশ পাইল না। কবি আর্দানিশ হইতে লিখিতেছেন (২৮ আগষ্ট ১৯২০) "এখানকার যেসব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করচেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েচে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তিলাভ করে। কেননা মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র।" (শান্তিনিকেতন-পত্রিকা ১৩২৭, ২য় বর্ষ আশ্বিন পৃঃ ৩৫৬)।

এইখানে বসিয়া তিনি The Meeting of the East and the West প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন; হল্যাণ্ড হইতে তাঁহার বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে তাহার জন্য লিখিতেছেন।

কবি দেশে থাকিতে খবরের কাগজ খুব মন দিয়া পড়েন না; মোটামুটি ভাবে খবরগুলি সংগ্রহ করেন। কিন্তু বিদেশে দেশের খবর সম্বন্ধে তাঁহার মন সর্বদাই জাগ্রত থাকে। দেশে এই সময়ে নন্-কো-অপরেশন আন্দোলন সুরু হইয়াছে।

জালিয়ানালাবাগের ঘটনা ঘটে ১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসে। তাহার পর বৎসর গান্ধীজি 'জালিয়ানালাবাগ দিবস'কে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে যতদিন সেই অপমানের ব্যবস্থা না হইবে ততদিন তিনি গবর্মেণ্টের সহিত অসহযোগ করিবেন, অর্থাৎ চাকুরেরা সরকারী কাজ ছাড়িবে, উকীলেরা কাছারী ত্যাগ করিবে, ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়া 'জাতীয়' বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পড়িবে। সে-সম্বন্ধে সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই; জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পাঠকমাত্রেই সেসব কথা জানেন।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির এই নেতি কর্ম পছন্দ করিলেন না। তিনি দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৭ সেপ্টেম্বর এণ্ড্রুজকে যে পত্র লিখিতেছেন তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি রবীন্দ্রনাথ বিলাতে আসিয়া যে ভাবে এই রাজনৈতিক ব্যাপারকে দেখিতেছিলেন, এখন তাহাকে অন্য দিক হইতে দেখিতেছেন; Let us forget the Punjab affairs—but never forget that we shall go on deserving such humiliation over and over again until we set our house in order.

"অপমান ও অন্যায়ের জ্বালায় জ্বলিয়া আমরা য়ুরোপকে তাহা ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছি; কিন্তু তাহা করিতে গিয়া আমরা আপনাকেই ক্ষুদ্র করিতেছি। আমরা যেন আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলি, কলহ বা জব্দ করিবার প্রবৃত্তি হইতে ক্ষুদ্রতার দ্বারা ক্ষুদ্রতার জবাব না দিই। আমাদের চরম নৈতিক প্রতিবাদ যখন স্বাভাবিকভাবে অসহযোগ আকারে দেখা দিবে, তখন ইহা মহিমা মণ্ডিত হইবে, তখন ইহা সত্য হইবে; কিন্তু ইহা যখন ভিক্ষারই রূপান্তর তখন ইহা বর্জনীয়।"

মহাত্মা গান্ধী এইভাবে রাজনীতির ব্যর্থতার মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিতেছেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "It is criminal to turn moral force into a blind force." (Letters from Abroad. p 17).

দেশের মধ্যে তখন যে তপ্ত হাওয়া বহিতেছিল, তাহা হইতে কবি দূরে ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার পক্ষে আন্দোলনের একটা ব্যাপক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছিল। দেশের মধ্যে উত্তেজনার অন্ত ছিল না। বিশেষভাবে এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া খুবই জোর পাইয়াছিল; পরাভূত তুর্কীর সহিত যে-সন্ধি য়ুরোপের হয় তাহাতে ভারতীয় মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট হন; গান্ধীজি মুসলমানদের সহিত সহানুভূতি দেখাইবার জন্য এইরূপ একটা পরদেশিক (extra-territorial) ব্যাপারের সহিত নিজের অসহযোগ আন্দোলন জুড়িয়া দিলেন। এ ছাড়া সম্মুখে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রবর্তিত নূতন রাষ্ট্রকাঠামো অনুসারে কাউন্সিল বসিবার সময় আসিতেছে। মহাত্মাজী কাউন্সিলের সহিত অসহযোগ ঘোষণা করিলেন। মোট কথা এই সময়ে

রাজনৈতিক আব্‌হাওয়ায় উত্তেজনার অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ হইতে যখন যেরূপ সংবাদ পাইতেছেন তাহারই জবাব এণ্ড্রুজকে লিখিয়া জানাইতেছেন।

একখানি পত্রে এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন, "Let Mahatma Gandhi * * send his call for positive service, ask for homage in sacrifice which has its end in love and creation. I shall be willing to sit at his feet and do his bidding, if he commands me to co-operate with my countrymen in service of love. I refuse to waste my manhood in lighting the fire of anger and spreading it from house to house" (18 Sept 1920, Paris).

রবীন্দ্রনাথ দেশের কাজ বলিতে যে সক্রিয়কর্ম বুঝিতেন তাহা বহু বৎসর পূর্বে স্বদেশীযুগে খুবই পরিষ্কারভাবে দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন। তিনি এণ্ড্রুজকে সেই প্রবন্ধগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করাইয়া ছাপিবার জন্য বলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'স্বদেশীসমাজ'-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন Modern Reviewতে। পরে Greater India নামে পুস্তকাকারে প্রবন্ধগুলি মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে এই রচনাগুলি এককালে সুপরিচিত ছিল, সেগুলি ইংরেজিতে এইবার বাহির হওয়ায় সমস্ত দেশ জানিতে পারিল positive work বলিতে কবি কি বোঝেন এবং কতদিন পূর্বে তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি দেশ সমক্ষে পেশ করিয়াছিলেন।

আর্দানিস হইতে প্যারীতে ফিরিয়া আসিবার পর কবির সঙ্গে অনেকের দেখাশুনা হয়। একদিন কাহ্‌ন ফ্রান্সের বিদুষী মহিলা কবি Countess de Noaillesকে রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এই বিদূষী মহিলার কথাবার্তা, মনীষা কবিকে খুবই মুগ্ধ করিয়াছিল ; এই মহিলা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন, ১৯৩১ সালে ফ্রান্সে কবির যে ছবির প্রদর্শনী হয়, তাহার চিত্রসূচীর বিস্তৃত ভূমিকা তিনি লেখেন। ১৯৩৪এর জানুয়ারীতে এই মহিলার মৃত্যু হয়। কবির সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলেন যেদিন যুদ্ধের খবর প্রকাশিত হইল, তিনি ক্লেমেনসোর (Clemenceau) সহিত গল্প করিতেছিলেন। যুদ্ধের সংবাদে ক্লেমসোঁর মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া

যায়; তখন তাঁহারা উভয়ে ফরাশী ভাষায় নূতন প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করেন।

রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হল্যাণ্ডে বিপুল আয়োজন চলিতেছে—সহরে সহরে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে, কাগজে পত্রে আলোচনার শেষ নাই। ১৯শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া রটারডামে পৌঁছিলেন; হল্যাণ্ডের প্রধান সাহিত্যিক ভ্যান ঈডেন (Van Eeden) কবিকে অভ্যর্থনা করিলে তাঁহারা সদলে সহরের পনেরো মাইল দূরে হুইজেন্ (Huizen) নামক স্থানে যান; সেখানে ভ্যান ঈগেন (Van Eegen) নামে এক ধনীর অতিথি হন। কয়েক বৎসর পরে মিসেস্ ভ্যান ঈগেন শান্তিনিকেতনে আসিয়া কয়েকমাস বাস করেন—তখন তাঁহার জীবনের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে—তখন তিনি স্বামী-পরিত্যক্তা। কবি যখন তাঁহাদের গৃহে যান তখন সেখানে আনন্দ সুখ উচ্ছ্বসিত দেখেন। শান্তির জন্য তিনি আশ্রমে আসিয়া বাস করেন। দুইদিন পরেই পিয়ার্সন বিলাত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হল্যাণ্ডে কবি দিন পনেরো ছিলেন; ইহার মধ্যে তিনি আমষ্টারডম হেগ্, রটারডাম, লাইডেন, য়ুট্রেকট্-এ বক্তৃতা দেন। একজন ওলন্দাজ লেখক সাময়িক পত্রে কবির এই ভ্রমণ ও বক্তৃতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ আমরা নিম্নে দিতেছি :—

কবি যখন হল্যাণ্ডে আসিলেন, তখন তিনি তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে এমন লোক পাইলেন না, যাহারা তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ; সহস্র সহস্র লোক তাঁহার গ্রন্থ ইংরেজি ও ডাচ্ ভাষায় পাঠ করিয়াছে। হল্যাণ্ডে কবি নবযুগের প্রতিনিধি রূপে সমাদৃত হন। Spirit of Tagore কথাটা একটা বিশেষ মনোভাব বুঝাইবার জন্য ক্রমশই ব্যবহৃত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিয়াছিলেন থিওজফিষ্টরা ও Free Religion Community। তিনি যেখানে গিয়াছেন লোকে তাঁহাকে যে-সম্মান দেখাইয়াছে, তাহা কোনো য়ুরোপীয়ের ভাগ্যে হল্যাণ্ডে হয় নাই। তিনি যে কেবল তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা হল্যাণ্ডবাসীদের মুগ্ধ করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার সংস্পর্শ আশীর্বাদের ন্যায় সকলকে তৃপ্ত করিয়াছে। বক্তৃতার স্থলে

স্থান হয় নাই; দেশের নানা স্থান হইতে লোকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহরে আসিয়াছে। কিন্তু সব থেকে বড় সম্মান তাঁহাকে দিয়াছে রটারডাম। সেখানকার চার্চের কর্ত্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন—শুধু তাহাই নহে বেদি হইতে তাঁহাকে উপদেশ দান করিতে হয়। এ পর্যন্ত কোন অ-খৃষ্টানকে তাহারা এ কার্য করিবার জন্য আহ্বান করে নাই। যাহারা সেদিন চার্চে উপস্থিত ছিল, জীবনে কখনো তাহারা সেদিনকার কথা বিস্মৃত হইবে না। (Dr. J. Van der Leeuw, Modern Review 1921, March)

হল্যাণ্ডে কবি The Message of the East প্রবন্ধ পাঠ করেন; কোনো কোনো স্থানে 'বাউল' সম্বন্ধেও বলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ডায়েরীতে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যুট্রেকটে বক্তৃতা হইয়াছে; বক্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কবির হাতে ছোট একটি পুলিন্দা দিয়া বলিলেন একটি মহিলা শ্রোতা বক্তাকে উপহার দিয়াছেন। কবি খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে একটি হীরার আংটি ও একটি সোনার লকেট; লকেটে একটি যুবকের ফোটো, তার চারিপাশে কয়েকটি শিশু। মহিলার অনেক সন্ধান করা হইল, পাওয়া গেল না; শোনাগেল সে একজন পলাতকা হাঙ্গেরিয়ান।

রবীন্দ্রনাথ হল্যাণ্ড ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, This fortnight has been most generous in its gifts to me. * * * Altogether Europe has come closer to us by this visit of ours. * * Now I know more closely than ever before that Santiniketan belongs to all the world and we shall have to be worthy of this great fact," (3 Oct 1920). শান্তিনিকেতনকে একটি বৃহৎ পটভূমিতে বসাইবার কল্পনা কবির মনে জাগিতেছে।

ইংলণ্ডের নীরবতা ফ্রান্সের ঔদাসীন্য কবিকে খুব পীড়িত করে; হল্যাণ্ডের এই সম্মানের বন্যা তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও বিচলিত করিয়াছে। কিন্তু শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তিনি যে আদর্শ পোষণ করিতেছিলেন, অর্থাৎ আশ্রম বিশ্বের ভাবরাজ্যের আশ্রয়দাতা হইবে তাহা সেইখানে প্রতিদিন ব্যাহত হইতেছিল। এই সময়ে শান্তিনিকেতনের মধ্যেও নন-কো-অপারেশনের আবর্ত আসিয়া সেখানকার শান্তিকে নষ্ট করিবার আয়োজন করিতেছিল

এবং অধিকাংশ অধ্যাপক এই আবর্তের মোহে পড়িয়া শান্তিনিকেতনের 'শান্তম্'কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন। তবে কবি সে-সব খবর ধীরে ধীরে পাইতেছিলেন বলিয়া মন উৎকণ্ঠিত হইতেছিল, উত্তেজিত হয় নাই। কিন্তু অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া এনটোয়ার্প হইতে লিখিতেছেন, Santiniketan must be saved from the whirl wind of our dusty politics. (Letters from Abroad p 25)

ইতিমধ্যে কবি আমেরিকায় যাইবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন এবং সেইমত মেজর পণ্ডকে (Pond) আমেরিকায় পত্র দেন। হুইজেনে আছেন এমন সময় কেবল্ পাইলেন—পণ্ড বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না; কবির বিরুদ্ধে সে-দেশের লোকের মন উত্তেজিত। কবি বুঝিলেন তাঁহার নাইট-উপাধি ত্যাগের জের আমেরিকা পর্যন্ত গিয়াছে। যুদ্ধের মিতা আমেরিকা বৃটীশের প্রদত্ত 'স্যর্' উপাধি পরিত্যাগের জন্য রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা করিবে না। রবীন্দ্রনাথ যে আমেরিকায় যান সেটা অনেকেই চান নাই; তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছিলেন তিনি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বলিবেন। কিন্তু কবির মনে জাগিতেছে উভয় সভ্যতার মিলন, উভয় দেশের বিচ্ছেদ ও বিরোধ নয়।

হল্যাণ্ডের বক্তৃতাদি হইয়া গেলে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী লণ্ডন চলিয়া গেলেন, পিয়ার্সন একাই থাকিলেন কবির সঙ্গে। হল্যাণ্ড হইতে বেলজিয়ামে গিয়া কবি এনটোয়ার্প ও ব্রুসেলসে বক্তৃতা করেন। ব্রুসেলসের Palace of Justice বা হাইকোর্টে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। একজন দর্শক লেখেন "In a touching comparison this Christ of India traced the course of the two civilizations—the East and the West.' (Mod. Rev. 1921. Jan, p 22-24)

বেলজিয়াম হইতে রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্সনকে লইয়া প্যারীতে চলিয়া আসিলেন—কোথায় যাইবেন কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না; য়ুরোপের এক দেশ হইতে অন্যদেশে চলাফেরার তখনো অসংখ্য বাধা ও অসুবিধা। ছাড়পত্র সংগ্রহ, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তার পরীক্ষা, বাক্স প্যাটরার ভিতর সন্ধান প্রভৃতি সব রকমের উপদ্রব। কথাছিল রথীন্দ্রনাথ প্যারীতে আসিবেন; নানা অজ্ঞাত

কারণে তাঁহাদের পত্র ও টেলিগ্রাম আশ্চর্যরকম যথাস্থানে পৌঁছতে বিলম্ব হইতে লাগিল। প্রতিমাদেবীর একটি অস্ত্রোপচার হয়—সে-সম্বন্ধে কোনো খবরই কবি পাইতেছেন না। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ও ১৩ই অক্টোবর লণ্ডন চলিয়া গেলেন।

লণ্ডনে আসিয়া কয়েক দিন মাত্র সেখানে থাকিলেন ও অবশেষে আমেরিকায় যাওয়া ঠিক করিলেন; সেখানে যাত্রার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আমেরিকানদিগকে তাঁহার বিশ্বভারতীর আদর্শ সমঝানো। 'To go to the Americans, for they must listen to the appeal of the East'

রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্সনকে সঙ্গে লইয়া ডাচ্ জাহাজ 'রটারডমে' আমেরিকা রওনা হইলেন, সঙ্গে কেদার দাসগুপ্তও চলিলেন। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী প্যারীতে থাকিলেন। প্রতিমাদেবী এই সময়ে চীনামাটির কাজ ও জাভানী বাটিক কাজ শেখেন। পরে এই জাভানী বাটিক কাজ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষা দেন। এই শিল্পটি অনেক মেয়ে শিখিয়াছে। প্রতিমাদেবীর এ বিষয়ে কৃতিত্ব কতখানি তাহা অনেকেই জানে না।

কবি কল্পনালোকে শান্তিনিকেতনের আদর্শকে ধ্যানের বস্তু করিয়াছেন, কিন্তু তিনি জানেন না শান্তিনিকেতন তাহার ব্যভিচার কি পরিমাণ হইতেছে—সেখানে শান্তম কিভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁই এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন Santiniketan is their for giving expression to the Eternal Man... Santiniketan must treasure in all circumstances that *Santi* which is the bosom of the infinite" দুঃখের বিষয় তিনি যাঁহার উপর এই শান্তি রক্ষার ভার দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই এণ্ড্রুজ সাহেবই শান্তিনিকেতনকে রাজনৈতিক অসহযোগ আন্দোলনের কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। কবি চাহিতেছেন International Fellowship আর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা মিলিয়া তাহার ঠিক বিপরীত দিকে রথ টানিয়া চলিয়াছিলেন; আমেরিকা হইতে কবি লিখিতেছিলেন—Keep Santiniketan away from politics; we must not forget that our mission is not political. Where I have my politics, I do not belong

to Santiniketan." "Politics is out of harmony with our Asram." (4 Nov. 1920). কিন্তু শান্তিনিকেতন তখন অসহযোগের কেন্দ্র ; বিশ্বের সহিত সহযোগের কথা কেহ তখন কল্পনা করিতেছিলেন না।

১৮। মার্কিন রাজ্যে

নিউইয়র্ক জাহাজ পৌঁছাইল ২৮ অক্টোবর ১৯২০। এই কয়দিন জাহাজে বসিয়া কবির নিজের সঙ্গে নিজের অনেক বোঝাপড়া হইয়াছে। য়ুরোপে থাকিতে 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন' সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন—কিন্তু তখনো তাঁহার মনে ঐ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন ও সেই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র শান্তিনিকেতন হইবে—এসব কথা স্পষ্ট হয় নাই। *

পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৮ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় আঠারো বৎসরে পদার্পণ করে ; বাঙলাদেশের হিন্দু আদর্শর গণ্ডী ডিঙাইয়া উহা তখন ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে ভারতীয় নানা সংস্কৃতির কেন্দ্র করিবেন বলিয়া কল্পনা করিতে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে সেই আদর্শর ব্যাপ্তি ও পরিণতি হইতে থাকে। এই বারে শান্তিনিকেতনকে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনক্ষেত্ররূপে গঠন করিবার কল্পনা করিতেছেন—শান্তিনিকেতন কোনো সম্প্রদায়ের নয়, কোনো রাজনীতিক অভীষ্টসিদ্ধির কেন্দ্র নয়, কোনো বিশেষ ধর্মের তীর্থ নয় ইহা সর্বমানবের মিলনভূমি—এই নূতন সত্য কবির মনে ক্রমশই দৃঢ় হইতেছে—এই কথাই তিনি আমেরিকানদের কাছে বলিতে চান।

---

* The idea of such an international university had been steadily growing in his mind and formulated itself more concretely during the voyage accross the Atlantic." (Mss. Diary, R. N. Tagore)

নিউইয়র্কের Hotel Algonquinএ আছেন ; কবি লিখিতেছেন 'একদিনেই আমরা এখানে যা খরচ করিয়াছি ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে এক সপ্তাহে তাহা ব্যয়িত হইত।' হোটেলের মালিক খুবই যত্ন করিতেছেন তবুও তাঁর মনে হইতেছে যেন উঁচু খাঁচার মধ্যে আছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়াছেন' এ সংবাদ রাষ্ট্র হওয়া মাত্রেই সাংবাদিকের দল মোলাকাৎ (Interview) প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন।

নন্-কো-অপারেশন সম্বন্ধেই লোকের ঔৎসুক্য বেশি। এ সম্বন্ধে কবিকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, 'অসহযোগ আন্দোলন আদর্শাত্মক আমি আইডিয়া বা চিন্তার শক্তিতে বিশ্বাস করি, কায়িক শক্তিতে বিশ্বাস করি না। ভবিষ্যতে মানুষের বিরোধ বাধিবে আইডিয়ার জগতে, দেহের জগতে নয়। আইডিয়ায় যাহাদের শ্রদ্ধা নাই তাহারাই পরস্পরকে হিংসা করে। অসহযোগ আন্দোলন এই আইডিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা হিংস্রতায় বিশ্বাস করে না। যদি আমাদের দেশ এই অহিংসা ব্রত গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে পারে, তবে আমি আমার জাতির জন্য গর্ব অনুভব করিব।'

'এই আন্দোলনের গুরু হইতেছেন শ্রীযুক্ত গান্ধী ; আমার বিশ্বাস আছে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে ইহা শুভ ফলপ্রদ হইবে। কিন্তু ইহা খুবই স্বাভাবিক যে এই নিরুপদ্রব অহিংস আন্দোলনকে শাসকগণ হিংসার দ্বারা আক্রমণ করিবেন এবং আমরা যদি দৃঢ় থাকিতে পারি তবেই জয় আমাদের, পশুশক্তি পরাভূত হইবে।" * (New York Call 2 Nov. 1920)

এই সাংবাদিকগণের নিকট তিনি তাঁহার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প সম্বন্ধেও বলেন।

নিউইয়র্কে অসহযোগ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা ইহার positive দিকের কথা, কিন্তু এণ্ড্রুজকে দুই দিন পরে যে চিঠি লিখিলেন তাহাতে এই

* Gandhi, one of the foremost of our people, holds forth hope for Indian freedom. * * It is his idea that men should not fight like beasts and kill one another on account of differences of opinion and interests. Instead the fight should be on a moral and spiritual plane. Gandhi believes that people should be ready to suffer, but never cause suffering to others ; be ready to die, but never ready to kill. If they have this moral and physical power and strength, no physical power can prevail against it.

আন্দোলনের অভাবাত্মক দিকটা দেখাইয়া তাঁহাকে হুসিয়ার করিয়া দিতেছেন। বিদেশে বিদেশীর কাছে তিনি তাঁহার মতানৈক্য সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

হোটেলে আছেন, লোকজন সাংবাদিকগণ আসিতেছে, কিন্তু আসল কাজ, বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কাজ কর্ম আগাইবার কোন চেষ্টা হইতেছে না। রিপোর্টাররা আসে প্রশ্ন করে, কবি উত্তর দিয়া যান, পরদিন কাগজে তাহা প্রকাশিত হয়। একজন রিপোর্টারের নিকট তিনি পরলোক সম্বন্ধে তাঁহার মত বলেন; সে সময়ে বিজ্ঞানবিৎ এডিসন্ (Edison) ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তিনি এমন একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করিতেছেন, যাহার সাহায্যে মৃত্যুর পর যদি কোন আত্মা বা অস্তিত্ব থাকে তবে উহার দ্বারা জানা যাইবে। এই ঘোষণায় লোকের মন খুব চঞ্চল হয়। রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাবে কবি বলেন "প্রশ্ন এই—পৃথিবী ত্যাগ করিবার পর মানুষের ব্যক্তি-পুরুষ (Personality) কি ইহলোকের সহিত বার্তাবিনিময় করিতে চায় কি? জন্মের পূর্বে জীবন কি আকার গ্রহণ করিবে সে-সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা জন্মায় না; তেমনি মৃত্যুর পর কি কি আছে সে-সম্বন্ধেও আমরা অজ্ঞ। * * এই পর্যন্ত আমরা জানি যে পরলোকে মঙ্গল হইবে, তাহা না হইলে সর্বচরাচরের একমাত্র গতি মৃত্যু যে অতি ভীষণ হইত। মৃত্যু সত্ত্বেও জীবন প্রবাহ চলিতেছে, তাহার আনন্দ, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই আছে। * * মৃত্যুর পর অসীম জীবনধারায় আমি বিশ্বাস করি এবং তাহা প্রমাণের জন্য আমার কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে না। *

পরলোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট কৌতূহল আছে। এ সম্বন্ধে তিনি বেশী কিছু বলেন নাই; তবে মানবাত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন। মাঝে একবার জনৈকা মিডিয়ামের দ্বারা তিনি অনেক আশ্চর্য কথা শুনিতে পান। সে-সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে পরলোকে আত্মা আছে কি না সে-বিষয়ে মন খোলা রাখা উচিত। মিডিয়ামের কাছে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য কথাবার্তা শুনিয়াছিলেন,

* International News Service by Margery Rex, Baltimore star, Nov. 9. 1920.

যাহার ব্যাখ্যা করা সহজ বিজ্ঞানের দ্বারা হয় না। পরলোক সম্বন্ধে কবি একখানি বিস্তৃতপত্র দিলীপকুমারকে একসময়ে লিখেন।

নিউ ইয়র্কে আসিবার পর পিয়ার্সন ও পণ্ড্ (Pond) সভাদি করিবার ব্যবস্থা করেন। ১০ নভেম্বর ব্রুকলীনের সঙ্গীতভবনে (Academy of Music) 'পূর্ব ও পশ্চিমের 'মিলন' বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করেন। ১২ই নভেম্বর ফিলাডেলফিয়ায় Brenmer নামে একটি সহরে মহিলাদের কলেজে 'বাঙলার মরমী কবি' (mystics) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরদিন প্রিন্সটনে ফুটবল খেলা দেখেন ও নিউইয়র্কে ন্যাশনাল আর্ট ক্লাবের পঞ্চদশ বার্ষিকী উৎসবে উপস্থিত হন। ১৬ই তারিখ নিউইয়র্কে প্রথম বক্তৃতা করেন—এই বক্তৃতা League of Political Education সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে হয়। দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় ২১শে তারিখে; বিষয় ছিল The Poet's Religion; সাময়িক পত্রিকায় এই সভা সম্বন্ধে লিখিয়াছিল, "Never has the Forum had as large an audience as that which turned out to hear the famous writer from the East......hundreds were turned away." (Standard Union N. Y. Nov. 22,1920)

প্রায় একমাস নিউইয়র্কে আসিয়াছেন; এপর্যন্ত বিশ্বভারতীর কাজ কিছুই হয় নাই। কোনো বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা, কিংবা কোনো সমিতি গঠন প্রভৃতি কাজ আগায় নাই। দুই একটি সামান্য ধরণের লোক বড় বড় কথায় কবিকে ভোলায়; তিনি তাহাদের কথায় আকাশ কুসুম রচনা করেন। একজন কোয়েকার 'বন্ধু' তাঁহার নিকট আসেন ও রবিবারে তাঁহাদের গির্জায় লইয়া যান; তিনি লিখিতেছেন যে লোকটি—"is taking me every Sunday morning to Quakers meetings; there in the silence of meditation. I am able to find the eternal perspective of truth, where vision of external success dwindles away to its infinitesimal minuteness "(Letters from Abroad), New York Nov. 25, 1920). সেই 'বন্ধু'টি কিছু কিছু চেষ্টা করেন, কিন্তু কাজ বিশেষ হয় নাই।

ইতিমধ্যে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী য়ুরোপ হইতে আসিলেন। ২০ নভেম্বর

ফ্রান্সের সেরবুর্গ (Cherbourg) হইতে তাঁহারা যাত্রা করেন। এক মাসের মধ্যে বিশ্বভারতীর কোনো কাজ আগায় নাই দেখিয়া রথীন্দ্রনাথ একটু আশ্চর্য ও বিরক্ত হন। পণ্ড্ পিয়ার্সনকে বুঝাইয়াছিল যে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বের জনপ্রিয়তা আর নাই, সুতরাং চেষ্টা করিয়া বিশেষ ফল নাই ; অথচ আসল কথা পণ্ড্ তখন দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছেন। এছাড়া অন্য কারণ ছিল। এইসব ব্যাপার লইয়া রথীন্দ্রনাথের সহিত পিয়ার্সনের একটু মনোমালিন্যও হয়। পিয়ার্সনের পক্ষে আমেরিকায় এই কার্য অত্যন্ত ক্লান্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল ; তিনি রথীন্দ্রনাথের উপর সমস্ত ভার দিয়া তাঁহাদের দল ত্যাগ করিয়া বষ্টনে চলিয়া গেলেন। পিয়ার্সন চলিয়া গেলে কবি খুবই আঘাত পাইয়াছিলেন। (ডায়েরী)

এদিকে নিউ ইয়র্কে সামাজিক পার্টি ও সভার অন্ত ছিল না ; কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত পোষাকী ব্যাপার। কোথায়ও কাহার কাছে দুই চারিটা আদর্শবাদের কথা শুনিলেই কবি অনেকখানি আশার কথা ভাবিয়া লইতেন। যখন কোথায়ও কোনো আশা নাই, তিনি কল্পনা করিয়া লিখিতেছেন, Things are working well and I have cause to be sanguine of success. বাহিরের মরীচিকায় মন কখনো প্রফুল্ল কখনো নিরানন্দ ; ভিতরে ভিতরে এইসব বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি অবজ্ঞাও জমিতেছে কিন্তু এখনো তাহা স্পষ্ট হয় নাই।

এদিকে ৭ই পৌষের উৎসব আসিতেছে—আর তাঁহার মন শান্তিনিকেতনের জন্য টানিতেছে। (Letters p 35)। দূরে থাকিয়া তিনি শান্তিনিকেতনের বৃহৎ সৃষ্টির দিকের কথা ভাবেন। একখানি পত্রে লিখিতেছেন 'শান্তিনিকেতন স্থিতিশীল নহে ; ইহা আগাইয়া চলিয়াছে। আমাদিগকে সেই সঙ্গে চলিতে হইবে। যখন আমি য়ুরোপে যাত্রা করি, তখন ভাবিয়াছিলাম যে শান্তিনিকেতনে ভারতীয় নানা বিদ্যা ও জ্ঞানের আলোচনার জন্য একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিব। কিন্তু যখন য়ুরোপে আসিলাম তখন বুঝিলাম, পাশ্চাত্য জাতিরা আমাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে ; তখন আমি উপলব্ধি করিলাম যে আমার কর্তব্য (মিশান) বর্তমান যুগের কার্য। সে-কাজ পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন

সাধনে সার্থক হইবে।' (Letters p 38-39) য়ুরোপে থাকিবার শেষ দিকে হল্যাণ্ড হইতে তিনি যে অভ্যর্থনা পান, তাহাতেই তাঁহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল। নিউ ইয়র্কে সাহিত্যিকের দল তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইল; শহরে সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে Society of Arts and Sciences হইতে কবির জন্য একটি ডিনার পার্টি হয়; তাহাতে বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত হেলেন কেলারের সাক্ষাৎ হয়। হেলেন কেলার জন্মান্ধ, মূক, বধির। তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর চেষ্টায় ও তাঁহার নিজ আত্মিক শক্তি বলে তিনি নানা বিদ্যা আয়ত্ব করিয়াছিলেন। কবি আসিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। কেলারের অনুরোধে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন ও গান গাহেন। কেলার কবির কণ্ঠে ও ওষ্ঠে অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহার গান অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি এইসব যেন তাঁহার অতীন্দ্রিয় শক্তিযোগে ভোগ করেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও ইহা নূতন অনুভূতি।

ডিসেম্বরের শেষ দিকটায় রবীন্দ্রনাথ নিউ ইয়র্কের বাহিরে সহরতলীতে কাটান; স্থানটি খুবই মনোরম, কিন্তু খৃষ্টোৎসবের তাণ্ডবে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে; কবি লিখিতেছেন, But where is the spirit of Christmas in human heart ?.........The men and women are feeding themselves with extra dishes and laughing extra loud. How immensely different from the religious festivals of our country. (25 Dec. '20) কিন্তু সত্যই কি ভারতীয় উৎসবগুলি খুব সাত্ত্বিক ? সেখানে আহার, পান, বাদ্য বাজির যে তাণ্ডব হয় তাহার কথা কবি দূরে গিয়া বিস্মৃত হইয়াছেন, এখন তাহাকে idealize করিয়া লিখিতেছেন।

নিউ ইয়র্কের হোটেলে ফিরিয়াছেন; এমন সময়ে হার্ভার্ডে কয়েকটি বক্তৃতার জন্য আহ্বান আসিল। সেগুলি খুবই আদৃত হইল। এদিকে দুই এক-জন অধ্যাপক কবির international বিদ্যায়তনের আদর্শ সফল করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু আমেরিকা আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে তখন অত্যন্ত উদাসীন। রবীন্দ্রনাথ এনড্রু কার্নেগীর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান; সেই মহিলা দেখা করিতেই চাইলেন না এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার পক্ষে সাহায্য

করা অসম্ভব। কবি এই আঘাত পাইয়া ভাবিলেন যে অর্থের জন্য এই হীনতা তিনি আর স্বীকার করিবেন না। লোকের কাছে টাকার কথা বলিতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন; নানা কারণে মন অত্যন্ত দমিয়া গেল; টাকার প্রতি একটা বিরক্তি আসিল, একখানি পত্রে এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন, This visit of mine to America, has produced in me an intense contempt for money. (২৫ ডিসেম্বর' ২০)। আর একখানি পত্রে লিখিতেছেন, 'যখন আমরা ভারতবর্ষে থাকি, তখন অর্থ আমাদের কি সুখ দিতে পারে তাহার কথাই কল্পনা করি; কিন্তু যখন এই দেশে আসি, তখন ধনের বিপদ কোথায় তাহা বুঝিতে পারি। এ কথা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়াছে যে ধন সৃষ্টির চেয়ে নষ্ট বেশি করিতে পারে। ধনকে সচল ও জীবন্ত রাখিতে হইলে ত্যাগের প্রয়োজন।' (Letters from Abroad Jan 4, 1921 p. 51-52) কবি নিজের মনকে এইভাবে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু বাহিরে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। শ্রীমতী উইলফ্রেড স্ট্রেট একজন ধনীর বিধবা, নিউ ইয়র্কের ধনী সম্প্রদায়ের নেত্রী-স্থানীয়; তিনি কবিকে Junior League নামে ধনী তরুণীদের একটি ক্লাবে পরিচিত করিবার জন্য বহুদিন হইতে আশা দিয়াছিলেন। সেই আশায় কবির মাসাধিক কাল এই নগরীতে অতিবাহিত হইয়াছে। শেষকালে সেই ক্লাবের অধিবেশন দিনে যাহা হইল, তাহা অত্যন্ত হাস্যকর। কবি সামান্য কিছু বলার পর এক মহিলা মঞ্চে উঠিয়া 'হুভার ফাণ্ড'—অর্থাৎ য়ুরোপের দুস্থদের জন্য যে তহবিল খোলা হইয়াছিল—তাহার জন্য বহুক্ষণ বক্তৃতা করিলেন। কবির বক্তব্য বিষয় কাহারও কানে পৌঁছাইল না। 'হুভার ফাণ্ড' লইয়া আন্দোলন আলোচনা চলিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় মিঃ উডস কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শান্তিনিকেতনের বিরুদ্ধে বৃটীশ গবর্মেণ্টের কোনো মত আছে কি? তৎক্ষণাৎ কবি বুঝিতে পারিলেন এতদিন তিনি যেসব চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কেন ব্যর্থ হইয়াছে। ১৯১৭ সালে তাঁহার নামের সহিত গদর বিদ্রোহীদলের নামের যোগ, ১৯১৯এ স্যর উপাধি ত্যাগ প্রভৃতি ব্যাপার তলে তলে এদেশে বিষ বিকীর্ণ করিয়াছে। কার্ণেগী গৃহিণী কেন দেখা করিতে চান নাই—তাহাও এখন স্পষ্ট হইল। আমেরিকা 'ডিমক্রেসি'র দেশ, তাহাদের সকলেই 'মিষ্টার'; সেইজন্য তাহাদের

'স্যর' প্রভৃতি উপাধির উপর মোহ ও সম্ভ্রম ভিতরে ভিতরে বেশি। কবি বুঝিলেন আন্তর্জাতিক বিশ্বায়তনের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা বৃথা।

নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিবার পূর্বে তথাকার Poetry Society কবিকে একদিন অভিনন্দিত করেন। যুদ্ধের পর আমেরিকায় যুবকবিদের মধ্যে 'ষোল আনা আমেরিকান' হইবার জন্য একটা তীব্র আন্দোলন আসিয়াছিল; এতদিন তাহারা ইংলণ্ডের ইংরেজি কবিতাকে তাহাদের আদর্শ বলিয়া মনে করিত; যুদ্ধের সময় তাহারা তাহাদের শক্তি অনুভব করিয়াছিল; সেই শক্তি সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহারা উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় আসিয়া তাঁহার তিন মাসের ব্যর্থতার প্রকোপ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। অর্থ পান নাই সে ত পৃথক কথা; কিন্তু তাঁহার নামের সহিত গদর আন্দোলনের ব্যাপার জড়িত করিবার চেষ্টা, তাঁহাকে জার্মান ভক্ত বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিকতার নামের অন্তরালে কতকগুলি রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকায় আসিয়াছেন এই কথাটি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা পীড়িত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সভায় তাঁহার মনের এই ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন; রথীন্দ্রনাথ তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিয়াছেন, I was fearing an outburst and it did come. This was the first time, I thought, he lost his dignity. I was moved to tears, it hurt me terribiy. It seemed a tragedy to me. আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তনের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা এই জাতীয়তামোহে মুগ্ধ দেশে এমনভাবে ব্যর্থ হইল।

ইহার কয়েকদিন পরেই তাঁহারা শিকাগো যান (১ ফেব্রু); সেখানে শ্রীমতী মুডীর বাড়ীতে থাকেন। পিয়ার্সন প্রায় দুই মাস পরে আসিয়া দলের সহিত মিলিত হইলেন; কবি তাঁহাকে পাইয়া খুবই খুসী হইলেন। এইখানে কবির সহিত আমেরিকার বিখ্যাত সমাজসেবিকা শ্রীমতী Jane Addamsএর সাক্ষাৎ হইল; তিনি কবির আন্তর্জাতিক বিশ্বায়তনের কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু বলিলেন আমেরিকায় তাঁহার নিজের কদর নাই; তাঁহাকে লোকে জার্মান ভক্ত বলসিভিকি প্রভৃতি অপবাদ দিতেছে।

শিকাগো হইতে কবি পণ্ডের ব্যবস্থায় দুই সপ্তাহের বক্তৃতাযাত্রায় বাহির হইলেন। বক্তৃতাগুলি দেন টেক্সাস ষ্টেটে। পনের দিন তাঁহাকে

নানাস্থানে ঘুরিতে হয়। তিনি লিখিতেছেন, It is my tyrant *karma* which is dragging me from one hotel to another. Between my two hotel incarnations, I usully have my sleep in a Pullman Car.

টেক্সাসে কবি একটু আরাম বোধ করিলেন। নিউ ইয়র্কের দুঃস্বপ্নময় জীবন হইতে দূরে আছেন—সেসব ব্যর্থতার অপমানের কথা ভুলিতে চাহিতেছেন। যুদ্ধের পর কোথায় লোকে মৈত্রী ও শান্তি চাহিবে—কিন্তু বিজয় মদগর্বিতের সে ভাবনা আসে না; তাই বৃহৎ আদর্শকে তাহারা সহজেই তাচ্ছিল্য করিতে পারিল।

টেক্সাস হইতে শিকাগোতে পুনরায় ফিরিয়া সেখানে দিন পনের থাকিয়া কবি ১৯শে মার্চ (১৯২১) নিউ ইয়র্ক হইয়া য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। মার্কিনমুলুকে এবার চারিমাস একুশদিন ছিলেন। ইহার মধ্যে অধিকাংশই কাটে নিউ ইয়র্কে।

এ কয়মাস স্থানীয় ব্যাপার বক্তৃতা পার্টি প্রভৃতি লইয়া এতই ব্যস্ত ও বিব্রত ছিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চিন্তা করিতে অবসর পান নাই। ষ্টীমারে যে কয়দিন ছিলেন, এণ্ড্রুজকে এইসকল সমস্যা লইয়া পত্র লিখিতে থাকেন। এই কয়মাস ভারতবর্ষে নানারূপ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সবগুলির যথার্থ খবর কবি পাইতেছিলেন না, আবার কতকগুলি অতিরঞ্জিতাকারেই পাইতেছিলেন।

রাজনৈতিক ব্যাপারগুলি সংক্ষেপে এই। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন হইল; এই সভায় অসহযোগতত্ত্বর ব্যাখ্যা হয়। মহাত্মাজী ১৩ই সেপ্টেম্বর কয়েক দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে আসিলেন; এই সময়ে আশ্রমের সকলপ্রকার কার্যের ভার ছিল এণ্ড্রুজের উপর। তাঁহার উদ্যোগেই গান্ধীজির আসা হয়; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয়ের সহিত কোনো কালেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; কিন্তু তিনি এই সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া গান্ধীজিকে দেশের পরিত্রাতা বলিয়া মনে করিতেছিলেন। শান্তিনিকেতনে রাজনৈতিক আন্দোলনের যে দাপট চলিতেছিল তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট দায়ী ছিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী

তখন একজন ভয়ানক অসহযোগী! মোটকথা শান্তিনিকেতন এইসব অস্বাভাবিক আন্দোলনের কেন্দ্র করিবার জন্য দায়ী প্রধানত ছিলেন ইঁহারা। গান্ধীজি আসিবার পরই সৈয়কত আলি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সৈয়কত আলির আগমন আশ্রমের ইতিহাসে স্মরণীয়। আশ্রমের ইতিহাসে মুসলমানদের সম্বন্ধে যে অন্ধ গোঁড়ামি ছিল তাহা এইবার ভাঙিল। বিধুশেখর স্বয়ং তাঁহাকে রান্নাঘরে লইয়া আহারে বসাইলেন; আজ রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনায় বহুদিনকার বাধা দূর হইল। অথচ কয়েক বৎসর পূর্বে যখন একটি মুসলমান বালক আসিবার জন্য প্রার্থী হয়, তখন তাহাকে কোথায় এবং কিভাবে আহার করিতে দেওয়া হইবে, তাহার আলোচনায় আশ্রমের অধ্যাপকগণের বহু সময় বৃথায় নষ্ট হয়। সাময়িক উত্তেজনা ও রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির লোভে মানুষ বড় কাজ করিয়া ফেলে; কিন্তু সেই কাজ শান্ত যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সফল করা কঠিন হয়।

শান্তিনিকেতন অসহযোগের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে; এণ্ড্রুজ ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'conscience'এর জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আশ্রমের যে সামান্য যোগ ছিল তাহা ছিন্ন করিতে হইল। সুরুলের কুঠি কলিকাতা কলেজ হইতে আগত যুবকদের 'গ্রামের কাজ' করিবার কেন্দ্র হইল। মহাত্মাজীর নির্দেশমত দেশের কাজ এক বৎসর করিলেই 'স্বরাজ' লাভ! সুতরাং এত সহজে ও শস্তায় স্বরাজ লাভের সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করা কঠিন।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের সময় কবি নিউ ইয়র্কে। এই অধিবেশনে গান্ধীজির জয় জয়কার হয়; সর্বাপেক্ষা বড় লাভ হইল চিত্তরঞ্জন দাসের সহায়তা লাভ। এই সময়ে দেশবন্ধু সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এইখানে স্থির হইল গবর্মেন্টের সহিত সকলপ্রকার সম্বন্ধ বর্জনই স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায়। স্থির হইল ১৯২১ সাল হইতে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইলে উহা বর্জন করিতে হইবে; স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়া 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' যোগদান করিতে হইবে, সরকারী চাকুরী আদালত বয়কট করিতে হইবে; মোটকথা গবর্মেন্টের সহিত সকলপ্রকার সহযোগিতা ছিন্ন করিলে গবর্মেন্টের কার্য পরিচালনা অসম্ভব হইবে ও তখন গবর্মেন্ট বাধ্য হইয়া দেশবাসীর দাবী পূরণ করিবেন!

রবীন্দ্রনাথ দূর হইতে এই আন্দোলনের সমগ্র মূর্তিটি দেখিতে পাইতেছিলেন না। এমন সময় 'প্রবাসী'র ১৩২৭ সালের পৌষ সংখ্যায় তাঁহারই বিদ্যালয়ের কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপক শান্তিনিকেতনের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া এই রাজনৈতিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এক পত্র প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ নিউ ইয়র্কে থাকিতে পত্রখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া এণ্ড্রুজকে পত্র লেখেন (Letters from Abroad 28 Feb. 1921)। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে সরিষায় ভূত ছাড়ায়, সেই সরিষাই ভূতগ্রস্ত! যে এণ্ড্রুজকে তিনি বিশ্বাস করিয়া আশ্রমের আদর্শ বজায় রাখিবার ভার দিয়াছিলেন, তিনি এই সাময়িক আন্দোলনের জন্য প্রধানত দায়ী। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, I am afraid I shall be rejected by my own people when I go back to India। বলা বাহুল্য শান্তিনিকেতনের 'অসহযোগী'দের দ্বারা তিনি rejected হইয়াছেন! তিনি বার বার করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন আশ্রমের শান্তিকে ক্ষুব্ধ করিও না; আমি যেখানে রাজনৈতিক, সেখানে আমি আশ্রমের নই।' একথা সকলের নিকট স্পষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ হয়।

১৯২১ সালে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে রাজনৈতিক আন্দোলন সবেগে চলিতেছে। নেপালচন্দ্র রায় নেতা হইয়া একদল অসহযোগী ছাত্রকে লইয়া স্কুলে 'গ্রামের কাজ' আরম্ভ করিলেন; মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হইল, বিজ্ঞাপন জারী হইল; কিন্তু স্বাধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িবার দিকে কোনো প্রচেষ্টা কাহারও মধ্যে দেখা গেল না।

এণ্ড্রুজ কিন্তু কবিকে এইসব ব্যাপারের একটা ভাল দিক দেখাইতেছিলেন; দেশের যুবকদের মধ্যে সত্যই ত্যাগের জন্য একটা আকুতি আসিয়াছিল; সেই ত্যাগের স্পৃহাকে যদি গঠনমূলক বা Positive কার্যে নিয়োজিত করা যাইত, তবে দেশের ইতিহাস হয় ত অন্যরূপ গ্রহণ করিত। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই একখানি পত্রে লিখিলেন; কবি তখন শিকাগোতে (২ মার্চ, ১৯২১)।

I hope that the spirit of sacrifice and willingness to suffer will grow in strength. * * * It is in fitness of things that Mahatma Gandhi should call up the immense

power of the meek that has been waiting in the heart of the destitute and insulted humanity of India. The destiny of India has chosen for its ally the power of soul, and not that of muscle. And she is to raise the history of man from the muddy level of physical conflict to the higher moral altitude. (Letters p. 128)

কিন্তু এই আন্দোলনের অভাবাত্মক দিকটা সম্বন্ধেও তিনি নানা সংবাদ দেশ হইতে পাইতেছেন। মনকে কিছুতেই এই আন্দোলনের স্বরের সঙ্গে মিলাইতে পারিতেছেন না ; তিনি কোথায় যেন অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন তাই পত্রে লিখিতেছেন, But deep in my being, why is there this spirit of resistence maintaining its place in spite of my strong desire to remove it.?

পরে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন 'অসহযোগের এই আদর্শ রাজনৈতিক কৃচ্ছ্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ছাত্ররা তাহাদের ত্যাগের অর্ঘ্য কিসের নিকট বহন করিয়া আনিতেছে ? পূর্ণতর শিক্ষার নিকট নহে, অ-শিক্ষার নিকট।' শিক্ষার সঙ্গে এই বিরোধ জ্ঞানের সঙ্গে অসহযোগ এই অ-শিক্ষার দেশে কবির কাছে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক প্রচেষ্টা বলিয়া মনে হইল। তিনি স্পষ্টতর করিয়া পত্রে লিখিলেন', অসহযোগ অনর্থক সত্যকে আঘাত করিতেছে ; ইহা আমাদের গৃহের রন্ধনের অগ্নি নহে। কিন্তু ইহা সেই অগ্নি যাহা আমাদের গৃহ ও পাকশালা ভস্মীভূত করিবে।' (Letters p. 133).

শিকাগো হইতে ৮ই মার্চ ১৯২১ (২৪ ফাল্গুন ১৩২৭) রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পত্রখানি শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়কে লেখেন :—

"আমাদের দেশে ফেরবার সময় কাছে এসেছে। একদিকে যেমন মন খুসি হচ্ছে, তেমনি আর একদিকে ভয় লাগ্‌চে পাছে দেশে লোকের সঙ্গে আমার স্বর না মেলে। Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা, পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত ; সেই ভূত ঝাড়্‌বার দিন এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তার আয়োজন করচি। দেবতার নাম করলে তবেই অপদেবতা ভাগে। আমাদের শান্তিনিকেতনের দরজায় সেই দেবতার নাম লেখা ;

আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথচি। দেশের নাম করে এখানে যদি আমরা কোনো বাধা দেবার বেড়া তুলি তা'হলে আমাদের দেবতার প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়া হবে। যে-ভারতবর্ষকে বহুকাল সমস্ত পৃথিবী একঘরে করে রেখেছে, সেই ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ কর্‌বার পত্র নিয়ে আমি বেরিয়েছিলুম—পাছে কিছুতে এই নিমন্ত্রণের পথ রোধ করে সেই আমার ভয়। * * * সেদিন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেই দিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা স্নরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে কর্‌চি —আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করতে বসেছি—একথা ভুলচি, যে-সব দুর্দান্ত জাতি পরকে আঘাত করে' বড় হতে চায় তারাও যেমন বিধাতার ত্যাজ্য, তেমনি যারা পরকে বর্জন করে স্বেচ্ছাপূর্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও তেমনি বিধাতার ত্যাজ্য।" (প্রবাসী ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ১৬৯)

১৯। য়ুরোপে প্রত্যাবর্তন

১৯২১ সালের ১৯শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ সদলে Rhyndam জাহাজে করিয়া নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল; কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি আমেরিকা হইতে বিপুল অর্থ পাইলেন। যে Mrs. Straight তাঁহাকে Junior Leagueএর অধিবেশনে সদস্যদের নিকট পরিচিত করিয়া অদৃশ্য হন, তিনিই তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য হইতে কবির গ্রাম-সংস্কার কর্মে যে সাহায্য দান করিলেন তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। যথাস্থানে আমরা সে-কথা আলোচনা করিব। এইবার আমেরিকায় থাকিবার সময় L. K. Elmhirst নামে একজন ইংরেজ যুবকের সহিত কবির পরিচয় হয়।

এই যুবক কেম্‌ব্রিজের গ্রাজুয়েট ; কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমেরিকায় যান। কবির সঙ্গে তাঁহার গ্রাম-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হয় ; তখন সেই যুবকটি বলেন যে তিনি কবির কার্যে যোগদান করিবেন। তাঁহারই মধ্যবর্তিতায় উক্ত আমেরিকান ধনী মহিলার সাহায্য পাওয়া যায়।

২৪এ মার্চ প্লিমাউথে কবি পৌঁছিলেন। ইংলণ্ডে আসিয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন ; যে-ইংলণ্ডকে কয়েকমাস পূর্বে পার্লামেণ্টে ডায়ার আলোচনার পর অত্যন্ত তিক্তভাবে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাকে আজ খুব খারাপ লাগিতেছে না। নামিয়া নেভিন্‌সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে ; নেভিনসনের উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা কবির ভাল লাগিয়াছে, তাই লিখিতেছেন, With all our grievances against the English nation, I cannot help loving your country, which has given me some of my dearest friends. (Letters 10 April, 1921).

৮ই এপ্রিল ভারতীয় ছাত্রদের হষ্টেলে 'পূর্ব পশ্চিমের মিলন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইংলণ্ডে জাতিগত বৈষম্য বিষয়ক প্রবন্ধপাঠ এই প্রথম। তিনি বলেন যে কিছুকাল পূর্বে তিনি ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে গিয়াছিলেন ; সেখানে গিয়া তিনি একটি প্রকাণ্ড দানবকে যেন দেখিলেন। পশ্চিমের সহিত পূর্বের মিলনক্ষেত্রে তিনি সেইরূপ একটি বিভীষিকাময় চিত্র দেখিতে পান। পশ্চিম পূর্বের নিকট কোনো রঙীন কল্পনা লইয়া আসে নাই, যে সমবেদনা বা দরদ সৃষ্টি করে, সংযোগ সাধন করে, তাহা লইয়া আসে নাই ; কিন্তু সে আসিয়াছে রিপুর আক্রোশে ও ধনের মাৎসর্যে ; পশ্চিম গুরুর ন্যায় আসিতে পারিত, কিন্তু সে সেভাবে আসে নাই ; সে আসিল ব্যক্তিকে জাতিকে দাসত্বে বন্ধন করিতে। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন হইল না। সেই মিলনকে সার্থক করিতে হইলে, তাহাকে পরিপূর্ণ করিতে হইলে, মানুষের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা ও বৃত্তির উন্মেষ করিতে হইবে ; সেই উচ্চতর মনুষ্যত্বের পটভূমিতে সেই মিলন সার্থক হইবে। (The Morning Post, London 9 April, 1921).

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা শুনিয়া একজন ইংরেজ মহিলা তাঁহার নিকট প্রতিবাদ করিয়া পাঠান ; তিনি পত্রে বলেন কবি বৃটীশ জাতির উপর অকারণে বিদ্বেষ ভাব ব্যাখ্যান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ মহিলার পত্রের জবাব দেন ; সেই পত্রখানি হইতে কিয়দংশ পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিলাম।

সপ্তাহ তিনেক লণ্ডনে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ এরোপ্লেনযোগে প্যারী আসিলেন (১৬ই এপ্রিল)। এবারও M. Kahn এর অতিথিশালায় উঠিয়াছেন ; এই সময় প্যারী কাজে কর্মে প্রাণলীলায় চঞ্চল। সিলভ্যাঁ লেভি ষ্ট্রাসবুগে অধ্যাপক হইয়া গিয়াছেন—কিন্তু এবার অনেক বন্ধুবান্ধব আসিতেছেন। একদিন কবি Grand Operaতে R. Wagner এর বিখ্যাত নাট্য Valkyre দেখিতে গেলেন। কিন্তু এসব বাহিরের ঘটনার অন্তরালে দুইটি জিনিষ তাঁহার মনে অহর্নিশি জাগিতেছে ; একটি বিশ্বমানবকে আহ্বান করিয়া বিশ্বভারতী গঠন সম্বন্ধে, অপরটি মহাত্মাজির পশ্চিমের সহিত অসহযোগ আন্দোলনের বেদনা। বিশ্বভারতী স্থাপনা সম্বন্ধেও অনেক কথা অনেক সন্দেহ মনে হইতেছে (Letters 18 April.)।

১৭ই এপ্রিল কবির সহিত রোমাঁ রোলাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রোলাঁর ভগ্নী ইংরেজি জানেন ; উভয়ের মধ্যে এই দোভাষীর সাহায্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আর একদিন Musee Guimet বা গিমে যাদুঘরে পূর্বদেশের বন্ধুসমিতির (Societe amis des Orientes) কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় একটি সভা আহূত হয় ; এইখানে তিনি Indian Folk Religion বা বাউল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সামাজিক ভোজে, পার্টি বা মিলন সভায়, বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ, আলাপ আলোচনা চলিতেছে, বিশ্রাম নাই বলিলেই চলে। ২৫এ এপ্রিল M. Kahn এর সমিতির (Comite National d'etudes Sociales at Politiques) সম্মুখে কবি Public spirit of India শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটি The Meeting of the East and the West ভাঙিয়া লিখিত।

প্যারী ছাড়িবার পূর্বে বৃটীশ রাজদূত Sir Thomas Barclay কবিকে একদিন লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেন ; অধ্যাপক Geddes, Desjardin এর সহিত এইখানে সাক্ষাৎ হয়। প্যারী থাকিবার সময়ে শ্রীধর রাণা নামে একজন ধনী কচ্ছী ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গুণগ্রাহী হন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি প্যারীতে আসেন ; তখন তাঁহার রাজনৈতিক মত শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতির মতানুযায়ী ছিল। পরে তাহার পরিবর্তন হয় এবং

মুক্তার ব্যবসায় করিয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। তিনি তাঁহার বিপুল লাইব্রেরী বিশ্বভারতীকে দান করিলেন। ভারতবন্ধুরা কয়েক সহস্র ফ্রাঁ (franc) তোলেন এবং তাই দিয়া ফরাসী লাইব্রেরীর জন্য বই ক্রয় করা হয়।

প্যারী ত্যাগ করিয়া কবি সদলে ষ্ট্রাসবুর্গে আসেন (২৭ এপ্রিল)। ষ্ট্রাসবুর্গ আলসেস-এর প্রধান সহর। যুদ্ধের পর সন্ধিসর্তে এই প্রদেশটি জারমেনীর হাত হইতে ফরাশীরা ফিরিয়া পাইয়াছে; ফরাশীরা ইহাকে তখন সজোরে সম্পূর্ণভাবে 'ফরাশী' করিবার জন্য লাগিয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ফরাশী সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়াছে, অধ্যাপকগণ ফরাশী; সিলভ্যাঁ লেভি সেই সূত্রে আসিয়াছেন। কবি বিশ্ববিদ্যালয়ে Message of the Forest প্রবন্ধটি পাঠ করেন। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁহার তখন দিবারাত্র ধ্যান চলিতেছে; এণ্ড্রুজকে এই সময়ের একখানি পত্রে এ সম্বন্ধে খুবই স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন; বিশ্ববিদ্যালয় কথাটির মধ্যে সাধারণ লোকের কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা আছে। সুবিধার জন্য তাঁহাকেও তাঁহার বিশ্বভারতীর ইংরেজি নাম International University দিতে হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ একটি শব্দের মধ্যে তাঁহার আদর্শকে সীমাবদ্ধ করা যাইবে না। ইহাকে কোনো definition-এর দ্বারা জানা যাইবে না, ইহাকে নিজ জীবনের সমৃদ্ধির মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে তিনি এককালে সরকারী শিক্ষাবিভাগের ষ্টীম-রোলারের চাপ হইতে রক্ষা করিয়া তাহার নিজ গতিতে চলিতে দিয়াছিলেন; কলের তৈয়ারী ছাটাই-করা বিদ্যার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই।

তাঁহার মতে যদি বিশ্ববিদ্যালয় করিতেই হয়, তবে তাহা আমাদের অন্তরের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠিবে। এইরূপ ব্যক্তিগত সাধনার মধ্যে বিপদ আছে সত্য। কিন্তু জীবনের মধ্যে বিপদ সম্ভাবনা আছে, স্বাধীনতার দায়িত্ব ভীষণ। সেইজন্যই তাহার মূল্য; ফলের জন্য নহে।

তিনি লিখিতেছেন, Very likely I shall never be able to work with a Board of Trustees। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সেই ট্রাষ্টি, কমিটি সবই গঠন করিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত যে ইহাদের সহিত কাজ করিতে পারেন নাই, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিতে পাইব। তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সহিত সর্বসাধারণের ইচ্ছার বিরোধ হইবে ইহা তিনি যেন

জানিতেন। সে কথা এখন থাক্। ষ্ট্রাস্‌বুর্গে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে যখন বক্তৃতা করিতেছেন তখন বিশ্বভারতীর বাস্তবরূপ সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছেন তাহাও স্পষ্ট নয়, তাহা ২১এ তারিখের পত্রখানি পড়িলে বুঝা যায়।

ষ্ট্রাস্‌বুর্গের সভায় অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি রবীন্দ্রনাথকে ছাত্রদের নিকট পরিচিত করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, In entertaining to-night Rabindranath Tagore, the University of Strasbourg do render homage not only to a poet of genius and a genius marking the millenium of a great nation; the French University of Strasbourg entertain a sister university of India. For the last twenty years Tagore has been dreaming to dedicate a University to his country * * The dream is about to be realized" (Alsace et Lorraine, 30 Ap. 1921, Mod. Rev. 1921 July p. 95-96).

লেভিকে কবির খুবই ভাল লাগিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি; এইবার তাঁহাকে বিশ্বভারতীর জন্য অধ্যাপকরূপে নিয়োগের কথা ভাবিতেছেন।

ষ্ট্রাস্‌বুর্গ হইতে কবি জেনেভা যান (৩০এ এপ্রিল)। জেনেভায় বেশ ভাল লাগিতেছে ; নিরালা সহর, পরিচ্ছন্ন ; কবির মনে ভাল লাগিবার মত সুন্দর। জেনেভায় তাঁহার সহিত অনেক মনীষীর সাক্ষাৎ হয় ; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Claparde, শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে একজন আচার্য। Rousseau Instituteএ কবি শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৬ই মে ১৯২১ (২৫শে বৈশাখ, ১৩২৮) রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন বাঙলায় পারিপার্শ্বিক হইতে দূরে থাকিয়া আজ যেন জন্মদিনটিকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না ; কাজে কর্মে, জনতার ভিড়ে দিনটি গেল (Letters May 6, 1921)।

ইতিমধ্যে দেশ হইতে শান্তিনিকেতনে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে সবিস্তার খবর পাইলেন। রবীন্দ্রনাথ এইসব সংবাদ পাইয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"দেশের থেকে একজনের চিঠিতে পড়েছিলুম, তোমাদের শান্তিনিকেতন

নন্-কো-অপারেশনের একটি কেন্দ্র, তাই আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। নন্-কো-অপারেশন সম্বন্ধে তোমাদের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা যেমনি থাক্‌না কেন, কিন্তু এই নন্-কো-অপারেশনেরই ঝোড়ো হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে শান্তিনিকেতনের তরণী চল্‌চে একথা কল্পনা করতে আমার কিছুতেই ভাল লাগ্‌ছিল না। আমাদের আশ্রমকে সাময়িক কোনো দমকা হাওয়ায় বিচলিত হতে পারব না। ভারতবর্ষের আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রের চেয়ে অনেক বড় তত্ত্ব হচ্চে শান্তিনিকেতনের। * * * আমাদের শান্তিনিকেতন পলিটিক্সের বাহিরে—খবরের কাগজ তার জয়ধ্বজা নয়।" (প্রবাসী ১৩২৮, আষাঢ় পৃঃ ৪৩২)

জেনেভা হইতে কবি ও রথীন্দ্রনাথরা লুসার্ণ যাত্রা করেন; লুসার্ণের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া এমনকি হ্রদে মোটর বোটে বেড়াইয়া কবি অশেষ আনন্দ পাইতেছেন। এইখানে থাকিতে থাকিতে তিনি সংবাদ পাইলেন যে জারমেনিতে একটি বিদ্বজ্জন সমাজ কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে জারমেন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছেন। এই সঙ্ঘের প্রধান ছিলেন হাউপট্‌মান, বেরন্‌সট্রফ্, য়াকোবি, কৈসরলিঙ্, অয়কেন প্রভৃতি। কবি এই সংবাদ পাইয়া কতদূর আনন্দিত ও বিচলিত হইলেন তাহা তাঁহার পত্র হইতে বুঝা যায়। তিনি যে বিশ্বের বিদ্যার কেন্দ্র করিতে চাহিতেছেন, তাহা যে সফল হইবে তাহার সূচনায় তাঁহার মন পুলকিত হইয়াছে! জারমেনীতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া যে পত্রখানি লেখেন, তাহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

The generous greeting and the gift that have come to me from Germany on the occasion of my 61st brithday are overwhelming in their significance for myself. I truely feel that I have had my second birth in the heart of the people of that country, who have accepted me as their own.

"Germany has done more than any other countries in the world for opening up and broadening the channel of the intellectual and spiritual communication of the west

with India, and the homage of love, which she freely has given today to a poet of the east, will surely impart to this relationship the depth of an intimate and personal character.

"Therefore I assure you that my message of gratitude which goes out to my friends in Germany carries in it India's grateful appreciation of this hospitality of heart offered to her in the person of her poet."

Basleএ কবি ১০ই উপস্থিত হইলেন; এটি জার্মান সুইস্‌দের দেশ; এখানে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইল। এখান হইতে যে পত্র লেখেন সেখানি পাঠ করিলে দেখা যায় তাঁহার মন খুব প্রসন্ন; তিনি জারমেন সাহিত্যিকদের উপহারকে প্রেমের প্রতীকরূপে লইয়াছেন। It has helped me to feel how near we are to the people who in all appearance are so different from ourselves. (Letters 10 May 1921)।

পরদিন ৎসুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা করেন ও Hotel Viererissenএ তাঁহার রচনাবলী হইতে পাঠ ও আবৃত্তি করেন।

ৎসুরিক হইতে তাঁহারা Darmstadt যাত্রা করিলেম। তথায় কাউন্ট কাইসারলিঙের সহিত মাত্র একদিন থাকিয়া হামবুর্গ গমন করিলেন; ডার্মস্টাটে পরে আসিয়া বাস করিবেন। হামবুর্গে প্রায় এক সপ্তাহ থাকিলেন (১৩—২০ মে); শেষ দিনে য়ুনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেন; জারমেনীতে এই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা।

এই সময়ে কবি গভীরভাবে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন; তিনি ধ্যান করিতেছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন, যে-মিলন জ্ঞানের উপর শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত; তিনি বিশ্ববাসীকে পরস্পরের সাধনাকে অন্তরে গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়েই মহাত্মা গান্ধী দেশে বর্জননীতি প্রচার করিতেছিলেন; সে-বর্জননীতি যে আর্থিক ও শিল্প বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তাহা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। রবীন্দ্রনাথ দূর হইতে অসহযোগ

আন্দোলনের এই মূর্তিটা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন ; বিশেষ করিয়া এই সময়ে মহাত্মাজির একটি উক্তিতে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হন। মহাত্মাজি তখন পুরীতে ; দেশের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা কালে তিনি বলেন ইংরেজি শিক্ষার ফল দেশে ভাল হয় নাই। নানক, কবীর প্রভৃতির তুলনায় বর্তমান ইংরেজি শিক্ষার ফলে রামমোহন রায় নিতান্তই বামন (a pigmy)। কথাটা রিপোর্টারদের অনুগ্রহে কাগজে প্রকাশিত হয় ও 'মডার্ণ রিভিউ' কাগজে তা লইয়া মন্তব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজকে এক পত্রে লেখেন যে নানক ও কবীর যে মহত্বলাভ করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে যে সত্যধর্ম আছে তাহার মিলন সাধন করিয়াছিলেন ; বাহ্য অনৈক্যের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক ঐক্যের সাধনাই যথার্থ ভারতীয়। (realization of the spiritual unity through all differences of appearances is truly Indian. Letters 10 May 1921)। এই পত্রের অন্যত্র লেখেন যে ভারতবর্ষ বহুকাল বৃহৎ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে ছিল ; তাহার ফলে একদিকে লোকের মনে ভারতবর্ষর সভ্যতার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অত্যন্ত অন্ধ ধারণা জন্মিয়াছে, অপরদিকে জাগিয়াছে আত্মনিন্দা যাহা আত্মহত্যার তুল্য। জগতের সহিত সত্যকার পরিচয় লাভ করিতে হইলে প্রয়োজন নিঃস্বার্থ intellectual co-operation। বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া কোনো মহাজাতি গর্ব করিতে পারে না। কিন্তু এপর্যন্ত আমাদের জ্ঞান অন্বেষণ বৈদেশিক দাতার দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়াছে ; আমরা গ্রহণ করিয়াছি মাত্র, অর্জন করি নাই (we have been accepting and not acquiring)।

হামবুর্গ হইতে ১৭ই তারিখে যে পত্রখানি লেখেন তাহার মধ্যেও মহাত্মাজির উক্তি লইয়া প্রতিবাদ আছে।

ইতিমধ্যে ডেনমার্ক হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল ; তিনি ২১এ মে কোপন্‌হাগেন যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে বিরাট জনতা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল ; ২৩এ য়ুনিভার্সিটিতে বক্তৃতার পর ছাত্রেরা মশাল আলো লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া কবিকে তাঁহার হোটেলে আনিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! হোটেলের সম্মুখে ছাত্ররা ডানিশ্‌ জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত

হল্লা করিল ; তাহাদের আনন্দ সম্বর্ধনা কবিকে খুবই মোহিত করিয়াছিল। এইখানে বিখ্যাত দার্শনিক Hoffdingএর সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়।

২৩এ মে কবি সদলে ষ্টকহলম যাত্রা করিলেন। ২৪এ প্রাতে ষ্টেশনে কবিকে লইবার জন্য Swedish Academyর সেক্রেটারী Karlfeldt ও একদল সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। বাহিরে বিরাট জনতা অপেক্ষা করিতেছিল। ভারতীয় যে-কবি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তিনি আসিতেছেন, সুতরাং লোকের ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না! নোবেল প্রাইজ একাডেমির নিকট হইতে লইতে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই ; ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধে ; তিনি একাডেমির পুরস্কার বৃটীশ রাজদূত মারফৎ লর্ড কারমাইকেলের হাত হইতে পাইয়াছিলেন।

ষ্টকহলমে তখন লোক-উৎসব (Folk festival) চলিতেছিল ; লোক-শিল্প, লোক-কলা সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ ম্যুজিয়ম্ আছে, তাহারই প্রাঙ্গণে লোকনৃত্যর আয়োজন। রবীন্দনাথ তাহা দেখিতে যান। পৃথিবীর নানা রস তিনি যে সম্ভোগ করেন, তাহার পশ্চাতে অনেকখানি জ্ঞান আছে। তাই দেখি যেখানে যাইতেছেন সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষদের সহিত পরিচয় করিতেছেন, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিতেছেন, তাহাদের বিচিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেছেন। জীবনের এত অভিজ্ঞতা খুব কম লোকের ভাগ্যে হইয়াছে। সুইডেনের বিখ্যাত প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় Upsalaতে কবি নিমন্ত্রিত হইয়া যান। সেখানকার আর্চবিশপ কবিকে ক্যাথিড্রালে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করেন ও বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া যান। কবি এইসব অভিনন্দনে খুবই আপ্যায়িত হইতেছেন তাহা তাঁহার পত্র হইতে বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন, There is a rising tide of heart in the West rushing towards the shores of the East, following some mysterious law of attraction. The unbounded pride of the European peoples has suddenly found a check, and their mind appears to be reciding from the channel it had cut for itself. (Letters May 27, 1921)।

ইহার মধ্যে একদিন Volksbingen Theaterএ কবির 'ডাকঘর' নাট্য

অভিনীত হয়; রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হন; ২৭এ সাধারণের কাছে Message of the Forest প্রবন্ধ পাঠ করেন। ষ্টকহলম হইতে বার্লিন যাওয়ার কথা; গবর্মেণ্ট এরোপ্লেন দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিখ্যাত পর্যটক Sven Hedin এই সংবাদ পাইয়া কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা রদ করিতে বলেন; তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান জীবন কখনো Swedish pilotএর হাতে দেওয়া যায় না। আকাশপথে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল।

ইতিমধ্যে কবিকে একদিন সুইডিশ একাডেমির সম্মুখে নোবেল ট্রাষ্টের পদ্ধতি অনুসারে বক্তৃতা করিতে হয়। এই ভোজ সভায় প্রায় একশত বিশিষ্ট লোক ছিলেন। সভাশেষে উপসালার আর্চবিশপ বলিলেন, The Nobel prize for literature is intended for the writer who combines in himself the artist and the prophet. None has fulfilled these conditions better than Rabindranath Tagore. ২৫এ মে সুইডেনের রাজার সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়; লীগ্ অব নেশন-এর প্রধান সভাপতি Dr. Brantingএর সহিত তাঁহার এখানে পরিচয় হয়।

২৯এ মে বার্লিনে ফিরিলেন ও তথায় জারমেনীর বিখ্যাত শিল্পপতি (indrustrialist) হুগো ষ্টিনেসের অতিথি হইলেন। ষ্টিনেস তখন দক্ষিণ জারমেনীতে ছিলেন, কবির সহিত দেখা করিবার জন্য আসিলেন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের অনুরোধে কবিকে বক্তৃতা করিতে হয় (২রা জুন) সেই বক্তৃতার ব্যাপার একটা ইতিহাস হইয়া রহিয়াছে। এরূপ জনতা পূর্বে কখনো কেহ দেখে নাই। Scenes of frenzied hero worship marked a public lecture given by Rabindranath Tagore. In the rush for seats many girls fainted......In the last moment the police came and restored order.

সেই সময়ের মধ্যয়ুরোপের সমসাময়িক কাগজে এসম্বন্ধে প্রচুর খবর ও সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কাগজে বলিয়াছিল যে রাস্তায় প্রায় ১৫ হাজার লোক জমা হইয়াছিল কেবল কবিকে দেখিবার জন্য।

সেইদিনই শিক্ষাসচিব ও আরবী ভাষার অধ্যাপক ডাঃ বেকার (Backer) কবির জন্য একটি banquet দেন, সেখানে বহু গণ্যমান্য লোক ও অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন (৩রা জুন) কবিকে য়ুনিভার্সিটিতে পুনরায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল; পূর্বদিনে যাহারা শুনিতে পায় নাই তাহাদিগের জন্য কবি বক্তৃতা করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সেইদিন মিঃ নোবেল তাঁহাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেন, ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁহার জন্য একটি পার্টি দেয়, রাত্রে Walter Rathenau ডিনারে বলেন। এই রাথেনাউ সে-সময়কার একজন চিন্তাশীল অর্থনীতিজ্ঞ ছিলেন; তিনি আর্থিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

প্রুশিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরীতে পৃথিবীর বিখ্যাত লোকদের কণ্ঠস্বরের রেকর্ড আছে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর, তাঁহার হস্তাক্ষর তাহারা লইয়া চিরকালের জন্য রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। Message of the Forest এর শেষাংশ ও বাঙলা 'মোর বীণা উঠে কোন্ সুরে বাজি' এই গানটির রেকর্ড তোলা হইয়াছিল।

৫ই জুন রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন জারমেনীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ম্যুনিক উপস্থিত হইলেন; সেখানে তাঁহার জারমান গ্রন্থের প্রকাশক কুর্ট্ উল্‌ফ (Kurt Wolff)এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহার বাসায় Thomas Mann, Bjornson (Jr) এবং অন্যান্য সাহিত্যিকরা মিলিত হন; কবি তাঁহার রচনা হইতে পাঠ করিয়া সকলকে তৃপ্ত করেন।

৭ই তিনি ম্যুনিক য়ুনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করেন; সেই বক্তৃতার ও জারমান গ্রন্থ বিক্রয় বাবদ যে ১০,০০০ মার্ক তাঁহার প্রাপ্য হয়, তাহা তিনি ঐ নগরীর ক্ষুধাক্লিষ্ট শিশুদের জন্য দান করেন।

ইতিমধ্যে জারমেনীর নানাস্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতে থাকে; কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিহেতু তিনি সেসব নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তবে ফ্রাঙ্কফুর্টের নিমন্ত্রণ তাঁহাকে গ্রহণই করিতে হয়। সেখানে Hesse এর Grand Duke কবিকে স্বয়ং অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাকে Darmstadt এ তাঁহার প্রাসাদে লইয়া যান। পূর্ব হইতে সেখানে যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; এই Darmstadt এ Count Keyserling তাঁহার দর্শন সম্বন্ধীয় একাডেমি (School of Wisdom) স্থাপন করিয়াছিলেন; Duke ছিলেন তাঁহার প্রধান শিষ্য। রবীন্দ্রনাথ এক সপ্তাহ

থাকিবেন বলিয়া পূর্ব হইতে বিজ্ঞাপন করা হয়, এবং চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র লোক কবিকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে আসিতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্ণে মুক্ত প্রাঙ্গণে সভা বসিত। লোকে প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইত, কবি তাহার উত্তর দিতেন, কাউণ্ট কাইসারলিঙ তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেন। তাঁহার উপদেশাবলী মুদ্রিত হইয়া প্রতিদিন প্রচারিত হইত।

একদিন রাজপরিবারের সম্মুখে কবি Message of the Forest প্রবন্ধটি পাঠ করেন; অপর একদিন ex-duke আসিয়া রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ লোকের একটি উৎসবক্ষেত্রে লইয়া যান। চার হাজারের বেশি লোক একটা খোলা জায়গায় বনের ধারে সমবেত হইয়াছিল; কবি আসিলে, তাহারা একসঙ্গে গান গাহিয়া উঠিল, সে-গান হৃদয়ের গান, আনন্দের গান, কবিকে সম্মান প্রদর্শনের তাহাদের ভাষা; সমস্ত জনসঙ্ঘ প্রায় একঘণ্টাকাল এইভাবে গান গাহিয়া তাহাদের মনের আবেগকে প্রকাশ করিল। কবি পরে যথোপযুক্ত-ভাবে একটি উত্তর দেন।

ডার্মষ্টাটে একদিনের প্রশ্নের নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি; একজন কানাডা প্রবাসী জারমান প্রশ্ন করেন, 'বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পরিণাম কি?' 'জনাধিক্যের সমস্যা কিভাবে পূরণ হইতে পারে।' ইহার পর প্রশ্ন হয় 'বৌদ্ধধর্মের মোট কথা কি?' এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে প্রায় তিনঘণ্টা লাগে। য়ুরোপীয় মনের ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হন; এবং ভারতের মনের দৈন্যের কথা তীব্রভাবে অনুভব করেন। ভারতের ইংরেজ অধ্যাপকগণ লোক ভাল, কিন্তু ideaর জগতের ছোঁয়াচ তাঁহাদের লাগে না; এবং সেইজন্য তাঁহারা ছাত্রদিগকেও ideaর ক্ষেত্রে জাগাইতে পারেন না। ডার্মষ্টাটের পত্রে তিনি বর্তমান রাজনীতিকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, Politics in every country has lowered the standard of morality, has given rise to a perpetual contest of lies and deceptions, cruelties, hypocrisies and has increased inordinately national habits of vainglory.

১৩ই জুন কবি ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তথায় Village

Mystics of Bengal সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রেক্টর সভায় কবিকে সম্বর্ধনাকালে যে বক্তৃতা করেন, তাহার একস্থানে বলেন, Out of a noble feeling of sympathy you have come to us to Germany, to a people that have imposed upon themselves a stern and heavy task of an inner regeneration. You wish to help us by your advice, you desire us to participate in the precious treasures stored up in your heart.

পরদিন তথাকার শ্রমিকসঙ্ঘ বলিয়া পাঠায় যে কবিকে তাহারা দেখিতে পায় নাই, তাঁহাকে তাহারা তাহাদের মধ্যে পাইতে চায়। শ্রমিকসম্প্রদায় কি শ্রেণীর লোক তাহা সকলেই জানিতেন। কবি তথায় উপস্থিত হইলে, তাহারা তাঁহাকে কোনো প্রকার সম্মান দেখাইবার জন্য ঔৎসুক্য দেখাইল না; বিয়ার-এর বোতল ও মগ সম্মুখেই থাকিল, চুরুটের ধোঁয়া উড়িতে লাগিল।

কবি ধীরে ধীরে কথা বলিতে সুরু করিলেন, এবং যেমন সেগুলি অনূদিত হইতে লাগিল, সভার শ্রোতাদের ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষিত হইল; কিছুক্ষণের মধ্যে বিয়ারের মগ বেঞ্চের নীচে গেল, চুরুট পকেটে গেল। কবি বলিয়াছিলেন যে জীবনে তাঁহার এতবড় জয় আর কোনো দিন হয় নাই।

ডার্মষ্টাট্ হইতে কবি বিয়েনা যান; দেশে ফিরিবার জন্য ইচ্ছা প্রবল হইলেও অষ্ট্রিয়ার ডেপুটেশনকে তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। বিয়েনায় দুটি বক্তৃতা করেন। সেখানে যে-সম্মান লাভ করেন, তাহা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায় বলি; I cannot remember any living poet who has been received with such unanimous and profound reverence and praise by the Vienna public and the Press or who has made such a deep impression by his personal appearance as this great Bengali writer and thinker.

১৭ই জুন কবি বিয়েনা ত্যাগ করিয়া প্রাগে আসিলেন। তাঁহার জন্য গবর্মেণ্ট বিশেষ সেলুনগাড়ী পাঠাইয়া দেন। এইখানে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; একটি চেক্, অপরটি জারমান। চেক্ য়ুনিভার্সিটির সংস্কৃত অধ্যাপক Dr. Lesny ও জারমান য়ুনিভার্সিটির সংস্কৃত অধ্যাপক Dr. Winternitz

সর্বদাই কবির সেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। প্রাগের Concert Hall বিশাল গৃহের মধ্যস্থলে কবির জন্য বিশেষভাবে একটি মঞ্চ নির্মিত হয়। সেইখান হইতে তিনি বক্তৃতা করেন।

২১এ জুন কবি প্রাগ্ ত্যাগ করিয়া ষ্ট্রাস্‌বুর্গ যাত্রা করেন ও সেখানে একদিন থাকিয়া প্যারীতে ফিরিয়া আসিলেন। ১লা জুলাই প্যারী ছাড়িয়া মার্সাই আসিয়া তিনি ভারতগামী জাহাজ 'মোরিয়া' ধরিলেন। ষ্টীমারে বসিয়া প্রতিদিন তিনি একখানি করিয়া পত্র এণ্ড্রুজের উদ্দেশ্যে লিখিতেন ও ভারতবর্ষে আসিয়া পত্রগুলি তিনি নিজেই তাঁহার সমর্পণ করেন। ১৬ই জুলাই ১৯২১ বোম্বাই পৌঁছান। এ যাত্রায় বিদেশে ১ বৎসর ২ মাস ২ দিন থাকা হয়।

ভারতবর্ষে পৌঁছিবার দিন চার পূর্বে তিনি যে পত্র লিখিতেছেন, তাহাতে International University সম্বন্ধে তাঁহার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন (July 12th, 1921, Letters p. 183)।

২০। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা

১৬ই জুলাই ১৯২১, বোম্বাইতে নামিয়া কবি সোজা শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলেন (২রা শ্রাবণ ১৩২৮)। শিশুবিভাগের বাড়ীটি (সন্তোষালয়) তখন নূতন হইয়াছে সেই ঘরে কবির সম্বর্দ্ধনা হইল। এই বাড়ীটি তৈয়ারী হয় আশ্রমের ভক্ত গুজরাতি পৃষ্ঠপোষকদের অর্থে। দুইদিন পরেই কলিকাতায় গেলেন; আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কাহারও সহিত দেখা হয় নাই; দেশের অবস্থাও কিরূপ তাহাও সেখানে না গেলে বুঝিতে পারিবেন না। কলিকাতার প্রেসের রিপোর্টারদের উপদ্রবে তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন; তাড়াতাড়িতে বলিবার সময় একদিন কি বলিয়াছিলেন, তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হইবার উপক্রম হয়; তখন তিনি পুনরায় তাহাদের স্পষ্ট করিয়া মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন

সম্বন্ধে তাঁহার মত বলেন। কিন্তু এভাবে রিপোর্টারদের কাছে মতামত প্রকাশ করিয়া কোনো লাভ নাই বুঝিয়া নিজেই তাঁহার মতামত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার জন্য লেখনী গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ও 'শিক্ষার মিলন' নামে প্রবন্ধ লিখিলেন। আশ্রমবাসীদের কাছে ১০ই আগষ্ট প্রবন্ধটি পাঠ করেন; বিলাত হইতে ফিরিয়া তিন সপ্তাহের মধ্যেই স্পষ্টভাবেই তিনি মহাত্মার বিস্তার অসহযোগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করিলেন। ১১ই আগষ্ট রথীন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

১৫ই আগষ্ট কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের হলে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন; এই সভায় কবি 'শিক্ষার মিলন' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন; স্যর আশুতোষ চৌধুরী সভাপতি হন। সন্ধ্যার সভায় বেলা ৪টার পূর্বে ঘর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এরূপ জনতা খুব কম হইয়াছিল। মহাত্মাজী সম্বন্ধে কবি কি বলেন তাহাই জানিবার জন্য লোকের উৎসাহ!

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশের ন্যাশনালিজমের বীভৎস রূপের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে পশ্চিমের চিন্তাশীল মনীষীরা ন্যাশনালিজম্‌কে দুর্বুদ্ধিরই নামান্তর মনে করিতেছেন। দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা এই নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া য়ুরোপে কি মহা অশান্তি আনিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছেন। মানুষের এই রিপু জাগিয়াছে,তাহার শিক্ষার মধ্য দিয়া; সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির শিক্ষা পাইয়া মানুষ এমন বিভীষিকাময় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীতে নূতনভাবের আদর্শ প্রচারের জন্য নূতন শিক্ষার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা সেই সমস্যার পুরণের কথা বলি। "স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ ক'রবে। যেসকল রিপু যেসকল চিন্তার অভ্যাস ও আচার পদ্ধতি এর প্রতিকূল তা' আগামীকালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে তুলবে।" য়ুরোপের ন্যাশনালিজমের আবর্জনা পাছে এদেশে আসিয়া ভারতবর্ষের মৈত্রীর সাধনাকে ম্লান করিয়া ফেলে তজ্জন্যই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিলেন। ভারতের সাধকদের মন্ত্র ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। সুতরাং ভারতবর্ষে ন্যাশনালিজমের ও অসহযোগের যে ধুয়া উঠিয়াছে, তাহা

য়ুরোপের ভাবুক মহলে, সাধকদের দ্বারা সমাদৃত নহে, তাহা ভারতীয় সাধকদের সাধনালব্ধ ঐশ্বর্য নহে।

"এইজন্য আমাদের দেশের বিদ্যা-নিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন করে তুলতে হবে। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। * * আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।" (প্রবাসী ১৩২৮ ভাদ্র)।

'শিক্ষার মিলনে'র মধ্যে খুব স্পষ্ট করিয়া ও প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও বেশ পরিষ্কার করিয়াই তিনি মহাত্মাজীর শিক্ষা-অসহযোগের বিরুদ্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করিলেন। দেশের লোক তখন উন্মত্তপ্রায়; স্বরাজ এক বৎসরের মধ্যে হইবে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে। সকলে অসহযোগ করুক আর নাই করুক, ইহার নৈতিক ও আত্মিক বল সম্বন্ধে তাহাদের কোন সন্দেহ ছিল না; সুতরাং এই সময়ে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থ লোকের বিরাগভাজন হওয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া কোনোকালে লোকের অপ্রিয় হইতে ভয় পান নাই। পুনরায় ১৮ই আগষ্ট এলফ্রেড্ থিএটরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে তিনি এই বিষয়েই বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় টিকিট বিক্রয় হয় এবং সেই টাকা খুলনার দুর্ভিক্ষ তহবিলে যায়; সেই সময়ে ঐ জেলায় দারুণ অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল।

২০এ আগষ্ট সেবা সমিতি রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা করে; ২১এ সঙ্গীত সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি গানের জলসা হয় ও সেখানে তিনি 'আমাদের সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন (সবুজপত্র ১৩২৮ ভাদ্র পৃঃ ৭৩-৭৯)।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি খুব ব্যস্ত; প্রথমত কলিকাতায় বর্ষাকালে বর্ষামঙ্গল বা গানের জলসা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন; 'সত্যের আহ্বান' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন ও ২৯এ আগষ্ট য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে উহা পাঠ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলনে'র প্রতিবাদ করেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র। তখন তিনি একজন

অসহযোগী,—রাজনৈতিক কর্মী না হন লেখক বটে। তাঁহার প্রবন্ধের নাম দেন 'শিক্ষার বিরোধ'। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলনে' যে-কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন এই 'সত্যের আহ্বানে'।

এইসব প্রবন্ধ পাঠ ও সভা সমিতিতে বক্তৃতার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ঘটনা হইতেছে কবির 'বর্ষামঙ্গলে'র জলসা; বাঙালীর আর্ট-ইতিহাসের এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে। । ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব হয়। কলিকাতায় এই ধরণের জলসা আধুনিক কালের মধ্যে বোধহয় ইহাই প্রথম। ইহার পর শান্তিনিকেতনের বালক বালিকাদের দ্বারা বহুবার এই ধরণের জলসা হইয়াছে, এবং অন্য বহু প্রতিষ্ঠান অনুরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছেন। গানের এই মজলিস কলিকাতার শিক্ষিত ও সমজদার সমাজের চিত্তকে বেশ একটু চেতাইয়া তুলিয়াছিল। গানের মাঝে মাঝে কবি 'কল্পনা' হইতে আবৃত্তি করেন। সমস্ত জিনিষটা সাহিত্য ও সঙ্গীত রসিকদের খুব ভাল লাগিয়াছিল। ইহা তখন কেবল গানের মজলিশই ছিল; নৃত্য তখনো সমাজে প্রবেশ করে নাই।

১৯এ ভাদ্র (৪ঠা সেপ) 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা করেন। য়ুরোপীয় যুদ্ধের পর বিদেশে গিয়া তিনি যে বিপুল সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য এই বিশেষ সভা আহ্বান করিয়াছিল। গুণমুগ্ধ হীরেন্দ্রনাথ সম্পাদকরূপে ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতিরূপে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। হরপ্রসাদ আশীর্বচনে বলেন, "শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ, তুমি যখন নিতান্ত বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙালী মুগ্ধ। * * তোমার গুণে বাঙলা চিরদিনই মুগ্ধ, ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশেই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'অভিভাষণে' তাঁহার মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন। ইহার একস্থানে তিনি বলেন। "পঞ্চাশোর্ধে আমি পশ্চিম মহাদেশে গিয়ে পৌঁছলেম। দেখলেম সেখানে আমার বাসস্থান আছে। দেখলেম সংসারে এই আমার দ্বিতীয় জন্মের মাতৃক্রোড় পূর্বে হতেই প্রসারিত। আপন দেশ থেকে দূরে, যেখানে জন্মগত কোনো দাবী নেই, কর্মগত কোনো দায় নেই,

সেইখানে যখন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া যায়, তখনি আমরা বিশ্বজননীর সুধাস্পর্শ পেয়ে থাকি। আমার ভাগ্যক্রমে সেই স্পর্শের আশীর্বাদ লাভ করেছি এবং মাতৃভূমিতে বহন করে এনেছি বলেই, আমার রচনার পরে বিশ্ববাণীর প্রসন্নতা লাভ করেছি বলেই, আজ আপনারা আমাকে নিয়ে বিশেষ আনন্দ করচেন।" (স-প ১৩২৮ ভাদ্র, পৃঃ ১১৩)।

কিন্তু বিদেশ হইতে সম্মান লাভের বহুপূর্বে দেশবাসী তাঁহার কপালে সম্মানের শ্রেষ্ঠতিলক দিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরের জন্মোৎসবের সময়। টাউন-হলের সেই বিরাট সভা, সেই অভিনন্দনের কথা লোকের স্মরণ আছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বাঙলার উপর দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচণ্ড তপ্ত হাওয়া বহিতেছে ; আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মচারীরা ধর্মঘট করিয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা তাঁহাদের সুবিধার জন্য এই ধর্মঘট পরিচালনা সুরু করিলেন। ধর্মঘট কয়েকমাস চলিয়াছিল, তাহাতে সর্বনাশ হইয়াছিল দরিদ্র বাঙালী কেরাণীকুলের ও চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ; দুর্ভোগ ভুগিয়াছিল সাধারণ বাঙালী যাত্রীরা।

এই উত্তেজনার মুহূর্তে গান্ধীজী কলিকাতায় আসিলেন। ২১ ভাদ্র বা ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাসায় রবীন্দ্রনাথের সহিত গান্ধীজী সাক্ষাৎ করিলেন। এণ্ড্রুজ ছাড়া সেখানে কেহই উপস্থিত ছিলেন না। প্রায় চারি ঘণ্টা তাঁহাদের আলোচনা হয়। আলোচনার কোনো রিপোর্ট কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। 'বিচিত্রা'র বাড়িতে তাঁহাদের আলোচনা যখন চলিতেছে, সেই সময়ে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণ জনতায় পূর্ণ হয়। এইসব লোকের মধ্যে যাহারা অতি বুদ্ধিমান তাঁহারা জানিতেন রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর বিরোধিতা করিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ বিলাতী বস্ত্রাদিতে অগ্নিসংযোগের পক্ষপাতী নহেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই মতের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর হইতেছে, তাঁহারই প্রাঙ্গনে বিলাতী কাপড় পোড়ানো ! মহাত্মাজীর এই সব অহিংসক চেলাদের সুবুদ্ধির প্রশংসা কোনো কাগজেই করে নাই।

উভয় মহাপুরুষের দীর্ঘ আলোচনার ফল বিশেষ কিছু হয় নাই ; মহাত্মাজী যথারীতি তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের ইন্ধন সন্ধানে বাহির হইলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মিলনমূলক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য শান্তিনিকেতনে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ কাপড় পোড়ানোর বিপক্ষে ; তিনি মহাত্মাজীকে বুঝাইতে পারিলেন না যে যখন খুলনায় দুর্ভিক্ষ, লোক অন্নবস্ত্রের অভাবে মরিতেছে, তখন কাপড় পোড়ানো অন্যায়। গান্ধীজী বলিলেন, বিলাতী কাপড় পাপ তাহাকে দগ্ধ করাই কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, কাপড় পাপ হয় কি করিয়া। পাপ ত একটা নৈতিক বিষয়, কাপড়ের সঙ্গে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বিষয় কেমন করিয়া আসিতে পারে তাহা তাঁহার পক্ষে অবোধ্য ; অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহাকে বরং বোঝা যায়। কিন্তু মহাত্মাজী ইহাকে পাপই বলিয়া বিশ্বাস করেন।

পরদিন কলিকাতা হইতে কবি শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলেন ; বুঝিলেন লোকের মানসিক অবস্থা যেখানে পৌছিয়াছে সেখানে তাহারা তাঁহার কথা বুঝিবে না। এবার আসিয়া শান্তিনিকেতনে সাড়ে তিন মাস (৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৮ এ ডিসেম্বর পর্যন্ত) ক্রমান্বয়ে ছিলেন। বাহিরের কোনো কাজে যান নাই ; দেশ তখন নিজের কোলাহলে নিজেই মত্ত। আশ্রমে বাস করিয়া বিশ্বভারতীর অধ্যাপনায় কবি সাহায্য করিতেছেন, কখনো ইংরেজি সাহিত্য, কখনো তাঁহার Creative Unity পড়াইতেছেন।

য়ুরোমেরিকা ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ বহু মনীষীকে আমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ২৬ এ সেপ্টেম্বর আশ্রমের পুরাতন বন্ধু অধ্যাপক পিয়ার্সন ফিরিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে তিনি ১৯১৬ সালের মে মাসে কবির সহিত জাপান যাত্রা করেন ; তার পর কবির সঙ্গে না ফিরিয়া তিনি জাপানে রহিয়া যান। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে তিনি বন্দী হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হন ; ১৯২০-২১ সালে কবির সঙ্গে আমেরিকায় ছিলেন। আশ্রমকে সেবা করিবার জন্য তিনি পাঁচ বৎসর পরে ফিরিলেন ; তাঁহাকে পাইয়া আশ্রমের ছাত্র অধ্যাপক সকলেই আনন্দিত হইলেন।

২৭ এ সেপ্টেম্বর আসিলেন L. K. Elmhirst নামে একজন ইংরেজ যুবক। এই যুবক অভিজাত ইংরেজ বংশের ; আমেরিকায় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কবির গ্রামসংস্কার সম্বন্ধে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তাহা সফল করিবার জন্য আসিলেন। আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া এলমহার্স্ট কবিকে লেখেন যে তিনি বিশ্বভারতীর কাজে যোগদান করিতে ইচ্ছুক। কবি

তাঁহাকে লেখেন যে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা এমন কিছু সচ্ছল নয়, যাহাতে তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহাকে গ্রামসংস্কারের কর্মে ব্রতী হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারিবেন। এলমহার্ষ্ট তাঁহার জবাবে কবিকে জানান যে টাকার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। তখনি কবি তাঁহাকে আসিবার জন্য লেখেন।

এলমহার্ষ্ট তাঁহার আমেরিকান বান্ধবী Mrs. Straightএর নিকট হইতে বিশ্বভারতীতে কাজ করিবার জন্য বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পান ; সেই ভরসায় তিনি আসিলেন। বিদেশী ইংরেজ এমনভাবে অর্থ সামর্থ্য দিয়া কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে, ইহাতে অনেকে আশ্চর্যান্বিত হন। এমনকি কেহ কেহ সন্দেহের চোখেই ইহার ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সে মহাপ্রাণকে বুঝিতে অনেকের সময় লাগিয়াছিল। এলমহার্ষ্ট স্থির করিলেন সুরুলে কাজ সুরু করিবেন।

পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১২ সালে কবি সুরুলের বাড়ী ও জমি ক্রয় করেন। তার উপর অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল ; রথীন্দ্রনাথ সপরিবার থাকিবার চেষ্টা করেন ; জামাতা নগেন্দ্রনাথও কিছুকাল ছিলেন। কিন্তু গঠনমূলক কার্য গড়িয়া উঠে নাই। এইবার সেখানে কার্য আরম্ভ হইল এই ইংরেজ যুবকের সহায়তায়।

এদিকে কবির মন নানাদিকে আত্মপ্রকাশে ব্যস্ত। শারদীয় অবকাশ আসিতেছে—তাহার পূর্বে বরাবর কোনো না কোনো নাটক অভিনীত হয়। এবার 'শারদোৎসব' অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে ; কবি পুরাতন নাটকখানিকে কিছু বদলাইয়া 'ঋণশোধ' নাম দিয়া লিখিয়াছেন। কিছুকাল হইতে কবির মধ্যে একটি নূতন দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে তিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহাকে 'বুঝাইবার' চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সুরু হয় 'ফাল্গুনী'র ভূমিকা 'বৈরাগ্য সাধন' দিয়া। 'শারদোৎসব' নাটিকাটির মধ্যে যে সৌন্দর্যটি প্রচ্ছন্ন ছিল, রাজা বিজয়াদিত্য যে সন্নাসী এই সংবাদটি বেশ নাটকীয়ভাবে নাট্যের শেষদিকে প্রকাশ পাইয়াছিল, কবি প্রথমেই সেটিকে প্রকট করিয়া দিয়াছেন 'ঋণশোধে'। কবিশেখর হইতেছেন টীকাকার। রাজা, কবিশেখর, ঠাকুর্দা তিনজনে মিলিয়া নাটকের মধ্যে কথাবার্তা কহিতেছেন ; সেগুলি তত্ত্ব হিসাবে ভাল, কিন্তু নাট্য-সাহিত্য হিসাবে নয়। অভিনয়কালে মনে

হইতেছিল যেন তিনজনে মিলিয়া পরস্পরকে প্রশংসা করিবার জন্য ব্যস্ত। সুখের বিষয় কবি রসজ্ঞ ক্রিটিক্; নিজের ত্রুটি ধরিতে পারেন এবং সাধারণ সমালোচকদের হইতে বেশি করিয়াই পারেন, তাই পরবর্তী সংস্করণে (ঋতু-উৎসব) পুরাতন 'শারদোৎসব' বজায় রাখিয়াছেন।

২রা অক্টোবর নাটক অভিনয় হইল, ৩রা অক্টোবর বিদ্যালয় বন্ধ হইল। কবি কোথায়ও গেলেন না। ছুটির মধ্যে মিঃ ও মিসেস্ কাজিন্স্, কলিকাতার সুকুমার রায় চৌধুরী (তাতা বাবু) সপরিবারে, অধ্যাপক সহিদুল্লা, কবি নজরুল ইসলাম আসিয়াছিলেন।

খুব ভিড় নাই; অতিথি অভ্যাগতের উৎপাত কম। কবি আপন মনে কবিতা রচনা করিতেছেন। বহুকাল কাব্যলক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; এবার লিখিতেছেন 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতা। 'শিশু ভোলানাথ' পড়িলে কবির 'শিশু'র কথা স্মরণ হয়। এ ছাড়া গানের সুর আসিয়াছে—একটির পর একটি গান চলিতেছে। য়ুরোপে ও আমেরিকায় এবার যেভাবে কাটাইয়াছিলেন, তাহাতে কাব্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ মেলা ভার হইয়াছিল। তাই এই বিরামের দিনে কবি নিজেকে যেন ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে আছেন। সকালে প্রায় বেড়াইতে যান; লেখকের মা তখন পীড়িতা, সুকুমার রাকু অসুস্থ; দুই জন রোগীই সাংঘাতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। কবি নিত্য আসিয়া দেখিয়া যান, ঔষধ দেন।

নভেম্বরের ১০ তারিখে বিদ্যালয় খুলিল; ৯ই নভেম্বর ফ্রান্স হইতে অধ্যাপক লেভি সস্ত্রীক আশ্রমে আসিলেন; তাঁহারা উঠিলেন 'সুর মন্দিরে'। *

অধ্যাপক লেভি আসিলে 'বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগে'র (পরে বিদ্যাভবন নাম হয়) কার্য রীতিমত সুরু হইল। তিনি বক্তৃতা দিতেন; সেই বক্তৃতায় কবি উপস্থিত থাকিতেন ও বক্তৃতার শেষে অতি পরিষ্কারভাবে সমস্ত বিষয়টি বাঙলায় বুঝাইয়া দিতেন। লেভি আসিবার পর বিশ্বভারতীতে চীনা ও তিব্বতী ভাষার অনুশীলন আরম্ভ হইল। ইতিপূর্বে ভারতের

* অর্থাৎ যেটাতে পরে দিনুবাবু থাকিতেন। ঐ বাড়ী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে তৈয়ারী করেন; তখন দিনুবাবু থাকিতেন দেহালিতে। কবি থাকিতেন তাহার মাটির বাড়ীতে; উত্তরায়ণের অট্টালিকা তখনো নির্মিত হয় নাই।

কোনো বিদ্যায়তনে এই দুটি ভাষার চর্চা আরম্ভ হয় নাই। ভারতের বাহিরের সহিত প্রাচীন ভারতের যে আত্মিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারই উপলব্ধির জন্য এই ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার উদ্বোধন হইল।

বিশ্বভারতীর idea ফ্রান্সে একদল লোককে ভাল লাগিয়াছিল; সেখানে 'ভারতের বন্ধু' নামে এক সমিতি গঠিত হয়; অধ্যাপক সেনার (Senart) তাহার সভাপতি হন। এই সভার চেষ্টায় যে টাকা উঠে তদ্দ্বারা ফরাশী সাহিত্যের প্রধান গ্রন্থাবলী, প্রাচ্য সাহিত্য ইতিহাসের গ্রন্থ ও পত্রিকা বহু শত খণ্ডে তাঁহারা প্রেরণ করেন। শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরী এতদিনে ভারতীয় ছিল, এখন যথার্থভাবে বিশ্ব-ভারতীয় গ্রন্থাগারের পত্তন হইল। ফ্রান্স-প্রবাসী কচ্ছি-ধনী বণিক শ্রীধর রাণা তাঁহার মৃত পুত্রের সুবৃহৎ গ্রন্থাগার এই সময়ে দান করেন। বাহির হইতে অর্থ সাহায্যও এই সময়ে আসিতে আরম্ভ করে। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের পর এক বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায় আঠার হাজার টাকা ও আশ্রমের হিতাকাঙ্ক্ষীরা চব্বিশহাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। (শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৮ পৃঃ ২৩)। এই অর্থ পাওয়াতে লাইব্রেরীর বাড়ী বড় করিয়া দোতলা করা হইয়াছিল।

বাহিরের এই আয়োজন; কবির অন্তরও এখন সঙ্গীতে পূর্ণ। 'হেমন্তে বসন্তের বাণী' 'শীতের হাওয়া লাগ্‌লো' ইত্যাদি গান এই সময় রচনা করিতেছেন। বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের ছাত্রদের জন্য তিনি 'বালকা' পড়াইতে সুরু করিলেন (১৮ই.নভেম্বর ; ২ অগ্র, ২৮); কবির ব্যাখ্যানগুলি পরে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমার সেন সেগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন।

ডিসেম্বর হইতে উৎসবের আয়োজন হইতেছে; তাছাড়া এবার 'বিশ্বভারতী' যথাবিধিভাবে পৌষ উৎসবের সময় প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া আলোচনা ও আয়োজন চলিতেছে এমন সময়ে পূর্ব-আফ্রিকা হইতে এণ্ড্রুজ ফিরিলেন; তিনি মহোৎসাহে এই কার্যে লাগিয়া গেলেন।

কবি বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিতেছেন। বিশ বৎসর তিনি স্বয়ং ইহার দায়িত্ব ও ভার বহন করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এখন তাঁহার একার পক্ষে সে-ভার দুর্বহ। বিদেশে গিয়া তিনি অনেককে

নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন, বিশ্বভারতীতে নানা বিভাগ খুলিতেছেন, অথচ তাঁহার অর্থের মধ্যে পুঁজি বই বিক্রয়ের টাকা ও নোবেল প্রাইজের সুদ। সুতরাং এখন বাহিরকে সহায়তার জন্য আহ্বান করিলেন ও 'বিশ্বভারতী' সর্বসাধারণকে উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

৭ই পৌষ উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইল। কবি মন্দিরের উপাসনা করেন।

পরদিন প্রাতে আম্রকুঞ্জে 'বিশ্বভারতী' স্থাপনের উদ্বোধন সভা হইল। সেই সভায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ' গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছিল তাহা গৃহীত হয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় রবীন্দ্রনাথ আচার্য সিলভাঁা লেভি, ম্যাডাম লেভি, রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির প্রমুখ বহু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভারূপে যে বক্তৃতা করেন তাহা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

উৎসবান্তে কবি ২৮এ ডিসেম্বর (১৩ পৌষ ১৩২৮) আশ্রম ত্যাগ করিয়া শিলাইদহ নির্জনবাসের জন্য যান। এক সপ্তাহ সেখানে থাকিয়া ফিরিয়া আসেন (২২ পৌষ)। ফিরিয়া আসিয়া একটি নূতন নাটক লিখেন; নাটকটিকে ঠিক নূতন বলিতে পারি না, কারণ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানির একটা সুর রাখিয়া তিনি 'মুক্তধারা' লিখিলেন। সাহিত্যের নূতন সুর পাইতেছেন না যেন—মন বাহিরের কাজে এতই লিপ্ত, অথচ কিছু করিবারও ইচ্ছা; তাই 'শারদোৎসব' ভাঙিয়া করিলেন 'ঋণশোধ', এবার 'প্রায়শ্চিত্ত'র ছায়াবলম্বনে লিখিলেন 'মুক্তধারা'।

'মুক্তধারা'র গল্পাংশ এইরূপ। উত্তরকূটের রাজা রণজিতের শিল্পী বিভূতি বহুবৎসরের পরিশ্রমের পর মুক্তধারার বাঁধ নির্মাণ করিয়াছে। বাঁধটি নির্মিত হওয়ায় শিবতরাইয়ের দুর্ধর্ষ প্রজাদের জলসরবরাহ নির্ভর করিতেছে উত্তর-কূটরাজের কৃপার উপর। প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ করিয়াছে। দেশে দুর্ভিক্ষ, তাহারা খাজনা দিবে না। রাজা যুবরাজ অভিজিৎকে তাহাদের

শাসন করিতে পাঠান ; তিনি প্রেমের দ্বারা তাহাদের বশ করেন ; কিন্তু রাজস্ব তাহারা দিতে অপারক বলিয়া রাজা তাঁহার শ্যালককে শাসনকর্তা করিয়া পাঠান ও তাঁহার অত্যাচারে লোকে অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। এদিকে যুবরাজ অভিজিৎ রাজখুল্লতাত বিশ্বজিতের নিকট জানিতে পারেন তিনি রাজকুলের কেহ নহেন, তাঁহাকে মুক্তধারার নিকট রাজা পান ও পুত্রস্নেহে পালন করিতেছেন। যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মুক্তধারা বন্ধ করিয়া শিবতরাইয়ের সর্বনাশ করিতে নিষেধ করেন। বিভূতির গর্ব মুক্তধারা শাসনে ; তাহাতে শিবতরাইয়ের কি ক্ষতি তাহা বিচার্য নহে। উত্তরকূটের সমস্ত লোক জাতিকে ও দেশকে ভালবাসে ; সে-ভালবাসার দ্বারা তাহারা শিবতরাইয়ের সর্বনাশ করিয়াছে। যুবরাজ তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া উত্তরের একটি পথ মোচন করিয়া দেন, তাহাতে সেখানকার লোকদের বাণিজ্যের সুবিধা হয় ; কিন্তু উত্তরকূটের স্বার্থ হানি হয়। মুক্তধারা বন্ধন করিতে বহু লোক প্রাণত্যাগ করে এবং জানা গেল ভবিষ্যতে শিবতরাইয়ের জলকষ্ট অনিবার্য। অভিজিৎ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান ও রাত্রে গিয়া বাঁধ খুলিয়া দেন। সেই সঙ্গে তিনিও ভাসিয়া যান।

এই নাটক রচনার মধ্যে কবির উদ্দেশ্যটি বড়ই স্পষ্ট হইয়াছে। পড়িলেই বোঝা যায় বর্তমান যুগের কলীয়তার বিরুদ্ধে কবির অভিযান ; অথবা মানুষের জন্মগত যে জ্ঞানধারার অধিকার আছে, তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা একদল স্বার্থপর লোক বন্ধ করিয়া দিতে চেষ্টান্বিত, ইহা তাহারই প্রতিবাদ। স্বার্থপর মানুষের শক্তি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে ; যুবপ্রাণ তাহার রুদ্ধ স্রোত উন্মুক্ত করিতেছে। জাতীয়তা কিরূপ বিকৃত হয় তাহা গুরুর চরিত্রে ও লোকদের কথাবার্তার মধ্যে খুব স্পষ্ট। এই নাটকটির মধ্যেও দেখি কবি নিজের গান-গুলিকে ধনঞ্জয়ের মুখ দিয়া টীকা করাইতেছেন। অর্থাৎ নিজেকে অপরের কাছে ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে চেষ্টা 'ঋণশোধে' দেখি, এখানেও সেটি পাই ; প্রত্যেকটি গানের পরই বৈরাগীর ব্যাখ্যা চলিতেছে।

শান্তিনিকেতনে ১৪ই জানুয়ারী (১৯২২) কবি 'মুক্তধারা' নাটকটি সকলকে পড়িয়া শোনাইলেন ও পরদিন কলিকাতায় গেলেন বন্ধুদের নিকট পড়িয়া শুনাইবার জন্য। ১৭ই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ১৮ই (৪ঠা মাঘ)

বুধবার যথারীতি মন্দিরের কাজ ও ৬ই মাঘ মহর্ষির বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা করিলেন।

বিশ্বভারতীর কাজকর্ম ও নিজ অত্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনধারার বাহিরে দেশের সর্বত্র যেসব অশান্তি ও আন্দোলন চলিতেছিল, সে-সম্বন্ধে কবি যে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে। পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ছয় মাস পূর্বে জুলাই (১৯২১) মাসে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। আগষ্ট মাসে দক্ষিণ ভারতে মালাবার উপকূলে মোপ্‌লা নামে স্থানীয় মুসলমানরা হঠাৎ হিন্দুদের উপর উৎপাত সুরু করে; তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল খিলাফৎ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সৈন্য গিয়াও বহুদিন তাহাদের দমন করিতে পারে নাই। বহু সহস্র হিন্দু নানাভাবে তাহাদের হাতে নির্যাপিত হয়। চিন্তাশীল মুসলমানরা ইহার নিন্দা করিয়াছিলেন; কিন্তু একদল লোক তাহাদের ধর্মের জন্য প্রেম দেখিয়া তাহাদের প্রশংসাও করিলেন।

হিন্দুমুসলমান প্রীতি যে বালির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মহাত্মাজী বিশ্বাস করিতেন না; তিনি তখনো উহাকে সাময়িক, স্থানিক ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে-পার্থক্য সত্যই রহিয়াছে, তাহা কেবল সাময়িক উত্তেজনায় ও রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কখনো দূর হয় না একথা রাজনীতিকগণ সেদিনের উৎসাহের আনন্দে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

এদিকে মহাত্মাজী কলিকাতা হইতে ফিরিবার মাসখানেক পরেই গুজরাটের বরদৌলী তালুকে 'সত্যগ্রহ' করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ২৩এ নভেম্বর এই আন্দোলন সুরু হইবার দিন ছিল; কিন্তু ইহার কয়েকদিন পূর্বে বোম্বাই সহরে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গেল। মহাত্মাজী বুঝিলেন সত্যগ্রহ করিবার মত ধৈর্য, অহিংসাব্রত অন্তরে গ্রহণ করিয়া দুঃখকে বহন করিবার শিক্ষা লোকের হয় নাই। তিনি আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে সরকারের সহিত মিটমাটের কথা চলিতে লাগিল। একটি রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স হইল। ফল কিছু ফলিল না। মহাত্মাজী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিতে লাগিলেন ও সত্যগ্রহের জন্য পুনরায় ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে অসহযোগীদের মধ্যে গৃহবিবাদ দেখা দিল ; মুসলমানদের খিলাফতের সহিত মহাত্মাজী তাঁহার অসহযোগ জুড়িয়া দিয়া ভাবিয়াছিলেন যে মুসলমানরা তাঁহার সহিত একত্র কার্য করিবে। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে একদল মুসলমান সঙ্ঘবদ্ধ ও মিলিত ভাবে থাকিতে অনিচ্ছুক ; তাহারাই হইল প্রবল। অপর দিকে গবর্মেণ্টও নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, ধর্ষণ নীতি ধীরে ধীরে প্রয়োগ সুরু করিলেন। মহাত্মাজী পুনরায় সত্যগ্রহ আরম্ভ করিবেন ভাবিতেছেন ; এমন সময় যুক্তপ্রদেশের চৌরাচৌর থানা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইল এবং বহু পুলিশ ও চৌকিদার নিহত হইল (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২২)।

এই ঘটনায় মহাত্মাজী অত্যন্ত আঘাত পাইলেন ও সত্যগ্রহ বন্ধ করিয়া বরদৌলীতে গঠনমূলক কার্যতালিকা নূতনভাবে ঘোষণা করিলেন (১১।১২ ফেব্রু)। তাঁহার কর্মপদ্ধতি হইল, খদ্দর পরিধান, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, মাদকতা নিবারণ ও সালিশী কাছারী স্থাপন। ফেব্রুয়ারীতে দিল্লীতে যে বিশেষ কংগ্রেস হইল, তাহাতে গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতি গৃহীত হইল। কিন্তু ইহার কয়েকদিন পরেই ১০ই মার্চ মহাত্মাজী বন্দী হইলেন ও ছয় বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সকল কর্মের মধ্যে থাকিয়া মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ চৌরাচৌরের দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্বে ১লা ফেব্রুয়ারী গুজরাটের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক নানালাল দলপতরাম রবীন্দ্রনাথের নামে একখানি খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ৩রা ফেব্রুয়ারী তাহার জবাব দেন। পত্রখানি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াছি ; পাঠক দেখিবেন কবি দ্রষ্টার ন্যায় ভবিষ্যতের সমস্ত যেন দেখিতে পাইয়া পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। আন্দোলন এভাবে চালনার বিপদ কোথায়, তাহা তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতেছিলেন, যাহা নেতারা কর্মসাগরের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও দেখিতে পারিতেছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ ২রা ফেব্রুয়ারী এই পত্রখানি প্রকাশের জন্য তৎকালীন বিখ্যাত দৈনিক Bengaliতে পাঠাইয়া দেন।

"I believe in the efficacy of *ahimsa* as the means of overcoming the congregated might of physical force on

which the political powers in all countries mainly rest. But like every other moral principle *ahimsa* has to spring from the depth of mind and it must not be forced upon man from some outside appeal of urgent need. The great personalities of the world have preached love, forgiveness and non-violence, primarily for the sake of spiritual perfection and not for the attainment of some immediate success in politics or similar department of life. They were aware of the difficulty of their teaching being realised within a fixed period of time in a sudden and wholesale manner by men whose previous course of life had chiefly persued the path of self. No doubt through a strong compulsion of desire for some external result, men are capable of repressing their habitual inclinations for a limited time, but when it concerns an immense multitude of men of different traditions and stages of culture, and when the object for which such repression is exercised needs a prolonged period of struggle, complex in character, I cannot think it possible of attainment. The conditions of South Africa [refering to the Passive Resistence of S. Africa and those in India,] are not nearly the same, and fully knowing the limitations of my powers I restrict myself to what I consider as my own vocation, never venturing to deal with blind forces which I donot know how to control." *

বিশ্বভারতীর কার্য দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। মিঃ এল্‌মহার্ষ্ট একদল ছাত্র লইয়া স্বরুলের গ্রামসংস্কার কর্মে ব্রতী হইলেন; ৬ই ফেব্রুয়ারী

* The Bengali, 3 February 1922.

(১৯২২) তিনি সেখানে যান, সেই দিনটি বিশ্বভারতীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয়; কারণ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণজীবনের আদর্শ যাহা এতদিন কেবল খণ্ডিতভাবে শান্তিনিকেতনে হইতেছিল, তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চলিল। জ্ঞান ও কর্ম বা সেবার সংযোগে মনুষ্যত্ব পূর্ণ বিকশিত হয়, সেই পরিপূর্ণ বিকাশের সহায় হইলেন এই ইংরেজ যুবক।

শান্তিনিকেতনে এই সময়ে intellectual আবহাওয়া বড়ই ক্রিয়াশীল; অধ্যাপকগণ নানা ভাষা ও বিষয় আলোচনায় রত, বাহির হইতে অনেক ছাত্র আগত। বিবিধ কর্ম ও বিচিত্র রসের সমাবেশ হইয়াছে; ১৭ই ফেব্রুয়ারী ফরাশী হাস্যনট মোলিয়ারের ত্রিশতাব্দিক উৎসব পালন করা হইল; শান্তিনিকেতনে ফরাশীভাষার শিক্ষক হিরজিভাই মরিসের উদ্যোগে এই উৎসব হয়। কবি বিস্তৃতভাবে হাস্যরস ও নাট্য রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। (শান্তিনিকেতন ১৩২৮ তৃতীয় বর্ষ পৃঃ ৩১-৩২)। তাঁহার মনীষা যে-বিষয়ই স্পর্শ করে তাহাতেই নূতন তত্ত্ব আনিতে পারে; এ দিনের বক্তৃতায়ও তাহা দেখি।

ফাল্গুনের শেষদিকে দেখি কবি পুনরায় তাঁহার গানের সুরে ফিরিয়াছেন। বহু গান এই সময়ে রচনা করেন;—'ফিরে চল মাটির টানে', 'শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে', 'ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'তোমার সুরে ধারা' ইত্যাদি। 'ফিরে চল মাটির টানে' গানটি বিশেষভাবে সুরুলের কার্যোপলক্ষে রচিত; মাটি মানুষকে ডাকিতেছে, সেই মাটিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই সময়ে একদিন বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের কতকগুলি ছাত্রের অনুরোধে তাহাদের কাছে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি কিভাব হইতে এই বিদ্যালয় সৃষ্টি করেন, তাহার কথা সংক্ষেপে বলিয়া বিশ্বভারতীর কথা বলিলেন। তিনি বলেন, "আধুনিককালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে আছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম—বিদ্বেষ নয়। * * চিরন্তন সত্যসাধনার মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্য সাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমার দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। * পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে

আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্য সম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে। * * আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সঙ্কোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমোদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বান বাণী এক সময়ে ঘোষিত হয়েছিল,—আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা!" (শান্তিনিকেতন পত্রিকা ৩য় বর্ষ ১৩২৯, পৃঃ ১০৭-১০৮)।

ফাল্গুনের শেষদিকে কবি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া কিছুকালের বিশ্রামের জন্য শিলাইদহ যান। প্রায় একমাস সেখানে থাকিয়া ১০ এপ্রিল (২৭ চৈত্র ২৮) পুনরায় আশ্রমে ফিরিলেন। এই সময়টি গানে গানে কাটিয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া যথারীতি বর্ষশেষ ও নববর্ষর (১৩২৯) উৎসব উদ্‌যাপন করিলেন। (দ্রঃ শান্তিনিকেতন তৃতীয় বর্ষ ১৩২৯, শ্রাবণ পৃঃ ৭৭-৭৯, ঐ জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ৫৩-৫৬)।

এই সময়ে শান্তিনিকেতনে নলকূপ খননের প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয়। বীরভূম জেলার ন্যায় মরুসদৃশ দেশে জল সরবরাহ একটা মস্ত সমস্যা। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় যান তখন কাহার পরামর্শে একটা অতিকায় নলকূপ খননের সাজ সরঞ্জাম আনেন; সে-জিনিষটা কোনো কাজে লাগে নাই; শেষকালে লোহার দরে বিক্রয় করিতে হয়। এইবার অখিল চক্রবর্তী নামে একজন আমেরিকা-ফেরৎ যুবক এই কাজ আরম্ভ করেন; বহু চেষ্টায়ও কৃতকার্য হইলেন না। পরে আরও দুইজন সাহেব কোম্পানী বৃথা চেষ্টা করে; শেষকালে ১৯৩৪ সালে উহা কৃতকার্য হয়, এটি অমূল্যচন্দ্র বিশ্বাস নামে একজন বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারের কৃতিত্ব। যাক্ প্রথমবার যখন দারুণ গরমের মধ্যে নলকূপ খননের চেষ্টা চলিতেছে, তখন কবি এই গানটি রচনা করেন, "এস এস তৃষ্ণার জল" (৪ঠা বৈশাখ ১৩২৯)।

বিশ্বভারতী গড়িতেছেন বটে, কিন্তু তখনই দেখি তার মধ্যে একটা নির্লিপ্ততা আসিয়া গিয়াছে;—চিরদিন সকল সৃষ্টির মধ্যেই একটি ভাঙনের সুর। কাব্যেও যেমন, জীবনেও তেমনি। কোনো স্নেহাস্পদ কবি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন যে তিনি যে কেবল কবি তাহা নহেন, কর্মী হিসাবেও তাঁহার কীর্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার জবাবে লিখিতেছেন, "তুমি এক

সাক্ষী খাড়া করেছ 'বিশ্বভারতী'। হায়রে, তুমি কবি হয়েও ওর স্বরূপটা বুঝতে পারলে না! ওটা কি কাজ? ওটা আমার কাজ-কাজ খেলা। সেইজন্যই ত আমাদের দেশের প্রবীণ কাজের লোক কেউ ওকে গ্রাহ্যই করলে না। ওটা যে উনপঞ্চাশ বায়ুরই কীর্তি-বিশেষ সেটা গৌড়জনের কাছে ধরা পড়ে গেচে। * * শেষ বয়সে 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়ে একটা মস্ত খেলা ধরেচি। যাবার বেলায় হয়ত ও-পুতুলটাকেও ভেঙে দিয়ে যেতে হবে—এমন অনেক পুতুল ভেঙেচি। 'সাধনা' নামক এক কাগজের খেলনা ছিল—সেটা ভেসে গেল কেন? যেহেতু ওটা অপদার্থের লীলা।"

১৪ই বৈশাখ বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে। কবি কোথাও গেলেন না; ২৫এ বৈশাখ তাঁহার ৬২তম জন্মদিন শান্তিনিকেতনে যে কয়টি অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা সুসম্পন্ন করিলেন।

ছুটিতে কবি অনেকগুলি বর্ষার গান রচনা করিয়াছেন, সেগুলি গাহিতেছেন শিখাইতেছেন, আনন্দে আছেন। 'রাণু' তাহার পিতামাতাদের সহিত শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন; পাঠকের স্মরণ আছে, কবির সহিত এই বালিকাটির পত্র চলিত; সেগুলি পরে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' নামে প্রকাশিত হয়। ছুটিতে কবির সঙ্গী ছিলেন এণ্ড্রুজ সাহেব; এ-সময়ে বেনোয়া (Benoit) নামে একজন সুইস্ ফরাশী এখানে আসেন। লেভি সাহেব গ্রীষ্মকালটি নেপালে পুঁথি-সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন।

এই সময়ে ফ্রান্স-প্রবাসী কালিদাস নাগের নিকট ভারতের জটিল রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে কবি একখানি পত্র লেখেন। মহাত্মাজী তখন প্রায় চারি মাস জেলে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে সম্প্রীতি এক বৎসর পূর্বে ছিল তাহা এখন লোপ পাইয়াছে; এখন প্রীতি হিংসা-বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। কোথায় সে দিল্লির জুমা মস্‌জিদে হিন্দু মুসলমানদের মিলনের ভাবোচ্ছ্বাস! স্বপ্নের মত তাহা আজ বোধ হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ পত্রখানির মধ্যে এই দ্বন্দ্বের মূলগত কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান; পত্রখানি দীর্ঘ; বিরোধের কারণগুলি খুব স্পষ্ট করিয়া ইহাতে

* ১৩ই বৈশাখ ১৩২৯; শান্তিনিকেতন পত্রিকা ৩য় বর্ষ পৃঃ ১৩২।

ব্যক্ত হইয়াছে (৭ই আষাঢ়, ১৩২৯। শান্তিনিকেতন তৃতীয় বর্ষ, ১৩২৯ পৃঃ ৮৩—৮৪)। কবি লিখিতেছেন—

"পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্চে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজেরা ধর্মকে পালন করে সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্য তাদের ধর্মগ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই। * * হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তাদের বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্চে মানুষের সঙ্গে মানুষের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেচে। * * এখানে হিন্দু মুসলমান দুই জাত একত্র হয়েচে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল;—এক পক্ষের যে দিকের দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকের দ্বার রুদ্ধ। * * হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মত করেই গড়ে তুলেছিল—এর প্রকৃতিই হচ্চে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। * * সমস্যা ত এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। * * ধর্মকে কবরের মত তৈরি করে তারি মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েচে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোন রকমের স্বাধীনতাই পাব না। * * হিন্দু মুসলমানের মিলন, যুগ পরিবর্তন অপেক্ষায় আছে; অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েচে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেচে।"

১৪ই আষাঢ় (১৩২৯) বিদ্যালয় খুলিল; কবি ক্লাস পড়াইতেছেন; সন্ধ্যার পর আর্ট, পলিটিক্স প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনা করেন; সাময়িক বিলাতী পত্রিকার প্রবন্ধ পাঠ ও সমালোচনা হয়। এই সব সান্ধ্যসভাগুলির স্মৃতি এখনো

মনে স্পষ্টভাবে আছে। ২৪এ আষাঢ় (৮ই জুলাই) শেলির (Shelly)র শতাব্দিক উৎসব হয়; কবি উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ কবিরা শেলির শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি করেন তাহার সভাপতি নির্বাচন করেন রবীন্দ্রনাথকে।

পরদিন কবিকে কলিকাতায় যাইতে হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে,—তাঁহারই শ্রাদ্ধোপলক্ষে সভা; কবিকে তাহার পৌরহিত্য করিতে হইবে; এই কাজ কবির পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক হইলেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি তাহার যে অকৃত্রিম স্নেহ ছিল, তাহার কথা স্মরণ করিয়া তিনি তাহা আজ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহারই উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন

বর্ষার নবীন মেঘ এলো ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে?

এই কবিতাটি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সত্যেন্দ্রনাথ কবির কি প্রিয় ছিলেন, কি গভীর স্নেহের বশে তিনি এইটি রচনা করেন।

বৈষয়িক কাজে কয়েকদিনের জন্য তাঁহাকে তাঁহার জমিদারিতে যাইতে হয়; সেখানে আত্রাই নদীতে নৌকায় আছেন; রাণুকে চিঠি লিখিতেছেন (ভানুসিংহের পত্রাবলী ২ শ্রাবণ ১৩২৯; পৃঃ ১২৮-৩০)

এই সময়ে কলিকাতায় বিশ্বভারতীর একটি শাখা সমিতি স্থাপিত হয়; তাহার উদ্বোধনে এলম্‌হার্ষ্ট সাহেব একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন (১২ শ্রাবণ, ২৮ জুলাই)। বিষয় ছিল Robbery of the soil, 'মাটির উপর দস্যুবৃত্তি'; ইংরেজি প্রবন্ধটির তর্জমা কবি স্বয়ং করিয়া দেন; উহা 'শান্তিনিকেতনে' প্রকাশিত হয় (৩য় বর্ষ পৃঃ ৯০-৯৭)। এই প্রবন্ধ পাঠের পরে রবীন্দ্রনাথ 'সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার ও প্রাণরক্ষার পথ কোন দিকে' এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। (ঐ পৃঃ ১১৫-১১৮)। রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তার সারমর্ম এই;—আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারটা একটা চক্রের মত। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। * * মাটিতে ফসল লাগানো সম্বন্ধে এই চক্র-রেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে; গাছ-

পালা জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ পাচ্ছে, তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। * * মাটির প্রাণ থেকে তার প্রাণময় সত্তার উদ্ভব হয়েছে।" প্রাণরক্ষার কথা যেমন বলিলেন, তেমন সামাজিক স্বাস্থ্যের কথা বলিতে গিয়া দেশের শিক্ষিত লোকদের গ্রাম ত্যাগের কথা বলিলেন। 'আমাদের মনের চিন্তা ও চেষ্টা ঠিক এমনি করেই সহরের দিকেই কেবল আকৃষ্ট হচ্ছে বলে আমাদের পল্লীসমাজে তার মানসিক প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না।' (শান্তিনিকেতন ৩য় বর্ষ, পৃঃ ১১৬)।

কবি ভাবিয়াছিলেন কলিকাতা হইতে তখনি ফিরিবেন ; হইল না ; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে সভায় তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিতে হইল (১৭ই শ্রাবণ)। (প্রবাসী ১৩২৯ ভাদ্র পৃঃ ৭৫৯-৭৬৩ দ্রষ্টব্য)

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি বর্ষামঙ্গল উৎসব করিলেন (২২ শ্রাবণ)। ইহার দুই দিন পরে বিশ্বভারতীর সংস্থিতি বা Constitution গঠনের সভা হয়। ৯ই আগষ্ট আচার্য লেভি শান্তিনিকেতন হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কবিও সেই সঙ্গে কলিকাতা যান। কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন লাইব্রেরীতে বিশ্বভারতীর সভ্যগণের জন্য বিশেষভাবে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব করিলেন। ৩১ শ্রাবণ ও ২রা ভাদ্র (১৭ই ও ১৯এ আগষ্ট) ম্যাডান ও এলফ্রেড থিএটরে পুনরায় অভিনয় হয়। পাঠকের স্মরণ আছে গত বৎসর য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার মাসখানেকের মধ্যে তিনি বর্ষামঙ্গল জলশা করেন ; সেবার হয় নিজ বাড়িতে।

২০এ আগষ্ট লেভিদের বিদায় সভা হয় রামমোহন লাইব্রেরীতে কবি স্বয়ং অর্ঘদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। লেভিকে কবি যথার্থ শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিদ্যা তাঁহাকে বিনয় দিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে দিয়াছিল মানবিক প্রেম। জ্ঞানালোচনা যে মানুষকে শুষ্ক করে না তাহারই প্রতীক আচার্য লেভি, ইহাই কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লেভি বিশ্বভারতীতে চীনা ও তিব্বতী ভাষার আলোচনা সুরু করিয়া যান ; তাহার দ্বারা ভারতের প্রাচীন লুপ্ত সংস্কৃতির উদ্ধার হইবে এই আশা তখন রবীন্দ্রনাথ পোষণ করিতেন। যাই হৌক তিনি অকৃত্রিম সৌহার্দ দেখাইয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে ফিরিবার আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে

একদিন একটি বক্তৃতা দেন (Presidency College Magazine 1922 Sep. p 97-104 শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত অনুলিখিত) এবং আরও স্থির করিয়া আসেন যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কলিকাতায় 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয় করিলেন। কবি রাণুকে লিখিতেছেন "সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে কলিকাতায় আমাদের 'শারদোৎসবে'র পালা বসবে—আমাকে সাজতে হবে সন্ন্যাসী। আমার এই সন্ন্যাসী সাজবার আর কোনো অর্থ নেই—অর্থ সংগ্রহ ছাড়া। শুনে তোমরা বিস্মিত হ'য়ো না, তোমাদের বারাণসীধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সন্ন্যাসী সেজেছেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরর্থক হয়নি।"

আর একদিন লিখিতেছেন, "'শারদোৎসবে'র রিহার্সালে আমাকে অস্থির ক'রেছে। রোজ দুপুরবেলায় বিভূতি এসে একবার ক'রে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়; ছোট ছেলেরা যে রকম পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই ক'রতে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি, তবু রিহার্সালের সময় কেবল ভুলি—ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত হাসে এত অপমান সে আর কী ব'লব।" (ভানুসিংহের পত্রাবলী পৃঃ ১৩৪)।

কলিকাতায় দলবল লইয়া আসিয়াছেন, সকলেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আছেন। রাণুকে লিখিতেছেন, "মেয়ের দল এবার নেহাৎ কম নয়। * * কিন্তু আমাকে দেখবার লোক কেউ নেই; স্বয়ং এণ্ড্রুজ সাহেব পাঞ্জাবে আকালীদের নাকাল সম্বন্ধে তদন্ত ক'রতে অমৃতসরে চ'লে গেলেন। লেভি সাহেবরা গেলেন বোম্বাই; বৌমা আছেন শান্তিনিকেতনে। সুতরাং ঠিকমতো শাসনে রাখতে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয়তো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারি এমন আশঙ্কা আছে। আপাতত যা তা বই পড়তে আরম্ভ করেছি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তার মধ্যে লজিকের বই একখানাও নেই।" (ঐ পৃঃ ১৩৬)।

'শারদোৎসব' নাটকটি অভিনীত হইতেছে, 'ঋণশোধ সংস্করণ নয়; তবে ইহারও একটা ভূমিকা লিখিয়াছেন—যেমন ভূমিকা লিখিয়াছিলেন ফাল্গুনী'র জন্য 'বৈরাগ্যসাধন' নাম দিয়া। এই ভূমিকাটি 'ঋতু উৎসবে' আছে; প্রথম প্রকাশিত হয় 'শান্তিনিকেতনে'। (৩য় বর্ষ ১৩২৯, পৃঃ ৯৭-৯৯)।

এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করেন; দিনেন্দ্রনাথ সাজেন ঠাকুর্দা; জগদানন্দ বাবু লক্ষ্মীশ্বর, অসিত হালদার রাজা। আল্‌ফ্রেড থিএটরে ৩১এ ভাদ্র (১৩২৯) ও ম্যাডান থিএটরে ১লা আশ্বিন অভিনয় হয়।

এই উৎসবের মধ্যে একটি নিদারুণ সংবাদ আসিল, শান্তিনিকেতনে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেহত্যাগ করিয়াছেন; দিনেন্দ্রনাথকে তখনই শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিতে হইল। দ্বিতীয় দিন অভিনয়ে দিনেন্দ্রনাথের অংশ অবনীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিতে হইল; এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রস্তুত হইয়া আশ্চর্য কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিলেন।

দ্বিপেন্দ্রনাথের সহিত শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ বহু বৎসরের; মহর্ষির তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ পৌত্র। সেজন্য তিনি তাঁহার বড়ই আদরের ছিলেন এবং মহর্ষির ইচ্ছানুসারে বিশেষ ভাতাও পাইতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে আসিয়া বাস করেন এবং সেখানকার কাজকর্ম দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যয়াদির ব্যবস্থা বহুকাল তাঁহার উপরই ছিল। শান্তিনিকেতন ও বোলপুরের মধ্যে তিনি ছিলেন সেতুস্বরূপ; বোলপুরের আপামর সাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার মৃত্যুতে এই দুই স্থানের মধ্যে যে-সম্বন্ধ ছিল তাহা ভাঙিয়া যায় এবং পরে অন্য ভাবের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারই মধ্য দিয়া যে সামাজিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

২১। বোম্বাই, মাদ্রাস ও সিংহল ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন না; অভিনয়ের একদিন পরেই বোম্বাই প্রদেশ যাত্রা করিলেন (২০এ সেপ্টেম্বর)। গম্যস্থান পুণা নগরী। এবার সঙ্গে ছিলেন গৌরগোপাল ঘোষ ও মিঃ এলম্‌হার্ষ্ট। রবীন্দ্রনাথের হয়ত' এই সময়ে শান্তিনিকেতনে ফেরার প্রয়োজন ছিল; বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথের এই নিদারুণ শোকের

সময় তাঁহার উপস্থিতি হয়ত' তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিত। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথকে বরাবর দেখিয়াছি মৃত্যুশোককে কখনো তীব্রাকারে দেখেন নাই; তাই বোধহয় এ ক্ষেত্রেও সেই মনোভাব হইতেই তিনি নিজ ব্যক্তিগত বা পরিবারগত দুঃখের নিকট নিজ কর্তব্যকে ক্ষুণ্ণ করিলেন না।

পুণা পৌছিবার দুই দিন পরে তিনি কিরলোসকর থিএটর গৃহে Indian Renaissance নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির নিন্দা করেন ও কি আদর্শে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে পথ নির্দেশ করেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন এই প্রবন্ধে প্রায় তাহাই বলেন। তবে স্পষ্ট করিয়া দেশের সম্বন্ধে বলিলেন, যে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি স্থানেও এমন ব্যবস্থা নাই, যাহাতে কোনো বিদেশী বা ভারতীয় ছাত্র ভারতীয় চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশের নিদর্শন দেখিতে পায় বা ভারতীয় চিত্তকে অধ্যয়ন করিতে পারে। সেই অভাব দূর করিবার জন্য ভারতীয় সংস্থিতির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানকে এক বিদ্যাকেন্দ্রে সমবায়িত করিবার জন্যই তিনি বিশ্বভারতী সংস্থাপন করিয়াছেন—"a University which would help India's mind to concentrate and to be fully conscious of itself; free to seek the truth and make this truth its own whenever found; to judge by its own standard, give expression to its own creative genius, and offer its wisdom to the guests who come from other parts of the world."

পুণায় স্বল্পকাল থাকিবার মধ্যে তিনি ও লেভি সাহেব এই পুণানগরীর প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি দেখেন, যেমন অনাথ বিদ্যার্থীগৃহ, সর্বজনিক সভা; শেষোক্ত স্থানে তিনি লোকমান্য টিলক সম্বন্ধে বিশেষ আবেগের সহিত কিছু বলেন; সেই মহাপুরুষের সহিত তাঁহার যে গভীর সম্বন্ধ ছিল সে-কথা তিনি সেদিন বলেন। (দ্রঃ যাত্রী)।

সেই দিন রাত্রেই রবীন্দ্রনাথ সদলে মৈশূর যাত্রা করিলেন; এণ্ড্রুজ ও লেভি তাঁহার সঙ্গে আছেন মৈশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চানসেলার স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নিমন্ত্রণে সেখানে যাইতেছেন। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৯এর জানুয়ারী

মাসে তিনি বাঙ্গালুরের নাট্য-পরিষদের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে যান। এবার যাইতেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে।

মৈশূরের পথে বেলগাঁ ও হুবলি ষ্টেশনে কবির বিরাট অভিনন্দন হয়। বাঙ্গালুরে গিয়া কবি মাত্র দুই দিন ছিলেন (২৭, ২৮ সেপ্টেম্বর)। সেখান হইতে মাদ্রাস যাত্রা করেন ও শ্রীযুক্ত রামস্বামী আইয়ারের অতিথি হইয়া ময়লাপুরে থাকেন। ২৯এ সন্ধ্যায় গোখ্‌লে-হলে ভারত ইতিহাসের ধারা Vision of Indian History নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরদিন The Spirit of Modern Times বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

মাদ্রাজ হইতে কবি এণ্ড্রুসের সহিত কয়েম্বটর উপস্থিত হন (১ অক্টো)। সেখানে ২রা ও ৩রা ভেরাইটি হলে দুইটি বক্তৃতা করেন—Vision of India's History ও An Eastern University। এইসব বক্তৃতা টিকিট করিয়া হয়। স্থানীয় বণিকসঙ্ঘ তাঁহাকে আড়াই হাজার টাকা দান করেন। ৩রা অক্টোবর প্রাতে তিনি Vathamalapalayam নামে একগ্রামে যান। এখানে বহুকাল পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার আসিয়াছিলেন; স্থানীয় লোকদের অনেকে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। রবীন্দ্রনাথকে তাহারা শ্রদ্ধার সহিত ১৮৩ টাকার একটি তোড়া দান করে। এই দানকে কবি বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই কয়দিনের অতিরিক্ত ঘোরাঘুরিতে তাঁহার শরীর খুব অসুস্থ হইয়াছে; তাই Alwaye যাইবার ব্যবস্থা রদ করিয়া তিনি মাঙ্গালুরে চলিয়া গেলেন। মাঙ্গালুর খৃষ্টান পাদরীদের একটি বিশেষ কেন্দ্র; বাস্‌ল্ (Basle) মিশনারীদের বিরাট আয়োজন এখানে। কবিকে এখানকার নানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাইতে হয় ও নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হয়। কিন্তু শরীর ক্রমশই অসুস্থ বোধ করায় তিনি বাহিরের সকল অনুষ্ঠানাদি হইতে ছুটি লইলেন।

কয়দিন পরে তিনি এণ্ড্রুজকে সঙ্গে লইয়া সিংহল যাত্রা করিলেন (১১ই অক্টোবর)। সেখানে তাঁহারা ডাঃ ডি'সিলভার অতিথি হন। একদিন ডি'সিলভার সহিত স্থানীয় ট্রেণিং কলেজ পরিদর্শনে গিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিকট বিশ্বভারতীর আদর্শর কথা ব্যক্ত করেন। কবি বুঝিলেন এখানেও বিশ্রাম পাইবেন না।

১৩ই অক্টোবর কলম্বোতে প্রথম পাবলিক সভা হইল Y. M. C. A. এর গৃহে ; Sir Anton Betrom এর সভাপতিত্বে এই বক্তৃতা হয়। পরদিন তথায় Forest University of India বিষয়ে বক্তৃতা হইল এবং ১৫ই The Growth of my life's work শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করলেন ; সেদিন স্যর পোনম্বলম্ অরুণাচলম্ হন সভাপতি।

১৬ই তারিখে কলোম্বের ভারতীয় ক্লাবে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোকেরা সমবেত হন; কবি তাঁহাদের কাছে তাঁহার আদর্শের কথা ব্যাখ্যা করেন ও বাঙলায় তাঁহার কাব্য হইতে কিছু আবৃত্তি করেন।

পরদিন কবি গালে (Galle) যান। সেখানে সুবৃহৎ অলকট হলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য অভূতপূর্ব জনতা হইয়াছিল। তিনি বক্তৃতায় বলেন সিংহল যদিও বর্তমানে রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক, কিন্তু ইতিহাস. ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে উভয় দেশ অত্যন্ত নিকট; উভয় দেশের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ পুনপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে মহিন্দ কলেজ পরিদর্শন করিয়া কবি এণ্ড্রুজের সহিত কলম্বো ফিরিয়া আসেন।

কলোম্বোতে ফিরিয়া তাঁহার বিশ্রাম নাই; নানা সামাজিক সভায় যোগদান, সভায় বক্তৃতা, কলেজের পারিতোষিক সভায় পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি কাজ করিতে হইতেছে। কিন্তু শরীরের উপর এত পরিশ্রম সহ্য হইল না; তাই কয়েকদিনের জন্য Newara Eliya নামক স্থানে তিনি বিশ্রামের জন্য গেলেন।

সিংহল বাসকালে তিনি সিংহলবাসীদিগকে ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যোগযুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন; তিনি প্রায়ই তাহাদের বলিতেন যে যাহারা ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ তাঁহারা লাতিন গ্রীক প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন, কিন্তু পালি সংস্কৃত জানেন না; এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে তাঁহাদের যোগ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি ত্রিবঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবন্দরমে আসিলেন (৯ই নভে)। বিরাট জনসঙ্ঘ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। কবি বলিলেন, "সম্মান আমি আপনাদের নিকট চাহিনা, আমি চাই আপনাদের প্রীতি, আমি

আপনাদের নিকট আসিয়াছি একজন ব্যক্তি হিসাবে, কবি হিসাবে; কোনো বাণী আমার দিবার নাই।" কিন্তু একথা বলিয়াও তিনি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ব্যাখ্যা করিলেন।

কুইলন যাইবার পথে বরকালে নামক স্থানে কবি থিয়া জাতির গুরু শ্রীনারায়ণগুরুর সাক্ষাৎ করেন। এই সর্বত্যাগী মানুষটি এই অস্পৃশ্য থিয়াদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে উন্নত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া কবি খুব তৃপ্ত হন; এই সাধুর চরিত্র কিভাবে পারিপার্শ্বিকের অবস্থা পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া কবি আশ্চর্য হইলেন।

এরানকুলম যাইবার পথে তিনি Allepeyতে থামিলেন; পূর্বে সেখানে যাইবার কথা ছিল না; হঠাৎ ঠিক হয়; কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে লোকে যে আয়োজনটা করিয়াছিল, তাহা সকলের বিস্ময় উদপাদন করিল।

কোচিনের নিকটবর্তী হইলে কবি দেখিলেন যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোচিনের কতকগুলি Snake boat আসিয়াছে, তাহার উপর নানাবিধ মধুর সঙ্গীত চলিতেছে; তাঁহাদের মোটর বোটের সঙ্গে তাহারা এরানকুল্লমের বন্দরে প্রবেশ করিল (১৭ নভেম্বর)। এখানে কলেজে বক্তৃতা করেন; বক্তৃতায় টিকিট বিক্রীত হয়। সেইদিনই তাঁহারা Alwaye যাত্রা করেন। সেখানে প্রথমে স্বামী নারায়ণগুরু অদ্বৈতাশ্রম দেখিতে যান। কিন্তু অবিলম্বে তাঁহাকে Union College-এর একটি হষ্টেল উন্মোচনের উৎসবের জন্য যাত্রা করিতে হয়। সেখানকার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া সেই রাত্রেই তাঁহারা Alwaye ত্যাগ করিয়া তাতাপুরম যাত্রা করেন (১৮ নভে)। সেখানকার গুজরাতি বণিকসঙ্ঘ তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্ধনা করেন ও বিশ্বভারতীর জন্য কিছু টাকা দেন।

১৯ এ নভেম্বর কবি মাদ্রাস ফিরিয়া আসিলেন। মাদ্রাসে United Womens College এ ২০এ তারিখে একটি বক্তৃতা করা ছাড়া আর কোন পাবলিক কর্মে তিনি যান নাই।

মাদ্রাস ও সিংহলে কবি প্রচুর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন, অর্থ প্রচুর পান

নাই ; পাইয়াছিলেন বক্তৃতার টিকিট বিক্রয় করিয়া ও donation হইতে সামান্য টাকা। মাদ্রাসে কবির বক্তৃতা ও interview যে একবারে সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল তাহা নহে। বিশেষভাবে গান্ধীজির চরকা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত লইয়া স্থানীয় গান্ধীপন্থীরা তাঁহাকে তীব্রভাবেই আক্রমণ করিয়াছিল (দ্রঃ Swarajya 6 Dec. '22)।

২৩এ নভেম্বর কবি মাদ্রাস হইতে বোম্বাই আসিলেন; সাপ্তহখানেক সেখানে থাকিলেন। বোম্বাইতে তিনি (The Indo-Iranians) পারসিক নীতি ও জরথুষ্ট্রর ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; (The Visva-Bharati Quarterly Vol No. 3, 1923 Oct. pp 191-207)

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে কবি আমেদাবাদ আসেন; সেখানে বিখ্যাত বস্ত্র-শিল্পী ও বণিক আম্বালাল সারাভাইএর বাড়ীতে থাকেন। ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি মহাত্মাজীর সাবরমতী আশ্রম দেখিতে যান ; ১৯২০ সালে এপ্রিল মাসে তিনি সেখানে প্রথম গিয়াছিলেন তখন মহাত্মাজী সেখানে ছিলেন ; এখন মহাত্মাজী কারাগারে ; কেবল গতবারের তাঁহার মধুর স্মৃতিকে পুনর্জাগরিত করিবার জন্য আশ্রমে গেলেন। তখন আশ্রম নিখিলভারত খাদি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কবি মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের অভাবাত্মক দিকের যতই নিন্দা করুন না কেন, আশ্রমে তাঁহার অনুপস্থিতি তাঁহাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল ; তিনি কর্মীদের বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিয়া আসিলেন।

প্রায় তিন মাস পরে কবি আশ্রমে ফিরিলেন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তিনি আশ্রম ত্যাগ করেন, তারপর কলিকাতায় শারোদোৎসব নাটক অভিনয় করিয়া পশ্চিম ভারত যাত্রা করেন। পুণা, বাঙ্গালুর, মাদ্রাস, কয়ম্বটর, সিংহলের নানা-স্থানে, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মাদ্রাস, বোম্বাই ঘুরিয়া তিন মাস পরে ডিসেম্বরের মাঝে, পৌষ উৎসবের পূর্বে আশ্রমে ফিরিলেন।

২২। বিশ্বভারতী

কবি পৌষ (১৩২৯) উৎসবের উপাসনাদি যথারীতি করিলেন; আম্রকুঞ্জে ৮ই পৌষ প্রাক্তন ছাত্রদের সভায় এবার তিনিই সভাপতি; খৃষ্টোৎসবের দিন তিনিই মন্দিরে আচার্য। বিশ্বভারতীর প্রথম বার্ষিক উৎসব ৮ই পৌষ হয়; কলিকাতা হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে য়ুরোপ হইতে বিনটারনিট্জ্ (Winternitz) বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় Visiting Professor হইয়া আসেন। এস্. ফ্লাউম্ নামে একজন ইহুদী বিদুষী মহিলা এই সময়ে আসেন। তিনি শিশুদের শিক্ষার বিশেষ ভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে বেনোয়া আসিয়াছিলেন।

পৌষ উৎসবের পর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার আশ্রম দেখিতে আসেন; ৩৫ বৎসর পূর্বে কৈশোরে একবার আসিয়াছিলেন আর এই; শিল্পীগণ তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ২৫ এ পৌষ খবর আসিল কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের দেহান্তর হইয়াছে।

এমন সময়ে আশ্রমে বাঙলার গভর্ণর লর্ড লীটন আসিবার কথা হইল। আশ্রমে তখনো অসহযোগ আন্দোলনের ঘোর লাগিয়া আছে; অধ্যাপকদের মধ্যে কেহ কেহ লাটসাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার মণ্ডপে উপস্থিত পর্যন্ত হইলেন না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এজন্য কাহাকেও কিছু বলেন নাই। রাজ-অতিথির যথাযোগ্য সম্মান তিনি দেখাইয়াছিলেন।

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন; গানরচনা, চিঠিলেখা প্রভৃতি কাজ ছাড়া অন্য বড় রকম সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। বিশ্বভারতীর অর্থচিন্তা, তাহার দৈনন্দিন তুচ্ছ কর্মের আবর্জনা তাঁহাকে গ্রাস করিতেছে; কেবল অন্তরে জাগিয়া আছে গানের সুরটুকু। সেই সুরগুলিকে এক করিয়া 'বসন্তোৎসবে' রূপ দিলেন। ক্ষুদ্র একখানি নাটিকা, নাটিকা বলিলে ভুল হয়, কতকগুলি গানকে গাঁথিবার জন্য কথার সৃষ্টি। এই সমস্ত গানে প্রকৃতির বনভূমি, আম্রকুঞ্জ,

করবী, বেণুবন, মাধবী, শালবীথি, বকুল, নদী, দখিন হাওয়া, বনপথ ইত্যাদি বসন্তোৎসবে সমাগত বসন্তের পরিচরগণের মুখ দিয়া তাহাদের মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ২৩টি নূতন গান রচনা করেন। * ফাল্গুনের গোড়ার দিকে এই 'বসন্ত' কলিকাতায় দুই দিন অভিনীত হয়।

বোম্বাই সহর হইতে ফিরিবার আড়াইমাস পরে পুনরায় ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কথা প্রচার করিবার জন্য পশ্চিম ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, গন্তব্য স্থল সিন্ধুদেশ। ২৮এ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে কাশী রওনা হইলেন ; সঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন।

কাশীতে (১লা-৪ঠা মার্চ) কয়েকদিন বাস করেন। সেখানে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতি ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ১৯এ ফাল্গুন ১৩২৯ ও ২০এ তারিখে সভার অধিবেশন হয় (শান্তিনিকেতন, ১৩৩০ জ্যৈঃ পৃঃ ৫৯—৬৬ ; ৬৬—৬৯)।

কাশী হইতে কবি ২১এ ফাল্গুন লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। সেখানে অতুলপ্রসাদের বাসায় চারিদিন থাকেন। ২৫এ ফাল্গুন (১০ই মার্চ) লক্ষ্ণৌ হইতে বোম্বাই রওনা হইলেন। কবি গানের ভাবে আছেন ; ট্রেণে অনেকগুলি গান রচনা করেন। বোম্বাইতে জাহাঙ্গীর পেটিটের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে একদিন মাত্র থাকিয়া ১৪ই মার্চ রাত্রে আহমদাবাদ যাত্রা করিলেন। সেখানে আম্বালাল সারাভাইএর বাড়ীতে থাকেন। আমাদাবাদে দিন চার থাকিয়া কবি সদলে করাচি যাত্রা করেন।

১৯এ মার্চ (৬ই চৈত্র ১৩২১) কবি করাচি পৌঁছাইলেন। স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি ও বিপুল জনতা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া গ্রহণ করিল। তিনি মিঃ জামসেদ মেঠার বাড়ীতে থাকেন ; সেইদিন বৈকালে বার্ণস্ গার্ডেনে বিরাট জনসভায় তাঁহার সম্বর্ধনা হয়। পরদিন করাচি ম্যুনিসিপালটি কবির সম্বর্ধনা করেন ; পূর্বদিনের সভায় কোনো য়ুরোপীয় আসেন নাই, কিন্তু এইদিনের সভায় তাঁহারা অনেকেই ছিলেন (The Sind Observer, March 21)।

---

* ঋতু উৎসব ১৩৩১ সাল, পৃঃ ১০১—১২৯। গীতবিতান পৃঃ ৬৫৫—৬৬৮। বসন্ত, স্বরলিপি শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৩৩০।

করাচিতে বিবিধ অনুষ্ঠান হয়; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নারীদের সভা; কেবলমাত্র নারীরা সমবেত হইয়া কবির সম্বর্ধনা খুব কম স্থানেই হয়। সেই জন্য এই বিশেষ অনুষ্ঠান কবিকে প্রীত করিয়াছিল। তিনি বক্তৃতা শেষে বলেন, "পরের অনুকরণ, স্বার্থান্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ, প্রতিদিন আমাদের দুর্বল করচে। তাদের সভ্যতার সুরা পান করে কেমন মত্ত হয়েছি তা দেখলে ভবিষ্যতের জন্য নিরাশা ও অবসাদ আসে। জানি এই দুর্গতি আসবে ও যাবে তোমরা যদি তোমাদের তপস্যার জ্যোতি দাও, তোমাদের শ্রদ্ধার জীবন দাও, প্রাচ্যের আত্মাও জাগ্রত হবে।" (শান্তিনিকেতন ১৩৩০ বৈশাখ, পৃঃ ৪৯)।

২১এ মার্চ্চ (৭ই চৈত্র) কবি করাচির থিওজফিক্যাল হলে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। (New Times. 22. 3. 23.) ২৫এ হইতে ২৮এ পর্যন্ত তিনি হায়দ্রাবাদে ছিলেন। ২৯এ করাচীতে ফিরিয়া আসেন।

৩০এ মার্চ্চ (১৬ই চৈত্র ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন করাচি হইতে ষ্টীমার যোগে পুরবন্দরে আগমন করেন। পুরবন্দর কাথিবাড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশীয় রাজ্য। (শান্তিনিকেতন ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩০ পৃঃ ৮৮-৮৯ সুদামা পুরবাসীদের প্রতি)। এইখানকার অধিবাসী ও রাজা কবিকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। এইখানে কয়দিন থাকিয়া বোম্বাই ফিরিয়া আসেন ও সেখান হইতে বোলপুর ফিরিয়া আসেন (১০ই এপ্রিল, ২৬এ চৈত্র ১৩২৯)।

চৈত্রের শেষাশেষি কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। বাহিরে প্রায় দেড় মাস ছিলেন। নানা কাজে বাহিরের মন ব্যাপৃত, বিশ্বভারতীর অর্থ চিন্তা, বহু ও বিচিত্র চরিত্রের লোকের সহিত নিরন্তর কথাবার্তায় ব্যস্ত, তাহারই মধ্যে সুরফল্গুর ধারা অন্তরে চলিতেছে। ১৩৩২ সালে প্রকাশিত 'প্রবাহিনী'র ('সুন্দর') অনেকগুলি গান এই সময়ের। বর্ষশেষের দিন 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে' এই গানটি রচনা করেন।

বর্ষশেষ ও নববর্ষের দিনে মন্দিরে উপাসনার কার্য কবি সম্পন্ন করেন। নব বর্ষের দিনে (১৩৩০) রতনকুটির ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হইল। বোম্বাইয়ের পার্শী দানবীর স্যর রতন টাটা বিশ্বভারতীর বিদেশী অধ্যাপকগণের আবাসগৃহ নির্মাণের জন্য ২৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ঐ দিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শী অধ্যাপক ডাঃ তারাপুরওয়ালা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র চণ্ডীচরণ সিংহ এই বাড়ী নির্মাণের কণ্টাক্টরি পান।

১৩ই বৈশাখ ১৩৩০ (২৬ এপ্রিল ১৯২৩) বিদ্যালয় বন্ধ হইল। বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্বেই তিনি বিশ্রামের জন্য শিলং পর্বতে গমন করেন। এইবার নিরালায় বাস করিয়া তিনি একখানি 'নাটক' লিখিলেন; বহুকাল পরে বাঙলায় একটা নূতন রচনা হইল; কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশ্বভারতীর জন্য তিনি ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন; অবসরের মুহূর্তগুলি মাত্র গানে ভরিয়াছেন; 'ঋণশোধ' ও 'মুক্তধারা' পুরাতন জিনিষকে রঙকরা মাত্র, নূতন সৃষ্টি বলা যায় না।

শিলঙে যে নাটকটি রচনা করেন, তাহার প্রথমে নাম দেন 'যক্ষপুরী', পরে দেন 'রক্তকরবী', এখন সেই নামেই পরিচিত। বইখানি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় অনেক কাটাছাটার পর ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে—দেড় বৎসর পরে।

গতবার য়ুরোপ হইতে আসিবার পর পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার উপর কবির একটা বিশেষ বিরূপতা আসিয়াছিল। সেই ভাবকে তিনি সাহিত্যে নাটকীয়-ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের গল্পের কিয়দংশ লইয়া 'মুক্তধারা' রচনা করেন। 'মুক্তধারা'র মধ্যে যন্ত্রসভ্যতার প্রতি তাঁহার তীব্রতা আরও স্পষ্টভাবে এই নাটকের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যান্ত্রিকতা মানুষের সকল সহজ শক্তি ও সৌন্দর্যকে নষ্ট করিয়া বিশাল বস্তুপিণ্ডের উপর মানুষের সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই নাটক তাহারই বিরুদ্ধে অভিযান। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রক্তকরবী'র এই দিকটা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যদি কোনো দূর ভবিষ্যতে এই অন্তক্ষুব্ধ, রুদ্ধ হাহাকারপূর্ণ যন্ত্রসভ্যতা শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়ে ও রাক্ষসের ন্যায় নিজের অস্ত্র নিজেই ছিঁড়িয়া খায়, তবে কবি নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির দাবী করিতে পারিবেন; কিন্তু সে-দাবী তাঁহার কবিত্বের খাতায় লেখা থাকিবে কিনা সন্দেহ।" (জয়ন্তী উৎসর্গ, পৃঃ ৪১৩)

শিলঙ বাসকালে কবিতা বেশি লেখেন নাই, গান রচনার কামাই ছিল না। 'পূরবী'তে একটি কবিতা আছে 'শিলংয়ের চিঠি' (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০)। কবিতাটি লেখেন শোভনা দেবী ও নলিনী দেবীকে। প্রথমা বালিকাটির বয়স বছর তেরো, দ্বিতীয়াটির বয়স বছর বারো। শোভনা দেবী বিখ্যাত বাগ্‌চী পরিবারের মেয়ে, গোপেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চীর কন্যা, অমিয় চক্রবর্তী

মহাশয়ের মাসতুতো ভগ্নী। দ্বিতীয়া অধ্যাপক ৺নিখিলনাথ মৈত্রের কন্যা, অমিয়বাবুর মামাতো বোন। জাভা যাত্রাকালে ইহারাই কবিকে নিয়মিত ডায়েরি লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন (দ্রঃ যাত্রী পৃঃ ২৭)।

শিলঙ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কবি নাটকটিকে দুইদিন আশ্রমে পড়িয়া শোনান। কবি নিজের লেখার উপর এখনো সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; আমরা জানি বহুবার উহাকে কাটাছেঁটা করেন, এবং ছাপাইতেও অবিলম্বে দিলেন না। উহা বহুদিন পরে প্রবাসীতে বাহির হয়। সাহিত্যের কিছুই না লিখিয়া কবি যেন নিজের উপর আস্থা হারাইয়া রচনাটিকে ফেলিয়া রাখিলেন। গত কয় বৎসর এবং সম্মুখে আরও কয়েক বৎসর কবির বড় রচনা নাই। বিশ্বভারতীর খুচরা কাজ, তাহার দৈনন্দিন তুচ্ছতা, সাময়িক রচনা ও বিশেষভাবে ইংরেজি বক্তৃতা লিখিয়া কবি তাঁহার সমস্ত শক্তিকে যেন নিঃশেষিত করিয়া দিতেছেন। বিশেষভাবে এই সময়ে ইংরেজিতে Visva-Bharati Quarterly ১৯২৩ এপ্রিল (১৩৩০ বৈশাখ) মাস হইতে বাহির হইলে, ইহার জন্য রচনা লিখিতে হইতেছে।

১০ই আষাঢ় বিদ্যালয় খুলিয়াছে। ১৩ই আষাঢ় (২৮ জুন) কবি কলিকাতায় ভবানীপুর সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন (নব্যভারত ভাদ্র ১৩৩০ ; শান্তিনিকেতন ৪র্থ বর্ষ ১৩২৯-১৩৩০ পৃঃ ১৫৮)

বঙ্কিম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে যেখানে বঙ্কিম কোনো মেসেজ্ দেন নাই, সেইখানেই বড়। বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতায় বলেন যে বঙ্কিমের Message এর কথা তাঁর স্বাদেশিকতা ইত্যাদি। কবি ঠিক সেই কথাটারই প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "মেসেজ্ লইয়া তর্ক হয়; কিন্তু সাহিত্যে আনন্দ-রূপের সৃষ্টি হয়, তা ভুল মেসেজ নিয়েও হতে পারে। আমি সেখানেই আনন্দ পাই এবং সেখানেই আমি বঙ্কিমের কাছে কৃতজ্ঞ যেখানে মেসেজ দেননি, যেখানে উনি আপনার সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপদান করেছেন। আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে প্রাণময় জগৎ ক'রে তোলে, মেসেজের সে-শক্তি নেই। এইজন্য সাহিত্য-সংসারে আমরা তাঁদেরই নমস্কার করি যাঁরা তাঁদের

প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরন্তন সুর ঢেলে দিয়ে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রদায়িক দিকে মনের মিল না থাকতে পারে, তাঁদের উপরে সামাজিক অসামাজিক নানা কারণে রাগও হতে পারে কিন্তু তা সত্বেও বলব তাঁরা আমাদের মস্ত দান করেছেন, যা দিলেন এ আর কেউ দিতে পারতো না।"

১৯এ আষাঢ় (৪ জুলাই) কবিকে শান্তিনিকেতনে দেখি। এইদিনে পিয়ার্সনের এক পত্রের উত্তর লিখিতেছেন। পাঠকের স্মরণ আছে পিয়ার্সন ১৯২১ সালের সেপ্টম্বরে ভারতে আসেন ; কিন্তু এবার ভারতে আসিয়া তাঁহার শরীর ভালো থাকিল না ; কয়েকমাস কাঠগুদামে স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় বাস করেন। অবশেষে দেশে গিয়া কিছুকাল থাকা স্থির করেন। পিয়ার্সনের সঙ্গে শিল্পী অসিত হালদার বিলাতে যান। বিলাত হইতে পিয়ার্সন রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে institutional religion বা সাম্প্রদায়িক ধর্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া লেখেন। কবি তাহার জবাব দেন ; পত্রখানি Letters to a Friendএর মধ্যে আছে। তবুও পত্রখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ; এই পত্রে সাম্প্রদায়িক ধর্মসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত খুব স্পষ্ট ; তিনি ক্রমশই কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারিতেছেন না ; এই পত্রে সেই মুক্তির মন্ত্র স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

"An institution which brings together individuals, who are profoundly true and sincere in their common aspirations is a great help to all its members. But if, by its very constitution, it offers accommodation to those who merely have uniformity of habits and not unity of true faith, it necessarily becomes a breeding place of hypocrisy and untruth. And because all organizations, by the very virtue of their power of combination, mechanically acquire a certain amount of force, such untruths and hypocrisies find ready opportunity to create widespread mischief." (p. 192)

আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে পুনরায় কবি কলিকাতায় ; শ্রাবণ মাসের পুরাটা ও ভাদ্রের আধাআধি সেখানেই কাটাইয়া দেন।

বহুকাল রাজনীতি হইতে দূরে আছেন ; এমন কি কোন ভাষণ বা বাণীও তিনি দেন নাই। কলিকাতায় বাসকালে একদিন মৃণালকান্তি বসু কবির সহিত দেখা করিতে আসেন (১৯এ আগষ্ট ১৯২৩)। তাঁহার সঙ্গে কবির দীর্ঘ আলোচনা হয় নানা বিষয়ে। তাহারই সার মর্ম আমরা নিম্নে দিতেছি। (বিজলী, ১৪ই ভাদ্র ১৩৩০)।

কিছুদিন পূর্বে তিনি অসুস্থ ছিলেন ; মৃণালকান্তি বাবু লিখিতেছেন, "তিনি অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন, কিন্তু যদিও দেহটা শুকিয়েছে, মনটা কিন্তু এতটুকুও সজীবতা হারায় নি।"

দেশের নিকট তিনি রাজনৈতিক মত কিছুদিন প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু সেদিন বেশ স্পষ্ট করিয়া মৃণালবাবুর কাছে ইহা ব্যক্ত করিলেন। এই সময়ে কংগ্রেসে দলাদলি সুরু হইয়াছে। প্রথমবারকার কাউন্সিলে কংগ্রেসের কোন লোক সদস্য পদে মনোনীত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ক্রমে এ বিষয়ে নেতাদের মধ্যে মতভেদ সুরু হয় ; একদল কাউন্সিল প্রবেশ করাটা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছিলেন না। এই প্রসঙ্গ উঠিলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, দলাদলির জন্য বা দলাদলির ফলে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—তা জীবনেরই লক্ষণ। একটি মাত্র প্রোগ্রাম নিয়েই যে সবাইকে কাজ করতে হবে এমন কথায় তাঁর মন সায় দেয় না। তবে মতানৈক্য হইলেই বিশেষ দলের উপর উদ্দেশ্যর আরোপ মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত করে। অপরের মনোভাব বুঝতে না পারা দুর্বল মনের লক্ষণ।"

কাউন্সিল প্রবেশ তখনকার দিনে সব থেকে বড় কথা। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, কাউন্সিলে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন দল যদি প্রবল হয়ে থাকে, তা'হলে তাদের কাউন্সিলে যেতে দেওয়াই ঠিক এবং সেখানে তারা যা করতে পারেন তাই করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করে, তাকে ভাঙবার চেষ্টার তিনি পক্ষপাতী নন ; তার চেয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা করা ভালো।

হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কেবলমাত্র রাজনীতিক আন্দোলনের চেয়ে এ আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার যে স্বাধীনতা আছে, হিন্দুদেরও তা

থাকা উচিত। "তারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে। আর তা করেছে এবং এখনো করছে— হিন্দুরা তো কখনো বাধা দিতে দাঁড়াইনি। হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে ?"

হিন্দুর দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেন, মোপ্‌লা বিদ্রোহের পর তিনি মালাবার গিয়েছিলেন ; সেখানে ৪০ লক্ষ হিন্দু এক লক্ষ মোপলার ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত হয়ে রয়েছে। এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে বলেন, "একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করে একটা সত্যকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করে তোলা যায়, আর কোনোভাবে যায় না। এইখানে আমাদের স্বার্থ এক, একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট।"

রবীন্দ্রনাথের এই মতগুলি বাংলা কাগজ হইতে ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত হয়, দেশ বিদেশে প্রচারিত হয় এবং কোনো কোনো স্থানে বেশ পরিবর্তিত আকারে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজের মত সম্বন্ধে নিজেই স্পষ্ট করিয়া V. B. Quartarly তে 1923 July মাসে 'The Way to Unity' নামে প্রবন্ধে প্রকাশ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলেন তাহা দেশের লোককে চিন্তার যথেষ্ট উপাদান দিল। হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিলে যে সমস্যা সমাধান হইবে না এ কথা রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে বলিয়া লোক-অপ্রিয় হন। কিন্তু তিনি রাজনীতিক না হইতে পারেন, তিনি মনুষ্যমনস্তত্ত্ব বিশেষ ভাল করিয়া বোঝেন বলিয়াই তখন বলিয়াছিলেন, এ মিলন ক্ষণিকের স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত। ইহার দ্বারা স্থায়ী ফল ফলিবে না।

রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখা, সাংবাদিকের সহিত মোলাকাত দেওয়া ছাড়া বিচিত্র রস সৃষ্টির কথা কবির মনে জাগিতেছে। গত দুই বৎসর কলিকাতায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব হইয়াছে ; এবার স্থির হইল 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় হইবে। 'বিশ্ব-ভারতী'র জন্য অর্থ সংগ্রহ প্রয়োজন, অভিনয় করিলে লোকে খুশীও হয়, অর্থও দেয় এবং পরোক্ষভাবে সুন্দর 'আর্টে'র প্রচার হয়। তাই এবার রিহর্শাল চলিল কলিকাতায় ; অভিনেতারা অধিকাংশই কলিকাতার ; কবি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন জয়সিংহের অংশ, দিনেন্দ্রনাথ রঘুপতির ও রথীন্দ্রনাথ

গোবিন্দমাণিক্যের। নক্ষত্ররায় হন তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী সংজ্ঞা দেবী গুণবতীর ভূমিকায় নামেন; পরে রাণু একদিন ঐ ভূমিকায় নামেন। অপর্ণার অংশ সংজ্ঞাদেবীর কন্যা মঞ্জু দেবী লইয়াছিলেন।

এম্‌পায়ার থিয়েটরে ২৫, ২৭, ২৮এ আগষ্ট (৮, ১০, ১১ই ভাদ্র ১৩৩০) অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ একটি আশ্চর্য ব্যাপার; বাষট্টি বৎসরের বৃদ্ধকে ত্রিশ বৎসরের যুবকের ন্যায় দেখাইয়াছিল, সে মূর্তি যাহারা দেখিল তাহারা অবাক হইয়া গেল, তিনি নিজের সাজ পোষাক নিজেই করিয়াছিলেন।

'বিসর্জন' অভিনয়ের পর পত্রিকায়, দৈনিকে, অভিনয় ও অভিনেতাদের সম্বন্ধে বহুবিধ সমালোচনা প্রকাশিত হয়; কাহারও ভাল লাগিয়াছিল, কাহারও ভাল লাগে নাই। বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমৃতলাল বসু অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার মত সমজদার বাঙলায় এখনো কেহ হয় নাই বলিলে হয়ত' অত্যুক্তি হইবে না; সেই ক্রিটিকের মত আমরা পরিশিষ্টে তাহারই ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। অমৃতলাল আজন্ম নাট্যমন্দিরে নটরাজের পূজারী, তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন কবির অভিনয়ে।

দুইমাস কাল কলিকাতায় থাকিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন ভাদ্রের মাঝামাঝি। ১৯এ ভাদ্র মন্দিরে উপাসনা করিলেন (শান্তিনিকেতন ১৩৩০ পৃঃ ১৩৯)। এইখানে তিনি সুকুমার রায়ের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। যে কয়জন ব্রাহ্ম যুবককে কবিকে আপ্রাণ শ্রদ্ধা করিতেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন সুকুমার রায় বা 'তাতা'বাবু—'আবোল-তাবোল' 'হযবরল' বই দুটির অমর রচয়িতা। কবিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সভ্য করিবার জন্য যে আন্দোলন কয়েক বৎসর পূর্বে হয়, তাহার প্রধান নেতা ছিলেন, প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ ও সুকুমার রায়। এই যুবকের মৃত্যু বহুকাল হইতে ধীরে ধীরে আসিতেছিল। কবি তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন এবং কলিকাতায় তাঁহাকে রোগযন্ত্রণার সময় দেখিয়া আসেন। ২৬এ ভাদ্র শান্তিনিকেতনে মন্দিরে তিনি তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ্যে উপাসনা করেন (শান্তিনিকেতন, ১৩৩০, পৃঃ ১২৭)।

এবার কলিকাতা হইতে আসিয়া কবি সন্ধ্যার পর আলোচনা সভা খুলিয়াছেন; তাহাতে বর্তমান যুগের নানা সমস্যা লইয়া প্রায় আলোচনা হয়। এই সভাগুলির কথাবার্তা সকলকে এমন একটা উচ্চ আনন্দলোকে উপনীত করিত, যে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। (দ্রঃ শান্তিনিকেতন, পত্রিকা ১৩৩০ পৃঃ ১৫৫-৫৬)।

বহুকাল পরে কবিকে একটি কবিতা লিখিতে দেখি 'যাত্রা' (৫ই আশ্বিন ১৩৩০, পূরবী পৃঃ ২৬)। কবিতা লেখা প্রায় নাই বলিলেও চলে। পরেও পাঁচ ছয় মাসে গোটা ৫।৭ মাত্র লিখিয়াছেন। আশ্রমে তখন এণ্ড্রুজ আছেন; কাজকর্ম মহানন্দে চলিতেছে; বিনটারনিটস তাঁহার কর্ম শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

ইতিমধ্যে ৩০এ সেপ্টেম্বর (১৩ই আশ্বিন) কেব্‌ল্ আসিল যে পিয়াস্‌ন ২৪এ সেপ্টম্বর ইতালিতে দৈবদুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। কথা ছিল আগামী নভেম্বরে তিনি আশ্রমে ফিরিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া য়ুরোপের বিদ্যাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতেছিলেন। পিয়ার্সনের মৃত্যুতে আশ্রমবাসী সকলেই মর্মাহত হইলেন; তিনি সকলের বন্ধু ছিলেন; সাঁওতাল পাড়ার ছেলেবুড়া হইতে আশ্রমের ছাত্রছাত্রী, বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁহাকে বন্ধু বিবেচনা করিতেন। মহাত্মাজী, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ— সকলকে তিনি বুঝিবার চেষ্টা করিতেন; সকলের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহার সন্ধানে তিনি ফিরিতেন এবং তাহারই সমন্বয় ছিল তাঁহার সাধনা।

বিদ্যালয় বন্ধ হইল ১২ই অক্টোবর ১৯২৩ (২৫এ আশ্বিন ১৩৩০)। বিজয়াদশমীর দিন আশ্রমবাসীদের নিকট কবি 'যক্ষপুরী' নামে নাটিকাটি পড়িয়া শোনান; পূর্বে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন; প্রথমবার লিখিয়া তিনি খুসী হইতে পারেন নাই, তাই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া ১৩৩১ সালে আশ্বিনের প্রবাসীতে উহা প্রকাশ করেন।

ছুটির মধ্যে তিনি আর একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন; তাহার নাম দেন 'রথযাত্রা'। এই রচনাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশির কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।" (প্রবাসী ১৩৩০, অগ্রহায়ণ পৃঃ ২১৬-২৫) আমরা

পূর্বে বলিয়াছি কবির মনে কয় বৎসর হইতে নূতন কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে না। ইহা তাহারই অন্যতম নিদর্শন। এই 'রথযাত্রা'র ইংরেজি অনুবাদ V. B. Quarterlyতে প্রকাশিত হয়; অনুবাদ কবির নিজের। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি নয় বৎসর পরে এই নাটিকা অবলম্বন করিয়া 'কালের যাত্রা' রচনা করেন; নাকটখানি ৩১এ ভাদ্র ১৩৩৯ সালে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭ তম জন্মোৎসবে উৎসর্গ করেন।

পূজার ছুটির অধিকাংশটাই শান্তিনিকেতনে কাটাইয়া নভেম্বরের গোড়ায় তিনি পশ্চিম ভারত বিশেষভাবে কাথিবাড় যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে তিনি ৫ই নভেম্বর (১৯ কার্তিক) Manchester Guardianএ Pearson Memorial Hospitalএর জন্য পত্র লেখেন। পিয়ার্সন বিলাতেও একদল লোকের কাছে সুপরিচিত ছিলেন; এই আবেদন প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ করিয়া পিয়ার্সনের নামে হাসপাতাল খোলা। পিয়ার্সনের বই Santiniketan হইতে ইতিপূর্বেই এই কাজ সুরু হইয়াছিল। কবি তাঁহার আবেদনের একস্থানে লিখিয়াছিলেন, We seldom met with anyone whose love of humanity was so concretely real, whose ideal of service so assimilated to his personality as it had been with him."

পিয়ার্সনের সহিত জাপানে ও আমেরিকায় কবির দুই তিন বার মতভেদ হইয়া বিরোধের উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু উভয়েই তাহা ভুলিয়া ছিলেন; কবি পিয়ার্সনকে স্নেহ করিতেন, পিয়ার্সন তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। তবে পিয়ার্সনের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটি mystical বা supernatural elementএর সন্ধান ছিল; সেইজন্য তিনি নানাস্থানে ও আশ্রমে ঘুরিতেন, কবির সেটি ভাল লাগিত না; পিয়ার্সনের intellectual শক্তির উপর কবির শ্রদ্ধা ছিল না এবং হয়ত তাঁহার সেই জিনিষটা বেশি ছিল না বলিয়া তিনি কবির বিশ্বভারতীর ideal এর স্বরূপটি তেমন হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার উদার হৃদয়ের সরলতাকে কবি চিরদিন শ্রদ্ধা করিতেন।

এবার পশ্চিম ভারতীয় ভ্রমণকালে কবির সঙ্গী ছিলেন এণ্ড্রুজ, ক্ষিতি-

মোহন সেন ও গৌরগোপাল ঘোষ। এইবার কাথিবাড় ভ্রমণকালে সেখানকার রাজাদের নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা 'কলাভবন' পত্তনের সহায়তা করে।

পৌষ উৎসবের পূর্বে পশ্চিমভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ফিরিলেন ও যথারীতি পৌষ উৎসব ও বিশ্বভারতীর উৎসব সম্পন্ন করিলেন। (শান্তিনিকেতন, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৩০ মাঘ পৃঃ ১) শান্তিনিকেতনে বসিয়া দৈনন্দিন কার্য সম্পন্ন করিতেছেন, তবে গান এখনও চলিতেছে। এমন সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতার জন্য আহ্বান আসিল; বক্তৃতা তিনি লেখেন নাই; অন্যের অনুলেখন পরে দেখিয়া দেন। (সাহিত্যের মূলতত্ত্ব, রসতত্ত্ব—পরিচারিকা ১৩৩০ ফাল্গুন; প্রবাসী ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ ২০২-২০৩)।

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ শ্রীনিকেতনের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব; কবি প্রাতে উপাসনার কার্য করেন। ঐদিন বৈকালে হাট বসাইবার উপলক্ষে আহূত জনসভায় কবি বক্তৃতা করেন। এই সময়ে তিনি কয়েক দিন সুরুলের গাছের বাড়ীতে বাস করেন। সুরুলে কাসাহারা নামে এক জাপানী মিস্ত্রি ও শিল্পী বাস করিত; প্রকাণ্ড একটা বটগাছকে আশ্রয় করিয়া সে এক বাড়ী নির্মাণ করে। কবির সখ্ হইল, সেই বাড়ীতে গিয়া কয়দিন থাকিবেন।

২৩। চীনদেশে

কিছুকাল হইতে কবির চীনদেশে যাবার কথা হইতেছে। সেখানকার চীনা ভক্তরা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতেছিলেন, কিন্তু কবি নানা কারণে যাইতে পারেন নাই। এইবার সেই আহ্বান স্পষ্টভাবে আসিয়াছে। আশ্রম হইতে বিদায়ের পূর্বদিন (৫ই চৈত্র ১৩৩০) মন্দিরে তিনি বলিলেন, "দেশের গণ্ডীর মধ্যেই আশ্রমের পরিচয় যতই মনোরম হোক, তার যথার্থ যে বড় চেহারা, তার

ভিতরকার বড় শক্তির পরিচয় নেই। যদি শান্তিনিকেতনের দূত হয়ে ভারত-বর্ষের বাইরে এখানকার বাণী বহন করে যেতে পারি, যদি কোনও বিশ্ববাসীকে অন্তরে বহন করে আনতে পারি, তবে আশ্রমের বড় পরিচয়টি পাব।" (শান্তিনিকেতন ৫ম বর্ষ ১৩৩১ পৃঃ ১৩৮)। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমবাসীরা বিদায় সভা করেন; সেই সভায় দুইটি সংস্কৃত কবিতা বিধুশেখর শাস্ত্রী রচনা করিয়া পাঠ করেন—একটি কবির উদ্দেশ্যে, অপরটি চীনাবাসীদের জন্য ভারতের দান উল্লেখ করিয়া রচিত।

কবির সঙ্গে যাইতেছেন কলাভবনের নন্দলাল বসু, বিদ্যাভবনের ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীনিকেতনের এলমহার্স্ট ও মিস্ গ্রীন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ডাঃ কালিদাস নাগ। ৮ই চৈত্র ১৩৩০ (২১ মার্চ ১৯২৪) রবীন্দ্রনাথ সদলে কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

চীনদেশ সম্বন্ধে কবির কৌতূহল জাগ্রত করিয়া দিয়া যান অধ্যাপক লেভি; দুই বৎসর পূর্বে তিনি বিশ্বভারতীতে চীনাভাষা ও সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র করিয়া যান। চীনদেশও ভারতকে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। বিশেষত সে-দেশে ডাঃ হু-সির ন্যায় চিন্তাশীল লোক চীনাযুবকদিগকে আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। চীনের রাজধানী তখনো পেকিং; সেখানকার বক্তৃতা সভা কবিকে আহ্বান করেন; এই সভা ইতিপূর্বে বার্টরাণ্ড রাসেল্ ও আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক জন্ ডিউইকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সভার অধিনেতা ছিলেন লিয়াং চি-চাও। এই শক্তিমান পুরুষ চীনের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন; ১৮৯৮ সালে মাঞ্চু সরকার তাঁহাকে নির্বাসিত করেন। চীনা রিপাবলিক গঠিত হইবার পর যখন প্রেসিডেন্ট য়ুন-শি-কাই রাজা হইবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন, তখন তিনিই তাঁহাকে বাধা দেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন; তাঁহার রচনা পদ্ধতি চীনদেশে আদর্শস্থানীয়; তিনি পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিন্তধারাকে চীনদেশে প্রচারকল্পে এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। Tse Mou Hsu সুসিমো নামে একজন তরুণ শিক্ষিত চীনা-কবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত ছিলেন; রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে একখানি পত্রে লেখেন, তাহা ভক্তি উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত; পত্রখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

We eagerly covet your presence,—a presence, we believe, which will lend comfort and calm and joy to this age of gloom and doubt and agitation ; a presence which will further strengthen our faith and hope in larger things in life, which you have helped to instil into our minds.

রবীন্দ্রনাথের চীন যাত্রার ব্যয় পেকিং বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছিল ; তবে অন্যান্য খরচ ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের ব্যয় নির্বাহার্থে দশ হাজার টাকা দেন দানপতি যুগলকিশোর বিড়লা। এই দানবীর ভারতের সংস্কৃতির সহিত চীনের সভ্যতার সংযোগ স্থাপনের জন্য মহা উৎসাহেই এই টাকা দান করেন।

৮ই চৈত্র (২১এ মার্চ) কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়ে; তাহার পূর্বদিন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের আলিপুর বীক্ষণাগার বাসায় বৃহৎ পার্টি হয় ; কবিকে বিদায় দিবার জন্য প্রায় ৫০০ নরনারী উপস্থিত হন।

'কবি আসিতেছেন' এ সংবাদ বর্মায় পৌঁছিয়াছে। সেখানে তাঁহাকে অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন হইয়াছে। ২৪এ মার্চ কবি রেঙ্গুন পৌঁছাইলেন ; ষ্টীমার ঘাটে বিরাট জনতা তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। সেইদিন তিনি গভর্ণর স্যর্ হারকোর্ট বাটলারের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। অপরাহ্ণে জুবিলি হলে তাঁহার পাবলিক অভ্যর্থনা হইল ; মিঃ U. Tokkyi M. L. A সভাপতি হন। যে অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল তাহাতে কবির মর্মকথা ও আদর্শটি খুব স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। এই অভিনন্দনের উত্তরে কবি বলেন—We all know that in a great age of our country messengers from India crossed the impassable deserts and insurmountable hills and came to the distant parts of the world * * * They fulfilled the highest mission of their country by proclaiming to all other countries that they were their own, that they had something through which they could establish a relationship which would last for ever. And through these ideals India truly revealed herself not only to her own people but to distant lands. That was a true revelation.

মৈত্রীর আদর্শই জগৎ ইতিহাসে ভারতের positive দান; সেইজন্যই ভারত এখনো বাহিরে পূজিত। She was known and would be known to all the world for all time by her immortal thoughts and her love for humanity.

২৫এ মার্চ রেঙ্গুনের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন কবির সম্বর্ধনা করেন; 'রেঙ্গুন মেলে'র সম্পাদক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হন; মিঃ মোয়াজ্জেম আলি অভিনন্দন পাঠ করেন। পরদিন রেঙ্গুনের চীনা সম্প্রদায় তাহাদের স্কুলে কবির অভ্যর্থনা করেন। এই স্কুলের অধ্যক্ষ লিম্ ঙো চিঙ্ পরে শান্তিনিকেতনে চীনা অধ্যাপক হইয়া আসেন ও প্রায় দুই বৎসর বাস করেন। রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা আয়োজনের প্রধানতম উদ্যোগী ছিলেন বেঙ্গল একাডেমীর হেডমাষ্টার মহিতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁহার বিরামহীন চেষ্টায় এইবারকার অভ্যর্থনা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

তিনদিন রেঙ্গুনে থাকিয়া কবি পেনাঙ যাত্রা করিলেন। পেনাঙ বন্দরে ষ্টীমার কয়েক ঘণ্টা থামে; কিন্তু তাহার মধ্যে স্থানীয় লোকেরা হাণ্ড্‌বিল্ দিয়া চারিদিকে কবির শুভ আগমন বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন। বিরাট শোভাযাত্রা ও বাদ্য করিয়া কবিকে তাহারা মিঃ নম্বায়ারের বাড়িতে লইয়া যায়। মোটর-যোগে সহর দেখিয়া রাত্রে ষ্টীমারে ফিরিলেন।

৩১এ মার্চ 'ইথিওপিয়া' জাহাজ মালয় উপদ্বীপের বন্দর Port Swettenhamএ থামে; সেখান হইতে তথাকার প্রধান সহর কুয়ালা লুম্‌পুরএ যান; সেখানকার বাঙালী ডাক্তার পরেশচন্দ্র সেন কবির বিশেষ যত্ন করেন; সেইদিন সন্ধ্যায় পোর্টে ফিরিয়া আসেন। পরদিন সিঙাপুর পৌছাইলেও কবির সম্বর্ধনার জন্য বহু শত লোক জেঠিতে উপস্থিত দেখা গেল। এখানে জাহাজ বদলাইয়া তাঁহাকে জাপানী জাহাজ ধরিতে হইল।

১২ই এপ্রিল 'আত্‌সুতা মারু' শাঙহাই বন্দরে পৌছাইল। পেকিং যাত্রার পূর্বে তিনি কয়েক দিন শাঙহাইতে থাকিলেন। হঠাৎ একজন ভারতীয় কবির আবির্ভাবে পূর্ব এশিয়ায় বেশ একটু চঞ্চলতা হইয়াছিল; ভারতবর্ষ ত' কখনো বাহিরের সহিত অকারণ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আসে নাই। ভারতের সঙ্গে এই নূতন পরিচয়ে চীনা, জাপানী, ইংরেজ আমেরিকান পত্রিকাওয়ালারা

বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিল। কেহ মনে করিল নিখিল-এশিয়ার (Pan Asia) যে স্বপ্ন লোকে দেখিতেছে, ইহা কি তাহারই সূচনা—না আর কিছু! জল্পনার অন্ত ছিল না। কিন্তু কবি স্বয়ং ইহার উত্তর দিলেন; তিনি বলিলেন, প্রাচীন ভারতের সহিত চীনের যে সম্বন্ধ ছিল, যাহার ক্ষীণধারা বিস্মৃতির অন্ধকারে প্রায় বিলীন হইয়াছে, তিনি সেই ধারা পুনর্প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন। এই সংযোগ কোনো রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য নহে, কেবল প্রেম ও বন্ধুত্বের জন্য—for disinterested human love and for nothing else. মানুষের সহিত মানুষের যে সহজ সম্বন্ধ আছে, তাহাকেই আবিষ্কার করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এই বক্তৃতা তিনি দেন হাঙ-চৌতে, চীনে আসিবার পরদিনই।

১৭ই এপ্রিল শাঙহাইএর জাপানী স্কুলে জাপানী শ্রোতাদের সম্মুখে তিনি এক বক্তৃতা করেন; সেই দিনই প্রাতে জপানী ক্লাবে তাঁহার এক অভ্যর্থনা হইয়া গিয়াছিল। এইখানকার বক্তৃতায় কবি স্পষ্ট করিয়া বলেন যে পশ্চিমের যে আদর্শ জাপানকে ধনলোলুপ, শক্তিমত্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা যেন পূর্বকে গ্রাস না করে; পূর্বদেশের আজ এই বড় ভয় যে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত দ্বন্দ্ব করিতে গিয়া আজ তাহার নিজস্ব স্বাত্তিকতা হারাইয়া য়ুরোপের অস্ত্র গ্রহণ করিতেছে। তিনি শ্রোতাদের বলিলেন, not to acquire the mentality of the primitive man, the mentality of the West eternally strivivg after power. The world was waiting for that moral idealism, for that spiritual standard of life to save it from that demon, the worship of power.

কবির এই উক্তির প্রতিবাদ না হইয়া যায় নাই, ইংরেজি ও আমেরিকান পত্রিকায় প্রতিবাদ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে শাঙহাইএর এঙলো-এমেরিকান সমিতি কবিকে প্রথম পাবলিক বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। ডাঃ স্থরমান (Schurman) কবিকে সভায় পরিচিত করিবার সময় খুব চতুরতার সহিত কবির পূর্ব বক্তৃতার বিষয়ের একটু মৃদু প্রতিবাদ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতার প্রথমে তাঁহার নিজ বিদ্যালয়ের কথা বলিয়া কিভাবে তাঁহার মন 'ন্যাশনালিজমে'র বীভৎসরূপ দেখিয়া প্রতিহত হইয়ছিল

তাহা বলেন। ১৯১৬ সালে আমেরিকা যাইবার পথে জাপানে উগ্র ন্যাশনালিজমের মূর্তি দেখিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদস্বরূপ কয়েকটি বক্তৃতা লেখেন; তাহার পর ১৯২১ সালে য়ুরোপে গিয়া যুদ্ধের প্রেত মূর্তি দেখিয়া Internationalism এর কথা তাঁহার মনে স্পষ্টভাবে হইল। য়ুরোপের তীব্র ন্যাশনালজিমের মদ আজ প্রাচ্যে আসিয়াছে; কবি তাহার নিন্দা করিলেন।

আংলো-আমেরিকান সমিতির সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা চীনময় বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল; পশ্চিমের নিন্দা যে কেবল ইংরেজ ও আমেরিকানদের আঘাত করিল তাহা নহে, চীনের যুবক সম্প্রদায় কবির সমালোচনায় তৃপ্ত হইল না; অথচ প্রাচীনরা কবির উক্তিতে খুসিই হইয়াছিলেন। পশ্চিমের বিদ্যালয়ে-পড়া চীন যুবকরা কবির পাশ্চাত্য সভ্যতার নিন্দাতে খুবই উত্তেজিত হয়। ইংরেজদের মধ্যে কোনো কোনো পত্রিকা কবির কথা গম্ভীরভাবে শুনিয়াছিলেন; কবির বক্তৃতার সমালোচনাকালে Peking Leader লিখিলেন যে য়ুরোপীয় Civilization is in danger of disintegration, the Great War was only a symptom of a disease, which is destroying the social Organism." ১৮ই এপ্রিল চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাবলিশিং হাউস কমার্শিয়াল প্রেসের অফিসে নানা সাহিত্যিক সমাজ একত্র হইয়া কবিকে সম্বর্ধনা করেন; সহস্রাধিক লোক ইহাতে উপস্থিত ছিল।

২৩এ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ চীনের তৎকালীন রাজধানী পেকিং পৌঁছাইলেন। সেদিন পেকিঙের ষ্টেসনে কি জনতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হন। North China Standard লিখিয়াছিলেন যে, চীনা intellectualদের (মনীষীদের) মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা করিবার সময়ে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, তাহা আধুনিকযুগে আর বড় দেখা যায় নাই; ইহার কারণ কি? ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের মহাপুরুষ এবং চীন তাঁহাকে সম্মানের দ্বারা প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে।

দিন তিন পরে ন্যাশন্যাল য়ুনিভার্সিটিতে চীনাদের তরফ হইতে কবির প্রথম সম্বর্ধনা হইল; চীনাছাত্র ও যুবকদের সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ। চীনের একদল যুবক প্রাচীন চীনের সংস্কৃতির উপর খুবই বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল;

যে-সংস্কৃতি ও সাহিত্য তাহাদিগকে বিদেশের আধিপত্য হইতে মুক্তির শিক্ষা দেয় নাই, যে-সংস্কৃতি তাহাদিগকে মূঢ়তার মধ্যে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা শিথিল হইতে বাধ্য; এখন রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সেই প্রাচীনের জয়গান করিতেছেন, ইহাতে তাহারা ভারতীয় কবির উপর পর্যন্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল। সুতরাং চীনাদের তরফ হইতে কবির বক্তৃতাদি সর্বদা সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল তাহা নহে।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনপন্থী, ঈশ্বরবিশ্বাসী ও নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিপন্থী মতামত পোষণ করেন—এইরূপ কতকগুলি কথা কোনো কোনো কাগজ চীনের মধ্যে প্রচার করে। চীনের যুবকগণ আধুনিকতার নবমন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারা রবীন্দ্রনাথকে এইসব পরিত্যক্ত মতের পোষক মনে করিয়া প্রথমদিকে দূরে ছিল; তাহারা সভার পূর্বে ছোট ছোট বিজ্ঞাপনীতে এইসব কথা লিখিয়া প্রচার করিত; তাহারা বলিত রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তাঁহার মতামত আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না; কিন্তু আশ্চর্যর বিষয় কোনো সভায় তাহারা কখনো কোনোদিন অভদ্রাচরণ করে নাই।

তরুণ চীনের চিন্তাজগতের নেতা ডাঃ হু-সি (Hu Hsi) কবির সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া বুঝিলেন যে চৌষট্টি বৎসরের বৃদ্ধের অন্তরে তারুণ্যের যে অগ্নি রহিয়াছে, যাহা ধ্যানে, চিন্তায় একটি গভীর অধ্যাত্মলোকে পৌঁছিয়াছে, তাহা তাঁহাদের পাশ্চাত্য জগতের ধারকরা আধুনিকতার অনেক ঊর্ধ্বে। হু-সির পরিবর্তন হইলে যুবকদের মধ্যে বিরোধিতা দূর হয়। ইহার পর তাঁহার বক্তৃতাদি যুবকরাও পরম শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিত। হু-সিও কবির মতে বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন।

২৭এ এপ্রিল Navy Clubএ কবির নিমন্ত্রণ হয়; সেখানে Liang Chi-Chao প্রভৃতি চীনের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরদিন প্রাতে চীনের পূর্বতন মাঞ্চু সম্রাট্ কবিকে তাঁহার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। বিশেষ সম্মানের সহিত তিনি কবিকে অভ্যর্থনা করেন ও চীনের অন্যতম কবি Mr. Tsing এর সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। সম্রাট্ কবিকে লইয়া ফটো তুলাইলেন। ইতিপূর্বে সম্রাট্ Dr. Hu Hsi ছাড়া আর কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন নাই। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি এই সম্রাট্ ১৯৩২ সালে মাঞ্চুকুও রাজ্যের রাজা হইয়াছেন।

সেই দিনই অপরাহ্নে 'পৃথিবীর মন্দিরে' কবি সহস্রাধিক চীনা ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা তরুণ কবি সে-মু-সু (Tse-Mou-Hsu) অনুবাদ করিয়া দেন। ইহার পর কয়দিন কবি নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। সর্বত্রই তিনি চীনাদের খুবই স্পষ্ট করিয়া বলেন যে পশ্চিমকে অনুকরণ করিয়া প্রাচ্যদেশ সমূহ বাঁচিবে না; প্রাচ্যকে তাহার প্রাণশক্তির উৎস তাহার ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাচীন চীনের সংস্কৃতির প্রতি কবির শ্রদ্ধা দেখিয়া যুবচীন খুব উৎসাহ প্রকাশ করে নাই; বরং তাহারা কোনো কোনো পত্রিকায় বিরুদ্ধ সমালোচনাই করিয়াছিল সেকথা পূর্বে বলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ ৎসিং-হুআ কলেজে কয়েকদিন শান্তভাবে বাস করেন; সেই সময়ে নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন ও কালিদাস নাগ চীনের প্রাচীনতম বৌদ্ধ নগরী লোয়াঙে যান। এদিকে পেকিঙে চীনা বন্ধুরা কবির ৬৪তম জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। ঐদিনে তাঁহারা কবিকে Chu Chen-Tan অর্থাৎ ভারতের Thundering Morning উপাধি দেন। ডাঃ হু-সি এই অনুষ্ঠানের পুরোহিতের কার্য করেন; ইহার পর কবির 'চিত্রা'র চীনা অনুবাদের অভিনয় হয়। উৎসবান্তে চীনারা কবিকে ১৫।১৬ • খানি মূল্যবান ছবি, একটি চীনা মাটির সুন্দর পেয়ালা ও অন্যান্য বহুবিধ জিনিষ উপহার দেন।

পরদিন Chen Kwang রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাবলিক বক্তৃতা হয়; এখানে Liang Chih-Chao উপস্থিত ছিলেন ও কবিকে পরিচিত করিয়া দেন। এই সভায় কবি তাঁহার জীবনেতিহাস বলেন; প্রবন্ধটি Talks in Chinaতে আছে। ইহার পর পেকিঙে সাধারণের কাছে কয়েকটি বক্তৃতা তিনি পাঠ করেন। শেষ বক্তৃতা দেন ২৬এ মে।

চীনে তিনি যে সব বক্তৃতা দেন ও ছাত্রদের সহিত আলোচনা করেন সেগুলি Talks in China নামক গ্রন্থে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

চীন হইতে কবি সদলে জাপান যান; ক্ষিতিমোহন সেন জাপানের প্রাচীন তীর্থস্থান, বিশেষভাবে বৌদ্ধসংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের জন্য কোবে হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। সঙ্গে থাকেন কালিদাস নাগ ও নন্দলাল বসু।

জাপানে কিছুকাল পূর্বে নিদারুণ ভূমিকম্পে তাহার বহু ক্ষতি করিয়াছিল। এছাড়া ১৯২৪ সালে আমেরিকার সহিত তাহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল; তখন আমেরিকানরা জাপানীদের তাহাদের দেশে অবাধে প্রবেশ সম্বন্ধে নিয়ম নিষেধ রচনায় প্রবৃত্ত। রবীন্দ্রনাথ জাপানে যেসব বক্তৃতা দেন, তাহার একটি হইতেছে International Relations সম্বন্ধে। তিনি জাপানকে আমেরিকার এই ক্ষুদ্র ব্যবহারে উৎক্ষিপ্ত না হইবার জন্য উপদেশ দেন; যখন কেহ অন্যায় বা অবিচার করে, তখন স্বভাবতই মানুষের নীচ রিপুগুলি জাগিয়া ওঠে; তিনি জাপানকে সেই সম্বন্ধে সাবধান করিলেন। তিনি বলিলেন আমি জানি যে এ সময়ে উচ্চ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা কঠিন। জাপানীরা নিজেরাই অন্যদের প্রতি nation রূপে যে-ব্যবহার করিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত করিতে ছাড়িলেন না।

I have a deep love and respect for you as a people, but when as a nation you have your dealings with other nations you also can be deceptive, cruel and efficient in handling those methods in which the Western nations show such mastery. (V. B. Q. II. p 311). এই প্রবন্ধে তিনি আট বৎসর পূর্বে যে কথা একদিন বলিয়াছিলেন সেই কথাই বলিলেন, নেশন-এর উগ্রমূর্তি মানুষকে ধ্বংস করিতেছে; If you must have peace, you will have to fight the spirit of this demon, Nation.

ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত অগ্নিযুগের বিপ্লবীনেতা রাসবিহারী বসু জাপানবাসী। ১৯১৬ সালে তিনি জাপান যান; তারপর তাঁহার জীবনের ও মতের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। রাসবিহারী কবিকে বিশেষভাবে সেবাযত্ন করেন। জাপান হইতে কবি সদলে জুনের শেষাশেষি দেশের দিকে রওয়ানা হইলেন।

২৪। দেশে দুই মাস

চীনযাত্রীর দল ৫ই শ্রাবণ ১৩৩১ (২১এ জুলাই ১৯২৪) ভারতবর্ষে ফিরিলেন। ভারতের বাহিরে চারি মাস মাত্র ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি একটি চা-বৈঠকের প্রবর্তন করিয়াছেন। চীনে সু সি-মো নামে যে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারই নামে চা-চক্রটির নামকরণ হয়। এই উপলক্ষে কবি একটি গান রচনা করেন—গানটিতে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন অধ্যাপকের চরিত্র বর্ণিত আছেন; "হায় হায় হায় দিন চলি যায় চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল হে"—এই পদ শুনিলে এখনো অনেক পুরাতন অধ্যাপকের অনেক প্রাচীন স্মৃতি জাগিয়া উঠে। (শান্তিনিকেতন ৫ম বর্ষ ১৩৩১ পৃঃ ১২৯)।

দেশে ফিরিবার অব্যবহিত পরে বাঙলা গভর্ণর লর্ড লীটনের সহিত পাবলিক খবরের কাগজের মধ্য দিয়া কবির সহিত একটি বিতর্ক উপস্থিত হয়। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশে রাজনৈতিক অশান্তির অন্ত নাই। এই সময় চরমনিয়ার নামে একটি গ্রামে পুলিশের ব্যবহার লইয়া দেশ মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা ও পত্রিকাদিতে তীব্র সমালোচনা চলিতেছিল। পুলিশের উপর লোকের মন এই কারণে অত্যন্ত বিরূপ ছিল। তাহার উপর জুলাই-এর শেষে ঢাকায় পুলিশ বাহিনীর বার্ষিক মিলনোৎসবে লাট সাহেব বক্তৃতাকালে এমন কতকগুলি মন্তব্য করেন, যাহার কটু ব্যাখ্যা করা যায়। সাময়িক পত্রিকাগুলি সে-সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেখাইলেন, লাট সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে ভারতীয় নারীর চরিত্রের উপর অশ্রদ্ধাপূর্ণ উল্লেখ আছে; কাগজগুলিতে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হইল। লীটনের মনোভাব আদৌ খারাপ ছিল না; অথচ তিনি দেশের লোকের কাছে নিজেকে পরিষ্কার করিয়া প্রকাশও করিতে পারিতেছিলেন না। কিভাবে তিনি উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করেন তাহা সাময়িক 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' প্রকাশ করিয়াছিল।

লর্ড লীটন তাঁহার জবাব ২১এ আগষ্ট তৈয়ারী করিয়া বাঙলা দপ্তরখানায় পাঠাইয়া দেন; কয়েকজন রাজভক্ত বাঙালীকে তাঁহার খশড়া দেখানো হইলে তাঁহারা লাট সাহেবের জবাবটা অনুমোদন করেন। কিন্তু কিভাবে উহা প্রকাশ করা যায় তাহাই হয় সমস্যা। স্যর দেবপ্রসাদ অধিকারীকে মধ্যস্থতা করিবার জন্য অনুরোধ হয়; তিনি রাজী হন না। মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র তখন লাটসভার মেম্বর; তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ইহার মধ্যে যাইতে অস্বীকৃত হন! অবশেষে মিঃ ফজলুল হকের সবিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ জন্মাষ্টমীর দিন (২২এ আগষ্ট) গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদে গিয়া লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করেন; লীটনের সহিত কথাবার্তার পর রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্র তাঁহাকে লিখিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। পরে রবীন্দ্রনাথের পত্র ও লর্ড লীটনের পত্র একই দিন কাগজে বাহির হয় (২৩এ আগষ্ট ১৯২৪)। লর্ড লীটন তাঁহার জবাবে বলেন যে তিনি আদৌ ভারতীয় নরনারীর চরিত্রের উপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে চান নাই; এবং যদি তাঁহার ভাষায় কেহ ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন, তাহার জন্য সবিশেষ দুঃখ তিনি প্রকাশ করেন।

কিন্তু তাঁহার জবাবে দেশের লোক খুব খুশী হয় নাই এবং কাগজের সমালোচনাও বন্ধ হইল নাই। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া (৩১এ আগষ্ট) পুনরায় একখানি পত্র লাটসাহেবকে লেখেন। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে চরমনিয়ার ব্যাপারের পরই লাটসাহেবের পক্ষে পুলিশের স্তুতিগান এবং এমনভাবে ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাহার অর্থ অন্যরূপ হইতে পারে—অশোভন হইয়াছে। In consequence, a considerable number of my countrymen who are honestly hurt at such an untimely expression of faith in the police department and sympathy with its individual members, are ready to challenge your Government to produce trustworthy evidence in support of your statement even about those rare cases of a particular type of conspiracy against public officials.

দার্জিলিং হইতে লর্ড লীটন (৩রা সেপ্টেম্বর) একখানি জবাব লিখিয়া

পাঠান ; তাহাতে তাঁহার সৌজন্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল ; তিনি তাঁহার উক্তির অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে, তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আসল বক্তব্য যে রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য একদল নেতা পুলিশের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ আনেন,—তাহা প্রত্যাহার করেন নাই। সে-সম্বন্ধে লিখেন incidents which must be familiar to almost every Judicial authority ; তাঁহার বক্তৃতার ভাষার জন্য sincere regret প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার অভিযোগের প্রমাণ দিলেন না !

রবীন্দ্র-লীটন সম্বাদ মিটিল, কিন্তু পত্রিকাসমূহের টিপ্পনী বন্ধ হইল না ; রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রের প্রথম বাক্য 'I am being urged by my countrymen ইত্যাদি ভাষার লইয়া সমালোচনা হয় ! অর্থাৎ তাহা হইলে কি কবি নিজের ইচ্ছায় পত্র লেখেন নাই ; নিজে অনুভব করেন নাই ; ইত্যাদি। বড় গাছেই ঝড় লাগে।

দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন বাঙলাদেশ নানাভাবে পীড়িত অপমানিত। লর্ড লীটন কিছু কাল পূর্বে দেশবাসীকে একবার তখনও তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন, তখন একজন পুরুষ সিংহর বাঙালীর কাছে তাঁহাকে নৈতিক পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল ; রবীন্দ্রনাথ চীন হইতে ফিরিয়া জানিলেন সে মহাপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। দেশে আসিয়া 'বিশ্বভারতী কোয়ারটারলি'তে কবি এই মহাপুরুষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন ; তাহার এক স্থানে লিখিয়াছিলেন, He had the courage to dream because he had the power to fight and the confidence to win,—his will itself was the path to the goal. এই মহাপুরুষের সহিত কবির বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে ; তিনিই সর্বপ্রথম কবির প্রতিভাকে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে Doctor of Literature উপাধিতে ভূষিত করেন ; তাঁহারই ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথ 'কমলা লেকচার' দেন ; তিনিই কবিকে 'জগত্তারিণী' পদক প্রথম দিয়া তাঁহার বৃত্তি আরম্ভ করেন। বিশ্বভারতীর বহু সুযোগ সুবিধা তাঁহার জন্যই হইয়াছিল সেসব কথা কবি কখনো বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

থাক্ এসব কথা। কবির সাহিত্য সাধনা কি হইতেছে বহুদিন দেখি নাই ; দুঃখের বিষয় সেখানে বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই। বাঙলা ভাষায় বড় বেশি কিছু পাই না ; ইংরেজিতে 'বিশ্বভারতী কোয়াটারলি'র জন্য লেখা দেখি। আশ্বিন (১৩৩১) মাসে 'রক্তকরবী' প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় ; সেই মাসেই কোয়াটারলিতে উহার তর্জমা Red Oleanders নামে বাহির হয় ; গ্রন্থখানি এলম্‌হার্ষ্টকে উৎসর্গ করেন। পাঠকের স্মরণ আছে এই নাটকটি প্রথম লেখেন শিলং থাকিতে ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মকালে।

'বিশ্বভারতী কোয়াটারলি'তে এই তর্জমা ছাড়া অনেকগুলি ইংরেজি রচনা দেখি। একই ব্যক্তিকে দুইটি ভাষার চিন্তা ব্যক্ত করা সহজ কথা নয়। তাই দেখি বাঙলায় বড় রচনা এখন কিছু নাই, যা কিছু লিখিতেছেন, তা ইংরেজিতেই।

ইতিমধ্যে কবির দক্ষিণ আমেরিকা যাওয়ার কথা হয়। ১৭ই ভাদ্র কবি শান্তিনিকেতনে বিদেশে যাত্রার পূর্বে তাঁহার বক্তব্যটুকু আশ্রমবাসীদের নিকট বলেন (প্রবাসী ১৩৩১ কার্তিক)। সেখান হইতে কলিকাতায় যান ; কিন্তু সেখানে গিয়া বিশ্রাম নাই। যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'অরূপরতন' নাটকটির মূকাভিনয় হয় ; কবি নাটকটি আবৃত্তি করেন ; সেই সঙ্গে মূক অভিনয় ও গান হয়। এই প্রথম যখন নৃত্যের আভাস পাবলিকে দেওয়া হইতেছে। 'বর্ষামঙ্গলে' কেবল গানই হইত, কোনোপ্রকার অভিনয়ের চেষ্টা হয় নাই। 'অরূপরতনে'র আবৃত্তির সময় ভাবব্যঞ্জনার মূকাভিনয় নৃত্যের প্রথম চেষ্টা। এখনো নৃত্য শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ হয় নাই।

২৫। দক্ষিণ আমেরিকা ও ইতালি

রবীন্দ্রনাথ তখন জাপানে ১৯২৪ মে মাসে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু হইতে তাঁহার কাছে নিমন্ত্রণ আসিল সেখানে যাইবার জন্য। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আমেরিকায় স্বাধীনতার শত বার্ষিকী উৎসব—সেই উপলক্ষে পেরু গবর্মেণ্ট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। একশত বৎসর পূর্বে স্পেনীশদের হাত হইতে ঔপনিবেশিকরা মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন হয়,—

উদ্‌যাপনলক্ষ্যে উৎসব। কবি য়ুরোপ ও আমেরিকার এংলো-সাক্সন জাতির মধ্যে ঘুরিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র ফরাশী ছাড়া লাতিন-জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি দেখিবার সুযোগ পান নাই। পেরুর এই আমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করিলেন। পৃথিবীর একটি দূরতম স্বাধীনরাজ্যের স্বাধীনতার শতবার্ষিকীতে বাঙালী কবির নিমন্ত্রণ—এই ব্যাপারটি যে কত বড়, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না।

চীন হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন ৫ই শ্রাবণ; দুইমাস পরে ৩রা আশ্বিন (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) দক্ষিণ আমেরিকার জন্য যাত্রা করেন; এই দুইমাস কিভাবে কাটে তাহার আভাস দিয়াছি। এবার সঙ্গে আছেন, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী ও সুরেন্দ্রনাথ কর। কথা হইয়াছে সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, ইংলণ্ড হইতে এলমহার্ষ্ট কবির সঙ্গে সেক্রেটারী রূপে দক্ষিণ আমেরিকা যাইবেন।

এবার কবির শরীর খুব খারাপ চলিতেছে; মাদ্রাজ হইতে ২০এ সেপ্টেম্বর একখানি পত্রে লিখিতেছেন,"ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।" সত্যই এবার স্বাস্থ্যের দিক হইতে তাঁহার যাত্রা খুবই অন্যায় হইয়াছিল। কলম্বো হইতে তাঁহারা জাপানী জাহাজ 'হারুনা মারু'তে উঠিলেন। সেখান থেকে লিখিতেছেন, "অনেকবার দূরদেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশি টানাটানি ক'রতে হয় নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে। * * তবু মনে জানি ঘাটের থেকে কিছু দূর গেলেই এই পিছুটানের বাঁধন খ'সে যাবে।" (যাত্রী পৃঃ ১-২)

পথে কবি স্থির করেন পোর্ট সৈয়দে নামিয়া প্যালেষ্টাইন ও মিশরে এক এক সপ্তাহ করিয়া থাকিবেন; সেইমত বেতারে খবর দেওয়া হয়; জেরুসালেম হইতে সানন্দে অভ্যর্থনা আসিল। এদিকে তাঁহারা পোর্ট সৈয়দে পৌঁছিয়া কেব্‌লে খবর পাইলেন যে ২২এ অক্টোবরের মধ্যে ফ্রান্সে না পৌঁছাইতে পারিলে, দক্ষিণ আমেরিকাগামী জাহাজ ধরা যাইবে না; সুতরাং জেরুসালেম যাওয়া স্থগিত করিয়া পুনরায় তার করা হইল।

এবার কবি ডায়ারি লিখিতেছেন পত্রাকারে; এই পত্রগুলি নানা-

লোককে লিখিত। কলম্বো থেকে জাহাজ ছাড়ার দিন হইতে প্রায় এই ডায়ারি-পত্র প্রত্যহই লেখেন ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত। নানা বিষয়ের আলোচনা এই পত্রগুলির মধ্যে আছে; ফলে এগুলি পত্র না হইয়া আলোচনা হইয়া গিয়াছে; 'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের রস পাই, এগুলিতে তেমন পাইনা; তা না হইলেও সাহিত্যের দিক হইতে এগুলি অনির্বচনীয় হইয়াছে। বাঁধাধরা প্রবন্ধে যে-কথা যে-চিন্তাধারা প্রকাশ করার সুযোগ হয় না, তা হয় এই ধরণের লেখার মধ্য দিয়া।

দুই একটা গানও রচনা করিতে দেখিতেছি; কিন্তু এবার পরিপূর্ণ বর্ষার দুর্যোগে কবি কবিতা বেশি লিখিতেছেন। ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত কবিতা পাই; বহুকাল পরে কবিকে তাঁহার আপনলোকে ফিরিতে দেখিয়া মন আনন্দিত হয়। চারিমাসে ৬১টি কবিতা রচনা করেন। 'পূরবী' কাব্যের কবিতা এইগুলি। (২৬এ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪—২৪এ জানুয়ারী১৯২৫। দ্রঃ পূরবী পৃঃ ৬৩-২২৪)

১১ই অক্টোবর মার্সাই জাহাজ পৌঁছাইল। প্যারিতে কয়েকদিন থাকিতেই খবর আসিল শেরবুর্গ (Cherbourg) বন্দর হইতে দক্ষিণ আমেরিকা-গামী যাত্রীজাহাজ ১৮ই ছাড়িবে। ইতিমধ্যে বিলাত হইতে এলমহার্স্ট আসিয়া কবির সহিত যোগদান করিয়াছেন। এই যাত্রা সম্বন্ধে কবি স্বয়ং লিখিতেছেন, "শেরবুর্গ বন্দর থেকে 'আণ্ডেস্' জাহাজে উঠে পড়লুম। লম্বায়-চওড়ায় জাহাজটা খুব মস্ত, কিন্তু আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় আরামের পক্ষে যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিল, তা পাওয়া গেল না। জাপানী জাহাজের আতিথ্যের প্রচুর দাক্ষিণ্যে আমার অভ্যাসটাও কিছু খারাপ ক'রে দিয়েছিল। * *

"বিষুবরেখা পার হ'য়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে, বিছানা ছাড়া গতি রইল না।" পথে শরীর খুবই খারাপ হইতে থাকে; পত্র লেখা এখন বন্ধ, 'বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে কবিতা লেখা চল্‌ল।' (যাত্রী পৃঃ ১৩০)। কিন্তু শরীর এমনি খারাপ হইল যে কবি পরে লিখিয়াছেন, "কয়দিন রুদ্ধকণ্ঠে সঙ্কীর্ণ শয্যায় প'ড়ে প'ড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্য

শক্তি আমার শেষ হয়ে গেছে।" এই শরীরে কবিতা চলিতেছে; কিন্তু বিশ দিন পরে যখন (৭ই নভেম্বর) জাহাজ বুইনস্ আয়ারসে পৌঁছাইল তখন কবির শরীর রীতিমত খারাপ হইয়াছে। অভ্যর্থনার বন্যা পার হইয়া কবি ও এলমহার্স্ট হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

আর্জান্টাইনের ভাষা স্পেনীস; সেখানকার নানা প্রতিষ্ঠান কবিকে সম্মানিত করেন; কবির বই স্পেনীশ ভাষায় প্রায় সবই অনূদিত হইয়াছিল; সুতরাং তিনি অপরিচিতের দেশে আসেন নাই। আর্জান্টাইনবাসীরা কবিকে রাজা বা সম্রাটের সম্মান দিয়াছিল, একথা সেখানকার সাময়িক কাগজে বলিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

কিন্তু কবির শরীর ক্রমশই খারাপ হইতে থাকিল, স্থানীয় ডাক্তাররা তাঁহাকে পেরু যাইতে নিষেধ করিলেন; গম্যস্থল বহুদূরে, ট্রেণ ভ্রমণে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র আরও বিগড়াইতে পারে এ আশঙ্কা তাঁহাদের ছিল। নগরবাসীরা San Isidore নামক সহরতলীর (২০ মাইল দূরে) একটি সুন্দর বাগানবাড়ীতে কবিকে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সমস্ত পাবলিক কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি সেখানে নিরিবিলি বাস করিতে লাগিলেন।

সান্ ইসিদোরেতে কবি একা থাকেন, শহর হইতে লোকে দেখা করিতে আসে, অবশিষ্ট সময় কবিতা লেখেন। এইখানে তাঁহার একটি সঙ্গী জোটেন, তাঁহার নাম Signore Victoria de Estrada; এই মহিলা কবির এই অসুস্থতার সময় তাঁহাকে সেবা করিয়া আনন্দ দান করিতেন, কবিও তাঁহাকে অমর করিয়াছেন,—'পূরবী' কাব্যখানি 'বিজয়ার কর-কমলে' সমর্পণ করিয়া। এইখানে থাকিতে লেখেন—

> "প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
> মাধুর্য সুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি
> দূরদেশী পথিকেরে"

এই মহিলা ১৯৩০ সালে কবি যখন য়ুরোপে তাঁহার চিত্র প্রদর্শনী করেন, তখনও বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

কবি কবিতা লিখিতেছেন, পত্র লিখিতেছেন, এমন সময় দেশ হইতে

সংবাদ পাইলেন বাঙলার রাজনৈতিক আকাশ অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিলাতে লেবর গবর্মেণ্ট প্রবল পার্টি হইলে লোকে খুবই আশা করিতেছিল শাসনের মধ্যে একটা পরিবর্তন হইবে; কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বেঙ্গল গবর্মেণ্ট প্রথম 'অর্ডিনান্স' পাশ করেন এবং সেই অর্ডিনান্সের সাহায্যে বহুশত যুবক অক্টোবর মাসে অন্তরীণাবদ্ধ হয়। দূর হইতে দেশের এই বেদনা কবিকে তীব্রভাবে স্পর্শ করে; তিনি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত এক পত্রে তাঁহার মনের বেদনা কিভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 'পূরবী'র পাঠক মাত্রেই জানেন (২০এ ডিসেম্বর ১৯২৪, পূরবী পৃঃ ১৯১-১৯৫)।

শুনছি নাকি বাঙলাদেশে গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে ক'রুছে আটক আলিপুরের জেলে।

আশ্রমের ৭ই পৌষ উৎসবে কবি অনুপস্থিত; কিন্তু তাঁহার মন এই উৎসবের জন্য উৎসুক। ৬ই পৌষ (২২এ ডিসেম্বর) এণ্ড্রুজকে লিখিতেছেন, You cannot imagine how my heart aches to be with you all at such a time. * * Tomorrow I shall join your festival from a distance and try to fill my heart with my yearly provision of *shanti*. খৃষ্টোৎসবের দিন তিনি সান ইসাডোরে নিরালায় এল্‌মহার্ষ্ট প্রভৃতি কয়েকজনের নিকট এই দিনের মর্মকথাটি ব্যাখ্যান করেন, শান্তিনিকেতনে বাসকালে তিনি যেমন ঐ দিনে করিতেন তেমনি ভাবে। (V. B. Quarterly 1925, July পৃঃ ১৭২)

৩০এ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ আর্জাণ্টাইন রিপাবলিকের সভাপতির সহিত দেখা করিয়া বিদায় লইয়া আসিলেন; ৪ঠা জানুয়ারী (১৯২৫) তিনি ইতালীয় জাহাজ 'জুলিয়ো চেজারে'তে (Giulio Cessare) য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। কবি দক্ষিণ আমেরিকাবাসীদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া পেরুর উদ্যোক্তারা কবির যাওয়া আসার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিতে চান; কিন্তু পেরুবাসীরা তাহা গ্রহণ করেন নাই; বরং আর্জাণ্টাইন কবির প্রত্যাবর্তনের সমস্ত ব্যবস্থা সানন্দে করিয়া দিল। আর্জাণ্টাইনে কবি প্রায় দুই মাস ছিলেন (৭ই নভেম্বর ১৯২৪—৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৫) ও এই সময়ের ২৫টি কবিতা রচনা করেন।

বুয়েনস্ আয়ারসে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ ইতালী হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। ২২এ ডিসেম্বর এণ্ড্রুজকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আছে—I know that in Italy I shall have a welcome; for from various sources I have heard that the people there are eagerly expecting me, and that my books are very widely read.

২১এ জানুয়ারী ১৯২৫, রবীন্দ্রনাথ এলমহার্স্টের সহিত জেনোয়া বন্দরে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে ইতালীতে বেশ একটু চঞ্চলতা দেখা দিল। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ফর্মিকি তাঁহার ইতালী দেশে অবতরণের অব্যবহিত পর হইতে তাঁহার দোভাষীর কাজ করেন এবং ফ্যাসিস্ত মত বিরোধীরা রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ না করিতে পারে তাহার জন্য পাহারাও দেন।

জেনোয়াতে রথীন্দ্রনাথ, ও প্রতিমাদেবী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করিলে তাঁহারা য়ুরোপ ভ্রমণ করিতেছিলেন। ২২এ জানুয়ারী কবি সদলে মিলানো নগরে উপস্থিত হন। সেই দিন প্রাতে মিলানোর কয়েকজন বিশিষ্ট লোক ও পুস্তক প্রকাশক মিলিয়া ভারতের সহিত কিভাবে ইতালীর যোগস্থাপন করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে পরামর্শ করেন, অধ্যাপক ফর্মিকি এই আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে Circolo Filologico Milanese নামে মিলানোর বিখ্যাত হলে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হয়; মিলানোর ডিউক তাঁহাকে স্বয়ং সভায় লইতে আসেন; তাঁহার সহিত তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ করেন। সভায় তিলার্ধ স্থান ছিল না। ভারতের এই কবি-মনীষাকে দেখিবার জন্য মিলানোর যাবতীয় ভদ্রমণ্ডলী সেদিন যেন উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন তাঁহার সতের বছর বয়সে য়ুরোপের সহিত প্রথম পরিচয় হয় ইতালীতে; এই বলিয়া তিনি তাঁহার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন। তারপর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি আসেন য়ুরোপে তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে। ইহার পর পূর্বদেশ ও পশ্চিমের তুলনা করিতে

করিতে বলেন য়ুরোপ যে বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করিয়াছে তিনি তাহাকে বিন্দুমাত্র হেয় করিতে চান না; কিন্তু পাশ্চাত্যদের পর্যবেক্ষণ শক্তি, মনন-শক্তি সমস্তেরই উচিত ছিল মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়তার জন্য; কিন্তু তাহা না হইয়া বিজ্ঞান সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপ আজ শান্তিকে হারাইয়াছে। শান্তিরক্ষার নামে য়ুরোপ যে নূতন যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও ভীষণতায় কম নয়। তিনি মানবের নিহিত সত্তায় শ্রদ্ধাবান এবং তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ পরস্পরের নিকট আসিবে। ইতালিবাসীকে সেইদিকে দৃষ্টি দিবার জন্য কবি আহ্বান করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হইয়া যাইবার পর অধ্যাপক ফর্মিকি ইতালী ভাষায় ইহার চুম্বক করিয়া দিলেন।

পরদিন (২৩ জানু ১৯২৫) People's Theatreএ এক বিপুল সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। প্রায় চারি হাজার বালক-বালিকা সেখানে সমবেত হয় ও কবি প্রবেশ করিলে বিপুল জয়ধ্বনিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। সেই চারি সহস্র কণ্ঠের সঙ্গীতে থিএটর গৃহ মুখরিত হইতে ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের অভ্যর্থনায় খুবই মুগ্ধ হন ও তাহাদিগকে কিছু বলেন।

অপরাহ্ণে Dukeএর বাড়ীতে ইতালীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Rietti তাঁহার একখানি ছবি আঁকেন।

দক্ষিণ আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের যে Influenza হইয়াছিল, তাহার জের শরীর হইতে যায় নাই; শনিবার দিন (২৪এ জানু) হইতে তাঁহার শরীর খারাপ হয়! Turin সহরে তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য বিপুল ব্যবস্থা হইতেছিল, ফর্মিকি তাঁহাদিগকে তার (wire) করিয়া আয়োজন বন্ধ করিতে বলিয়া দেন। ডিউক মিলানো সহরের দুইজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে রবীন্দ্র-নাথের স্বাস্থ্য লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রেরণ করেন।

মিলানোর বক্তৃতার পর ইতালীর প্রত্যেক সহর হইতে টেলিগ্রাম ও পত্র আসিতে লাগিল—সকলেই কবিকে দেখিতে চায়। কিন্তু তখন তিনি প্রায় শয্যাশায়ী; চিকিৎসকেরা কিছুতেই নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। বিছানায় শুইয়া তিনি ইতালীকে উদ্দেশ্য করিয়া এক কবিতা

লেখেন (দ্রঃ পরিশেষ), ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহা পরদিন ইতালীর কাগজে মুদ্রিত হয়।

কয়েকদিন বিশ্রামের পর (২৯এ) রবীন্দ্রনাথ মিলানো ত্যাগ করিয়া Venice যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে শত শত ছাত্র-ছাত্রী Viva la Poeta indiens, Viva Tagore ধ্বনি করিতে থাকে, সে-দৃশ্য না দেখিলে বর্ণনা করা যায় না। Paduaতে একদল ছাত্র গাড়ীতে উঠিয়া autograph লইবার জন্য Venice পর্যন্ত চলিল।

Veniceএ Royal Commissaris (অর্থাৎ Lord Mayorএর ন্যায় ভবে গবর্মেণ্ট হইতে নিযুক্ত লোক) স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়া কবির সম্বর্ধনা করিলেন। মোটর বোটে করিয়া Grand Canal দিয়া তাঁহাকে Grand Hotelএ তোলা হইল। রবীন্দ্রনাথের Veniceএর দৃশ্য খুবই ভালো লাগিল।

পরদিন রবীন্দ্রসম্বর্ধনা কমিটির প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার অধ্যাপক Jona আসিয়া কবির শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে বিশ্রাম করা তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন। Venice দেখিবার বিশেষ ব্যবস্থা সভা করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহারা আর্মেনিয়ান ভ্রাতৃসঙ্ঘের (Armenian Friar) একটি দ্বীপে লইয়া যান; সেখানকার পাদরীরা তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। Veniceএর বিখ্যাত কাঁচের কারখানা ও লেস তৈয়ারীর স্থান তাঁহাকে দেখানো হয়। তিনি যে কেবল প্রাকৃতিক শোভা দেখেন তাহা নহে, মানুষ যেখানে কর্মী, স্রষ্টা, সেখানে তাঁহার interest প্রবল।

২০এ ফেব্রুয়ারী তাঁহারা জাহাজে করিয়া ভেনিস ত্যাগ করেন। ৮টা জাহাজ ব্রিণ্ডিসি পৌঁছায়। জেঠিতে বেশ ভিড়। একটি মেয়ে একরাশ ফুল ও আঙ্গুর আনিয়া কবিকে দিয়া বলিল যে এগুলি সেই বাগানের যেখানে তিনি সতের বৎসর বয়সে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মিলানোর বক্তৃতা কিভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল বুঝা গেল।

নৌবিভাগের লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে মোটর করিয়া সহর দেখাইবার অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি officialদের হাতে পড়িতে চান না বলিয়া ধন্যবাদ দিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। রথীন্দ্রনাথ পিতাকে লইয়া একখানা

ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সহর ও গ্রামের দিকে ঘুরিয়া আসেন। Museum এর কাছে গাড়ী দাঁড় করিবামাত্র রটিয়া গেল রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন; স্থানীয় পাদরী আসিয়া উপস্থিত, দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল। পাদরী ইংরেজি না জানিয়া হাত মুখ নাড়িয়া কথা চালাইল। এইভাবে ব্রিণ্ডিসির পালা শেষ হইল।

পোর্ট সৈয়দে প্রবাসী ইতালীয়রা আসিয়া কবিকে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া শুনাইল ও পুষ্পমাল্য উপহার দিয়া গেল। *

রবীন্দ্রনাথকে ইতালীতে লোকে খুবই আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল; কিন্তু সরকারী মহলে সেবার তাঁহার সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন ছিলেন; কবির 'শান্তিবাদ', তাঁহার অন্তর্জাতিকতা য়ুরোপের গুণ্ডামির নিন্দা প্রভৃতি বিষয় ইতালীয় সরকারের জবরদস্তি-কানুনের বিরোধী। সুতরাং লোকে যতটা উৎসাহন্বিত ছিল সরকার ততটাই সেবার নীরব ছিবেন। ডাঃ সুধীন্দ্র বসু একখানি পত্রে লিখেন (জুন ১৭ই ১৯২৫) বর্তমান ফাসিষ্ট গবর্মেণ্ট which is operating without the check of an intelligent Italian public opinion, international altruism as preached by Tagore cannot live (Forward 22. 7. 25). একথা যে কত সত্য তাহা কবি পরে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। তখন তিনি সাধারণের উৎসাহে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। Nation পত্রিকায় একজন ইতালীদেশীয় সংবাদদাতা ইঙ্গিত করিয়া বলেন যে রবীন্দ্রনাথের তাড়াতাড়ি ইতালী ত্যাগের অন্যতম কারণ ফ্যাসিষ্ট গবমেণ্ট তাঁহার মত পছন্দ করে নাই। (Nation N. Y. 15 Ap 1925)। বঙ্গীয় কোঅপারেটিভ বিভাগের শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী তখন ইতালিতে; তিনি কবির যে সম্বর্ধনা দেখিয়াছিলেন তাহা তিনি সাময়িক কাগজে প্রকাশিত করেন (Forward 25 July 1925, Modern Rev. Aug. 1925 p 251)।

২৬। রাজনীতি ও স্বরাজ সাধন

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ (৫ই ফাল্গুন ১৩৩১) রবীন্দ্রনাথ সদলে দেশে ফিরিলেন। এবার দেশের বাহিরে পাঁচ মাস মাত্র ছিলেন। এই পাঁচ মাসের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ১৯২৪ সালের ২৪এ অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিনান্স পাশ হয়, বাঙলায় ইহার প্রতিবাদ সভা হয় ৩০এ। ইহারই কয়েকদিনের পরে গান্ধীজি, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতারা কলিকাতায় আসিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য চিত্তরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। চিত্তরঞ্জন ইতিপূর্বে গান্ধীজির অসহযোগনীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বাঙলায় স্বরাজ্যদল সংগঠন করিয়াছিলেন। গান্ধীজি আসিয়া চরকা ও খদ্দরের উপর বিশেষ জোর দিয়া আন্দোলনটিকে অন্যপথে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিলেন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বেলগাঁও-এর কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন গান্ধীজি। চরকা ও খদ্দরের প্রোগ্রাম তথায় গৃহীত হয় এবং ইহারি প্রচারই কংগ্রেসের প্রধানতম কার্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়। মোটকথা রবীন্দ্রনাথ যখন ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি দেশে ফিরিলেন, তখন দেশময় চরকা ও খদ্দরের চল খুব হইয়াছে; শান্তিনিকেতনে প্রায় নব্বইখানি চরকা ও তক্‌লি চলিতেছিল। বাজারে পথে ঘাটে ছেলে বুড়ার হাতে তক্‌লি। অকস্মাৎ একটা বন্যা আসিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ লইয়া তেমন প্রচারকার্য হয় নাই, লোকে স্বতই ইহা গ্রহণ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল ইহার মধ্য দিয়া স্বরাজলাভের সাধনা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ দেশে আসিয়া এই আন্দোলন সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নাই, তিনি তাঁহার নিরালা আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

দেশে ফিরিবার পনের দিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ আসিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহুকাল রাঁচিতে একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনীপাঠকমাত্রেই জানেন এই দাদার

নিকট তিনি কত বিষয়ে ঋণী ; কিন্তু ইদানীং উভয়ের মধ্যে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইত না ; কবি কখনো রাঁচি যান নাই, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ইদানীং শান্তিনিকেতনে আসেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতের এত দেশ দেখিয়াছেন, অথচ কখনো রাঁচিতে তাঁহাকে দেখিতে যান নাই, এ অভিমান তাঁহার মনে ছিল শুনিয়াছি। যাই হৌক কবির মনে এসব দাগ বড় করিয়া পড়ে না, তাহা আমরা বহুবার দেখিয়াছি। তিনি বসন্তোৎসবের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, সেই উদ্যোগ চলিতে লাগিল ; ২৬এ ফাল্গুন বসন্তোৎসব (সুন্দর) হইল।

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন, নিজ রচনার অনুবাদ, গান রচনা প্রভৃতি কাজ চলিতেছে। এমন সময় সংবাদ পাইলেন আমেরিকায় এল্‌ম্‌হার্ষ্টের সহিত শ্রীমতী হুইটলি ষ্ট্রেটের বিবাহ হইয়াছে (৪ঠা এপ্রিল ১৯২৫)। এই মিসেস্ ষ্ট্রেটের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় আমেরিকায় ১৯২১ সালে। এল্‌ম্‌হার্ষ্ট যখন আমেরিকায়, তখন ইঁহার সহিত বন্ধুত্ব হয় ; এবং সেই বন্ধুত্বের খাতিরেই তিনি বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে ১৯২২ সাল হইতে প্রায় বার্ষিক ৪০।৫০ হাজার টাকা করিয়া দান করিয়া আসিতেছেন। এই মহিলার স্বামী ছিলেন ক্রোড়পতি, জে. পি. মরগ্যানের অংশীদার। ইঁহার পিতা বিলিয়াম হুইটলিও ক্রোড়পতি ছিলেন ; তাঁহার সম্পত্তিও ইনি পান। এই বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণীকে এলম্‌হার্ষ্ট বিবাহ করিলেন।

এল্‌ম্‌হার্ষ্ট পরিবার ইংলণ্ডের প্রাচীন পরিবার। কেম্‌ব্রিজে ইতিহাসে এম, এ পাশ করিয়া এল্‌ম্‌হার্ষ্ট আমেরিকায় যান ও সেখানে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞানে বি, এসসি উপাধি লন। যুদ্ধের সময় Y. M. C. A. কার্য লইয়া তিনি মেসোপটেমিয়া চলিয়া যান ; পরে যুদ্ধে যোগদানও করেন ; এমন সময়ে যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও কবির আদর্শর সঙ্গে তাঁহার আদর্শ মেলায় তিনি তাঁহার সহিত কাজ করিতে আসেন। ১৯২২এর ৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনিকেতনের কার্য আরম্ভ হয়। ১৯২৪ সালে কবির সহিত তিনি চীন যাত্রা করেন কিন্তু তাঁহার সঙ্গে ফেরেন না, তিনি আমেরিকায় চলিয়া যান। ১৯২৪ অক্টোবর মাসে তিনি কবির সেক্রেটারী হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় যান ও কবি য়ুরেপে ফিরিয়া আসিলে তিনি দেশে চলিয়া যান, ইতালীতে তাঁহার সঙ্গে আর থাকেন নাই।

এল্‌ম্‌হার্ষ্ট এই বিপুল ধনের ব্যবস্থাপক হইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছেন; বিশ্বভারতীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিবিড়তর হইয়াছে ও ইংলণ্ডে Dartington Hall নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কবি সেখানে পরে গিয়াছেন। ইংলণ্ডে এখন যেসব নূতন আদর্শের বিদ্যালয় খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে এল্‌ম্‌হার্ষ্টের Dartington Hall শ্রেষ্ঠ বলিয়া শিক্ষাভিজ্ঞদের মত।

এইবার ২৫এ বৈশাখ (১৩৩২) কবির ৬৫তম জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে বেশ ঘটা করিয়া হইল; উত্তরায়ণের উত্তরে 'পঞ্চবট' রোপিত হয়, কবি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'মেরু বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে' এই গানটি রচনা করেন। কলিকাতা হইতে কবির বহুগুণগ্রাহী ও বিশ্বভারতীর সদস্য এই উৎসবে যোগদান করেন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য রাত্রে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকাটি অভিনীত হয়।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ; রবীন্দ্রনাথ কোথায়ও যান নাই। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩২) মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতনে আসিলেন—এবার তিনি বাঙলা শফরে বাহির হইয়াছেন; চরকা ও খদ্দর প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য। শান্তিনিকেতনে আসিয়া এইসব বিষয় লইয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বরাবরই মহাত্মাজীর ভক্ত; গান্ধীজিও তাঁহাকে 'বড় দাদা' বলিয়া সবিশেষ ভক্তি করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের সহিত মহাত্মাজীর দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা হয়; আলোচনার বিষয় বর্ণাশ্রম ধর্ম ও চরকা। উভয় বিষয়েই উভয়ের মধ্যে মতের কোনো ঐক্য ছিল না; তবুও মহাত্মাজী আশা করিতেছিলেন যে যদি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত গ্রহণ করেন! দুই দিন তাঁহাদের আলোচনা হয়, কিন্তু কেহ কাহাকে নিজের মত হইতে টলাইতে পারেন নাই। একদিন মহাত্মাজী শ্রীনিকেতনের গ্রামের কাজ দেখিয়া আসেন। এই সময়ে মার্কিন দেশের বিখ্যাত পাদরী বিশপ ফিশার মহাত্মা ও রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য আশ্রমে আসেন। মহাত্মা যেকয় দিন ছিলেন, সেকয় দিন বহু শত লোক তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসেন।

মহাত্মাজী রাজনৈতিক শফর হইতে ফিরিবার কয়েকদিন পরেই বাঙলার

রাজনৈতিক গগনের অত্যুজ্জ্বল তারকা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (২রা আষাঢ় ১৩৩২)। শেষ জেল হইতে বাহির হইবার পর হইতে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া যায়। মৃত্যুর এক মাস পূর্বে ফরিদপুরে প্রাদেশিক সভায় তিনি সভাপতি হন। তার পর দার্জিলিঙে যান এবং সেখানেই তাঁহার কাল হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে; তিনি এই সংবাদ পাইয়া চারিটি পংক্তিতে চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন;

এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ;
মরণে তাহাই তুমি
করি গেলে দান।

রবীন্দ্রনাথের সহিত চিত্তরঞ্জনের নানা বিষয়ে মতভেদ ছিল; ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি—সকল বিষয়েই পৃথক মত উভয়ে পোষণ করিতেন। 'নারায়ণ'-পত্রিকা বহুকাল ধরিয়া রামমোহন, মহর্ষি, রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী-মত প্রকাশ ও প্রচারে ব্যাপৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তাহার উত্তর দেন নাই। সেসব কথা সৌভাগ্যক্রমে লোকে প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু পুরাতন পত্রিকার পাতায় এখনো সেসব কাহিনী জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জন শেষ জীবনে চরম ত্যাগের মধ্য দিয়া নিজেকে যে পূতলোকে উঠাইয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার সর্বগ্লানি বিলুপ্ত হইয়া যায়; সেই 'মৃত্যুহীন প্রাণ' আজও বাঙলাকে ত্যাগের মন্ত্র শিখাইতেছে।

কবি এখন দুটি বিষয় লইয়া ব্যস্ত, প্রথমত 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে হইবে—এজন্য নাটকখানিকে একটু কাটিয়া ছাঁটিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া দিতেছেন; দ্বিতীয়ত চরকা সম্বন্ধে তাঁহার মত স্পষ্ট করিয়া সাধারণে ঘোষণার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

এই সময় বাহির হইতে তাঁহার কাছে এক লেখার ফরমাইস আসে। জার্মানির দার্শনিক লেখক কাউণ্ট কাইসারলিঙ কবির বন্ধু; ১৯২১ সালে ডার্মস্টাটে তাঁহার দর্শন বিদ্যালয়ে কবির সম্বর্ধনার কথা পূর্বে বলিয়াছি। অধুনা তিনি পৃথিবীর নানা সভ্যদেশের বিবাহ পদ্ধতির নিগূঢ় অর্থ সম্বন্ধে

জিজ্ঞাসু হইয়া মনীষীদের কাছে পত্র দিয়াছিলেন ; তাঁহার ইচ্ছা এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ। বিভ্রান্ত য়ুরোপের সম্মুখে বিবাহ ও যৌনীতি সম্বন্ধে এমন সব আদর্শ আজ উপস্থিত হইয়াছে যে নানা দেশের মনিষীরা এবিষয়ে কি বিচার করিতেছেন তাহা তাহাদের সম্মুখে দেওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় বিবাহ পদ্ধতির আদর্শ সম্বন্ধে লিখিতে বলেন। (V-B. Q.-II July 1925 ; প্রবাসী ১৩৩২ শ্রাবণ)।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীয় বিবাহের আদর্শ' সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখিয়া পাঠান। উহার জারমেন অনুবাদ কাইসারলিঙের Das ehe buch গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। বইখানির ইংরেজি অনুবাদও বাহির হয় The Book of Marriage.

৩রা শ্রাবণ (১৩৩২) শান্তিনিকেতনে 'বর্ষামঙ্গল' উদ্যাপন করিয়া কবি কলিকাতায় যান। সেখানে ষ্টার থিএটরে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয়। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দৃশ্যপট পরিকল্পনায় সাহায্য করিলেন ; দিনেন্দ্রনাথ গান শিখাইবার ভার লইয়াছিলেন ; এইজন্য কবি নূতন নূতন গান লিখিয়া সুর সংযোগ করিয়া দেন। ৯ই শ্রাবণ যে অভিনয় হয়, তাহাতে কবি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। রসজ্ঞ পাবলিক এই অভিনয় দর্শনে খুবই প্রীত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে 'রাজা ও রাণী' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটক পাবলিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই ; 'চিরকুমার সভা'র নিরবচ্ছিন্ন হাস্যকৌতুক দর্শকদের মনে যে আনন্দ দিয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়।

এই সফলতায় উৎসাহিত হইয়া কবি তাঁহার আরও কতকগুলি পুরাতন নাটককে ওলটপালট করিয়া নূতন করিয়া লিখিতে সুরু করিলেন ; এই বৎসরেই 'গোড়ায় গলদ' ভাঙিয়া 'শেষবোধ' ও 'মাসি' গল্পটিকে ভাঙিয়া 'শেষের রাত্রি' রচনা করেন।

ইতিমধ্যে 'চরকা' সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মত ব্যক্ত করিবার একটি কারণ জুটিল। মহাত্মাজীর এই আন্দোলনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আপ্রাণ যোগদান করিয়াছিলেন। কোনো বক্তৃতাকালে মহাত্মাজীর সহিত একমত না হইতে পারার জন্য তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথকে একটু মৃদু আক্রমণ করেন।

এতদিন রবীন্দ্রনাথ চরকার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই উক্তির জবাবে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন কেন তিনি চরকার বিরোধী। তিনি বলিলেন, 'সকল মানুষ মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ-বিধাতারা কখনো কখনো সেই রকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না।" (সবুজপত্র ১৩৩২ ভাদ্র, পৃঃ ১১)।

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ ব'লেই * * * বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবী থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি, তাহলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্মকর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নাই। এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম ক'রে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি, আর মনে মনে বল্‌ছি স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চল্‌ছে।" * * "কিন্তু মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সুতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে ; কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষ্যের বাইরে পড়ে থাকবে।" পৃঃ ২১-২২)।

চরকাকে কখনো স্বরাজপ্রাপ্তির প্রোগ্রাম হিসাবে গ্রাহ্য নয় একথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন 'স্বরাজ সাধন' প্রবন্ধে (স-প ১৩৩২ আশ্বিন পৃঃ ১১৬)। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন, "চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত ক'রে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্চে।"

"বহুল পরিমাণ সুতো ও খদ্দরের ছবি দেশের কল্যাণের বড় ছবি নয়। এ হ'ল হিসাবী লোকের ছবি, এ'তে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবী শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না, যা' বৃহতের উপলব্ধিজনিত আনন্দে কেবল যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।" (পৃঃ ১৪৫)।

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর সমক্ষে দেশের মঙ্গল ও দেশের প্রতি তাহাদের

কর্তব্যের সমগ্র দাবীকে সুচিন্তিতভাবে দিবার জন্য বলিলেন। দেশের কল্যাণকে "অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোট ক'রে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবী কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণ সাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট ক'রে তোলবার উপায়। দেশের লোকের শক্তির বিচিত্রধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে সেই রূপটিকে যদি ছোট করি, আমাদের সাধনাকেও ছোট করা হবে। পৃথিবীতে যারা দেশের জন্য মানুষের জন্য দুঃসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাটরূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই, তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার।"

বলা বাহুল্য, চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতকে অনেকেই গ্রহণ করেন নাই; এবং সেজন্য ছোট বড় অনেকেই তাঁহাকে তিরস্কারও করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, সেকথা এখন দেশের লোক দেখিতেছেন বটে তবে তাহা স্বীকার করিবার বিনয় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে আশা করা যায় না।

'স্বরাজ সাধন' নামক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ শুধু চরকা ও খদ্দর নহে—সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা ও মনোভাবের বিস্তৃত সমালোচনা করেন। কিছুকাল পূর্ব হইতে হিন্দুমুসলমান সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুরা এক সময়ে যোগদান করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই; বরং মিলনের যে সাময়িক আভাস দেখা গিয়াছিল, তাহাও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল, নানা বিভীষিকাময় কাণ্ড গুলবার্গা (হায়দ্রাবাদ), কোহাট প্রভৃতি স্থানে সংঘটিত হইল। রবীন্দ্রনাথ এইসব সমস্যা আলোচনা করিয়া লিখিলেন, "খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময় যেই আমাদের কানে পৌঁছিল যে, স্বরাজ পাওয়া খুব সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয়, তখন এসম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি রহিল না। তামার

পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর ক'রে দিতে পারে, এ কথায় যারা মেতে ওঠে, তারা বুদ্ধি নেই ব'লেই যে মাতে তা নয়, লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না ব'লেই তাদের এত উত্তেজনা।" (পৃঃ ১৩৭)

দুই বৎসরের অন্দোলনের ফলে দেখা গেল যে স্বরাজ লাভ নির্দিষ্ট সময়ে হইল না ; কারণ হিন্দুমুসলমানে খিলাফৎ লইয়া এককালে সদ্ভাব দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা টিঁকিল না। এই সমস্যার কথা তুলিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, "যখন কোনো একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয়, তখন মানুষের মনকে কি করে এক পথ থেকে আর এক পথে চালানো যায়, সেই শক্ত কথাটা ভাবতে হয় ; কোনো একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাৎলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয়, তা বিশ্বাস করিনে,—মানুষের মনের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করাই হ'ল গোড়ার কাজ। 'হিন্দুমুসলমানের মিলন হোক,' বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। * * কিন্তু হিন্দুমুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যা সেইখানেই ঠেকেচে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজ প্রাপ্তির লোভেও একথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। * * ধর্মনিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত, সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দুমুসলমান বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে. খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।

"আমাদের দেশের এই সকল সমস্যা আন্তরিক বলেই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে ; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

চরকা সেইরূপ একটা বাহ্যিক ক্রিয়া। চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে—এই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের মত (পৃঃ ১৪৪)।

এই প্রবন্ধ কার্তিকের (১৩৩২) গোড়ায় ছাপা হইয়া বাহির হয় ; তারপর অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি সময়ে Modern Review (1925. Dec.)এ ইহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

রাজনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মত এবং কিছুদিন আগে লেখা 'চরকা' (সবুজপত্র ১৩৩২ ভাদ্র) সম্বন্ধে প্রবন্ধ লইয়া দেশময় বেশ একটু আলোচনা আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ চরকা ও খিলাফৎ আন্দোলনে বিশ্বাস করেন না, স্বরাজ স্বল্পকালে পাওয়া যায় না,—রবীন্দ্রনাথের এই মত সম্বন্ধে লোকের ধারণা আর অস্পষ্ট থাকিল না। লোকে কবিকে নিতান্তই কৃপার চোখে দেখিতে লাগিল, কারণ এতবড় জিনিষটা তিনি দেখিতে পারিতেছিলেন না।

এই সময়ে আশ্বিন মাসে Romain Rollandর ষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি সম্বর্ধনা লিপি ইংরেজিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন (প্রবাসী ১৩৩২ কার্তিক, পৃঃ ১১৫)। আলোচিত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া অনুবাদটির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"আমেরিকায় অবস্থান-কালে, যন্ত্রসংঘসমূহ (Organisations) ব্যক্তিগত (Personal) মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে (Mechanical) প্রকাণ্ড পদ্ধতি-পিণ্ডের মধ্যে সংহত করিয়া, প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল এবং সে-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা আমি কয়েকবার বলিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রাণ ও অনুভূতির অভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মানুষ ধীরে ধীরে এই যন্ত্রেরই অংশমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজন সে অনুভব করে না। প্রাণশক্তিকে পরিহার করাতে এই যন্ত্রবদ্ধ জড়শক্তির দোহাই দিয়া আজিকার দিনে ভয়াবহ অত্যাচার ও অবিচার করা সহজসাধ্য হইয়াছে,—কারণ জড়শক্তি, অন্য সকল বিচার বিবেচনাকে পদদলিত করিয়া আপন উদ্দেশ্য-সাধনে দ্বিধাহীন নির্মম-গতিতে অগ্রসর হয়। যে-ধর্ম প্রেম ও করুণায় কমনীয় সেই ধর্মের নামে কী কদর্য রক্ত-লোলুপ ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠে তাহা আমরা দেখিয়াছি ; দেখিয়াছি ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া কী বিরাট প্রবঞ্চনা চলিতেছে ! অথচ এইসকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ ! নিরীহ প্রজাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রাজতন্ত্রের নামে কী বীভৎস মিথ্যাবাদ প্রচারিত হইতেছে দেখিতেছি, অথচ যাহারা এই রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার-আচরণ ও বংশগরিমায়

ভদ্র! ইহার কারণ এই যে, মানুষ যখন এইসকল বিপুল যন্ত্রসংঘকে নির্বিচারে মানিতে স্বরু করে, তখন তাহারা এই যন্ত্রকেই দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়া অশেষ গৌরব অনুভব করে এবং অন্ধ ভক্তের মতো এই যন্ত্রের নামে ভয়াবহ অবিচার সাধনেও কুণ্ঠিত হয় না। এই আধুনিক জড়-পৌত্তিলকতার (Fetish worship) প্রভাবে অন্যসব মানবীয় ধর্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে, মানুষ ও মনুষ্যত্ব বলির অসংখ্য উপায় এই পৌত্তলিকতাই দিনদিন জোগাইয়া দিতেছে।"

এই লিপিতে তিনি Foreign Affairs এর সম্পাদক, কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বন্ধু, উৎপীড়িতদের সহায়, মহাপ্রাণ E. D. Morelএর কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন ও বলেন রঁমা রলাঁর জীবন ও সাধনা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বহির্জগতের সহিত বিশ্বভারতীর যোগস্থাপন উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে বিদেশে গিয়াছেন। নানা দেশ দর্শন, নানা ভাবুক ও মনীষীর সহিত চিন্তার বিনিময়, বিচিত্র সমস্যাকে বিবিধ দিক হইতে দেখার জন্য তাঁহার চলিষ্ণু মন সর্বদাই ব্যস্ত। এই উদ্দেশে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য প্রথমবার ১৯২১-২২ সালে ফরাশীদেশের পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন; ১৯২২-২৩ সালে Visiting Professor রূপে আসেন চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগের জার্মান-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক বিন্‌টারনিটস ও তাঁহার সঙ্গে আসেন চেক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেস্‌নি। ১৯২৪-২৫ সালে আসেন নরওয়ে দেশের পণ্ডিতপ্রবর স্টেন কোনো। কোনো চলিয়া যান ১৯২৫ সালের গোড়ায়। তারপর ইতালি ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকিকে বিশ্বভারতীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন; ইনি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধরচিত' ইতালীয় ভাষার অনুবাদক। পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার নাম না থাকিলেও ডিপ্লোমাট্ হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব। ফর্মিকি আসিলেন ২১এ নভেম্বর ১৯২৫ (৫ই ফাল্গুন ১৩৩২)। বিশ্বভারতী তাঁহার বেতন দিত। কয়েকমাস পরেই ইতালীয় গবর্মেণ্ট অধ্যাপক তুচি (Tucci)কে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকরূপে পাঠাইয়া দেন; ইঁহার মতন পণ্ডিত অধ্যাপক বিদেশ হইতে কেহই আসেন নাই।

ফর্মিকি শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া ইতালির সর্বময় কর্তা মুসোলিনী ভারতের প্রতি ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার সদ্ভাব জ্ঞাপন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তিনি অধ্যাপক তুচির সমস্ত খরচ ইতালীয় সরকার হইতে দিলেন ও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের জন্য ইতালীয় ভাষার এক বৃহৎ লাইব্রেরী উপঢৌকন পাঠাইলেন।

ফর্মিকি যখন ইতালির মন্ত্রীর উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে; তাঁহার সম্বর্ধনা সভায় তিনি উপস্থিত হইয়া মুসোলিনীর বন্ধুত্বের জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া টেলিগ্রাম করা হয়।

মুসোলিনি ফর্মিকিকে যে পত্র দেন তাহার ইংরেজি অনুবাদ—

Rome 21 Oct. 1925

Illustrious Professor,

While I express my lively satisfaction to you on account of the invitation you have received from the Visva-Bharati University, an institution which honours in Italian savant the Italian science and the University of Rome, I am glad to entrust you with the charge of bringing in my name as a gift to that Institution which is the greatest centre of Indian culture, the books (of which I enclose a list) with the wish that this offering may always render more and more intense the cultural relations between Italy and the classic land of India, the cradle of the civilization of the world.

রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনিকে ধন্যবাদ দিয়ে যে টেলিগ্রাম করেন তাহা এই :—

Allow me to convey to you our gratitude in the name of the Visva-Bharati for sending us, through Prof. Formichi, your cordial appreciation of Indian civilization, and deputing Prof. Tucci of the University of Rome for acquainting our

Mod. Rev. 1925, Dec. p 729 (with a facsimile of the original letter)

students with Italian history and culture and working with us in various departments of oriental studies, and also for the generous gift of books in your name, showing a spirit of magnanimity worthy of the tradition of our great country."

ফর্মিকি আসিবার কয়েকদিন পরেই বাঙলার গভর্ণর লর্ড লীটন আশ্রম দেখিতে আসেন ২৪ নভেম্বর, ১৯২৫। রবীন্দ্রনাথ যথারীতি তাঁহার অতিথি সংকার করেন; আশ্রমে লাটসাহেবের আগমন এই নূতন নহে, কারমাইকেল, রোনাল্ড্‌শে পূর্বে আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান দেখা লাট সাহেবরা তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। লাট আগমন ও তাঁহার অভ্যর্থনা লইয়া বাংলার কাগজে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা হয়, কারণ দেশের এই রাজনৈতিক অবস্থায় কোনো রাজ-অতিথিকে সম্বর্ধনা করা অন্যায় এই তাঁহাদের মত। যাহা হউক লর্ড লীটন Private visitএ আসিয়াছিলেন; সিউরীতে আসিয়াছিলেন, সেখান হইতে শান্তিনিকেতনে আসেন কবির আশ্রম দেখিতে। রবীন্দ্রনাথের সহিত লীটনের পূর্বে পরিচয় ছিল, বিলাতে তিনি তাঁহার বাড়ীতেও যান, এবং তাঁহার পিতামহ ঔপন্যাসিক লীটনের একখানি আদি গ্রন্থ তিনি কবিকে উপহার দেন।

এমন সময়ে একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বের জন্য কবির আহ্বান আসিল। এবার কলিকাতায় প্রথম Philosophical Congress; রবীন্দ্রনাথকে উদ্যোক্তারা ইহার সভাপতি মনোনীত করেন। সেই কংগ্রেস উপলক্ষে তিনি পৌষের গোড়ায় কলিকাতায় যান ও ১৯এ ডিসেম্বর সভার কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল কবি নহেন, তিনি যে মনীষী তাহা এই পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সভাপতি পদে বরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণে তিনি ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে যে গূঢ় আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহার কথা বহু গান ও কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখান। সাধারণ লোকের ধর্মের মধ্যে মুক্তির জন্য যে আকুতি আছে, তাহাই সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রে কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন ও ভারতীয় মুক্তির সহিত, পাশ্চাত্য খৃষ্টান মুক্তির পার্থক্য কোথায় তাহাও দেখান। তিনি প্রবন্ধের গোড়ায় বলেন পাশ্চাত্য জগতে কবিতা ও দর্শন

পৃথক বস্তু; সেইজন্য প্লাতুন (Plato) তাঁহার আকাশকুসুম রিপাবলিকে কবিদের নির্বাসন দিয়াছেন। কিন্তু ভারতে কাব্য ও দর্শন মিলিয়া আছে; শঙ্করাচার্যর নামে অনেক কবিতা আরোপিত হয়। মধ্যযুগে কবীর প্রভৃতি সাধকদের মধ্যে দার্শনিকতত্ত্ব কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; বাঙলায় বাউল ও ঐ শ্রেণীর নানা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি দেখান গভীর দার্শনিক তত্ত্বকথা তাঁহারা কত সহজ সরল কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন; সেই সব জটিল তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে লোকে রাতকে ভোর করে। ভারতের এই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি কবি তাঁহার শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

দর্শন-কংগ্রেসের কাজ শেষ করিয়াই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন পৌষ উৎসবের জন্য। পৌষ উৎসবের পর কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। এই সময়ে F. S. Marvin আশ্রমে আসেন (জানুয়ারী ১২, ১৯২৬); মার্ভিন একজন নামকরা লেখক; তাঁহার Living Past, The Century of Hope প্রভৃতি গ্রন্থ অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। তিনি ভারতে আসেন League of Nations এর প্রতিনিধিরূপে। শান্তিনিকেতনে লীগের জয়গান করেন; কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা আদৌ মনোজ্ঞ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বলেন—তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের জন্য লীগ্ অব্ নেশনের দূতস্বরূপ আসিয়াছিলেন; সেই কথা উঠিলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পূর্বদেশে প্রেরিত হন না; যেসব ইংরেজ এদেশে আসেন তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক বা artistic type এর লোক কম। ইংরেজ ব্যবসা লইয়া সুরু করে ও শাসনে তাহার সমাপ্তি হয়; সেদিক হইতে উপযুক্ত লোক আসে। কিন্তু শাসনকার্যই য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত অঙ্গ নয়; সেই দিকটা এদেশে অজ্ঞাত থাকে; সেইটি হইলে পশ্চিমের সঙ্গে যথার্থ ও সম্যক যোগ হইতে পারে।

দেশে ফিরিয়া গিয়া Marvin একটা কথা লিখিয়াছিলেন, যাহা সকলের ভাবা উচিত। 'He (Tagore) is the attraction and the stimulus, and one can see but a doubtful prospect for the settlement if these were withdrawn.' (The Manchester Guardian, 23 June 1926).

২৭। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ

লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন; বক্তৃতার জন্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আসিয়াছে; জানুয়ারীর মাঝামাঝি কবি সেখানে যান। তিনি যখন লক্ষ্ণৌএ—সেই সময়ে আশ্রমে ৪ঠা মাঘ, ১৩৩২ (১৮ জানুয়ারী ১৯২৬) তাঁহার সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (বড় দাদা) দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৮৯এর কাছাকাছি।

মহর্ষিদেবের মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ১৯০৫ সাল হইতে বরাবর বাস করিয়া আসিতেছিলেন; কচিৎ কলিকাতায় যাইতেন, একবার খুব অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য যান, আর একবার যান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির কাজ করিবার জন্য। আশ্রমের 'নীচু বাংলা'য় এই তাপস আপনার দর্শনশাস্ত্র, ক্যাণ্ট, বেদান্ত, Boxometry, শালিখপাখী, কাঠবিড়ালী লইয়া দিন অতিবাহিত করিতেন। আশ্রমের অধ্যাপকগণ তাঁহার কাছে যাইতেন জ্ঞানের জন্য। এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সনকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌএর কাজকর্ম সারিয়া আশ্রমে ফিরিলেন ও যথোচিতভাবে জ্যেষ্ঠের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিলেন (১৫ই মাঘ)।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গের ভ্রমণের আয়োজন চলিতেছিল; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক ফর্মিকি ও অধ্যাপক তুচির কয়েকটি বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ আসে। ঢাকায় এই যাইবার সুযোগ হওয়াও তিনি পূর্ববঙ্গে বিশ্বভারতীর কথা প্রচার করিয়া আসিবেন স্থির করিলেন। সেই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা যাত্রা করেন। সঙ্গে চলিলেন রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, কালীমোহন ঘোষ, মরীচি (Morris), এছাড়া অধ্যাপক ফর্মিকি ও তুচি। নেপালবাবু পূর্বেই গিয়াছিলেন, ব্যবস্থা করিবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে ঢাকা গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জগৎব্যাপী খ্যাতি

হয় নাই; খ্যাতিলাভের পর এই তাঁহার ঢাকায় প্রথম আগমন; পূর্ববঙ্গ-বাসীরা তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ (২৪ মাঘ) ঢাকা পৌঁছাইলেন।

সমসায়িক সংবাদপত্র হইতে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জানিতে পারে কি সম্বর্ধনা কবি পূর্ববঙ্গে পাইয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছিবার বহুপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য ঘাটে জেটিতে রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল; ষ্টীমার ঘাট হইতে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ মোটরযোগে ঢাকায় লইয়া যান। ঢাকা সহরের পূর্বসীমান্তে একদল স্কাউট, বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও সহরের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে রাজসম্মানে সহরবাসীরা অগ্রসর হইলেন। বুড়ীগঙ্গার উপর নবাব বাহাদুরের গৃহনৌকা 'তুরাগে' রবীন্দ্রনাথের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নদী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় বলিয়া এই আয়োজন করা হয়।

সেইদিন অপরাহ্নে নর্থব্রুক হলে সভা হয়; এইখানে ম্যুন্সিপালটির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। অতঃপর 'জনসাধারণের সভা'র (People's Association) সভ্যেরা অভিনন্দন প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ উভয় অভিনন্দনের একটি উত্তর দান করিলেন। তাঁহার মোট বক্তব্য ছিল এই যে ভিক্ষার দ্বারা দেশকে পাওয়া যায় না; দেশকে পাওয়া মানে হৃদয় দ্বারা, মনের দ্বারা, দেহের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে তাহার সেবা করা। তিনি বলিলেন, "অন্তরের মাঝে যে তপোবন, সেখানে যজ্ঞশালা স্থাপন করে বল্‌তে হবে—আমরা একদিন তোমাদের দিয়েছি—এখনও দিতে পারি, দিব। ভারতবর্ষ চিরদিন সকলকে আহ্বান করেছে; ভারতের বাণী শান্তির বাণী। শান্তির মন্ত্র ভারতবর্ষ চিরদিন দেশ বিদেশে প্রচার করেছে, করবে।" বিশ্বভারতী ভারতের সেই যজ্ঞশালা, সেখানে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে অতিথি আসিয়াছে; সেই অতিথিশালার ভার সর্বসাধারণকে নিতে হবে।

বক্তৃতার পর করোনেশন পার্কে সাধারণের অভিনন্দন গৃহীত হয়; সেখানে সর্বপ্রথম জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পঠিত হয়; পরে রেট্‌ পেয়ার্স এসোসিয়েশন ও হিন্দুমুসলমান সেবকসমিতি পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করা

হয়। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া জানান যে তিনি বঙ্গদেশের এই প্রাচীন নগরীকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন।

পরদিন সন্ধ্যায় (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬) দীপালিসঙ্ঘের আয়োজনে ঢাকায় মহিলাদের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হয়। সভার প্রায় দেড় হাজার মহিলা উপস্থিত ছিলেন; কবি প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন ও তিনি বলেন, "এত মহিলা এমন শান্তভাবে আমাকে কোথায়ও অভ্যর্থনা করে নাই।" *

৯ই প্রাতঃকাল হইতে অতিথি অভ্যাগত আসিতে থাকেন; এই দিন বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট এক কলেজে বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিলেন আমাদের দেশের সভ্যতা আত্মীয়মূলক সভ্যতা, এদেশের সভ্যতা ব্যাপক কোথাও পুঞ্জীভূত হয়ে সংহত হয়ে নেই—দেশময় ছড়িয়ে আছে। হিন্দু মুসলমান সমস্যার কথা তুলিয়া বলিলেন, গ্রামের মধ্যে দারিদ্র্য, প্রাণের অভাব বিরোধের অন্যতম কারণ; যেদিন প্রাচুর্য হবে, সেদিন বিরোধ ঘুচে যাবে। মিলন কৌশলে হবে না, ফাঁকি দিয়ে হবে না, চাকুরী কিংবা বিষয় দিয়ে হবে না। এ রকম মিলন হয় দেশে দেশে—Political alliance; এক দেশের ভাইএ ভাইএ এ রকম মিলন হয় না। ঘুষ দিয়ে আত্মীয়তা হয় পুলিশের সঙ্গে, দস্যুর সঙ্গে। তাই বঙ্গ-বিচ্ছেদের সময় মিল হল না। এই সমস্যার সমাধান হবে গ্রামে, যেখানে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি আছে—সেইখানে সেবার কাজের দ্বারা। ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও আত্মশক্তি যদি সত্য হয়, তাতেই ভারতের সেবা হবে। পল্লীর প্রাণ সজীব শুধু অন্নবস্ত্র দ্বারা হবে না—শিক্ষার আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীনিকেতনের চারিদিকে গ্রামে ব্রতীবালকরা যে অনুষ্ঠানদ্বারা পল্লীগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহার কথা বলিলেন। পূর্বে বহুবার যে কথা বলিয়াছেন সেদিনও ঢাকায় সেই কথা বলিলেন, আত্মীয়তার জন্য আত্মীয়তা কর, কোনো রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নহে। †

* দীপালি সংঘ, সবুজপত্র ১৩৩২, চৈত্র পৃঃ ৫৭২।

† আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা ফাল্গুন ১৩৩২, 15th Feb. 1926.

পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথকে বিচিত্র কর্মসূচীর জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছে। সকালবেলায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা প্রদান, দ্বিপ্রহরে কলেজিয়েট্ স্কুল পরিদর্শন; অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্টস্ য়ুনিয়নের অভিনন্দনপত্র গ্রহণ; অপরাহ্নকালে মোস্লেম হলের ছাত্রগণ কর্তৃক সম্বর্ধনা; সন্ধ্যাবেলা কর্জন হলে (Curzon Hall) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা। শেষোক্ত বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আর্টের অর্থ (The Philosophy of Art)। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চানসেলার মিঃ লাংলে সভাপতি হন।

কবি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, মানব তাহার প্রাচুর্যের প্রভাবেই আপনাকে অভিব্যক্ত করে, যেটুকু নিজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সেটুকুতেই মানবের আত্মা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম সৃষ্টির ভিতরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন; অথচ সে-সৃষ্টির আবশ্যকতা তাঁহার পক্ষে কিছুই নাই। * * * মানব পূর্ণস্বরূপে আপনাকে মিলিত করিতে চায়, সেই মিলনে যে অপূর্ব স্বাধীনতার আনন্দ আছে, সে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছে; আর্ট মানবের জীবনের সম্পদকেই অভিব্যক্ত করে। আর্টের এই যে সাধনা, সেই সাধনা নিজেই ফলরূপা, এই সাধনার ভিতরেই সিদ্ধির আনন্দ রহিয়াছে।

আনন্দই সৃষ্টির মূলে—এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন; ইহার পর আর্ট ও বিজ্ঞানের প্রভেদ কি তাহাও সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলেন; বিজ্ঞান যাহা আছে তাহাকে অপরিসীম আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে, বাছাই করে না; শিল্পী কিন্তু বাছাই-ই বেশী করিয়া বুঝে; এই বাছাইয়ের খেলা তাহার অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় পাওয়া যায়।

সঙ্গীতও আর্ট; অভিব্যক্তির যেটুকু খাঁটি সার, তাহাই সঙ্গীত। বিজ্ঞানে গণিতের যে স্থান, আর্টে সঙ্গীতেরও সেই স্থান, ইহা সম্পূর্ণ বস্তু-নিরপেক্ষ। সঙ্গীতের যে ঝঙ্কার তাহা মুক্ত, অবাধ; বস্তু-বিচারের বাঁধন, চিন্তার বাঁধন সঙ্গীতকে বাঁধিতে পারে না। সঙ্গীত যেন আমাদিগকে সকল জিনিষের আত্মার ভিতর লইয়া যায়। ইহার পর তিনি সংক্ষেপে ভারতের আর্টের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথের শরীর খারাপ হওয়ায় ১১ই ও ১২ই তারিখে তিনি কোনো সাধারণ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই।

শেষ দিনে ঢাকা সাহিত্যপরিষদ্‌ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হল, জগন্নাথ হলের ছাত্রগণের অভিনন্দন দিবার কথা ছিল।

১৩ই ফেব্রুয়ারী বৈকালে Vice-Chancellor-এর পার্টি রবীন্দ্রনাথের উপলক্ষে হয়। সেই সন্ধ্যায় কর্জন হলে তিনি The Rule of the Giant নামে এক বক্তৃতা করেন। বর্তমান যুগে মানবের এমন ঐশ্বর্যের মধ্যেও যে শান্তি নাই, সুখ নাই, ইহারই বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে করিলেন। মানুষ যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া এখন যন্ত্রদৈত্যের দাস হইয়াছে, যন্ত্রকে সে আর নিয়ন্ত্রিত করিতেছে না। যন্ত্রই তাহাকে চালাইতেছে। মহত্বের বেদীতে স্থূলত্বের পূজা হইতেছে (The idolatory of bigness has occupied the alter of greatness)। জীবন্ত প্রাণের সহিত হৃদয়হীন যন্ত্রের সংগ্রাম হইতেছে বর্তমান যুগের ধর্ম; রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্রিয়াপন্থী নহেন। তিনি ব্যবস্থা, বিজ্ঞান—সমস্তেরই পক্ষপাতী; কিন্তু সেই ব্যবস্থা ও বিজ্ঞান মানুষের মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিতেছে; তিনি সেই কলীয়তার বিরোধী। 'মুক্তধারা'য় তিনি এই কথাটি বলেন, পরে 'রক্তকরবী'তে তাহাই বলিবেন।

অধ্যাপক ফর্মিকি ও তুচি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করিয়া বক্তৃতা এই সময়ে করেন। তাঁহাদের তিনটি বক্তৃতা একত্র করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় আরও দুই একটি সামাজিক অনুষ্ঠান করিয়া রাত্রে তিনি মৈমনসিংহ রওয়ানা হইলেন। মৈমনসিংহে রেল ষ্টেশনে মহারাজা বাহাদুর এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যায় মিউনিসিপালিটির টাউন হলে কবির সম্বর্ধনা হয় ও তিনি সংক্ষেপে একটি উত্তর প্রদান করেন ও বলেন এই দ্রুত যানবাহনের যুগে মানুষে মানুষে প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে; কারণ এই তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়িতে ভালবাসা বলিয়া যে জিনিষ, তাহা এখন সঙ্কুচিত হইতেছে।

"এই পূর্ববঙ্গের শ্যামলক্ষেত্রের মধ্যে বঙ্গমাতার একটি পীঠস্থান আছে, কিন্তু দেবীকে সহজে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তাঁর দরিদ্রবেশ—অপূর্ণতা সর্বদাই আমাদের চোখে পড়ে। দেশমাতার পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায় না। * * দেশমাতার পূজাবেদীর সাম্‌নে ঈর্ষা, অশুচি ও বিদ্বেষ জর্জরিত হচ্ছি

বলেই তাঁর পরিপূর্ণতা আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পাচ্ছে না।" রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে দেশের সেই প্রকৃত রূপ দেখিবার জন্য আহ্বান করিলেন

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, (৫ই ফাল্গুন) প্রাতে রবীন্দ্রনাথকে স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে অভিনন্দিত করা হয়। উত্তরে কবি বলেন,—আজকের দিনে যে বাণী সকলের চেয়ে আকাশ বাতাস পূর্ণ করে আছে সে হচ্ছে মুক্তির বাণী। মানুষের মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য শক্তি আছে যা দ্বারা সে বর্তমান অবস্থাকে আপনার বন্ধন বলে জ্ঞান কোরে সেই বন্ধনকে নিয়ত ছেদন করতে চেষ্টা করে। মানুষের ইতিহাস হচ্ছে মুক্তির ইতিহাস। ভারতবর্ষ সেই মুক্তি চেয়ে বারবার পৃথিবীকে জয় করে, লক্ষ্মী লাভ করেও বলেছে "ততঃ কিম্"। ঐশ্বর্য, প্রতাপ—সেও বন্ধন বলে সে ঘোষণা করেছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অসীমের জন্য, 'ভূমৈব সুখং'। নানাপ্রকার কামনাদ্বারা প্রবৃত্তি দ্বারা আমরা কর্ম করে থাকি। জীবনের অর্থই হচ্ছে নিয়ত কর্ম চেষ্টা ; আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তার অভিব্যক্তি।

ইহার পর তিনি আকাঙ্ক্ষা ও কামনার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ রহিয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। কামনার দ্বারা জীবের শারীরিক ধর্ম রক্ষিত হয়, তার পশুধর্ম সার্থক হয়। কিন্তু এতে মানুষের তৃপ্তি নাই। মানুষের প্রাণ পশুর প্রাণ নয়—তার আধ্যাত্মিক যে জীবন, সে পশুর জীবন থেকে মুক্তি চাচ্ছে। যে সত্যকে দেখে সে এই পশুধর্মকে ত্যাগ করে।

বড় রূপ দেখলেই ত্যাগধর্ম আসে। এই ত্যাগের অর্থ সন্ন্যাস নয়, কৃচ্ছ্রসাধন নহে। বাইরের দিক থেকে বাসনাকে ছিন্ন করলে অন্তরের যথার্থ যে আবরণ তা ছিন্ন হয় না। আনন্দই যথার্থ সমস্ত কামনাকে পরিপূর্ণতায় নিয়ে আসে। পরিপূর্ণ উপলব্ধি হলেই বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে হয় না। মানুষ বলছে মুক্তি চাই ; যে যে-পরিমাণ ত্যাগ করতে পারে সে সেই পরিমাণে ধন্য। †

সেই দিন অপরাহ্নে মুক্তাগাছার ত্রয়োদশী সম্মিলনী রবীন্দ্রনাথের ময়মনসিংহে আগমন উপলক্ষে অভিনন্দিত করে। মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার সুধেন্দুনারায়ণ আচার্য চৌধুরীর ময়মনসিংহস্থ ভবনে অভিনন্দন দেওয়া হয়।

* আনন্দবাজার পত্রিকা ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩২ (16 Feb. 1926) ; ৬ই ফাল্গুন, (18th Feb).

† আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ ফাল্গুন ১৩৩২।

তথায় মুক্তাগাছার সমস্ত জমিদার ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। রাজা শশিকান্তও রবীন্দ্রনাথের সহিত আসেন। জমিদারগণ রবীন্দ্রনাথকে দেড় হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেন!

পরদিন ময়মনসিংহের নগরবাসীদের পক্ষ হইতে এবং সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে অপরাহ্নে সম্বর্ধিত করা হয়। কবি ইহার উত্তরে যাহা বলেন তাহা সংক্ষেপে এই। জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির সেবা-নিষ্ঠার প্রভাবেই জাতির ঐক্য এবং সংহতি সাধিত হইয়াছে। কবি দেশবাসীকে সেই ঐক্যের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, জাতীয় কল্যাণের ফসল শুধু ফাঁকা কথার বক্তৃতা, ভাবপ্রবণতা এবং চিন্তার বিলাস বশেই অর্জন করিতে পারা যায় না; ইহা নিদারুণ আত্মপ্রবঞ্চনা। আবার গ্রামে ফিরিতে হইবে; সেখানে গিয়া দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সংক্ষেপে গ্রাম-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি জোর দিয়া এই বক্তৃতা প্রদান করেন। *

একদিন স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করে ও তিনি দীর্ঘ বক্তৃতায় তাহাদিগকে বর্তমান শিক্ষার দুর্গতি কোথায় তাহাই বিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। বহুবার পূর্বে তিনি যে-কথা বলিয়াছেন, সেদিনও সেই কথা আরও জোর দিয়া বলিলেন; জ্ঞান আমাদের অন্তরকে উদ্বোধিত করে নাই,—জ্ঞান আমাদের বোঝার মত হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা অর্থে পুঁথির বোঝা বহন হইয়াছে; আমাদের চিন্তা করবার সাহস জেগে ওঠে নাই। তাতে চিত্তের দৈন্য ঘটেছে। দেশকে জানিতে ও চিনিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা, তথ্যের দ্বারা এই কথাই সেদিনও ছাত্রদের সম্মুখে বিষদভাবে বলিলেন। †

সেইদিন অপরাহ্নে স্থানীয় মহিলা সমিতিতে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। ইহার পূর্বে তিনি স্থানীয় বিদ্যাময়ী স্কুলের ছাত্রীবৃন্দকে এবং পরে সিটি স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে উপদেশ দেন। সিটি স্কুল প্রাঙ্গণের মহিলা সমিতিতে বলেন, "সকল মঙ্গল কর্ম মেয়েদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মাতৃভাষার যথার্থ যে বাণী তা মেয়েদের কাছে যেমন সত্য হয়ে পৌঁছায়, এমন আর কোথাও নয়। মেয়েরা

* অনন্দবাজার ৬ই ফাল্গুন। পুনরায়, ১১ই, ১২ই ফাল্গুন। ১৩৩২।

† আনন্দবাজার, ১৩ই, ১৪ই ফাল্গুন ১৩৩২ 25th, 26th, Feb. 1926.

এতদিন নিজের নিকট আত্মীয়দের সেবায় সান্ত্বনায় সহায়তা করেছেন, আজকের দিনে যখন সমস্ত পৃথিবী অতিথিরূপে দ্বারে এসেছে—তার সম্মানের ভার যদি মেয়েরা না নেন তাহলে অতিথি সংকার হয় না। কর্মক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষেরই যে স্থান আছে—তা' নয়; মেয়েদেরও সেখানে স্থান আছে। পল্লীর সেবাতে, দেশের সেবাতে আজ পুরুষ মেয়ে কর্মক্ষেত্রে একত্রে মিলিত হোক্, এই আমি আশা করে রয়েছি। এতদিন পুরুষেরা যে কাজ করেছে তাতে একটা অসম্পূর্ণতার ভাব দেখা গিয়েছে। তাই মেয়েদের আজ এগিয়ে এসে পুরুষদের সাথে মিলতে হবে—সেই অসম্পূর্ণতার ভাব দূর করে দিতে।"*

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ শুক্রবারে রাত্রে, রবীন্দ্রনাথ সদলবলে কুমিল্লায় পৌঁছান; কবির সঙ্গে ছিলেন, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, তাঁহার কন্যা নন্দিনী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীমোহন ঘোষ ও মিঃ মরিস্। ফর্মিকি ও তুচি যান নাই। কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রমে' তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্বাহ্ণে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে 'অভয়-আশ্রমে'র তরফ হইতে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিলেন। আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণে স্বীকার করেন।

অভয় আশ্রম কুমিল্লায় ১৩২৯ সালে (১৯২৩) স্থাপিত হয়; ইহার প্রধান-কর্মী ছিলেন সর্বত্যাগী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্রমের আদর্শ মাতৃভূমির সেবাদ্বারা ভগবান লাভ; অপর কোনো দেশের অনিষ্ট না করিয়া সত্য ও ভগবানের সেবাই মাতৃভূমির সেবা। আশ্রমের উদ্দেশ্য স্বরাজলাভ; এই স্বরাজলাভের জন্য হিন্দু মুসলমানের প্রেম অত্যন্ত আবশ্যক। অস্পৃশ্যতা ও জন্মগত জাতিভেদ হিন্দুসমাজের অকল্যাণকর। খদ্দর উৎপাদন ও পরিধান স্বরাজ সেবকদের কর্তব্য। সংক্ষেপে এই কয়টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা জনসেবার জন্য চিকিৎসালয়, খদ্দর শিল্প বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করেন। কর্মীদের অদম্য চেষ্টায় তিন বৎসরের মধ্যে অভয় আশ্রমের নাম শুধু এই জেলায় নয়, সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তারিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের

* বিস্তারিত বক্তৃতা শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন হোম দ্বারা অনুলিখিত; Tagore Cutting. Vol. 11. দ্রষ্টব্য।

কর্মনিষ্ঠা, একাগ্রতা ও পল্লীসেবার আদর্শে মুগ্ধ হইয়া বার্ষিক উৎসবে সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়া কুমিল্লায় আসিলেন।

২০এ, ২১এ ও ২২এ ফেব্রুয়ারী আশ্রমের উৎসব। প্রথমদিন আশ্রমের উপাসনার পর কর্মীরা রবীন্দ্রনাথকে এক মানপত্র দেন। তিনি উত্তরে বলেন, "আত্মাই শক্তির উৎস, এই শক্তির সহিত পরিচয় লাভ করতে হলে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিতে হবে। অভয় আশ্রমের কর্মীরা এইরূপে আত্মত্যাগ করছেন বলে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি এখানে এসেছি।"

দিনব্যাপী বিচিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের অনেকগুলিতেই কবি যোগদান করেন। ২১এ ফেব্রুয়ারী রবিবার, প্রাতে সহরের বহু গণ্যমান্য লোক ও মহিলা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দ্বিপ্রহরে ক্রীড়াকৌতুক প্রতিযোগিতা ও সার্বজনিক ভোজ হয়; ইহাতে ভদ্রলোক ও মেথরেরা এক পংক্তি ভোজন করেন। দুইটার পর চরকার প্রতিযোগিতা চলে।

সেইদিন দ্বিপ্রহরেই কুমিল্লার মহিলা সমিতি কবিকে এক অভিনন্দন দেন। বৈকালে এক বিরাট জন সভায় প্রায় ৬।৭ হাজার লোক অভয় আশ্রমের প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। এই দিন আশ্রমের বার্ষিক সভা। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি; সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অভিভাষণকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বৈচিত্র্যের ভিতর সৃষ্টিরহস্য নিহিত। বিভিন্ন মত থাকা ও বিভিন্ন পথে কাজ করা জাতির দৌর্বল্য সূচিত করে না। কর্মধারাকে শতদল পদ্মের মত ফুটাইয়া তোলাই কাজের সার্থকতার মূলমন্ত্র।"

সন্ধ্যার পর সুরেশচন্দ্রের রচিত 'গৌরাঙ্গ' নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

২২এ প্রাতে উপাসনার পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছু উপদেশ প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে তিনি মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত 'রামমালা ছাত্রাবাসে' যান; সেখানে ছাত্রেরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। সেখান হইতে ভিক্টোরিয়া কলেজে যান। নমঃশূদ্র কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর মহেশ-প্রাঙ্গণে এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন; অভয়-কর্মীদের কথা এখানে তিনি খুব প্রশংসার সহিত বলেন। এই দিন রাত্রে কবি আগরতলা রওনা হন।

ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় বহুবার আসিয়াছেন, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল; তাঁহার পিতা ব্রজেন্দ্রকিশোর রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্যজীবনের প্রত্যুষে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সেকথা রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হন নাই। ২৪এ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় কিশোর সাহিত্য সমাজ কর্তৃক আহূত জনসভায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করা হয়। মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোর মাণিক্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ যে চারিদিন আগরতলায় ছিলেন, উৎসবে আনন্দে নগরী মুখরিত ছিল। মণিপুরী নৃত্য প্রভৃতি দেখিবার বিশেষ সুযোগ তাঁহার হয় এবং ইহার পর তিনি দুইজন মণিপুরী নর্তক সেখান হইতে শান্তিনিকেতনে আনেন। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের মধ্যে নাচের পরিবর্তন ও প্রচলনের জন্য এই মণিপুরী নর্তকদ্বয় বিশেষভাবে দায়ী।

২৬এ ফেব্রুয়ারী (১৪ই ফাল্গুন ১৩৩২) রবীন্দ্রনাথ সদলবলে আগরতলা ত্যাগ করেন। আগরতলায় বাসকালে এই দুইটি গান রচনা করেন— "দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা হৃদয় আকাশে", 'ফাল্গুনের নবীন আনন্দে'।

আগরতলা হইতে ফিরিবার পথে রবীন্দ্রনাথকে কিয়ৎকালের জন্য চাঁদপুরে থাকিতে হয়। সহরের বহু গণ্যমান্য লোক রবীন্দ্রনাথের সাদর অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হন। নীরদ-পার্কে তাঁহার সম্বর্ধনা হয়; জাতিনির্বিশেষে বহু নরনারী রবীন্দ্রনাথের দর্শনমানসে উপস্থিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন; বলিলেন, বাংলাদেশের আজ এই গুরুতর সমস্যা।

২৮এ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ষ্টীমারযোগে নারায়ণগঞ্জে আসেন। সেখানকার ছাত্রসঙ্ঘ তাঁহাকে মানপত্র দান করে। প্রতি-অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের চরিত্রবল ও কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে বলেন। এখানেও পল্লীমঙ্গল সম্বন্ধে বলিলেন ও অভয় আশ্রমের আদর্শ দেশময় প্রচারিত হয় সেজন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। যারা সমাজে অশুদ্ধ বলে অপাংক্তেয় তাহাদিগকে সেবার দ্বারা অভয় আশ্রম 'মানুষ' বলে পরিচয় দেবার সাহস বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগিয়ে অভয় আশ্রম যে মহৎ আদর্শ দেখাচ্ছেন তিনি সকলকে সেই আদর্শ গ্রহণ করতে বল্লেন।

কলিকাতায় ফিরিয়াই আশ্রমে আসেন নাই। ফর্মিকির বিদায় সভা (২৫এ ফাল্গুন ১৩৩২) বিচিত্রা-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইল। ফর্মিকি চলিয়া গেলেন, তুচি থাকিলেন। তখন আশ্রমে ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্য অনেকে পড়িতেছেন; মুসোলিনী চাহিয়াছিলেন ভারতের সঙ্গে ইতালির যোগ হয়, তাহা যেন পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছিল, এমনি সকলের মনে হইতেছিল।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ শেষ করিয়া কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। এই সময়ের লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে দিলীপকে লিখিত একখানি চিঠি বিশেষভাবে চোখে পড়ে; পত্রখানি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে। সাহিত্যক্ষেত্রে একদল লোক আছেন যাঁদের প্রধান কাজ বড়লোকের কাছে গিয়া অপরে তাঁদের সম্বন্ধে কি ভাবে সেই বিষয়ে গল্প করা। তাঁহারা মনে করেন এইভাবে গল্প করিতে পারিলে সাহিত্যিক সমাজে মান ও নাম হয়। রবীন্দ্রনাথ পত্রখানিতে লিখিতেছেন, "এইমাত্র কোনো পত্রলেখক আমাকে জানিয়েছেন যে, শরতের বিশ্বাস আমি তাঁর উপর বিরক্ত। যাঁরা আমাকে ভাল ক'রে জানেন তাঁরা এত বড় ভুল করতেই পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বা কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে মতে না মেলাকে আমি কোনো দিনই ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্গত ব'লে মনে করতে পারিনে। * * * শরতের এককালীন চরকা-ভক্তি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে বার বার হেসেছি,—কখনো হাসতুম না, গম্ভীর হ'য়ে নীরব হ'য়ে থাকতুম যদি আমার মনের মধ্যে লেশমাত্র কাঁটার ক্ষত থাক্‌ত। * * যাকে প্রশংসা করতে পারিনে তাকে আমি নিন্দাও করতে নারাজ। * * তিনি চরকা ছেড়ে কলম ধরেছেন তাতে আমি খুশি হয়েছি এই জন্য যে, তাঁর কলম থেকে দেশোন্নতির যে সূত্রপাত হবে চরকা থেকে তা হবে না—কিন্তু খেয়ালের বশে যদি তিনি চক্রধর হ'য়েই থাকেন তা হ'লেও তাঁর বিরুদ্ধে আমি কখনোই চক্রান্ত করব না।"*

রবীন্দ্রনাথের ৬৫তম জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়, (২৫ বৈশাখ, ১৩৩৩)। এই উৎসবে বিদেশ ও ভারতের নানা স্থান হইতে অনেকগুলি

* ৩ বৈশাখ ১৩৩৩; দ্রঃ অনামী পৃঃ ৬৫০। অসহযোগযুগে শরৎচন্দ্র একজন বিশেষ কর্মী হইয়াছিলেন।

সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। ইতালীয় অধ্যাপক তুচি (Tucci) ছাড়া সেদিন ইতালীয়ান কন্সাল সস্ত্রীক, ফরাশী কন্সাল সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। ফরাশী কন্সাল য়ুরোপে কবির প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলেন ও বিশেষভাবে ফরাশীদেশে। ইতালিয় কন্সাল রবীন্দ্রনাথের ইতালিভ্রমণের কথায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। বিশ্বভারতীর চীনাভাষার অধ্যাপক N C Lim চীনদেশের হইয়া কবিকে উপঢৌকন প্রদান করেন; মিঃ এণ্ড্রুজ দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকার অধিবাসীর তরফ হইতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ডাঃ কাজিনস্ আইরিশ জাতির হইয়া কবির আয়ুবৃদ্ধি কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন। পেয়র বন্দরের মহারাজা কবির ৬৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলা-ভবনের জন্য অর্থদান করেন।

সেইরাত্রে 'নটীর পূজা'র প্রথম অভিনয় হয়। বৌদ্ধযুগের আখ্যানমূলক প্রসিদ্ধ কবিতা 'পূজারিণী' অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত। কিছুদিন হইতে কেবল মেয়েদের দ্বারা অভিনয় হইতে পারে এমন একটি নাটিকা প্রণয়নের জন্য তাঁহাকে আশ্রমের মেয়েরা তাগিদ করিতেছিল। সেই উদ্দেশ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন। বহু গান সেই সঙ্গে রচিত হয়। তবে এই নাটিকাটি খ্যাতি লাভ করে ইহার নৃত্যের জন্য। শ্রীমতী গৌরী বসু নটীর ভূমিকা গ্রহণ করেন; তাঁহার নৃত্যে একটি অপরূপ অপার্থিব সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শান্তিনিকেতনে নৃত্য একটি নূতনরূপ লইল। 'অরূপরতনে' কলিকাতার মকাভিনয় হইয়াছিল, সাহসভরে নৃত্যের চন্দ্রমুখীনো দেখাইবার মতো হয় নাই। কিন্তু গৌরীর শ্রীমতীর ভূমিকা দেখিয়া কবির সন্দেহ থাকিল না যে বাহিরে শান্তিনিকেতনের কিছু দেখাইবার আছে।

কিছুকাল পরে কলিকাতায় এই নাটিকার অভিনয় হয়; গৌরীর নৃত্য সত্যই নৃত্যকলায় যুগান্তর আনিল। বাঙলাদেশের নৃত্যের ইতিহাস ১৩৩৩ সাল হইতে নূতন পথে চলিল।

২৮। ইতালি ভ্রমণ

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পুনরায় য়ুরোপযাত্রার কথা হইতেছিল। সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশ পায় যে তিনি ইতালীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে—তিনি য়ুরোপে তাঁহারা বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন।

এইবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক গৌরগোপাল ঘোষ। ত্রিপুরা রাজপরিবারের মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা এই জাহাজেই যান। মিঃ এণ্ড্রুজের যাবার কথা ছিল, কিন্তু সিমলায় বড়লাট আরুইন্ তাঁহাকে আফ্রিকার বর্ণসমস্যা সম্বন্ধে একটি গুরুতর বিল-এর আলোচনার জন্য আহ্বান করেন।

১২ই মে ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ১৪ই বোম্বাই পৌছান। ১৫ই তারিখে 'রাজমক' (Razmak) নামে ইতালীয় জাহাজে তাঁহারা ইতালি-যাত্রা করিলেন। জাহাজে উঠিয়া সকলেই বুঝিলেন তাঁহারা সত্যই ইতালীয় সরকারের অতিথি হইয়া যাইতেছেন; কারণ কাপ্তেন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কর্মচারী তাঁহাদিগকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহা অন্য জাহাজে দেখা যায় না।

পোর্ট সৈয়দে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীমতী Shulamith Flaum প্যালেষ্টাইন হইতে আসেন। এই মহিলা জার্মান্ ইহুদী; ইনি ১৯২৩-১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে শিশুদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য করেন। তার পর প্যালিষ্টাইনে গিয়া নূতন ইহুদী আন্দোলনে (Zionist) আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহার যোগ এখনো রহিয়াছে; তাঁহার ইচ্ছা ছিল ফিরিবার পথে রবীন্দ্রনাথকে নূতন প্যালেষ্টাইনে লইয়া যান। রবীন্দ্রনাথ বলেন ফিরিবার সময়ে জেরুসালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন ও গ্যালিলিতে ইহুদীদের যে গণতন্ত্রমূলক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে তাহা দেখিবেন। ইহুদীরা পূর্ব ও পশ্চিমের

সেতুস্বরূপ ; তিনি জিওন আন্দোলন বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। কিন্তু নানা বাধা হওয়ায় এই দেশটি তাঁহার দেখা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথকে ইতালিতে যাইতে দেখিয়া এদেশের ও বিদেশের একদল লোক খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতালীয় গভর্মেণ্টের নিমন্ত্রণে যান নাই—একথা সত্য ; ইতালিতে তাঁহার বন্ধুদের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান। ব্যাপারটি ঘটান—অধ্যাপক ফর্মিকি। প্রথমবার যখন তিনি ইতালি যান্ তখনই তাঁহার বক্তৃতা ও কথাবার্তাদি ইতালীয় ফ্যাসিষ্ট মহলে সামান্য অপ্রীতি সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া য়ুরোপীয় কাগজে সন্দেহ প্রকাশ করে। যাহাই হোক, মুসোলিনি তাহার প্রতিবাদ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রেমের পরিচয়স্বরূপ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের জন্য বহুশত মূল্যবান্ ইতালীয় গ্রন্থ ও অধ্যাপক তুচিকে শান্তিনিকেতনে ষ্টেট্ খরচে থাকিবার জন্য প্রেরণ করেন। এইসব প্রীতির নিদর্শন কবিকে স্বভাবতই মুগ্ধ করিয়াছিল।

এই সময়ে ফ্যাসিষ্টদের উৎপাতের বিরুদ্ধবাদীরা শশঙ্কিত ; কয়েক মাস পূর্বে ম্যাতিওনেটি (Mationetti) নামে একজন ধনী ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সিনেটরকে পথিমধ্যে গুপ্তভাবে হত্যার ব্যাপার লইয়া য়ুরোপে বেশ একটু আলোচনা চলিতেছিল (Europe নামে ফরাসী মাসিক দ্রষ্টব্য)। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ পায় মুসোলিনির প্রাক্তন সেক্রেটারীর স্বীকারোক্তি হইতে। মোটকথা সভ্যজগতে মুসোলিনির একটা বদনাম রটিয়াছিল। সেইহেতু তাঁহার এই বিনষ্ট-গৌরব উদ্ধারকল্পে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষীর প্রশংসাপত্র জগত সমক্ষে খাড়া করিবার ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য তিনি অধ্যাপক ফর্মিকির দ্বারা এই নিমন্ত্রণটি ঘটান। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য ছয়জনকার মত যাইবার ব্যবস্থা জাহাজে হয়, সে-ব্যয় ইতালীয় ষ্টেট্ বহন করেন। ফর্মিকি লিখিয়াছেন যে তিনি যখন রোমে রবীন্দ্রনাথের আগমনের কথা শান্তিনিকেতন হইতে লিখিয়া পাঠান, তখন "Sig. Mussolini at once replied extending the hospitality of the Italian Government to him and his retinue" (Manchester Guardian 14 Aug. 1926.)

ইতালি যাইবার সময়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল, যে কি করিয়া মুসোলিনির উগ্র জাতীয়তাবাদের সহিত, বিশ্বতন্ত্রবাদী রবীন্দ্রনাথের মিলন সম্ভব! যদিও রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি উভয়েই ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি-সংগ্রহ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সহায়ক বলিয়া বিশ্বাস করেন, তথাচ রবীন্দ্রনাথ কখনোই মুসোলিনির পদ্ধতিকে সমর্থন করিতে পারেন না একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন।* কয়েকমাস পরেই প্রমাণ হইল, রবীন্দ্রনাথ অসত্যের সহিত আপোষ করিতে অসমর্থ; যত বড় রাষ্ট্রশক্তি তাঁহাকে আদরে যত্নে অভিভূত করিতে চেষ্টায়িত হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি অসত্যের আবরণ ভেদ করিয়া নির্গত হইবেনই।

রবীন্দ্রনাথ নেপলসে ৩০শে মে (১৯২৬) নামামাত্র সেইদিনই স্পেশেল ট্রেণে করিয়া তাঁহাকে রোমে লইয়া যাওয়া হয়। মুসোলিনির আদেশে ইতালির বৈদেশিক মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো আড়ম্বর হয় নাই। রোমে কবি মুসোলিনির অতিথি হন; কবিও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য গ্রাণ্ড হোটেলে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।†

মুসোলিনির সহিত কথাবার্তার পর ও রোমের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি ফ্যাসিসমোর যে রূপ দেখিলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ খুবই প্রীত হইয়াছিলেন। দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে জবরদস্ত শাসক যে কতখানি প্রয়োজন, তাহা বোধহয়, তিনি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন মুসোলিনি ও ফ্যাসিসদের সম্বন্ধে যে মত তিনি পোষণ করিতেন, তাহা এইবার রোমে আসিয়া পরিবর্তন করিয়াছেন। It is for [illegible] to study and not criticise from outside; I am glad of this opportunity to see for myself the work of one, who is assuredly a great man and a movement that will certainly be remembered in history. (Daily News London, 11 June)

রবীন্দ্রনাথের এই সামান্য সার্টিফিকেট মুহূর্ত মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র ঘোষিত হইল। মুসোলিনি ইহাই চাহিয়াছিলেন। অল্প কালের মধ্যে তিনি

* Amrita Bazar Patrika, 30 May 1926. Tagore as the Guest of Mussolini by G. C. Shah.

† Italian Mail, Florence 5th June 1926 দ্রষ্টব্য।

এমনকি দেখিলেন যাহাতে তিনি জগৎ সমক্ষে মুসোলিনির সুখ্যাতি করিলেন ? দুঃখের বিষয় যত শীঘ্র তিনি প্রশংসা করিলেন, ইতালি ত্যাগ করিয়া তেমনি দ্রুত তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। (**Madras Mail, 17th June 1926**)

৩১-এ মে মুসোলিনির সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইল।* দুই দেশের দুই Personalityর সাক্ষাৎ। ভাবে, স্বভাবে দুইজন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। মুসোলিনি কবিকে বলিলেন যে 'যাঁহারা কবির প্রত্যেকখানি গ্রন্থ ইতালীয় ভাষায় পাঠ করিয়াছেন আমি তাঁহাদের অন্যতম।' কবি তাঁহাকে তাঁহার বদান্যতা ও অধ্যাপক তুচিকে বিশ্বভারতীতে প্রেরণের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দান করিলেন।

ইতালির কাগজে কাগজে রবীন্দ্রনাথের কথা, তাঁহার আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃত

---

* The meeting between the great Bengali poet and the Italian Duce at Rome is a piquant incident in the international life of to-day. Not so many years ago Dr. Rabindranath Tagore condemned Mr. Gandhi's policy of non-co-operation as "making of India a prison." Tagore's poems and teachings breathe the very spirit of freedom and it is difficult to realise how the Indian and Italian could find common ground, except perhaps in their individual greatness of vision. Mussolini's greatness has yet to receive the final verdict of History. He depends for immortality on the ultimate success of his vehement assertion of the right of a strong man to rule without consideration of ethical precepts. Tagore has already been assured of immortality by reason of his sublimation of ethics above all material facts, although he is not blind to the reality of those facts and their possible power of conquest. It is not beyond the imagianation to see in the interchange of view between the two men a portent which might have significance for Italy and the world. The dreamer is often the tyrant in embryo. The poet in Tagore may see much that is admirable in the wonderful work which Mussolini has done for his country. The colour of it will fill his artist's eye, the dogmatism will appeal to him as a teacher. But he will not fail to see the danger ahead. How can the present rule dependent on the personality of one man be eventually consolidated with violent reaction into a real freedom? For, to use Tagore's words, Italy must in some respects be a prison. The transcendent vision of the poet-philosopher may find for Mussolini the bridge which will carry him back safely and his country back safely to the liberty which the great Dictator still desires, but fears to regain."

The Pioneer, Allahabad 3 June 1926.

বর্ণনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ২রা জুন তারিখের Fascismo প্রধান মুখপত্র Tribuna-এ তাঁহার Interview প্রকাশিত হয়; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "রোমে আমার আগমন স্বপ্নেরন্যায় বোধ হইতেছে। আমি এখনো বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, যে-দেশকে আমি শেলি, কীট্‌স্‌, বাইরন, ব্রাউনিন ও গোটের কাব্যের মধ্য দিয়া পাইয়াছিলাম, আমি সেই দেশে আসিয়াছি।"

মুসোলিনি সম্বন্ধে তিনি বলেন, "His Excellency Mussolini sums modelled body and soul by the chisel of a Michael Angelo, whose very action showed intelligence and force. I see a great future for your country, a future as great as her past.

ইতালি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "Let me dream that from the fire-bath the immortal soul of Italy will come out clothed in quenchless light."

রোমে আসিয়া প্রথম কয়দিন স্থানীয় দৃশ্য দেখিয়া পত্রিকাওয়ালাদিগকে Interview দিয়া, বিশিষ্ট লোকের সহিত কথাবার্তায় কাটে। অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকায় কবি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও প্রশংসা ছিল; তবুও একদল লেখক রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন স্বপ্ন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। La Voce Republican (4 June 1926) এই বিষয়ে সমালোচনা করিয়া লিখিলেন, To appreciate our nature, it is necessary to come into contact with our world and our life. The civilization of Europe is essentially dynamic, while the civilization of India is essentially static and dualistic, and Tagore's idea of a meeting of the two is absolutely utopian.

Il Messagero (9th June) কাগজে Alessandro Chiappelli নামে একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক ও সিনেটর আরও স্পষ্ট করিয়া এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলেন; তিনি ভারতীয় ধর্মমতকে Pantheism ইত্যাদি বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, We do not belong to the civilization of pantheism, but to that of Christian creationism, which do not accept a philoso-

phy of a God-nest, in Tagore's won phrase, but which boasts of a God-eagle using a strong biblical experssion, which carries on its wings the children of people.

মোট কথা এই রূপ সামান্য প্রতিবাদ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অভিনন্দন ও সমাদরের ত্রুটি হয় নাই।

৭ই জুন রোম নগরীতে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা হয়; কাপিটোল (capitol) এ রোমের গভর্ণর ভাইস গভর্ণর দ্বয়, বহু ডিউক ও ডাচেস উপস্থিত হইয়া কবিকে সম্মানিত করেন। ইহাই প্রথম Public অনুষ্ঠান।

৮ই জুন রবীন্দ্রনাথ Colony school of orti di pace (শান্তিকুঞ্জ) দেখিতে যান ও সন্ধ্যায় 'আর্টের অর্থ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বিদ্যালয়ের সহিত শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদানের আদর্শের বিশেষ যোগ আছে; তাহাদের বাগান, কাজকর্ম দেখিয়া তিনি খুব প্রীত হন; এই অতিথির আগমনকে স্মরণীয় করিবার জন্য তাহারা তাঁহাকে দিয়া বাগানে একটি জলপাইয়ের গাছ পোঁতাইয়া লয়; জলপাই শান্তির দ্যোতক।

সন্ধ্যার সময় Unione Intellectual Italien সভার আয়োজনে Quirinal Theatre এ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হয়—বিষয় Meaning of Art. প্রত্যেকখানি টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়, বহু শত লোককে ফিরিয়া যাইতে হয়। মুসোলিনি ও পারিষদের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। (Il Resto del Carlino. 10th June, 1926)

১০ই জুন প্রাচীন কলোসিয়ামের ধ্বংসের মধ্যে ২৫।৩০ হাজার ইতালীয় সমবেত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে। প্রায় হাজারটি বালক বালিকা যুক্ত কণ্ঠে সঙ্গীত করিয়া কলোসিয়মকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল। (Annual choral concert of school children in Colloseum) কবি প্রবেশ করিল সেই বিপুল জনতা যেভাবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল, তাহা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহাদের স্মরণে চিরদিন থাকিবে (V. B. Q. 1926 Oct. p. 289)

সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অভিনন্দন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের Rector Prof. Del Vechio রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে যথার্থভাবে

ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অভিভাষণ হইতে আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

You are no stranger to Rome, for Rome is the seat of the Universal spirit, and she considers nothing which is human strange to her. Your great humanistic poetry, which is at the same time humanistic philosophy, has found a profound echo in our hearts. You have affirmed in mystic and sublime words this eternal truth, that above the material life, above the desire of wealth, of pleasure, and of power, there exists the Kingdom of Spirit, of goodness, of love. * * * Your message however terminates in no vein of asceticism ; it is essentially the poetry and philosophy of action—action which gathers strength from wisdom, from justice, from the harmony of love. This, if I understand right is your supreme idea, which is also ours." (Il Messagero ; Popoli di Roma 11th June 1926 ; V. B. Q. 1926 Oct. p 286).

অধ্যাপক ফর্মিকিও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায় ও ভাবে কবির আদর্শের প্রশংসা করিলেন। শ্রীমতী Vera Certa নামে একজন মহিলা সংস্কৃতে Doctorate পাইয়াছিলেন ; তিনি রোমের ছাত্রদের তরফ হইতে কবিকে ফুল দিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন—

ভদন্তু তানি পুষ্পানি অস্মাকম্ স্নেহম্ মানম্ চ।
পুষ্পানি এতানি তু ম্লানম্ গমিষ্যন্তি ন তু অস্মৎ স্নেহম্ মানম্ চ ॥

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের তাঁহার অন্তরের কথা বলেন ; ছাত্রেরা তাঁহার চিরদিনই প্রিয়, তা তাহারা যে দেশেরই হোক ; কারণ Students everywhere belong to a country of their own, which has no distinction of nationality or race, a land of human hope, a land of young minds seeking life and light ; and in this land guidance and leadership belongs to the poet.

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ছাত্রদের খুবই ভাল লাগিয়াছিল এবং বহুক্ষণ তাহারা আনন্দপ্রকাশ করিয়া তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিল।

১১ই জুন ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথের সহিত ইতালির রাজার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের সময় বাহিরের কেহই উপস্থিত ছিলেন না। রাজা বেশ ভালই ইংরেজি বলিতে পারেন, সুতরাং দোভাষীর প্রয়োজন হয় নাই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন প্রভৃতি অনেক বিষয় তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

রোম হইতে বিদায় লইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহিত মুসোলিনির দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয় (১৩ই); এইবার প্রথমবার অপেক্ষা কথাবার্তা আরও আন্তরিকভাবে হয়; অন্যান্য কথাবার্তার পর ভারতবর্ষ ও ইতালির মধ্যে ছাত্র বিনিময়ের কথা ওঠে। এ ছাড়া কবি দার্শনিক ক্রোচের (Croce) সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। মুসোলিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য ফর্মিকিকে যথাকর্তব্য নির্দেশ করেন। ক্রোচে মুসোলিনির সুনজরে ছিলেন না বলিয়া তাঁহার সহিত কাহারও দেখা-শোনা করা ফ্যাসিষ্টশাসনে সুবিধাজনক ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ Croceএর লেখা পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার রসবোধ ও সৌন্দর্য বোধশক্তিকে বিশেষভাবে প্রশংসা করিতেন। ক্রোচেকে Naples হইতে Telegram করিয়া আনা হয়। কবি তাঁহাকে বলিলেন, 'যদি ইতালি হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতাম তাহা হইলে অত্যন্ত লজ্জিত হইতাম। আপনি যে Naplesএ আছেন তাহা আমি জানিতাম না।' উভয়ের মধ্যে ইতালীয় জাতির মনোভাব লইয়া আলোচনা হয়। Croce বলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য তাঁহার খুব ভাল লাগে; তাহার কারণ যে কেবল ইহার চিন্তার মহত্বে তাহা নহে ইহার Classical formএর জন্য ইহা তাঁহার ভাল লাগে। "This is quite different from our ideas of oriental poetry which we usually think of as steeped in fancies".

Croce আরও বলেন 'My idea of divinity is similar to yours; God is not a being amongst beings, but Being of Beings."

চৌদ্দ দিন রোমে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনি সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন ও দেখিয়াছিলেন তাহাতে এই জবরদস্ত লোকটির প্রতি কবির শ্রদ্ধা খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল; এবং তিনি সেকথা বহুবার অধ্যাপক ফর্মিকি ও সাংবাদিকগণের নিকট ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি ফ্যাসিস্‌মো সম্বন্ধে কোনো মতামত দেন নাই, তিনি বারবার বলেন সে-সম্বন্ধে তিনি বলিতে অপারক। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্টারের নিকট মুসোলিনির ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করা ও ফ্যাসিস্‌মোর প্রশংসা প্রতিশব্দবাচক। সুতরাং ইতালির কাগজে পত্রে ঘোষিত হইতে লাগিল যে রবীন্দ্রনাথ ইতালির বর্তমান ব্যবস্থার ঘোর সমর্থক। (V-B. Q. 1926 Oct. p 292).

রোম হইতে কবি সদলে Florence যান (১৬ই) Florence Leonardo da Vinciর স্থান। পৃথিবীর যে কয়টি লোক মনীষাবলে প্রণম্য da Vinci তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহারই নামে গঠিত সোসাইটি রবীন্দ্রনাথকে ১৬ই জুন অভ্যর্থনা করেন। সভাপতি Marchese Corsini অভিভাষণে বলেন, This name Leonardo da Vinci stands for whatever is great in art and creative impulse in Italy and therefore whole world, and in association with this name we greet you. We welcome you as a *Master* of our society. You represent the unity of life in the midst of a diversity of activities, and we feel proud at having you in our midst today." (V-B. Q. 1926 Oct. p 294).

পরদিন (১৭ জুন) রবীন্দ্রনাথ ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ হলে My School সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। হলে তিলার্ধ স্থান ছিল না, এবং সভা বসিবার বহু পূর্বে ঘর লোকে লোকারণ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের Volunteer Corps Guard of Honour-ভাবে সিঁড়ির উপর ও প্লাটফর্মে সারি দিয়া দাঁড়ায়; সে-দৃশ্য বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার তুবক ইতালীয় ভাষার অধ্যাপক Pavolini করিয়া দেন।

ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিবার সময় Stationএ বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। অধ্যাপক Pavolini সংস্কৃতের অধ্যাপক—তিনি একটি গাথা নিজে রচনা করিয়া ষ্টেশনে কবিকে উপহার দিলেন;

পুষ্পপুরমিতি খ্যাতম্ শ্রুত্বা বাক্যমমৃতম্ গুরোঃ
এষ্যত্যভিনবম্ সঙ্গম্ ফলপুরমতঃপরম্ ॥

ফ্লোরেন্স-এর অর্থ পুষ্পপুর City of flowers। ফ্লোরেন্স শিল্প স্থাপত্যকলার জন্য বিখ্যাত, রবীন্দ্রনাথ এইসব সৌন্দর্যসম্পদ বিশেষভাবে দেখিবার সুযোগ পান। তাঁহার বিরাট মন পৃথিবীর সকল রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া ফিরিতেছে।

ফ্লোরেন্স হইতে Turinএ রবীন্দ্রনাথ যান। সেখানে Societa pro cultura Femminille অর্থাৎ 'মহিলাদের সংস্কৃতি সাধনের সভা সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান; তাঁহারাই কবিকে প্রথমে সম্বর্ধনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য Dr. Amelia Allan Civita ইংরেজিতে অভিভাষণ পাঠ করেন; তিনি বলেন—

This Society is not a literary academy for lady scholars, its chief ambition is to encourage women in their love of a simple mode of life, to prepare them for the sweet yet hard tasks that await them, to make them sensitive to currents of world thought, and to help them to judge of life in accordance with a high and serene standard of values. * * There is a great affinity between your aims and ours, that is why our welcome is so warm and sincere, why your books are so popular, and so much appreciated, and your heroines so familiar to us. *

"This is why we tenderly love your Chitra, sweet Mashi and passionate Bimala, and the sensitiveness of their souls finds a deep echo in our own. You possess a flame which brings warmth to us all, and specially to us Italians, who have much in common with the people of the East.

ইতালির লোকে তাঁহাকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা আমরা দেখিতেছি; আর Fascismo দলের লোকেরা কি সন্দেহের চোখে দেখিতেছিল তাহারও আভাস পাইয়াছি। পরে আমরা দেখিব রবীন্দ্রনাথকে

* Stampa, 20 June 1926 see V-B. Q. 1926 Oct. p. 296

ফ্যাসিস্‌মো দলে না টানিতে পারিয়া মুসোলিনির দল কি বীভৎস রূপ ধারণ করিয়া কবিকে গালি দিয়াছিল।

২১এ জুন অপরাহ্ণে Liceo Musicelleএর হলে Turin সহরের বহু গুণী জ্ঞানীজনের সম্মুখে City and Village সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন; ফর্মিকি ইতালীয় ভাষায় ইহার চুম্বক করিয়া প্রথমে ব্যাখ্যা করেন ও তৎপরে কবি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সিগ্‌নোরা Lipovetaka 'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ', 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে', 'যদি তোর ডাক শুনে' এই তিনটি গান বাঙলায় গান করেন। ইহার সুর সাধারণের খুবই ভাল লাগিয়াছিল। কবি কয়েকটি বাংলা কবিতা পাঠ করিয়া শোনান।

২২এ জুন টুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেন। সেইদিনই তিনি ইতালি ত্যাগ করিয়া সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যান। শেষদিন পর্যন্ত অধ্যাপক ফর্মিকি কবির সঙ্গে ছিলেন।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ভিলেনেভুতে তিনি রঁলার নিকট যান। সেখানে আসিবার পর তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও ভক্তরা একে একে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন, ও ইতালির কাগজপত্রে তিনি মুসোলিনি ও ফ্যাসিসমো সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল সেসব সম্বন্ধে সত্য ঘটনা ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত করিতে লাগিলেন। সেখানে থাকিতে থাকিতে বহু উৎপীড়িত অত্যাচারিত ইতালীয় তাঁহার নিকট আসিয়া তাহাদের দুঃখের কাহিনী ও মুসোলিনি শাসনের বীভৎস দশা বলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ সুইটজারল্যাণ্ড হইতে ইংলণ্ডে এণ্ড্রুজকে এক পত্রে জানান যে তিনি কখনো ফ্যাসিস্‌মোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন নাই। এই পত্রখানি বিলাতে বিখ্যাত দৈনিক Manchester Guardianএ প্রকাশিত হয়। ইতালির কাগজপত্রে তাঁহার মত সম্বন্ধে যেসব অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রকাশিত হয়, তাহার যথাযথ অনুবাদ হইতে তিনি এইখানে আসিয়া জানিতে পারেন যে তাঁহার মত বলিয়া যাহা জগতে প্রচারিত হইতেছে তাহা তাঁহার বক্তব্য হইতে কত দূরে! তিনি এখান হইতে ফর্মিকিকে যে-পত্র দেন তাহাতে এসব কথার আভাস আছে। কিন্তু সে-পত্র তিনি ইতালি সম্বন্ধে কোনো বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করেন নাই।

ভিলেনভু-এ বাসকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত রঁলার দেখা হয়; ও দুই মনীষীতে মিলিয়া মহাত্মা গান্ধী, অসহযোগ, রুদ্রপন্থা সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করেন। কিন্তু প্রধানত আলোচনা চলে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও মৈত্রীবিষয়ে। এই ভিলিনোভ য়ুরোপীয় মনীষী ও ভাবুকদের একটি তীর্থক্ষেত্রের ন্যায় হইয়াছিল; এখানেই রবীন্দ্রনাথের সহিত ফরাশী কবি George Duhamel, বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত, Golden Bough নামক নৃতত্ত্বের বিশ্বকোষ প্রণেতা J.G. Frazer, অশীতিপর পণ্ডিত ফোরেল (Forel) Rousseau Institute এর অধ্যাপক বোভে (Bovet)র সহিত সাক্ষাৎ হয়। এইসব চিন্তাশীল ব্যক্তির সংস্পর্শ রবীন্দ্রনাথকে খুবই আনন্দ দান করিত। সেই সময়ে রঁলা তাঁহাকে ইতালির কাগজে ইতালি সম্বন্ধে কবির মতামত দেখান।

ভিলেনভু হইতে রবীন্দ্রনাথ সদলে ৎসুরিক (Zurich) যান; সেখানে সাধারণের সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার জন্য যে অভ্যর্থনা সভা হয় তাহাতে ৎসুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপকগণের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এইখানে কবির সহিত ইতালির অধ্যাপক সলভাদোরির স্ত্রীর দেখা হয়; ইঁহারা ইতালি হইতে বিতাড়িত হইয়া ৎসুরিকে বাস করিতেছিলেন। এই মহিলা কবিকে ফ্যাসিস্‌মোর অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করেন; তিনি প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া বলেন। তিনি বলেন-তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সম্মুখে পিতাকে হত্যা করা হইয়াছে; পিতার সম্মুখে পুত্রের উপর অত্যাচার হইতেছে;' এই শ্রেণীর কয়েকটি উদাহরণ তিনি দেন। (V-B. Quarterly 1926, Oct)। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন কবির চিত্তকে এই সব ঘটনা বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। কিন্তু তখনই তিনি কাগজে কিছু লিখিলেন না।

ৎসুরিক হইতে তাঁহারা বিয়েন (Wien) রওনা হয়েন; পথে লুসার্ণসহরে একদিনের জন্য থামেন। সেখানে বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ তিনি পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১০ই জুলাই ১৯২৬ তাঁহারা বিয়েন-এ পৌছান। এখানে তাঁহার সহিত কয়েকজন উপদ্রুত, বিতাড়িত ইতালীয়র পুনরায় দেখা হয়। ইহাদের মধ্যে এক

জন রোমের এডভোকেট, ইনি Matteotti হত্যায় অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান। সেই অপরাধে তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে। আর একজন সোসিয়েলিষ্ট মহিলা-নেত্রা কবির সহিত দেখা করেন। তাঁহারা কবির কাছে ফ্যাসিস্‌মোর যে কাহিনী বর্ণনা করেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় স্পর্শকাতর কবির পক্ষে নীরবে সহ্য করা অসম্ভব।

তিনি তাঁহার রুদ্ধ মনের সমস্ত শক্তি দিয়া ফ্যাসিস্‌মোকে ধিক্কার দিয়া এক দীর্ঘ পত্র Andrewsকে লেখেন। সেই পত্রখানি আগষ্ট মাসের গোড়ায় Manchester Guardianএ প্রকাশিত হয়। সেই পত্রখানি প্রকাশিত হইলে ইতালীয় গর্মেণ্টের সহিত রবীন্দ্রনাথের যথার্থ বিচ্ছেদ হইল। পত্রখানি লিখিত হয় ২০এ জুলাই।

Manchester Guardianএ রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশিত হইলে ফর্মিকি তাহার উত্তর দেন। তিনি বলেন কবির সঙ্গে তিনি বরাবর ছিলেন একদিনের জন্যও তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই; তিনি তাঁহার দোভাষীর কাজ করিতেন এবং ইতালির কাগজ পত্রে যাহা বাহির হইত, তাহা তাঁহাকে অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির কার্য দেখিয়া একাধিকবার তাঁহার সম্মুখে মন্ত্রীবরের প্রশংসা করিয়াছেন। (Manchester Guardian. 4 August 1926)

বার্লিন (১৫ই অক্টোবর) হইতে রবীন্দ্রনাথ জবাবে লেখেন যে তিনি মুসোলিনির আতিথ্য ও সৌজন্য যাহা পাইয়াছেন, তাহা প্রচুর ও আন্তরিক। তাঁহাকে যেটি আকর্ষণ করিয়াছিল সেটি হইতেছে মুসোলিনির ব্যক্তিত্ব। আজকালকার দিনে রাষ্ট্র-যন্ত্রের মধ্যে একটা যোগ্য মানুষের অন্তর দেখিতে পাইলে আনন্দ হয়; সেই আনন্দেই তাঁহাকে ইতালির মহত্বের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি বলেন ইহার দ্বারা এ প্রমাণ হয় না, যে তিনি ফ্যাসিস্‌মোকে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিলেন, যে রোমে একজন ইংরেজের সহিত সাক্ষাৎ হয়; তিনি ইতালির সমস্ত স্কুলে গভর্মেণ্ট যে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতই একমাত্র শিক্ষণীয় ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারই সমর্থন করেন। আজকালকার দিনে জাতীয়তা সুদূর ভিত্তির উপর খাড়া হইবে বলিয়া এরূপ জবরদস্তি দুঃসহ। এই ইংরেজের সঙ্গে কথা বলিতে

বলিতে তিনি প্রথম অনুভব করেন এদেশে স্বাধীনতা নিষিদ্ধ। (Manchester Guardian 20 Sep. 1926.)

"It may be because of the great attraction that we have in the East not so much for an efficient organization as for some living genius in all departments of Society that I was actuality drawn to the vision of a creative mind, working in the person of Mussolini, moulding the destiny of Italy, infusing life into her from his own abundant life when she showed any sign of feebleness. * * For sometime I felt almost elated with the idea that an object-lesson was being offered by Italy to show that an ample room could be made for human personality in the heart of a political machine, modulating its rhythm in sympathy with the movement of a great living mind."

ইতালির কোনো কাগজ পত্রে রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশিত হয় নাই, হইবার জো ছিল না। লোকে জানিতে পারে নাই রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন; কেবলমাত্র মুসোলিনির নিজের কাগজ Popolo d' Italiaতে (ইহার সম্পাদক মুসোলিনির ভ্রাতা) অত্যন্ত জঘন্য গালাগালি বাহির হয়; ইহাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একমাত্র কথা যাহা ইতালীয়রা জানিতে পারে। "No mention of the letter or of its contents got into the Italian Press, although it was widely read in journalistic circles."

২৯। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে

জুলাই (১৯২৬) মাসটা বিয়েনায় থাকিয়া আগষ্টের গোড়ায় কবি ইংলণ্ড যান ; এইখান হইতে তিনি ইতালি সম্বন্ধে অনেকগুলি পত্র Manchester Guardian এ লেখেন, সেগুলির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এবার ইংলণ্ড বাসকালে তেমন কিছু বিশেষ ঘটনা উল্লেখযোগ্য ঘটে নাই ; এপ্‌স্‌টাইন্‌ (Epstein) তাঁহার একটি bust নির্মাণ করেন ; এপষ্টাইন সম্বন্ধে কবির কৌতূহল বরাবরই। কিছুকাল পূর্বে (জুলাই ১৯৩৫) দেখিয়াছি এপস্‌টাইনের আর্ট সম্বন্ধে একখানি নূতন বই বাহির হইয়াছে এবং কবি সেখানি ভাল করিয়া পড়িয়া নন্দলাল বাবুর সহিত আলোচনা করিতেছেন। বিলাতে এবার Brailsford, Rothenstien, Robert Bridges প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

২১এ আগষ্ট কবি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া নরওয়ে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন লর্ড সিংহ ; এই সময়ে অস্‌লো (Oslo)-তে একদিন নরওয়ের রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ; ওরিএণ্টেল-একাডেমিতে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহাতে রাজা উপস্থিত ছিলেন। নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় এবং Nansen, Bjornson, Bojer প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয়।

স্টকহলম (সুইডেনে) Sven Hedin ও সুইডিশ একাডেমির সদস্যরা কবিকে বিশেষভাবে সম্মান দেখান। স্টকহলম হইতে তাঁহারা কোপেনহাগেন যান ; সেখানে পাব্‌লিক সভায় তাঁহার আদর আপ্যায়ন হয় ; দার্শনিক হেফ্‌ডিং (Hoffding) ও সাহিত্যিক ব্রান্দেস্‌ (G. Brandes) এর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

স্কান্দিনাভিয়ার তিনটি দেশে প্রায় একপক্ষ কাল কাটাইয়া কবি সদলে জারমেনিতে আসেন। ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯২৬) হামবুর্গে তাঁহার বক্তৃতা হয় 'Culture and Progress'।

পরদিন বার্লিনে আসিয়া Der Kaiser Hof হোটেলে উঠেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর কবি বার্লিনের সর্ববৃহৎ হল Philoharmonicএ 'ভারতীয়দের দর্শন' বিষয় বক্তৃতা করেন। সমস্ত টিকিট পূর্ব হইতে বিক্রয় হইয়া যায়; কিন্তু এবার গতবারের ন্যায় জনতার উৎসাহ ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রী, Dr. Becker ও দার্শনিক Einsteinএর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও সেইদিন হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে।

পরদিন জারমেনির প্রেসিডেন্ট Von Hindenburgএর সহিত কবি সাক্ষাৎ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা তাঁহাদের মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা হয়—বিশেষ ভাবে সংস্কৃতি (culture) সম্বন্ধে কথাবার্তা চলে। সাময়িক কাগজে বলে যে এমন দুই বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ইতিপূর্বে এমন সমান সমান ভাবে কখনো দেখা সাক্ষাৎ করেন নাই।

কুর্ট উল্ফ কবির প্রকাশক। তাঁহার বাড়িতে কবির যে সম্বর্ধনা হয়, তাহাতে বেভেরিয়া রাজকুমার ও বহু অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এবার সাধারণ লোকের মধ্যে পূর্বের ন্যায় মত্ত উৎসাহ দেখা যাইতেছে না; তবে জারমেন কাগজগুলি কবি সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেছিল। জারমেনিতে এই উচ্ছ্বসিত আদর অভ্যর্থনা সম্বন্ধে ইংরেজি কাগজওয়ালারা একটু টিপ্পনি করে। তাঁরা বলেন যে ভারতীয় মনীষীদের প্রতি সম্ভ্রম দেখাইয়া তাহারা জারমেনির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে ও ইহার দ্বারা ভারতে জারমেন বাণিজ্যের সুবিধা হইবে। (Daily Telegraph, London 16 Sep. 1926)। এ দেশেও ইংরেজদের কাগজ Madras Mail লিখিলেন কিছুদিন পূর্বে ইতালি রবীন্দ্রনাথকে তাহাদের স্বার্থের জন্য ব্যবহারের চেষ্টায় ছিল; এখন জারমেনির, পালা। কিন্তু ইহারা জারমেনির প্রতি কোনো অভিসন্ধি আরোপ করেন নাই। তাহারা বলেন যে রবীন্দ্রনাথের বই জারমেনিতে খুবই লোকে পড়ে, বিক্রয়ও খুব। "They figure among the best sellers." Madras Mail, 18 Sep. 1926।

১৫ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ বার্লিন ত্যাগ করেন। এবার তাঁহার বক্তৃতার তেমন সমাদর হয় নাই। কাগজে পত্রে তাঁহার ভাষা, তাঁহার বলিবার ভঙ্গী সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির হয়; কিন্তু তিনি যে-কথা বলিতে চাহিতেছেন সে

সম্বন্ধে লোকের উৎসাহ বড়ই মন্দ। ছয় বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে জারমেনিতে আসিয়াছিলেন, এখন সে জারমেনি নাই। দেশ তখন যুদ্ধের পরাজয়ে অপমানিত, ক্লান্ত; রবীন্দ্রনাথের দর্শন, গান্ধীজির অহিংসা তত্ত্ব,বুদ্ধের বাণী তাহাদের রণশ্রান্ত মনকে নূতন পন্থা নির্দেশ করিয়াছিল। কিন্তু গত ছয় বৎসরে জারমেনি আবার উঠিয়াছে, য়ুরোপের সর্বত্রই রণকামী দল প্রবল হইয়াছে। জারমেনির মধ্যে সেই দল প্রবল হইতেছে বলিয়া প্রাচ্যের শান্তির বাণী শুনিয়া তারিফ করিবার মতো মনোভাব তাহাদের নষ্ট হইয়া আসিতেছে। (The Hindu, Madras 14 Oct. 1926)

বার্লিন হইতে কবি জারমেনীর নানা সহরে বক্তৃতা করেন, ড্রেসডেন, কোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিছুকাল হইতে রথীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন; এবার তিনি য়ুরোপে আসিয়া পিতার সহিত ঘুরিতে পারেন নাই। কবির সহিত ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ও তাঁহার পত্নী রাণী দেবী। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী বার্লিনে চিকিৎসার জন্য ছিলেন; কবি বার্লিন ত্যাগ করিলে রথীন্দ্রনাথ অস্ত্রোপচার করিবার জন্য হাসপাতালে যান; তিনি প্রতিমা দেবীকেও পিতার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। অস্ত্রোপচার কঠিনই ছিল; তিনি তাঁহার উইল করিয়া, দুর্ঘটনা ঘটিলে কি টেলিগ্রাম কোথায় কোথায় করিতে হইবে তাহা করিয়া বালিশের তলায় রাখিয়া দিয়াছিলেন। যাই হোক অস্ত্রোপচার ভালয় ভালয় হইয়া গেল। কবি খবর পাইয়া বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন (২৬ সেপ)।

বার্লিনে এক পক্ষকাল থাকিয়া রথীন্দ্রনাথকে সুস্থ দেখিয়া তিনি চেকোস্লোভোকিয়া যাত্রা করেন। প্রাগে পৌঁছান ১০ই অক্টোবর। সেখানে দিন পাঁচ থাকেন ও কয়েকটি বক্তৃতা করেন; বক্তৃতার বিষয় ছিল Art Forms ও Civilization and Progress। সেখানে একদিন নূতন জারমেন থিএটরে Bachএর Aria শুনিতে যান; সেদিন Zemlinskyর কতকগুলি গান হয়, উহার ভাষা রবীন্দ্রনাথের।

প্রাগ্ হইতে বিয়েনায় যান ১৬ই ও সেইদিনই বক্তৃতা করেন। এত ঘোরাঘুরি করিয়া এখানে আসিয়া কবির শরীর খারাপ হইয়া পড়ে; কিন্তু তখন তিনি তত গ্রাহ্য করেন নাই। এই সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় য়ুরোপ ভ্রমণ করিতে

ছিলেন, এখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। বিয়েনায় Lisa von Pott নামে একজন শিল্পী ও ভাস্কর মহিলা কবিকে তাঁহার চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সাহায্য করিবার জন্য আসেন। এই মহিলা ভারতবর্ষে আসিয়া শান্তিনিকেতনে কিছুকাল বাস করেন।

বিয়েনা বাসকালে (২৩এ অক্টোবর ১৯২৬) তিনি 'বনবাণী' কাব্যের প্রথমে যে কবিতাটি আছে, সেটি লেখেন। এত কাজে কর্মে ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার ভিতরের মনটি কিসের জন্য ব্যাকুল এই ভূমিকাটি পাঠ করিলেই বোঝা যাইবে।

শরীরের অবস্থা ঠিক না বুঝিয়া কবি ঘোরাঘুরি বন্ধ করিলেন না; বুড়াপেষ্ট আসেন ২৬এ অক্টোবর। এখানে বক্তৃতা দেন; কিন্তু তারপর শরীর এমনি খারাপ হইল যে ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁহাকে সকল কাজকর্ম বন্ধ করিয়া হাঙ্গারির বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস Balaton হ্রদের তীরে গিয়া বাস করিতে হইল। হাঙ্গারি বাসকালে তাঁহার সহিত Admiral Horthyর দেখা হয়। হাঙ্গারির বিখ্যাত কবি Sandor Kisfalndyর (১৯ শতাব্দীর) মর্মরমূর্তির নিকট বাঙলার কবি একটি বৃক্ষরোপণ করিয়াছিলেন; আর একদিন বিখ্যাত সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক Maurice Jokaiর স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান করেন।

Balatonএ বসিয়া কবি 'লেখনে'র লেখাগুলি কপি করেন, ভূমিকায় লিখিতেছেন (২১ কার্তিক ১৩৩৩) "এই লেখনগুলি সুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। সেথায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্য লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তারপর স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি ক'রে এই টুক্‌রো লেখাগুলি জমে উঠ্‌ল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে কেন, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও ধরা পড়ে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয়—সে অবস্থায় এইসব লেখা বাতি-নেবা চীন লণ্ঠনের মতো হাল্কা ও ব্যর্থ হতে পারে। তাই জর্মনিতে হাতের অক্ষর ছাপাবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখনগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল। অন্যমনস্কতায় কাটাকুটি ভুলচুক ঘটেছে। সেসব ত্রুটিতেও ব্যক্তিগত পরিচয়েরই

আভাস রয়ে গেল।” ‘লেখন’ বইখানি দুষ্প্রাপ্য। ইহার পুনর্মুদ্রণ বিশেষ প্রয়োজন।

এইবার কবি আসিয়া পড়িলেন বলকান দেশে। ১৫ই নভেম্বর পৌঁছাইলেন বেলগ্রেডে। য়ুনিভার্সিটিতে দুইদিন বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বহুদিন আগেই টিকিট সব বিক্রয় হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিন লোকে বাহিরের দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢোকে কবির কথা শুনিবার জন্য। কবি বলিয়াছিলেন যে এরূপ উৎসাহ তিনি এবার কোথায়ও দেখেন নাই। তাঁহার ইংরেজি বক্তৃতা অক্সফোর্ডের একজন সার্বিয়ান্ গ্রাজুয়েট অনুবাদ করিয়া দেন।

এই সময়ে অনেক কাগজে প্রকাশিত হয় যে কবি ২৮এ নভেম্বর Warsaw গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে; কবি সেখানে যাওয়া নানাকারণে স্থগিত করেন এবং পোল্যাণ্ডে পরেও কখনো যান নাই।

যুগোস্লাভিয়া হইতে কবি গেলেন বুলগেরিয়া। কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একদল বুলগেরিয়ান্ সাহিত্যিক রাজ্যের সীমান্তে গিয়াছিলেন। সোফিয়া আসিলে বিপুল জনতা তাঁহাকে সমাদর করিল। হোটেলের সম্মুখেও বহু সহস্র লোক সমবেত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে থাকে। সেখানে একদিন বক্তৃতা করেন ও তাঁহার বাঙলা বই হইতে কিছু আবৃত্তি করেন। বুলগেরিয়ার ভাষায় কবির প্রায় অনেকগুলি বই অনূদিত হইয়াছে; ‘সাধনা’ অল্প কিছুকাল পূর্বে M. Stavrev অনুবাদ করিয়াছিলেন, বুলগেরিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক Nicolai Rainov ইহার মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।

সোফিয়া ত্যাগ করিবার পূর্বে রাজা Borisএর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

বুলগেরিয়া হইতে কবি চলিলেন রুমেনিয়া। সেখানেও বিজয়যাত্রা। ২১এ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ রুমেনিয়ার রাজা ফার্ডিনাণ্ড্ ও তাঁহার পরিবারের সকলের সহিত মধ্যাহ্নভোজন করিলেন। বাহিরেও তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনার অন্ত ছিল না। বুখারেষ্টে দিন পাঁচ থাকিয়া ২৫এ নভেম্বর গ্রীসে উপস্থিত হইলেন।

এথেন্সের সাহিত্যিক মণ্ডলী কবিকে পাইয়া খুবই প্রীত হন; গবর্মেণ্ট তাঁহাকে Commander of the order of the Redeemer উপাধি

দান করেন। প্রাচীন গ্রীসের ঐশ্বর্যসমূহ কবি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ; তিনি আর্টিষ্ট, গ্রীক আর্ট সাধনার গুণগ্রাহী।

দেশে আসিবার জন্য কবির মন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাই আর তুর্কি, পালিস্থান যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া তিনি এথেন্স ত্যাগ করিয়া মিশর যাত্রা করিলেন ; ২৭এ নভেম্বর আলেকজেণ্ড্রিয়া পৌঁছিলেন ও ১লা ডিসেম্বর কাইরো আসেন।

মিশর ভ্রমণ সম্বন্ধে কবির নিজের একখানি পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উঠাইয়া দিতেছি। "আলেকজান্দ্রিয়ার থেকে খবরের ধারার মধ্যে এসে পড়েচি। যাঁরা আমার ইজিপ্টের পালা জমাবার ভার নিয়েছিলেন তাঁরা ইটালিয়ান, নাম সোয়ারেস, ধনী ব্যাঙ্কার। আমাকে তাদের যে বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন সে অতি সুন্দর * * সমস্ত দিন নিস্তব্ধ নির্জন অবকাশের অভাব ছিল না। যেদিন সকালে পৌঁছলুম, তার পরদিন সায়াহ্নে বক্তৃতা * * *। পরদিন কৈরোর পালা। ঘণ্টা চারেক গেল রেলগাড়িতে। এবার হোটেল। * * বৈকালে সেখানকার সর্বোত্তম আরবী কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। কবির নিমন্ত্রণ ছাড়া * * সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের দল উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটায় পার্লামেণ্ট বসাবার সময়। আমার খাতিরে একঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হ'লো এমন ব্যবস্থা-বিপর্যয় আর কখনো আর কারো জন্যে হ'তে পারতো না। * * ওখানে কবালুন ও বেহালা যন্ত্রযোগে আরবী গান শোনা গেল—বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে আরব পারস্যের রাগরাগিণীর লেন্ দেন্ এক সময় খুবই চল্‌ছিলো।

পরদিন ম্যুজিয়ম দেখতে গিয়েছিলেম * * এই সব কীর্তি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরে মানুষ সাড়ে তিন হাঁত কিন্তু ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।"

এখানকার রাজার সঙ্গে দেখা হোলো। তিনি বিশ্বভারতীর জন্য আরবী গ্রন্থ উপহার দিলেন। (দ্রঃ পত্র. বহি নং ১ পৃঃ ১৩—১৪)।

মিশরে Miss Pott নামে সেই অষ্ট্রিয়ান্ মহিলাটি আসিয়া জুটিলেন। কাইরো থেকে ফিরিয়া সুয়েজে আসিয়া কবি ভারতীয় ডাক পাইলেন ও সন্তোষ মজুমদারের মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন ৭ঠা ডিসেম্বর (১৯২৬)। কবির মনে খুব লাগিয়াছে ; কয়েকখানি পত্রে এই কথা পর পর লিখিতেছেন।

"মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যে এত কঠিন তা'র কারণ অন্যের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমি আছি, অথচ আর যে একজন আমার সঙ্গে এমন একান্ত মিলিত ছিল সে একেবারেই নেই এমন বিরুদ্ধ কথা ঠিকমত মনে করাই শক্ত। আমরা নিজেকে অনেকখানি পাই অন্যের মধ্যে। সন্তোষ সেই তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার মধ্যে যা কিছু সত্য ও শ্রদ্ধেয় জিনিষ ছিল তা'র প্রতি এমন অকৃত্রিম ও সুগভীর শ্রদ্ধা সন্তোষের মতো এমন খুব কম লোকেরই দেখেচি। * * তার মধ্যে যে অকৃত্রিম সৌজন্য ও মহত্ব ছিল, যে-সরল নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা তাকে নিয়ত সাধনার পথে প্রবৃত্ত রেখেছিলো তা'র মূল্য অনেকেই বুঝতো না। * * তা'র অনেক অসম্পূর্ণতা সত্বেও আমি তাঁকে এত গভীর স্নেহ ক'র্‌তে পেরেছিলুম।"

ভারতবর্ষের যতই নিকটে আসিতেছেন, দেশের নানা কথা, শান্তিনিকেতনের বিচিত্র ইতিহাসের কথা স্পষ্ট করিয়া মনে হইতেছে। কলোম্বো পৌছাইবার আগের দিন কবি লিখিতেছেন, "দূরের থেকে শান্তিনিকেতন আমার কাছে কতখানি, কাছের থেকে ঠিক ততখানি না হ'তেও পারে—কিন্তু তার থেকে কী প্রমাণ হয়? দূরের দৃষ্টিতে যে-সমগ্রতা আমরা এক ক'রে দেখ্‌তে পাই সেইটাই বড়ো দেখা, কাছের দৃষ্টিতে যে খুঁটিনাটিতে মন আবদ্ধ হ'য়ে সমষ্টিকে স্পষ্ট দেখ্‌তে দেয় না, সেইটেই আমাদের শক্তির অসম্পূর্ণতা। * * শান্তিনিকেতনের আকাশ ও অবকাশে পরিবেষ্টিত আমাদের যে জীবন তা'র মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণ রূপ আছে, যা কলকাতার সূত্রচ্ছিন্ন জীবনে নেই। * * শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের উপর আমি নিজেকে কী রকম ক'রে প্রকাশ ক'রেচি সেইটের দ্বারাই প্রমাণ হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কী—মাঝে মাঝে কী রকম নালিশ করেচি, ছট্‌ফট্‌ ক'রেচি তা'র দ্বারা নয়। শুধু আমি নই, শান্তিনিকেতনে অনেকে আপন আপন সাধ্যমত একটি সুসঙ্গতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েচে। * * আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা বা কর্মপ্রণালীর দ্বারা কাউকে অত্যন্ত আঁট ক'রে বাঁধিনে—তাতে ক'রে কোনো অসুবিধে হয় না তা বলিনে—আমি নিজেই তার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েচি কিন্তু তবু আমি এইটে নিয়ে গৌরব করি। * * স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা

এটি আমার একটি সৃষ্টি—আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব। আমি যখন বিদায় নেবো যখন থাক্‌বে সংসদ পরিষদ ও নিয়মাবলী তখন এ জিনিষটিও থাক্‌বে না। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করে একদিন একে বাঁচিয়ে রেখেচি কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ তারা এ'কে বিশ্বাস করেন না। এর পরে ইস্কুল-মাষ্টারের ঝাঁক নিয়ে তা'রা অতি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে, শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শালবীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌বে। তখন তাদের নালিস কি কোনো কবির কাছে পৌঁছবে ?"

৩০। নটীর পূজা ও নটরাজ

প্রায় সাত মাস য়ুরোপে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, গৌরবাবু, ১৯এ ডিসেম্বর ১৯২৬ (৩রা পৌষ, ১৩৩৩) শান্তিনিকেতন ফিরিয়া আসেন; উৎসবের আয়োজনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে আশ্রমের সকলেই বিশেষ আনন্দলাভ করেন; উৎসবের পূর্বে ফিরিবার জন্য কবিরও মন ব্যস্ত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের দেশে ফিরিবার দেড়মাস পূর্বে ৩রা নভেম্বর ১৯২৬ কলিকাতায় আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথ পথে পান। সন্তোষচন্দ্র তাঁহার আযৌবন বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের পুত্র। শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি বালককে লইয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন সন্তোষচন্দ্র তাহাদের অন্যতম। এদেশের শিক্ষার পর তিনি ও রথীন্দ্রনাথ একত্র আমেরিকায় যান ও কৃষিবিদ্যায় উপাধি লইয়া ফিরিয়া আসেন। সে সময়ে তিনি অনায়াসে সরকারী চাকুরী পাইতে পারিতেন, কিন্তু সে

সব ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন; এবং সতের বৎসর একই বেতনে শেষ পর্যন্ত সেবা করেন। তাঁহার মৃত্যুতে শান্তিনিকেতনের বিশেষ ক্ষতি হয়; রবীন্দ্রনাথও এবার ফিরিয়া আসিয়া উৎসবের কাজেকর্মে সন্তোষচন্দ্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিলেন।

দেশের মধ্যেও নানা অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গৌহাটিতে কংগ্রেসের সময়ে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে একজন মুসলমান গুলি করিয়া মারে। স্বামীজি তখন অসুস্থ অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিলেন; একজন মুসলমান যুবক তাঁহার সহিত জরুরী কাজ আছে এই অছিলাতে ঘরে প্রবেশ করে ও তাঁহাকে হত্যা করে। কিছুকাল হইতে হিন্দুমুসলমান অসদ্ভাব সর্বত্রই তীব্রভাবে দেখা দিতেছিল। যে দিল্লীনগরীতে ১৯২১ সালে হিন্দুমুসলমান সমবেত হইয়া জুমা মস্‌জিদে সমবেত হয় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করেন, সেই দিল্লীতে পাঁচ বৎসর পরে মুসলমানের হস্তে তিনি নিহত হইলেন।

এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে বিরোধের বিষ তীব্রতর হইল। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে; বিদেশ হইতে কয়েকদিন পূর্বে ফিরিয়াছেন। তিনি এই ঘটনায় বিশেষভাবে আহত হন; শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন ও চতুষ্পার্শ্বের বহুলোক সেদিন আশ্রমে উপস্থিত হন; রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় স্বামীজি সম্বন্ধে বলেন (১০ই পৌষ ১৩৩৪)। প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩ পৃঃ ৫৪১—৫৪৩) হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই ভেদবুদ্ধি যে জাগিয়াছে ইহার জন্য হিন্দু দায়ী কিনা ভাবা প্রয়োজন। মুসলমানসমাজ ঈশ্বরের নামে ডাক দিলে সমস্ত মুসলমান সাড়া দেয়, সমবেত হয়; আর আজ আমরা যখন ডাক্‌ব হিন্দু এস, তখন কে আসবে? রবীন্দ্রনাথ বলেন "যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ ক'রে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে, আমরা প'ড়ে প'ড়ে মার খাই—তবে জান্‌ব এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। * * " দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে—কেউ বাধা দিতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান বিরোধের গোড়ার কথায় গিয়া দেশবাসীকে শান্ত হইতে বলিলেন।

মাঘোৎসবের সময় কবি কলিকাতায় গিয়াছেন; উৎসবের পর এবার 'নটীর পূজা'র অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। পাঠকের স্মরণ আছে কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনে এই নাটিকাটির অভিনয় হয়। এইবার হইল কলিকাতায়।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভিক্ষু উপালীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কন্যা শ্রীমতী গৌরী নটীর ভূমিকায় নামেন। তাঁহার নৃত্য ও অভিনয় সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্রিকা সমূহ এত প্রশংসা করিয়াছিলেন যে বোধহয় এরূপ বাংলা সমসাময়িক সাহিত্যে কখনো হয় নাই। গৌরী নৃত্যকলায় নূতন ছন্দ ও ভঙ্গী আনেন; বাংলাদেশের নৃত্যকলায় তাঁহার বিশেষ স্থান আছে। আনন্দবাজার লিখিয়াছিলেন, "প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের সঙ্গীতগুলি শ্রোতৃবৃন্দকে কবির ভাবরাজ্যের মাধুর্যরসে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীমতীর ভাবাভিব্যক্তির সহিত সঙ্গীত অনুপম। * * সংযত ভক্তির শুভ্র শুচিতা অভিনয়টিকে এমন মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিল যে অনেকেই ভাবাশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।" (২৪ জানুয়ারী ১৯২৭)।

এদিকে দেশের মধ্যে অশান্তি ও ধর্ষণনীতি যুগপৎ চলিতেছে। দেশের শিক্ষিত সমাজের আশা আকাঙ্খা কোনো দিকে মূর্তিগ্রহণ করিতে পারিতেছে না; বাঙলার যুবকরা নিরাশার চরম সীমায় উপনীত হইয়া ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিতেছে। গবর্মেণ্টও তাহাদের বেদনার উপর অপমানের বোঝা চাপাইয়া কঠোর মূর্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

অনেক ক্ষেত্রেই Ordinance এর সাহায্যে যুবকদিগকে আটকানো হইতেছে, অথবা কোনো বিচারালয়ের সমক্ষে তাহাদের অপরাধ প্রমাণ করা হইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথ গবর্মেণ্টের এই নীতির প্রতিবাদ করিয়া একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করেন; নিম্নে আমরা সেখানি উদ্ধৃত করিলাম।

According to the teaching of our modern law-givers we refuse to believe that our countrymen who are being punished without trial are guilty of any crime. Taking short-cuts in law is like setting the whole house on fire

in order to roast one's pig,—it is the primitive form of despotism. That we are amazed at such instances happening to us, is the best compliment that can be paid to the British administration in India. For we know that even in the West there are governments which in their attempt to enforce loyalty have no scruple in blindly applying the hasty method of punishment that has no restriction of law. The mind of the rulers whose misfortune is to govern a people that are physically helpless, is daily being sucked into the depths of demoralisation. For want of adequate resistance they are too often tempted to simplify the problem of administration by breaking through the barriers of their own law, thus not only doing injustice to their subjects, but much more so to themselves. As they have partially paralysed their own courts of justice, which represent their conscience, we have no other recourse but to appeal to the higher nature of the British people, and to remind them that civilisation takes infinite trouble to prove itself, to keep the lamp of its best ideals from being extinguished,—and that is why it is more afraid of the innocent being punished than of the chance escape of the guilty.

We cannot claim the sympathy of kinship from our ruling race, while on the other hand, we only make our impotence ludicrous when we insinuate retaliation—our only claim is the claim of humanity which if refused comes secretly to hurt those who ignore it. (3 Feb. 1927)

কবির মন কেবল ভাবরাজ্যে ঘোরে একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা তাঁহাকে ভুল বোঝেন। কবি তিনি নিশ্চয়ই, তবে দেশের সুখ দুঃখ, বেদনার সঙ্গে তাঁহার যোগ নাই, একথা যথার্থ নহে।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখন বাঙলার অনেক গ্রন্থ সরকার রাজনৈতিক কারণ দর্শাইয়া বাজেয়াপ্ত করিতেছেন। বই বাজেয়াপ্ত হইলে লেখকের ক্ষতি হয়—একথা সত্য। অনেক সময়ে লেখককে শাস্তি ভোগও করিতে হইতেছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত খুবই স্পষ্ট; তিনি বলেন লেখকরা উত্তেজক গ্রন্থ লিখিবেন অথচ তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে আশাও করিবেন যে ইংরেজ সরকার তাঁহাদের শাস্তি দিবে না, এরূপ মনোভাব স্বাস্থ্যকর নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হইতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হনীয় মনে করেন তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু চুপ করিয়া না থাকার যে বিপদ আছে সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করিবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ-রাজকে আমরা নিন্দা করিব সেটাতে পৌরুষ নাই। * * নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাইতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র—তাহাতে ইংরেজ রাজ্যের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নিজের প্রতি নয়। * * * সকল দেশেই শাস্তিকে স্বীকার করিয়াই কলম চালাইতে হইতেছে; যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটিয়াছে সেখানে এমনিই ঘটিয়াছে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকিতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহে জানিয়াই ঘটিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ বার বার দেশের কর্মীদের বলিয়াছেন শক্তিকে আঘাত করিলে তার প্রতিঘাত সহিবার জন্যে প্রস্তুত থাকিতে হইবে,—এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য,—আঘাতের গুরুত্ব লইয়া বিলাপ করিলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করিয়া দেওয়া হয়।

বসন্তের আগমনে কবির মনকে কাব্যলক্ষ্মী জাগাইয়া তুলিয়াছেন। নূতন কাব্যরচনায় তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন; এই কাব্য গানে, কবিতায় একটি অপরূপ সৃষ্টি হইতেছে। কিছুকাল হইতে কবি তাঁহার গানকে নৃত্যের রূপে দেখিতেছেন, যাহা ছিল শ্রুতির বিষয় তাহা এখন হইয়াছে শ্রুতি ও দৃষ্টির গোচর। গানকে মূর্তি দিয়া তিনি যে নৃত্যের ছন্দ আনিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে নব নব কবিকল্পনায় উদ্বোধিত করিতেছে। তাই তাঁহার কাছে নট বা নটী তাহাদের হীন রূপ ত্যাগ করিয়া মহীয়ান হইয়াছে, নটীর পূজায় আত্মবিসর্জন হইতেছে, নটরাজ মনকে নূতন প্রেরণা দিতেছে।

দোল পূর্ণিমার দিনে ১৩৩৩, ৪ঠা ফাল্গুন (১৮ মার্চ) 'নটরাজ' নামে রবীন্দ্রনাথের নূতন গীতিগুচ্ছ অভিনীত হইল। এই সময়ে কলিকাতা হইতে 'বিচিত্রা' নামে একখানি উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা প্রকাশের কথা হইতেছিল। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ইহার উদ্যোগ। পরে অমলবাবুর সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি উহার সংস্রব ছাড়িয়া দেন। রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই নূতন পত্রিকা টানে। 'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যা ১৩৩৪, আষাঢ় মাসে বাহির হয়। বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ নটরাজের পাণ্ডুলিপি তাঁহাদের হাতে দিয়া দেন। প্রথম সংখ্যা বিচিত্রা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন পত্রিকার কর্মকর্তারা বেশ পয়সা খরচ করিয়া কাগজখানি ছাপাইয়া ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' নামে কবিতাটি ইহাতে দেন। (পরিশেষ দ্রষ্টব্য)। 'নটরাজ' কাব্যকে চিত্রভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু।*

'নটরাজ' প্রকাশিত হইলে বিচিত্র সমালোচনা হইয়াছিল ; কেহ তাঁহার রচনার মধ্যে দুর্বলতার, বার্দ্ধক্যের চিহ্ন দেখিলেন ; কেহ ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তবে সঙ্গীত অভিনয় ও কাব্যের ভিতর দিয়া এমন জমাট্ বাঁধা কোনো রচনা ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই ; সমস্তটা মিলিয়া একটা বিরাটের ছাপ মনোমধ্যে দিয়া যায়। কবি তাঁহার ভূমিকায় যাহা সংক্ষেপে লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠকের অজ্ঞাত নহে।

১৩৩৩, ফাল্গুন, চৈত্র রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কোনার্কে আছেন। মাঝে মাঝে কবিতা লিখিতেছেন (বনবাণী, পরিশেষ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বহুকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন স্থির হইয়া আরাম পাইতেছেন না ; কোথায়ও বাহির হইবার জন্য ইচ্ছা আছে। সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষায় আছেন। সে সুবিধা আসিল।

* পরে কলিকাতায় অভিনয় করিবার জন্য ইহাকে অনেক অদল বদল করিয়া 'ঋতুরঙ্গ' নামে ছাপানো হয় (১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)। আরও পরে শোধন ও পরিবর্তন করিয়া পুনরায় 'নটরাজ' নামে 'বনবাণী' গ্রন্থের অন্তর্গত করা হয় (আশ্বিন, ১৩৩৮)।

৩১। ভরতপুর হইতে শিলঙ

১৯২৭ সালে জানুয়ারী মাসে ভরতপুর রাজ্যের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর জী ভরতপুর রাজের নিকট হইতে এক পত্র আনেন, সেই পত্রে মহারাজ কবিকে হিন্দীসাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হইয়া তাঁহার রাজধানীতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। প্রথমে ফেব্রুয়ারী মাসে সভা হইবার কথা হয়, পরে মার্চের শেষে হইবে স্থির হয়। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত যাইবেন কি যাইবেন না, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; চৈত্র মাসের গরম পশ্চিম দেশে মোটেই আরামদায়ক নহে। শেষ পর্যন্ত যাওয়া স্থির করিলেন।

১৪ই চৈত্র ১৩৩৩ (২৮ মার্চ ১৯২৭) বোলপুর হইতে রওনা হন। সেইদিন একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "আজ রাত্রে এগোরটার গাড়িতে আমি ভরতপুরে রওনা হচ্চি। * * * বিশ্বভারতীর দাবী দয়ামায়া নেই। অথচ বিশ্বভারতী জিনিষটা যে কোন্ শূন্যে আছে, তা'র চিহ্নও দেখতে পাচ্চিনে। যে-মানুষদের নিয়ে কাজ ক'রছি তাদের নিষ্ঠার মধ্যে নেই—তাদের স্বপ্নের মধ্যেও আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত বিশ্বভারতীর মর্ম কথাটা কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দানা বাঁধবার মতো পদার্থ নয়—এখন ওটা নানা দেশে নানা লোকের হৃদয়ের মধ্যে কাজ ক'রছে।" * * "লোকে যে সহায়তা ক'রছে না তার কারণ এর মধ্যে তা'রা সত্যের মূর্ত্তি দেখতে পাচ্চে না। * * সুতরাং এখন সত্য উপলব্ধির আনন্দ আমাদের কাছ থেকে দূরে, অথচ তার উপকরণের দীনতা প্রতিদিনই আমাদের পীড়ন করছে। দুঃখের ভার প্রায় একলা আমারই মাথায়।

"মানুষকে সমভাবে নিকটে টানবার শক্তি আমার নেই কারণ আমি একেবারে অন্তরের দিক থেকে একঘরে। যারা আমার কাজে আসতেও পারতো, তা'রা আমাকে পেলে আসতো—কিন্তু আমার নিজের একটা সামাজিকতার অভাববশতই তারা আমাকে পায় না—শুধু কাজটা পায়। সেটা বিশুদ্ধ বোঝা হ'য়ে ওঠে। তার থেকে সকলেই একে একে পালিয়ে যায়, শুধু আমারই পালাবার পথ বন্ধ।" (দ্রষ্টব্য—পত্রবই নং ১, পৃঃ ৩৯-৪০)

আগ্রায় ভরতপুর প্রাসাদে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া মোটর যোগে ভরতপুর রওনা হন; সেখানে সভাক্ষেত্রের নিকটে একটি বাড়ীতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। সেই গোলমালের মধ্যে তাঁহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এ কথা শুনিতে পাইয়া মহারাজ স্বয়ং আসিয়া কবিকে তাঁহার প্রাসাদে লইয়া গেলেন। ভরতপুরে কবি পাঁচদিন ছিলেন। এইখানে শান্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তিনি 'নীলমণিলতা' নামে কবিতাটি লেখেন (বনবাণী, পৃঃ ১৩)।

হিন্দীসাহিত্য সম্মেলন একটি বিরাট ব্যাপার; বহু সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায় বলেন যে হিন্দীভাষাকে লোকে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। রাষ্ট্রীয় ভাষা কেবল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তায় হয় না, সাহিত্যের দিক হইতে তাহাকে তাহার উপযোগিতা দেখাইতে হয়। ইংরেজি ভাষা যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে সে তাহার বাণিজ্য বিস্তার ও রাজ্য জয়ের জন্য নহে, সে-ভাষায় কবি, সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব দাবী কেবল সাহিত্যের দাবী পূরণ করিয়া মিটানো যায়।

ভরতপুর হইতে ফিরিয়া আগ্রায় আওয়াগড় মহারাজার বাড়ীতে দুইদিন থাকেন। সকাল হইতে অনবরত অতিথির ভিড় হয়; বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য—আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষ Canon Davies, রাধাসোয়ামী কলেজের অধ্যক্ষ নারায়ণ দাস। বৈকালে বাঙালীরা কবির সম্বর্ধনা করেন, সেখানে তিনি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কিছু বলেন। পরদিন (৩ এপ্রিল) প্রাতে তাজমহল দেখিতে যান; কিন্তু সিংহদ্বার হইতেই ফিরিলেন, তাঁহার শরীর খারাপ বোধ করিতে থাকে। বৈকালে রাজপুত স্কুলের Prize বিতরণ সভায় কবি সভাপতি হন। আগ্রার বিশিষ্ট সমস্ত লোক সেদিন আসিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ এখানে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

সেইদিন রাত্রে তিনি জয়পুর যাত্রা করেন। ভোররাত্রে জয়পুর পৌঁছাইয়া সুবোধ মজুমদারের বাসায় ওঠেন। প্রাতে জয়পুরের কাউন্সিলের কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন—লোকের ভিড় খুব বেশি না হলেও ছিল।

জয়পুর হইতে ফিরিবার পথে আমাদাবাদে নামেন; সেখানে কয়েকদিন

আম্বালাল সারাভাই-এর বাড়ীতে থাকেন। সহরের বিচিত্র অনুষ্ঠানে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করে। গুজরাতী সাহিত্য সভা বিশেষভাবে তাঁহাকে একদিন সম্মান প্রদর্শন করেন। ভরতপুর হইতে বিশ্বভারতীর জন্য কোনো অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নাই; কবি ৭ই এপ্রিল আমাদাবাদ হইতে লিখিতেছেন "শূন্য ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে বেরিয়েছি—শূন্য অবস্থাতেই ফিরতে হবে।" অর্থের জন্য এই ভিক্ষাবৃত্তি যখন ব্যর্থতা আনে তখন কবি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে এক রকম করিয়া ভাবেন, সে-ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। তিনি লিখিতেছেন, "আমার নিজের যেটা যথার্থ কাজ সে হচ্ছে কাব্যকে প্রকাশ দান করার কাজ। সেই কাজ যখন বিপুল হয়ে ওঠে বিষয় কাজকে নিজের সহায় করতে চায়, তখনই দুই নৌকোয় পা দিয়ে বিপদে পড়ি। আমার উচিত ছিল আমার কাজের আনুষ্ঠানিক কাঠামোকে এত বড় করে না তোলা।"

এইখানে কবির হাতে Thompson এর Life of Rabindranath বইখানি হাতে পড়ে ও অবসর কালে পড়েন। একখানি পত্রে কবি এই বই সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। টমসনের বাঙলা ভাষার জ্ঞান যে খুব গভীর নয় তা কবি বুঝিয়াছেন অনুবাদের অবস্থা দেখিয়া। মানুষ ভুল করিতে পারে, কিন্তু যেটা কবিকে আঘাত দিয়াছে সেটা এই যে "এমন উদ্ধত নিঃসংশয়তার সঙ্গে তিনি আমার রচনা সম্বন্ধে রায় দিয়েছেন যেন বাংলা ভাষায় তাঁর দৃষ্টির কোনো বাধা নেই। * * ইংরেজ লেখক যখন আমাদের বিচার করেন তখন অধিকাংশ সময়ে তাঁদের অগোচরেও এ কথাটা মনে থেকে যায় যে অবিচারে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এই বইয়ে Thompson অনেক জায়গাতে খুব flippant এবং dogmatic ভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেচেন—যাতে তাঁর অন্তর্নিহিত ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েচে। * * অথচ মোটের উপর তিনি যে আমাকে নিন্দা করেচেন তা নয়, কি যে ভাবে ভালো ছেলেকে ইস্কুল মাষ্টার উৎসাহ দিয়ে থাকেন কতকটা সেই সুরে। * * যেখানে তিনি আমার ইংরেজি লেখা নিয়ে আলোচনা করেচেন সেখানে তাঁর অবজ্ঞা আমি স্বীকার করে নিতে পারি * * কিন্তু যেখানে ভাষা বাংলা সেখানে তিনি যদি তোলেন যে এ ভাষা আমার, এ ভাষার অনেকখানি আমার নিজের হাতে

গড়া তাহলে বুঝব তার একমাত্র কারণ তিনি ইংরেজ, আমি বাঙালী। তাঁর সমসাময়িক কোনো ফরাশী বড় লেখকের সম্বন্ধে তাঁর বিচারে ও ভাষায় তিনি এর চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও সংযত হতেন। * * * টমসন তাঁর নিজের এংলোইণ্ডিয়ান্ সংস্কারের কুহেলিকা থেকে দূরে থেকে যদি লিখ্‌তেন তাহলে আমাকে ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন এই একটা অবজ্ঞা ও মুরুব্বিয়ানা মিশ্রিত স্বাদ ওর মধ্যে থাক্‌ত না। * * একদিকে আমাদের ভাষায় তাঁর নিতান্তই অগভীর অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অবজ্ঞা এই দুইএর মিশালে তাঁর বই এমন অস্পষ্ট এবং ভঙ্গী এমন উদ্ধত হয়েচে।" (পত্র-বই নং ২ পৃঃ ১০-১১)।

কয়েকদিন পরে রোদেনষ্টাইনকে যে একখানি পত্র লেখেন তাহাতেও টমসনের বই সম্বন্ধে উপরের কথাগুলিই লেখেন।

আম্বালালের বাড়ীতে কবির বিশেষ যত্ন হয়। সেখান হইতে ৯ই এপ্রিল রওনা হইয়া ১১ই এপ্রিল (২৮ চৈত্র ১৩৩৩) বোলপুর পৌছান। এবার তাঁহার সহিত এই গ্রন্থের লেখক ছিলেন।

আশ্রমে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসবাদি করিলেন। কবির মন এখন আছে কবিতার মধ্যে, ফাল্গুন হইতে মাঝে মাঝে কবিতা লিখিতেছেন; 'পরিশেষ' ও 'বনবাণী' দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন।

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কলিকাতায় গেলেন। কলিকাতা থাকিবার সময় চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের গুরু শ্রীমতিলাল রায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের আশ্রমের মন্দির প্রতিষ্টার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ১৩৩৪, বৈশাখ ২১এ (1927 May 4) প্রাতে তিনি প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রার্থনা মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তরে প্রোথিত করেন। অপরাহ্নে চন্দননগরের দানবীর শ্রীহরিহর শেঠ প্রতিষ্ঠিত 'কৃষ্ণভামিনী' বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে যান।

ফরাশী Administrator তাঁহাকে বৈকালে চা-এ নিমন্ত্রণ করেন; সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে প্রবর্তক প্রদর্শনীতে উপস্থিত হন; শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের অনুরোধে কবি প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার পর একটি সুন্দর অভিভাষণে সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্ম সম্বন্ধে বলেন।

প্রবর্তকের কার্য হইয়া গেলে তিনি 'নিত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে' যান। নাগরিকদের তরফ হইতে মেয়র নারায়ণচন্দ্র দে তাঁহাকে অভিনন্দন দেন। সভান্তে মেয়র রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর জন্য হাজার টাকা দান করেন। (New Empire, Calcutta 6 May 1927 ও অন্যান্য সাময়িক পত্র দ্রষ্টব্য)।

চন্দননগর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলং যান; এবার আহমাদাবাদের ধনী আম্বালাল সারাভাই শিলং যান; রবীন্দ্রনাথের জন্য তিনি তাঁহার বাসার নিকটে একটি বাসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এবার শান্তিনিকেতনের দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাহাঙ্গীর বকিল ও লেখক সপরিবারে শিলং গিয়াছিলেন।

শিলঙে কোনো Public function হয় নাই। কবি আপন মনে বসিয়া এক নূতন উপন্যাস লিখিতে সুরু করেন; ইহার নাম দেন 'তিন পুরুষ'; পরে ইহার নাম হয় 'যোগাযোগ'।

উপন্যাসখানি লেখা ছাড়া গান রচনা করিতেছিলেন; একদিন মাত্র খাশিয়াদের নৃত্য দেখিতে গিয়াছিলেন; আম্বালালদের বাড়ী ছাড়া বাহিরে কোথাও বড় বাহির হইতেন না; ময়ূরভঞ্জের রাণী ছিলেন, সামাজিকভাবে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতেও যান। এ ছাড়া তাঁহাকে বেশি বাহির যাইতে দেখি নাই।

৩২। পূর্বদ্বীপালি ভ্রমণ

গত য়ুরোপ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্ট ওলন্দাজ ও জাভানীরা জাভাদ্বীপে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়াও বৃটীশ মালয় হইতে তিনি আমন্ত্রণলিপি পাইতেছিলেন। মন বাহিরে যাইবার জন্য সর্বদাই চঞ্চল; বৃহৎ জগৎ ও বিচিত্র মানবের সম্বন্ধসুখ তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করে, তাহাতে তিনি আনন্দ পান। জাভা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি

দ্বীপে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্তি দেখিবার জন্য ও পূর্বদ্বীপালির সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠযোগ স্থাপনের জন্য তিনি বহুকাল হইতে কল্পনা করিতেছিলেন। কবির ঐসব দেশে যাইবার ইচ্ছা আছে জানিতে পারিয়া কলিকাতার দানবীর যুগলকিশোর বিড়লা দশহাজার টাকা ও নারায়ণদাস বিজোরিয়া একহাজার টাকা এই উদ্দেশ্যের জন্য দান করেন। শ্রীযুক্ত বিড়লা ইতিপূর্বে চীন ভ্রমণ-কালেও দশহাজার টাকা দিয়াছিলেন। এছাড়াও তিনি শান্তিনিকেতন শ্রীভবনের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দেন এবং তাঁহারই নামানুসারে ঐ গৃহের নাম 'বিড়লা সদন' হইয়াছে।

যাত্রার পুর্বে কলিকাতাস্থ 'বৃহত্তর ভারত পরিষদ্' (Greater India Society) কবির বিদায়-উপলক্ষে সম্বর্ধনা করেন। কবি তদুপলক্ষে একটি ভাষণ দান করেন ; তাহাতে তিনি বলেন, "আজ একটা আকাঙ্খা আমাদের মধ্যে জেগেচে, যে-আকাঙ্খা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো ক'রে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্খাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেচে। সেই আকাঙ্খাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করেচে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।" (প্রবাসী ১৩৩৪ শ্রাবণ পৃঃ ৫৮৩)।

কবির সঙ্গে এবার অনেকে গিয়াছিলেন ; শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক মিঃ আরিয়াম, কলাভবনের সহকারী-অধ্যক্ষ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, শান্তিনিকেতন কলাভবনের তৎকালীন অন্যতম অধ্যাপক ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মিঃ ও মিসেস্ বাকে (Bake) নামে ওলন্দাজ দম্পতি ; ইঁহারা শান্তিনিকেতনে বাংলাগান শিক্ষা করিতেছিলেন। বাকে কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যাত্রা করেন।

কবি সদলে ১২ই জুলাই ১৯২৭, (২৭ আষাঢ়, ১৩৩৪) কলিকাতা হইতে মাদ্রাস মেলে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে লিখিত (১৬ই, ১৭ই আষাঢ়) দুটি কবিতা আছে—নাম 'মুক্তি' (পরিশেষ পৃঃ ২৫-২৬)। কবিতা দুটির মধ্যে যাত্রার জন্য উদ্বেগ ও সঙ্গে সঙ্গে একটি মঙ্গলময় শক্তির উপর নির্ভরের আভাস পাই। মাদ্রাস হইতে Amboise ষ্টীমারে সিঙাপুর রওনা হইলেন। ষ্টীমারে বসিয়া কবি আপন মনে পত্র লিখিতেছেন। পত্রগুলিই পরে 'যাত্রী' নামে প্রকাশিত হয়।

২০এ জুলাই জাহাজ সিঙাপুরে পৌছিয়াছে। পথে তিনি 'আহ্বান' নামে কবিতাটি লিখিলেন (পরিশেষ পৃঃ ২৭)। এই কবিতার মধ্যে কবির বাহিরের তোলাপাড়া ওঠানামার কোনো সন্ধান পাই না; কবিতার সুরটি আপনার গূঢ় অন্তঃস্থল হইতে উঠিতেছে।

সিঙাপুরের ঘাটে হিন্দুসভা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। স্ট্রেট্‌স সেটেলমেণ্টের চীনা অধিবাসীরা তাঁহাকে একদিন একসভায় অভিনন্দিত করিল। সেই সভায় তিনি চীনের সহিত ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক যোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলেন ও বিশ্বভারতী কিভাবে এই যোগসূত্র পুনর্গঠিত করিতেছে, তাহার কথা বলেন।

পরদিন (২২এ) Victoria Theatreএ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হয়; লাট সাহেব Sir Hugh Cliford সভায় কবিকে পরিচিত করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Unity of Man। পরে তিনি মানবের ধর্ম নামে যে বক্তৃতাধারা দেন, ইহা তাহারই ভূমিকা বলিতে পারি। তিনি এই বক্তৃতায় একস্থানে বলিয়াছিলেন;

"In order to know man one had to know men. Even the most primitive of all people had to be known before one could know oneself. They had to have their connection with the great world culture,' for if they ignored it they are doomed." (V.-B. Q. 1927 Oct. p. 278).

এই কথা তিনি জীবনে বিশ্বাস করেন বলিয়া তিনি জগতকে দেখিয়া ফিরিয়াছেন। মানুষকে দেখিয়াছেন—তাই মানবের যথার্থ ধর্ম কি সে-সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছেন।

সিঙাপুর যথার্থ আন্তর্জাতিক বন্দর। এইখানেই ভারতের বিচিত্র জাতির মিলনক্ষেত্র। ভারতবাসীরা তাঁহার যে সম্বর্ধনা করিয়াছিল, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। মিঃ নামাজির গৃহে (২৩ জুলাই) সকল ধর্ম সকল জাতির ভারতীয়রা সমবেত হইয়া তাঁহাকে মানপত্র দান করেন। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর গৌরবের স্থল, একথা প্রত্যেক ভারতীয় বিদেশে গিয়া বুঝিতে পারেন; সেই কথা তাঁহারা মানপত্রে স্পষ্ট করিয়া বলেন, You have

substantially raised the status of your countrymen in the comity of nations.

সিঙাপুরের চীনাবাসিন্দার সংখ্যা বহু; সেখানে অনেকগুলি চীনা স্কুলও আছে। সেইসব স্কুলের নিমন্ত্রণে (২৪এ) সমবেত চীনা শিক্ষকমণ্ডলীর সম্মুখে এক বক্তৃতায় তিনি চীনের সহিত ভারতের প্রাচীন যোগের কথা বলেন ও ১৯২৪ সালে চীনদেশ ভ্রমণের কথা উত্থাপন করেন। চীন ও ভারতের মধ্যে পুনরায় সেই যোগসূত্র যাহাতে স্থাপিত হয়, সেইজন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিতেছেন; ভারতের সহিত সে-সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে আত্মিক, কোনো প্রকার আর্থিক স্বার্থবোধ প্রণোদিত নহে।

ভারতীয়দের সভায় তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতাটি পূর্ব্বাহ্নে তিনি হিন্দীতে লিখাইয়া রাখেন; তাঁহার নিজ শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করায় তিনি সুনীতি-বাবুর উপর বক্তৃতাটি পাঠ করিবার ভার দেন। বক্তৃতান্তে তামিল ভাষায় বক্তৃতাটি পঠিত হয়। এই বক্তৃতায় বিশ্বভারতীর কাজ ও তাহার প্রয়োজন ব্যাখ্যাত হয় এবং তিনি বাহির হইতে যে সহায়তা লাভ করিয়াছেন তাহাও বলেন।

কবি ২৭ জুলাই পর্যন্ত সিঙাপুর থাকেন; এ কয়দিন বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া অভ্যাগতদের সহিত কথাবার্তা, পার্টিতে যোগদান প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহাকে খুবই ব্যস্ত থাকিতে হয়। এখান হইতে ষ্টীমারে করিয়া মালাক্কায় যান।

মালাক্কার বন্দরে কবির বিরাট অভ্যর্থনা হইল; Mr. Chung Kung Sui নামে এক ধনী চীনার বাড়ীতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। বৈকালে পার্টি, পার্টির পর পাব্লিক বক্তৃতা। এইখান থেকে লিখিত একখানি পত্র 'যাত্রী'র মধ্যে আছে (৩০এ জুলাই)। "এখনি দুশো মাইল দূরে এক জায়গায় যেতে হবে।" চলিয়াছেন কুয়ালামপুরে মালাক্কার প্রধান সহরে। কুয়ালাম-পুরের টাউনহলে ৩১এ জুলাই বৈকালে কবির সম্বর্ধনা হইল; চীনা, মাদ্রাস, ইংরেজ, মলয়বাসী প্রভৃতি সকল জাতির লোক উপস্থিত হইয়া কবিকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

মালাক্কায় বক্তৃতার শেষ নাই; কুয়ালামপুর, সেরেম্বান, সেলাঙগর, ক্লাঙ, কুয়ালা কাঙসার, তাইপিঙ, দিনের পর দিন, একের পর এক বক্তৃতা

চলিতেছে ; নানা লোকের সহিত অনর্গল বকিতে হইতেছে ; একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। দিনের মধ্যে দু তিন রকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় বক্তৃতা, নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। গীতার উপদেশ যদি মানতুম, ফললাভের প্রত্যাশা যদি না থাক্‌তো তা হ'লে পাল-তোলা নৌকার মতো জীবন তরণী তীর থেকে তীরান্তরে নেচে নেচে যেতে পারতো। চলেছি উজান বেয়ে, গুণ টেনে, লগি ঠেলে, দাঁড় বেয়ে পদে পদে জিভ বেরিয়ে পড়ছে। আমৃত্যু-কাল কোনোদিন কোথাও যে সহজে ভ্রমণ ক'রতে পারবো সে আশা বিড়ম্বনা। * * পথে-বিপথে যেখানে সেখানে আচম্‌কা আমাকে বক্তৃতা ক'রতে বলে, আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ব'কে যাই— * * হাসিও পায় দুঃখও ধরে। পৃথিবীর পনেরো-আনা লোক কবিকে নিয়ে সর্বসমক্ষে এই রকম অপদস্থ ক'রতেই ভালোবাসে, 'বলে মেসেজ্‌ দাও।' মেসেজ্‌ বল্‌তে কী বুঝায় সেটা ভেবে দেখো। সর্বসাধারণ নামক নির্বিশেষ পদার্থের উদাসীন কানের কাছে অত্যন্ত নির্বিশেষ ভাবের উপদেশ দেওয়া, যা কোনো বাস্তব মানুষের কোনো বাস্তব কাজেই লাগে না।" (যাত্রী, পৃঃ ১০৯)।

মালাক্কার পালা শেষ করিয়া ১৩ই আগষ্ট টাইপিঙ হইতে পেনাঙ যাত্রা করিলেন। সেখানেও অভ্যর্থনা ও বক্তৃতার শেষ নাই। পেনাঙ খুব বড় সহর ও বন্দর ; সুতরাং নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁহাকে যোগদান করিতে হইতেছে। পাব্‌লিক বক্তৃতায় তিনি 'জাতীয়ত্ব' সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন ; এই বক্তৃতায় তিনি বিশ্বভারতীতে যেভাবে উহার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন তাহা বলেন।

এইবার তাঁহারা চলিলেন ইংরেজ রাজ্য ছাড়িয়া ডাচ্‌দের রাজ্যের দিকে। পিনাঙ থেকে Kuala জাহাজে করিয়া তাঁহারা প্রথমে পৌঁছিলেন সুমাত্রাদ্বীপে। সঙ্গে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুরেন কর, ধীরেন বর্মা। সুমাত্রার (Belawan) বেলাওয়ান বন্দরে জাহাজ বদলির জন্য নামিতে হয়। বেলা-ওয়ান ক্ষুদ্র বন্দর। মেদান (Medan Deli) কয়েক মাইল ভিতরে, এখানকার বড় শহর। কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা Medanএর হোটেলে উঠিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার দিকে তাঁহাদের পুনরায় জাহাজে উঠিতে হইল।

২১এ আগষ্ট জাভার বন্দর বাতাবিয়া পৌঁছাইলেন। বালিদ্বীপ যাত্রার পূর্বে

তিনদিন সেখানকার হোটেলে তাঁহাদিগকে থাকিতে হয়, অভ্যর্থনায় ত্রুটি হয় নাই। ২২এ বৃটীশ কন্সাল ক্রসবি সাহেব কবিকে লইয়া গেলেন ডচ গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে দেখা করাইতে। বিকালে হোটেলেই কবির সম্বর্ধনা হইল, বহু ভারতীয় বণিক ও ডচ্ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। সন্ধ্যায় কন্সালের বাড়ীতে হয় ভোজ। সেখানে কবি 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' নামে কবিতাটি ইংরেজি তর্জমা পাঠ করেন। ঐ কবিতাটি ২১এ জাভায় আসিয়া রচনা করেন।

"তোমায় আমায় মিল হ'য়েছে কোন্ যুগে এইখানে'
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ প'ড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।"

ইংরেজিতে নাম দেন The Indian Pilgrim to Java.

পরদিন দ্বিপ্রহের "স্থানীয় ভারতীয়েরা কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। বিশ্বভারতীর কথা, আর বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের কোন্ বাণী কবি প্রচার ক'রতে চান আর বিদেশে এসে প্রবাসী ভারতীয়ের দায়িত্ব কি, এইসব বিষয়ে তিনি এদের বললেন। বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তোলবার বন্দোবস্ত এঁরা করলেন। * * এই কাজে (সিন্ধী) শ্রীযুক্ত মেথারাম আর শ্রীযুক্ত নবলরায় রূপচাঁদ অগ্রণী হ'লেন।" (দ্বীপময় ভারত, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী ১৩৩৬ মাঘ, পৃঃ ৫৮৮)।

২৩ আগষ্ট তাঁহারা বালি দ্বীপ যাত্রা করিলেন। পথে পূর্ব-জাভাদ্বীপের সুরাবায়ার বন্দরে নামিতে হয়; বন্দরটি জাভার চিনি রপ্তানীর কেন্দ্র; কবি লিখিতেছেন, "এও একটা আধুনিক শহর। জাভার আঙ্গিক নয়, জাভার আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে শহরটাকে নিউজীলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না।" (যাত্রী পৃঃ ২১৪)।

জাভা হইতে বালি যাবার পথে 'প্লানসিউস' জাহাজে বসিয়া 'যাত্রীর ডায়ারি' লিখিতেছেন। কিন্তু যেটা লিখিলেন সেটা সম্পূর্ণ সাহিত্য বিষয়ক রচনা, নাম দিলেন, 'সাহিত্যে নবত্ব'। জাভা যাত্রার পূর্বে তিনি 'সাহিত্যধর্ম' নামে যে প্রবন্ধটা লিখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া বাঙলা সাময়িক সাহিত্যে যে সমুদ্রমন্থন চলিতেছিল, তাহার সংবাদ কানে মাঝে মাঝে পৌঁছাইতেছে। সেইসব কথা লইয়া এই প্রবন্ধটি লেখেন 'যাত্রীর ডায়ারি'

রূপে ২৩এ আগষ্ট (৬ ভাদ্র), কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ মাসে দেশে ফিরিবার পর (প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্র)।

২৪এ আগষ্ট কবি বালি পৌঁছিলেন ; এখানকার শতকরা ৯৯ জন লোক হিন্দু। লম্বকদ্বীপের দশভাগের একভাগ মাত্র হিন্দু। দ্বীপময় ভারতের "মুসলমানেরা মোটেই গোঁড়া নয় ; যবদ্বীপে হাজী হ'য়ে এলেও ভারতের সাধারণ মুসলমানের মত পিতৃপুরুষের কৃতিত্ব বা সভ্যতাকে অস্বীকার করে না। বরং তা নিয়ে যথেষ্ট গৌরব করে। হিন্দু আচার অনুষ্ঠান যথেষ্ট পালন করে, এখনও মন দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত শোনে, তার পুতুলনাচ আর যাত্রা গান সারা রাত ধ'রে জেগে দেখে, ছেলেমেয়েদের বড়ো বড়ো সংস্কৃত নাম দিয়ে থাকে। অথচ মসজিদেও যায়, নমাজও পড়ে, হজও খুব করে।" (দ্বীপময় ভারত, প্রবাসী ১৩৩৬ পৃঃ ৭৩৪)।

বুলেলেঙ বালিদ্বীপের বন্দর। জেটির ধারেই, সমুদ্রের কিনারায় একটি মন্দির। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "দেখলেম ধরণীর চির যৌবনা মূর্তি। প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে বিস্তীর্ণ ; বনচ্ছায়ার অঙ্কলালিত লোকালয়-গুলিতে স্বচ্ছল অবকাশ। সেই অবকাশ উৎসবে অনুষ্ঠানে নিত্যই পরিপূর্ণ।" (যাত্রী, পৃঃ ২১৫)।

রবীন্দ্রনাথের গম্যস্থান বাঙ্লি গ্রামে এক গণ্ডগ্রামে। সেখানে কোনো এক রাজবংশের কা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বাঙ্লির পথ দীর্ঘ—মোটরে করিয়া কবি সদলে চলিয়াছেন। বালির লোকেরা হিন্দু, ব্রাহ্মণের উপর তাহাদের ভক্তি খুব। সুনীতিবাবু য়ুরোপীয় পোষাক ছাড়িয়া বাঙালীর ধুতি চাদর পাঞ্জাবী পরিলেন। সুনীতিবাবু এই পথের অতি বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ বর্ণনা লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনবদ্য ভাষায় বালির সৌন্দর্যকে বর্ণনা করিয়াছেন কাব্যে ('বালী',প্রবাসী ১৩৩৪, পৌষ)। কবিতাটির অন্য নাম পরে দেন—'সাগরিকা', (মহুয়া পৃঃ ৭০ ৭১)। ২৬এ আগষ্ট বাঙ্লিতে দলশুদ্ধ কবি পৌঁছিলেন। "সেদিন বাঙলিতে যে অনুষ্ঠান হয় সেটা প্রেতাত্মার স্বর্গারোহণ পর্ব।" মৃত্যু হ'য়েছে বহু পূর্বে ; এতদিনে আত্মা দেবসভায় স্থান পেয়েছে ব'লে এই বিশেষ উৎসব। সুখবতী নামক জেলায় উবুদ্ নামক শহরে হবে দাহক্রিয়া। * *

এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এত অসম্ভব রকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তা'র আয়োজনে—যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্মূল্য চালে। এখানে অতীতকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চ'লেছে বহুকাল ধ'রে। বর্তমান কালকে আপন সর্বস্ব দিতে হ'চ্ছে তা'র ব্যয় বহন করবার জন্যে।"

"এখানে এসে বার বার আমার এই কথা মনে হ'য়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হোক্ নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে।" এই ভাবটি হইতে তিনি একটি কবিতা লেখেন (যাত্রী পৃঃ ২২২)—'নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে বল্‌লে আমায় হেসে' ইত্যাদি।

তাঁহারা চলিয়াছেন কারেঙ আসেমে। "সেখানকার রাজা ছিলেন বাঙলির শ্রাদ্ধ উৎসবে। পারিষদসহ বালীর ওলন্দাজ গবর্ণর সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন, সেই ভোজে আমরাও ছিলেম। ভোজ শেষ ক'রে যখন উঠলেম তখন বেলা তিনটে। সকালে সাড়ে ছয়টার সময় জাহাজ থেকে নেমেছি; ঘাটের থেকে মোটরে আড়াই ঘণ্টা ঝাঁকানি ও ধুলো খেয়ে যজ্ঞস্থলে আগমন। এখানে ঘোরাঘুরি দেখাশুনা সেরে বিনা স্নানেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে বসেছি; আহার সেরে আমাদের নিমন্ত্রণ কর্তা রাজার সঙ্গে তাঁর মোটর-গাড়িতে চ'ড়ে আবার সুদীর্ঘপথ ভেঙে চললুম তাঁর প্রাসাদে।" (যাত্রী, পৃঃ ২২৮) বালির দ্বীপের বিস্তৃত বর্ণনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সুনীতিবাবু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 'দ্বীপময় ভারতে' এখানকার কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লেখেন, "সমস্ত বিবরণ বোধহয় সুনীতি কোনো-এক সময়ে লিখবেন। কেননা সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ।" রবীন্দ্রনাথ নিজেও বালি-দ্বীপের কথা অনেক লিখিয়াছেন।

কারেঙ-আসেমের রাজবাড়ীতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন। রাজা কবির আনন্দবর্ধনের জন্য বালির নাচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বালির ও জাভার নৃত্যকলা কবি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পরিদর্শন করেন এবং তার ভিতর থেকে অনেক কিছু লাভ করিয়া আসেন। নাচের দ্বারা অভিনয় হইতেছে

বালির নৃত্যের বিশেষত্ব। কবি একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "একএকটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। * * এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায় ফেরায়, যুদ্ধে বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে এমনকি ভাঁড়ামিতে সমস্তটাই নাচ। * * কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গ'ড়ে তোলে। পৌরাণিক যে-আখ্যায়িকা কাব্যে কেবলমাত্র কানে-শোনার বিষয়, এরা সেইটেকেই কেবলমাত্র চোখে দেখার বিষয় ক'রে নিয়েছে। * * এদের নাচের মধ্যে শুধু ছন্দ থাক্‌লে তাতে আখ্যান বর্ণনা চলে না, সঙ্কেতও আছে, এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ ক'রে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গী-সঙ্গীতে।"

বালি ও জাভার নৃত্যকলার মধ্যে যে বাক্যহীন অভিনয় আছে, তাহা পরযুগে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকলার মধ্যে প্রবর্তন করেন। 'শাপমোচন' প্রভৃতি তাহারই চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে নৃত্যকলা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার কতখানি তাঁহার দ্বীপময় ভারতের নৃত্যলীলা সন্দর্শনের ফলে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, তাহা বিশেষজ্ঞদের বিচারের বিষয়।

৩১এ আগষ্ট পর্যন্ত কারেঙ আসেমে থাকেন। শেষদিকটা রাজবাড়ীর উৎসব আয়োজন অত্যন্ত ক্লান্তিকর বোধ করায় 'রাজপুরী থেকে পালিয়ে আম্পুল তীর্থাশ্রমেষু নির্বাসন গ্রহণ' করিলেন। সেখান থেকে যান গিয়ান-যারের রাজবাড়িতে। সুনীতি বাবুরা সঙ্গে আছেন। (যাত্রী পৃঃ ২০০)।

দুই দিন পরে তাঁহারা উবুদ যাত্রা করিলেন। সুনীতিবাবু লিখিতেছেন "গৃহস্বামী পুঙ্গব সুখবতী কবিকে স্বাগত করে নিয়ে বসালেন। রাস্তায় তখন আর ভিড় ধরে না। এখান থেকে কবি বাদুঙে (গিয়ানয়ারে) ফিরিয়া গেলেন। এইখানেই রাজকীয় উৎসব চলিতেছিল। ইহার পর 'মুণ্ডুক (Moendoek) বলে একটি পাহাড়ের উপয় ডাকবাঙলায় আশ্রয়' গ্রহণ করেন। এইখানে বসিয়া মিস্ মেয়ো লিখিত 'Mother India' গ্রন্থের New Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার জবাব লেখেন। এই আমেরিকান মহিলা রবীন্দ্রনাথের মত বলিয়া কতকগুলি অত্যন্ত কুৎসিত কথা লেখেন তাঁহার

বইতে। তাহাই আবার New Statesman উদ্ধৃত করিয়া জগৎ সমক্ষে প্রচার করেন। কবির পত্র 'মানচেষ্টার গার্জেন'-এ প্রকাশিত হয়। এইখান হইতে কবি জাভা আসিলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর বালি হইতে জাহাজ আসিয়া জাভার বন্দর সুরাবায়া (Soerabaja) পৌছিল। সেখানে কবি মঙ্কুনগরো নামে এক সম্ভ্রান্ত যবদ্বীপ-বাসীর অতিথি হন। এইখানে আসিয়া কবি জানিতে পারিলেন যে মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' বইখানির বহুলপ্রচার হল্যাণ্ডেও হইয়াছে এবং তার ঢেউ জাভায় আসিয়া পৌছিয়াছে। বন্ধুদের পরামর্শে কবির লিখিত পত্রখানি স্থানীয় ইংরেজি কাগজে ও ডাচ্ ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করা হইল।

সুরবায়াতে একটি কলা-সভা আছে, তাহাতে কবিকে একদিন আর্ট সম্বন্ধে কিছুতে বলিতে হইল। এখানকার ভারতীয়েরা আর একদিন কবিকে সম্বর্ধনা করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর কবি সদলে শূরকর্তা নামে স্থানে আসিলেন। জাভার সবচেয়ে বড়ো রাজপরিবারের এইখানেই অবস্থান। ওলন্দাজেরা এঁদের রাজপ্রতাপ কেড়ে নিয়েছে কিন্তু প্রতিপত্তি কেড়ে নিতে পারেনি। রাজা ষ্টেশনে গিয়ে কবিকে অভ্যর্থনা ক'রে এনেছিলেন। (যাত্রী পৃঃ ২৬৪) জাভায় কবির দিন কিভাবে কাটে তাহা 'যাত্রী'র পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। তাহার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। একটি জিনিষ বিশেষভাবে এখানেও কবির ভাল লাগিল সেটি এখানকার নৃত্য। তাঁহার জন্য বহু নাচের সভা ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় রাজা যাঁর অতিথি তিনি ছিলেন, তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন।

শূরকর্তা হইতে কবি যোগ্যকর্তায় আসেন; সেখানে "পাকোয়ালাম উপাধিধারী রাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েচি। শূরকর্তার শহরে একটি নূতন সাঁকো ও রাস্তা শেষ হয়েচে, সেই রাস্তা পথিকদের ব্যবহারের জন্যে মুক্ত ক'রে দেবার ভার আমার উপর ছিলো। * * আমার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে।" যোগ্যকর্তায় যবদ্বীপীয় নানাবিধ নাচ দেখিবার সুযোগ পান।

যোগ্যকর্তা হইতে কবি বোরোবুদুরের বিখ্যাত মন্দির দেখিতে যান। সেখানে একরাত্রি কাটাইয়া আসেন। বোরোবুদুরের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করেন। (যাত্রী পৃঃ ২৯৪; পরিশেষ দ্রষ্টব্য)।

সেখান হইতে ২৫এ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ কবি সদলে বান্দুঙ নামে শহরে আসেন। এখানে আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হয়। পরদিন লেম্বাঙ নামে একস্থানে একটি বিদ্যালয়ে কবির নিমন্ত্রণ হয়। এটি থিওজফিষ্টদের বিদ্যালয়। ২৭এ সকলে বাতেবিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। এইবার ফিরিবার পালা। ৩০এ সেপ্টেম্বর তাঁহারা ওলন্দাজভারত ত্যাগ করিয়া শ্যামরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইতিপূর্বে মালয় হইতে শ্রীযুক্ত আরিয়াম ব্যাঙ্ককে গিয়াছিলেন ও সেখানে কবির আসার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে শ্যাম হইতে আরিয়ামের টেলিগ্রাম আসে ও সেই দেশ হইতে নিমন্ত্রণ আসে।

বাতাবিয়া হইতে ছোট জাহাজ S. S. Mijerএ রবীন্দ্রনাথ সিঙ্গাপুর পৌঁছাইলেন। তাঁহার পথের সাথীর মধ্যে সুনীতিবাবু একদিন পরে জাভা ত্যাগ করিয়া ৬ অক্টোবর কবিকে আসিয়া সেখানে ধরেন। সেইদিন তাঁহারা 'কিস্তা' নামে জাহাজে করিয়া পেনাঙ যাত্রা করিলেন। এই 'কিস্তা' জাহাজে বসিয়া তিনি 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে জানাইয়া দেন যে 'তিনি পুরুষ' নামে যে উপন্যাসের কয়েকটি সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম হইবে 'যোগাযোগ'।

৫ই অক্টোবর ১৯২৭ প্রাতে কবির জাহাজ পেনাঙ বন্দরে পৌঁছাইল। সেখান হইতে দূরে Tanjong Bungali নামক শহরতলিতে কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয়। পরদিন বিজয়াদশমী খুব ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দিনটি কাটিয়া গেল।

পেনাঙ একটা দ্বীপ; সেখান থেকে বৃষ্টির মধ্যে স্বল্পপরিসর সমুদ্র শাখা পার হইয়া অপর পারে ওয়েলেস্‌লি শহরের রেলে গিয়া উঠিলেন। সিয়াম্‌ রাজকীয় রেল সুরু এখানে। ৮ই কবি ব্যাঙ্ককে পৌঁছাইলেন; সেখানে ভারতীয়দের অতিথি হন। Phiathai নামে সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া দেন।

সিয়ামে প্রবেশের পর মুহূর্ত হইতে নানা অনুষ্ঠানে কবিকে যোগদানের জন্য আহ্বান আসিতে লাগিল। শিক্ষাসচিব প্রিন্স Dhaniর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন; সেই দিনই Rajbopitr (রাজপবিত্র) মন্দিরের প্রধান ধর্মগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরদিন কবি সমর সচিব

কুমার নগরস্বর্গর সঙ্গে দেখা করেন; পথে স্বর্গীয় মহারাজ চূড়ালঙ্কারের মূর্তিকে দেশের রীতিঅনুসারে মাল্যাদি দান করিয়া তিনি তুষিত প্রাসাদে যান। সেখানে চূড়ালঙ্কারের পত্নী নগরস্বর্গর জননী, মহারাণী সুকুমার মারশ্রী অগ্ররাজ দেবীর শবাধারে কবিকে মাল্যদান করিতে হয়। কবি অর্ঘ্যর সহিত এই প্রস্তাবটি লিখিয়া দান করেন

পুণ্যচরিতায়াঃ মহারাজাধিরাজ শ্রীচূড়ালঙ্করণ দেব মহিষ্যাঃ অগ্ররাজ দেব্যা পুণ্যলোকবাসিন্যা শ্রীসূক্ষ্মমাল্যশ্রিয়ঃ শ্রদ্ধোপায়নম্ মাল্যময়ম্ অর্ঘ্যমেতাৎ অর্পিতম্ কবিনা ভারতবর্ষাদাগতেন শ্রীরবীন্দ্রেন। বুদ্ধাব্দাঃ ২৪৭০ আশ্বিন পৌর্ণমাস্যাম্।

সেদিন কবি Prince Damnong Rajanubhavaএর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার বিখ্যাত আর্ট সংগ্রহ দেখেন। ১৬ই অক্টোবর Prince of Chantabunএর সহিত দেখা করেন; ইনি সিয়ামের অক্ষরে পালি ত্রিপিটক প্রকাশ করিয়াছেন; বিশ্বভারতীর জন্য তিনি সেই অমূল্য গ্রন্থরাজি পাঠাইয়াছেন। সেইদিন কবি 'সিয়াম' সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। পরদিন বজ্রায়ুধ স্কুলে কবির নিমন্ত্রণ হয়; সেখানে শ্রেষ্ঠ-আসন, ধর্মাসন—তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই দিনই চূড়ালঙ্করণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা হয়। ১৩ই কবির সহিত রাজা ও রাণীর সাক্ষাৎ হয়। কবি 'সিয়াম' সম্বন্ধে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কিংখাপে লিখিয়া উপহার দেন। পরদিন ম্যুজিয়মে বক্তৃতা হয়; সেখানে অভূতপূর্ব ভিড় হয়।

ইহার পরদিন কবি সিয়াম্ ত্যাগ করেন। পথে সিয়াম্ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কবিতাটি লেখেন (দ্রঃ পরিশেষ পৃঃ ১৫৫—১৫৯)।*

দেশে আসিবার পথে কবি অনেকগুলি কবিতা এবার রচনা করেন। অক্টোবরের শেষদিকে কবি দেশে ফিরিলেন। এবার বিদেশে মাত্র সাড়ে তিন মাস ছিলেন।

* শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিয়াম সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা কোথায়ও প্রকাশ করেন নাই; তিনি অনুগ্রহ করিয়া নিজের দিনপঞ্জী হইতে লেখককে তথ্যগুলি দিয়াছেন।

৩৩। যোগাযোগ ও শেষের কবিতা

মালয়যাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ধর্ম * নামে একটি প্রবন্ধ 'বিচিত্রা'য় (শ্রাবণ ১৩৩৪) প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বালির পথে 'সাহিত্যে নবত্ব' শীর্ষক আর একটি রচনা লেখেন তাহার কথা বলিয়াছি।

এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে রস ও নীতি লইয়া বেশ একটু আলোচনা চলিতেছিল। তরুণ লেখকগণ সাহিত্যে এমনসব বিষয়ের অবতারণা করিতেছিলেন, যাহা সাহিত্যের বস্তু হইতে পারে কিনা—সে-বিষয়ে মতভেদ হইতেছিল। এ বিষয়ে তখনকার 'শনিবারের চিঠি' তরুণ লেখকগণকে নানাভাবে ধীকৃত করিতেন। এই লইয়া তরুণদের মধ্যে বেশ একটু উষ্মা চলিতেছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য ধর্ম' লিখিয়া মালয় ভ্রমণে চলিয়া যান। এদিকে সাহিত্যিক মহলে সেই প্রবন্ধের সমালোচনা সুরু হয়; অন্যদের কথা বাদ দিই। প্রধান সমালোচনা হইয়াছিল নরেশচন্দ্র সেন ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখনী হইতে।

নরেশচন্দ্র বেশ তীব্রভাবেই কবির মতকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন; তিনি রবীন্দ্রনাথের উক্ত রচনার মধ্যে যুক্তিতর্ক কিছু দেখিতে পান নাই, উহাকে তিনি 'রসরচনা' বলিয়া অভিহিত করেন। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেন যে সাহিত্যসৃষ্টি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৃষ্টি; নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু মানুষের মনে মনে রসসৃষ্টি করে না। এ কথার প্রতিবাদ উভয়েই করেন। তারপর সাহিত্যের 'বে-আব্রুতা' বা যৌনসম্বন্ধ যে বিদেশী ভাবের আমদানী সম্বন্ধে তাঁহার মতের সুতীব্র আলোচনা হয়।

* রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যধর্ম (বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ পৃঃ ১৭১-১৭৫)। নরেশচন্দ্র, 'সাহিত্যধর্ম'র সীমানা (বিচিত্রা ভাদ্র পৃঃ ৩৮২-৯০)। দ্বিজেন্দ্র বাগচি, 'সাহিত্যধর্মর সীমানা' বিচার (বিচিত্রা আশ্বিন পৃঃ ৫৮৭-৬০৬)। নরেশচন্দ্র, সাহিত্যধর্ম সীমানা বিচার-এর উত্তর (বিচিত্রা অগ্রহায়ণ পৃঃ ৮৯২-৯৫)। শরৎচন্দ্র, সাহিত্যের রীতিনীতি (বঙ্গবাণী ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৪ আশ্বিন পৃঃ ২৩৭-২৪৬)।

শরৎচন্দ্র বলেন যে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল বাঙলা সাহিত্যের সংবাদ খুব কম রাখেন তাঁহার সময় অল্প, তা ছাড়া বিদেশে তাঁহার অনেক সময় কাটে ; তরুণ লেখকদের রচনা দুই চারিখানি কখনো পড়েন কখনো পড়েন না ; অনেক সময়ে অন্যের মুখের কথা শুনিয়া তিনি মত পোষণ করেন ও এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল এইরূপ ইঙ্গিতও তিনি করেন।

যাই হোক কলহের শেষ এইখানেই হইল না। নরেশচন্দ্রের সঙ্গে বেশ খানিকটা তীব্র রকমের আলোচনা হয়। অনুরোধে উপরোধে পড়িয়া বা oblige করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ে এমনসব কাজ করেন বা মত প্রকাশ করেন যার জন্য তাঁহাকে বহুবার দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে। বহু বৎসর আগে তিনি নরেশচন্দ্রের কোনো রচনা ভাল বলিয়াছিলেন, সে কথা তিনি হয়ত' ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; প্রসঙ্গক্রমে কাহাকে তিনি বলেন যে সে-পত্র তিনি নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধ পড়িয়া লেখেন, উপন্যাস পড়িয়া নয়। দুঃখের বিষয় ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও আলোচনা অনেক সময়ে কাগজে ছাপা হয় ; সেই কথাটি যাহার সঙ্গে হয় তিনি কাগজে উহা প্রকাশ করেন। এই লইয়া বিবাদ চলে।

মালয় হইতে আসিয়া তিনি চারিদিক হইতে এই কয়মাসের আলোচনার অতিরঞ্জিত বর্ণনা শুনিতে থাকেন ; তাহাতে তাঁহার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয় এবং সেই মনোভাব হইতে নরেশচন্দ্রকে একখানি পত্র দেন তাহার ভাষা তাঁহাকে পুনরায় তিরস্কৃত হইবার সুযোগ দিয়াছিল।

ইহার কারণও ঘটিয়াছিল ; এই সময়ে একদিন 'শনিবারের চিঠি'র দল কবির সহিত দেখা করিতে আসেন। যেমন অন্য সকলে আসে তেমনিভাবেই বাইরের লোকে ভাবিল যে তিনি এই দলে যোগ দিয়াছেন এবং সে-সম্বন্ধে লোকে পত্র লিখিয়া কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করিল। এই ধরণের পত্র পাইয়া কবির মন খুব তিক্ত হইয়া উঠে এবং সেই দুর্বল মুহূর্তে নরেশচন্দ্রকে পত্রখানি লিখিত।*

---

* মালয় থেকে আসিয়া দিলীপকুমারকে একখানি পত্রে কবি লিখিতেছেন, 'সাহিত্যধর্ম' বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। তার কর্মফল চল্‌চে। তার ভোগ ফুরোতে না ফুরোতেই 'সাহিত্যে নবত্ব' ব'লে আরো একটা লেখা হয়েছে।' (১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) [অনামী পৃঃ ৩৪৩]।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি মালয় যাত্রার পূর্বে গ্রীষ্মকালে (১৩৩৪) শিলং বাসকালে কবি 'তিনপুরুষ' নামে এক উপন্যাস সুরু করেন। পূর্ব দ্বীপালি যাত্রার পূর্বে বইখানির লিখিত অংশ 'বিচিত্রা'র জন্য উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া যান। উপেন্দ্রবাবু এই বইখানি ধারাবাহিক তাঁহার মাসিক পত্রে প্রকাশ করিবার জন্য কবিকে তিন সহস্র মুদ্রা দান করেন। আশ্বিন মাস হইতে 'তিন পুরুষ' নামে উপন্যাসখানি 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হইতে থাকে অগ্রহায়ণ মাস হইতে উহার নামান্তর হয়—'যোগাযোগ' সেকথা পূর্বে বলিয়াছি। এই নামান্তরের কারণ ঐ নামে একখানি উপন্যাস আছে বলিয়া তিনি শোনেন।

পূর্ব দ্বীপালি হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৭ অক্টোবর ১৯২৭ (১০ কার্তিক ১৩৩৪) শান্তিনিকেতনে আছেন; ফিরিবার পথে তিনি যে গান ও কবিতার ঝোঁকে ছিলেন, তাহা এখনো রহিয়াছে। এবার আসিয়া যে-'নটরাজ'কে গত দোল পূর্ণিমার (১৩৩৩ ফাল্গুন) সময় লেখেন, তাহার অভিনয় করিবার জন্য লাগিলেন। উহাকে বদলাইয়া কাটিয়া নূতন গান দিয়া অভিনেয় করিয়া তুলিলেন ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া কলিকাতায় ২২এ অগ্রহায়ণ (৮ ডিসেম্বর ১৯২৭) 'ঋতুরঙ্গ' নাম দিয়া ষ্টেজে উপস্থিত করিলেন। সাজে সজ্জায়, গানে আবৃত্তিতে, নৃত্যে ছন্দে ইহা অতুলনীয় হইয়াছিল। বিশেষভাবে লক্ষ্যর বিষয় এই যে, নৃত্য ক্রমশই এসব অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। কিছুকাল হইতে নৃত্যের উপর কবির ঝোঁক পড়িয়াছে; এবং শান্তিনিকেতনে নানাদেশীয় নৃত্যশিল্পী আনাইয়া তিনি বিশেষ করিয়া তাহাদের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন ও কিভাবে নৃত্যকলা নূতন ছন্দরূপে নিজ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতে পারে তাহার গবেষণা করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় প্রতিমাদেবী; ইঁহার সম্বন্ধে বাহিরে বড় কেহ জানে না, কিন্তু শান্তিনিকেতনের নৃত্যকলা যে ভারতে একটি বিশেষ স্থান লইতেছে, তাহা তাঁহারই চেষ্টায়; কারণ তিনি নিজে সুদক্ষ শিল্পী এবং সেই শিল্পীর চোখ দিয়া তিনি এই জিনিষটিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

পৌষ উৎসবের পর কবিকে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় যাইতে হয়; সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে সভাপতিত্ব

করিতে হয় (২১ পৌষ ৫ জানু ১৯২৮)। এই নারীমঙ্গল সমিতি বাঙলার অনেক হিতকর কার্যে লিপ্ত আছে, তাছাড়া শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের অনুরোধেও তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে যান; তাঁহার বিশেষ অনুরোধেই কবি সরোজনলিনী সম্বন্ধে একটি ভূমিকা A Woman of India নামক গ্রন্থের জন্য লিখিয়া দেন (The Hogarth Press, London 1928)।

পরদিনই কবিকে শান্তিনিকেতনে ফিরিতে হয়; কারণ সেইদিন অপরাহ্ণে একটি স্পেশাল্ ট্রেণযোগে Science Congressএর সদস্যগণ শান্তিনিকেতন দেখিতে আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে নানাভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। এই সময়ে একদিন বিখ্যাতা গায়িকা Clara Butt আসিলেন—কবিকে তাঁহার শেষ গান শোনাইবার জন্য তাঁহার আসা; কারণ এইবার তিনি কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথকে য়ুরোপের গুণীরা কি চক্ষে দেখে এটি তারই একটি দৃষ্টান্তমাত্র। *

এই সময়ে শান্তিনিকেতনে প্রাগ্ (চেক্) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেস্‌নী আসিয়াছিলেন। এই লেস্‌নী সাহেব পূর্বে বিনারনিট্‌জের সঙ্গে আসিয়াছিলেন; ইনি কবির 'লিপিকা' খাশ বাংলা হইতে চেক্ ভাষায় অনুবাদ করেন। লেস্‌নী অবৈতনিক অধ্যাপকরূপে কাজ করেন।

---

* Clara Butt তাঁহার আত্মজীবনী 'My Life of Song' গ্রন্থে কবি সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

In India I met three of the most wonderful personalities of that wonderful country, Mrs. Annie Besant, Gandhi, and Sir Rabindranath Tagore. The last named lent me his villa, where he wrote many of those wonderful poem which rank among the great classics of all literature.

I have heard that he sometimes sang and once when he was complimenting me after hearing me sing I said, "But you too are a singer; I should so much like to hear you." He made excuses, deprecating any claim to having a voice, but said at last, "I have had such pleasure from listening to your wonderful voice, that, since you wish it, I will sing to you."

With me alone for an audience, and without accompaniment of any kind, he then sang two or three songs of his own composition. Rarely have I been so moved by any body's singing as by that of the stately and venerable poet; he sang with exquisite feeling, and his voice, though quite untrained, had a natural silvery sweetness. V. B. News 1936 May-Jun p. 85 হইতে উদ্ধৃত।

২৩এ মাঘ (১৩৩৪) শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে কবি একটি বিশেষ ভাষণ দান করেন। পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার প্রাণের কথা তিনি খুবই পরিষ্কার করিয়া বলেন (পল্লীপ্রকৃতি, বিচিত্রা ১৩৩৫, বৈশাখ ৬০৮-১৩)।

বিচিত্র কাজের মাঝে কবির দিন যাইতেছে। একখানি পত্রে লিখিতেছেন :—"আমি কুক্ষণে 'যোগাযোগ' ব'লে একটা গল্প লিখতে বসেছিলেম, কুক্ষণে অক্সফোর্ডের থেকে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেম। গল্প লেখাটায়, বক্তৃতা লেখাটায় আমার ভিতরকার মনিবের তাড়া আছে। সেটা বাইরের কাজ নয়। কিন্তু দিনের পর দিন চ'লে যাচ্ছে কিছুতেই লেখার সময় পাচ্ছিনে। যখন ক্লান্তিতে অভিভূত হ'য়ে থাকি, মন হাজার খুঁটিনাটি কাজের ধাক্কায় উদ্‌ভ্রান্ত তখন এ জগতের লেখা লিখতে বস্‌লে লেখনীর ইজ্জত থাকে না—সে আমার পূরো মন দাবী করে। (৫ই ফাল্গুন ১৩৩৪। দিলীপকুমার রায়, অনামী পৃঃ ৩৪৪)।

ইতিমধ্যে হিবার্ট ট্রাষ্টিরা রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ডে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন ; স্থির হয় আগামী শরৎকালে ইংলণ্ডে যাইয়া বক্তৃতা দিবেন এবং সেইমত প্রবন্ধগুলি লিখিতেও আরম্ভ করেন। মনোলোকে চলিতেছে গল্প, চিত্তলোকে চলিতেছে 'মানবের ধর্ম' সম্বন্ধে ভাবনা, রূপলোকে চলিতেছে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তোৎসবে সুন্দরের আহ্বান। শান্তিনিকেতনে দোল পূর্ণিমার উৎসব রজনীতে শ্রীমতী সাহানা দেবী উপস্থিত ছিলেন ; তিনি 'নটরাজে'র নৃত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। (বিচিত্রা ১৩৩৪ ১ম বর্ষ আশ্বিন পৃঃ ৫৬৫-৬৯)।

কবির স্বধর্ম পালন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না ; বাহিরের বিচিত্র সামাজিক সম্বন্ধ তাঁহাকে কাজে টানে ; সেইটাতেই তাঁর ক্লান্তি আসে। কিন্তু সেগুলি বাদও দিতে পারেন না। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ তাহা অস্বীকার তিনি করিতে পারেন না।

এই সময়ে বাঙলা দেশের উপর দিয়া ছোট একটি ঘটনা লইয়া অত্যন্ত বিসদৃশ সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। সিটি কলেজ ব্রাহ্মসমাজের কলেজ ; কলেজের সংলগ্ন রামমোহন হষ্টেলের ছাত্ররা জোর করিয়া সরস্বতী পূজা করে, ও কর্তৃপক্ষ জোর করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই ব্যাপারটি লইয়া

৩৪। মহুয়া

মাদ্রাস হইতে ঘুরিয়া জুনের শেষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। ১৪ই জুলাই ১৯২৮ (৩০ আষাঢ়, ১৩৩৫) শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গলের উৎসবে কবি উপস্থিত থাকিয়া একটি নূতন অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিলেন। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ হইতেছে বৃক্ষরোপণ। এই সময় হইতে বৃক্ষরোপণ উৎসব বর্ষামঙ্গলের একটি বিশেষ অঙ্গরূপে চলিয়া আসিতেছে। বৃক্ষরোপণ উৎসবের পর সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বলাই' নামে তাঁহার নূতন একটি গল্প পাঠ করেন।

ইহার পরদিন শ্রীনিকেতনে হলচালন উৎসব সম্পন্ন হয়; ইহাও একটি নূতন অনুষ্ঠান। হলচালনা এ দেশে নিন্দনীয়—তাহা শূদ্রদের হস্তে আছে; সেই জিনিষটিকে সুন্দর ও বর্তমান জীবনের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য তিনি এই অনুষ্ঠানটি প্রবর্তন করেন। শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য উপযুক্ত বৈদিক শ্লোকাদির দ্বারা সভায় ইহার সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেন; কবি স্বয়ং হলচালনায় সাহায্য করেন; উৎসব স্থানটি অতিপরিপাটীভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। নন্দলাল বসু এই সময়ে স্কুলে একটি প্রাচীর চিত্র করেন, তাহা আর্টের দিক হইতে যেমন একটি বড় সৃষ্টি, তেমনি একটি অভিনব প্রচেষ্টা।

এই সময়ে অধ্যাপক লেভি জাপান হইতে য়ুরোপে ফিরিবার পথে শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন থাকিয়া যান। লেভি সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া কবি প্রথম এণ্ড্রুজকে চিঠি লেখেন (Letters from Abroad, Ganesan. 21 Aug 1920 p. 130) তাহার অনেকখানি পরে খর্ব হয়, এবং নানা স্বার্থান্বেষী ভ্রমণকারী ও ছাত্রদের জন্য কবির মন অধ্যাপকের উপর বিরূপ হয়। কিন্তু অধ্যাপক যে শান্তিনিকেতনকে সত্যই শ্রদ্ধা করিতেন তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য কবির সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কবি তখন তাঁহার সম্বন্ধে সকল বিরুদ্ধতাই ভুলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক লেভি ১৯২১ সালে প্রথম আসিয়াছিলেন; ১৯২৭ সালে জাপানের সহিত ফ্রান্সের একটি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তিনি সেখানে

যান ও বৌদ্ধধর্মের আলোচনা ও চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান সেখানে স্থাপন করিয়া আসেন। ৩১ অক্টোবর ১৯৩৫ অধ্যাপকের মৃত্যু হয়।

শ্রাবণের শেষদিকে কবি কলিকাতায় যান; ৬ই ভাদ্র ১৩৩৫ ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসবের দিন; একশতাব্দী পূর্বে এই দিনে ৬ই ভাদ্র ১২৩৫ (আগষ্ট ১৮২৮) রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই দিনের স্মরণে এই উৎসব। কবি 'রুদ্রের আহ্বান ও আশীর্বাদ' নামে এক প্রবন্ধ এই দিনে পাঠ করেন (প্রবাসী ১৩৩৫ আশ্বিন) V.-B. Q. 1929 April-July; Modern Review 1928 Sep.)। এই ভাদ্র মাস হইতে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁহার নূতন উপন্যাস 'শেষের কবিতা' প্রকাশ হইতে আরম্ভ করেন।

কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে কবির শরীর খারাপ হওয়ায়, আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু বিশ্রাম মিলিল না। বিশ্বভারতীর অনেকখানি কাজ এখন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; রথীন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপে। এই সময়ে প্রায় প্রতিদিন তিনি অধ্যাপকদের সহিত অধ্যাপনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন; ছাত্রদের সভা ও জলশায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের আনন্দ বর্ধন করেন। পূজার ছুটির পূর্বে অশ্রেমের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা মিলিয়া 'গুরু' অভিনয় করেন; রবীন্দ্রনাথ সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়ে কতকগুলি আদর্শবাদী লোক পৃথিবীতে শান্তির জন্য World League for Peaceএ নামে একটি আন্দোলন করিতেছিলেন এবং তাঁহারা রঁলাকে দিয়া কবির নিকট তাঁহাদের আবেদন পাঠাইয়া দেন। ইহার কেন্দ্র ছিল Genevaতে; তাঁহারা একটি Vellumএ কবির বাণী লিখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন; কবি তাহাতে তাঁহার বাণী লিখিয়া দেন।*

* "In our political ritualism, we still worship the tribal God of our own make and try to appease it with human blood. This fetishism is blindly primitive and angers truth that leads to death dealing conflicts. To many of us it seems that this blood-stained idolatory is a permanent part of human nature. But we know in our past history, there have been things born of dark unreason producing phantoms of fear in our mind and ferocity of suspicion. Within the bounderies of night they also had loomed large and appeared as everlasting. But a great many of them have already vainished, making the social life of a fruitful peace possible in civilised communities.

Letirs, today, by the strength of our own faith prove that the homicidal orgies of cannibalistic polltics are doomed inspite of contradictions that seem overwhelmingly formidable." (3 Sep. 1928).

কিছু কাল হইতে শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থার ভার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লইয়াছেন তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি ; পূজার ছুটির পর ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইল। অধ্যক্ষ প্রেমসুন্দর বসু কর্ম হইতে বিদায় লইয়া য়ুরোপে চলিয়া গেলেন ; তাঁহার স্থানে আসিলেন নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলি। ইনি পূর্বে Y.M.C.Aএর একজন উচ্চ কর্মচারী ছিলেন, দর্শন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বিলাতের Friend Society (যাহাদিগকে সাধরণত বলা হয় Quaker) বিশ্বভারতীর জন্য অধ্যক্ষ নলিন গাঙ্গুলির ব্যয় বহন করিতে রাজি হইলেন। ইতিপূর্বেই আমেরিকায় মেথডিষ্টরা অধ্যাপক Tuckerএর ব্যয় দিতেছিলেন ; সেটি হইয়াছিল Bishop Fisherএর জন্য। কিছুকাল পরে আমেরিকার কোয়েকাররা শ্রীনিকেতনের চিকিৎসা বিভাগের জন্য ডাক্তার (Timbers) টিম্বার্সকে প্রেরণ করেন। এইভাবে খৃষ্টান জগতের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় উদার ধর্মসম্প্রদায়গুলির যে একটি কনফারেন্স হয় (Conference of the International Religious leaders) তাহাতে য়ুনিটেরিয়ান্, কোয়েকার প্রভৃতিরা বিলাত হইতে সভায় যোগদান করিবার জন্য আসেন। রবীন্দ্রনাথ এই কনফারেন্সের সভাপতি হন (১৪ই মাঘ ১৩৩৫ ; ২৭ জানু ১৯২৯। V.-B. Quarterly 1929 Vol VIII)।

খৃষ্টমাস সপ্তাহে কলিকাতায় নিখিল-ভারত লাইব্রেরী সভার এক সম্মেলন হয় ; রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির প্রেসিডেণ্ট হন ; শ্রীমতী বেসান্ত হন সভাপতি। সভার দিন উভয়ের কেহই উপস্থিত হইলেন না ; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণ লিখিয়া পাঠইয়া দিলেন ; বেসান্ত কংগ্রেসের কার্য লইয়া ব্যস্ত বলিয়া আসিতে পারিলেন না। কবির অভিভাষণ পঠিত হইল ও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন সভাপতির কার্য করিলেন। (V.-B. Quarterly 1929, Vol VI. p 454 শিক্ষা, ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

বাহিরের সহিত বিশ্বভারতীর যোগ নানাভাবে সংস্থাপিত হইতেছে। কার্তিক মাসে চীন হইতে সু সী মো নামে এক যুবক আসেন। সু সী মো রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত ছিলেন ; ১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণ কালে এই যুবক-অধ্যাপক কবিকে বিশেষ সহায়তা করেন। যেসব বিদেশী মনীষী কবির

আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন এই তরুণ চীনা সাহিত্যিক। কবি আসিয়া চা-চক্রের নাম দেন 'সু সী মো চা-চক্র'।

বাহির হইতে যেসব অতিথি এই সময়ে আশ্রম দেখিতে আসেন তাঁহাদের মধ্যে বড়লাট লর্ড আরউইন অন্যতম। ইতিপূর্বে কোনো বড়লাট আশ্রমে আসেন নাই; সুতরাং তাঁহার আগমন উপলক্ষে সরকারী পক্ষ হইতে যে বিরাট আয়োজন চলিয়াছিল তাহা আশ্রমের পক্ষে বিশেষ আরামদায়ক হয় নাই। পূর্বে পূর্বে আশ্রমের ভিতরে সুরক্ষার জন্য পুলিসের কোনো প্রকার সহায়তা গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ায় কবি সে-দায়িত্ব এবার গ্রহণ করিতে পারিলেন না; পুলিসই বড়লাটের রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। (১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮)

বাহিরে কাজে কর্মে কবি ব্যস্ত। কাব্য প্রেরণা বহুদিন হইতে নাই। কিছুকাল হইতে অপূর্বকুমার ও প্রশান্তচন্দ্র প্রভৃতিরা কবিকে অনুরোধ করিতেছিলেন যে বিবাহে উপহার দিবার মত কতকগুলি প্রেমের কবিতা তাঁহার কাব্য হইতে বাছাই করিয়া একখানি সুদৃশ্য বই প্রকাশ করিতে হইবে; এবং সেই সঙ্গে কবিকে কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিবার জন্যও তাঁহারা অনুরোধ করেন। ' খুব ভাল কাগজে ছাপা হইবে, ছবি থাকিবে ইত্যাদি অনেক জল্পনা কল্পনা ইঁহাদের মধ্যে চলিতে থাকে; কবি সেসবে যোগদান করিয়া উৎসাহিত হন।

ফরমাইস বা তাগিদ আসিতে লাগিল বাহির হইতে কবিতার জন্য; এই তাগিদের ফলে কবির অন্তর হইতে কবিতার অপরূপ ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইল। পূর্বেও আমরা বহুবার দেখিয়াছি, বাহির হইতে লেখার তাগিদ আসিয়াছে, হয় ত বা অনিচ্ছায় লিখিতে সুরু করিয়াছেন, কিন্তু লিখিতে বসিয়া তিনি কাব্যলোকের অমরাবতীতে উপনীত হইয়া যান, তখন ফরমাইসের কথা আর মনে থাকে না। 'মহুয়া'র ভূমিকায় মুদ্রিত একখানি পত্রে কবি লিখিয়াছেন, "ফরমাস ব্যাপারটা মোটর গাড়ির ষ্টার্টার-এর মতো। চালনাটা সুরু করে দেয়, কিন্তু তারপরে মোটরটা চলে আপন মোটরিয় প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। 'মহুয়া'র কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাসের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে।"

এই পত্রের আর এক স্থানে লিখিতেছেন, "এক একটা সময়ের এক একটা নতুন ঝোঁকের কবিতা। বারো মাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে-ঋতু যায় সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা করে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না এ হোতেই পারে না, কিন্তু যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলের মতো। মনের যে-ঋতুতে 'মহুয়া' লেখা সে আকস্মিক ঋতুই ফরমাসের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক।" মহুয়ার অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ এর শ্রাবণ হইতে পৌষের মধ্যে লিখিত। এমন সময়ে বাহির হইতে ডাক আসিল; পুনরায় বিদেশ যাত্রার পালা; 'মহুয়া'র কবিতায় ছেদ পড়িল। কবি যাত্রা করিলেন কানাডা।

৩৫। কানাডা ভ্রমণ

কানাডার National Council of Education একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান; ভাঙ্কুভারে ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ইহার একটি অধিবেশনে কর্তৃপক্ষ নানাস্থানের নানা প্রতিনিধিদের আহ্বান করেন। তাঁহারা বাঙলার কবিকেও ডাকিলেন। কানাডায় রবীন্দ্রনাথের আহ্বান ইতিপূর্বেও দুই একবার আসিয়াছিল; মার্কিণরাজ্যে যখন গিয়াছিলেন, তখনো তাহারা তাঁহাকে ডাকে; কিন্তু তাঁহার দেশবাসীকে যেখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না সেইদেশে তিনি স্বয়ং গিয়া সম্মান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু এবার আহ্বান আসিলে বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, সকলেই বলিলেন ইহাতে উভয় দেশের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে; তাছাড়া যুদ্ধের পর ও যুদ্ধের পূর্বের মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তনও হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবার চলিল অধ্যাপক Tucker ও অপূর্বকুমার চন্দ।

টাকার সাহেব ছিলেন মিশনারী, মেথডিষ্টরা তাঁহাকে অধ্যাপক রূপে এখানে প্রেরণ করেন। অপূর্বকুমার কবির সেক্রেটারী রূপে চলিলেন।

২৬এ ফেব্রুয়ারী (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বাই যাত্রা করেন; কারণ বোম্বাই হইয়া তিনি কলোম্বো দিয়া পূর্ব দিকে যাত্রা করিবেন।

বোম্বাই-এর পথে ট্রেনে তাঁহার সক্রিয় মন কাজ করিয়া চলিয়াছে। তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহাভারত' খানি লইয়া তাহা আরও সংক্ষিপ্তাকারে কেবল মাত্র গল্পাংশটুকু রাখিয়া সম্পাদনের কথা ভাবিতেছেন ও পেন্সিল দিয়া দাগ দিতেছেন। একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মহাভারতের অতি বিপুলতা থেকে আমি তার যে সারভাগ উদ্ধার করেছি সেটা অতি উত্তম হয়েচে।" ইহা পরে 'কুরু পাণ্ডব' নামে ছাপা হয়। (ক্যানাডার পত্র, প্রবাসী ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ১৭৮)

বোম্বাইতে অম্বলাল সারাভাই কবিকে তাজমহল হোটেলে লইয়া যান। ১লা মার্চ বৈকালে তিনি Morea জাহাজে গিয়া উঠিলেন।

কলোম্বোতে (৪ঠা) দুই একদিন থাকেন; পেনাঙে (৮ই) অল্পক্ষণ ষ্টীমার থামিল। সিঙাপুরে জাহাজ বদল করিতে হইল; সেখানে (৯-১১ই) পুরাতন বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। হঙকঙে পৌঁছাইলেন ১৫ই; সেখানে গভর্ণর তাঁহাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেন ও সিন্ধী বণিকরা তাঁহাকে একটি রৌপ্যকৌটায় কিছু টাকা উপহার দেন। সাঙহাইতে (১৯এ) চীনা কবি ও অধ্যাপক সু-সী-মোর অতিথিরূপে দুই দিন কাটান। এখানে জেনারেল Ching Fan Chenএর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়।

২৬এ মার্চ জাপান আসিলেন; সেখানে নানা প্রতিষ্ঠান কবিকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন; Asahi জাপানের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা, কবি তাহাদের অতিথি হন ও তাহাদের সুবৃহৎ হলে একদিন বক্তৃতা করেন। কিন্তু এ যাত্রায় জাপানে থাকিবার সময় নাই, দুই দিন পরেই তাঁহাকে কানাডা যাত্রা করিতে হইল।

বৃটীশ কলম্বিয়ার প্রধান নগরী ভিক্টোরিয়াতে জাহাজ পৌঁছাইল ৬ই এপ্রিল। রবীন্দ্রনাথ পৌঁছিবামাত্র কানাডার সমস্ত কাগজে পত্রে তাঁহার কথা প্রকাশিত হইল। মিঃ এণ্ড্রুজ তখন মার্কিণ রাজ্যে ছিলেন তিনি আসিয়া কবির সহিত মিলিত হইলেন।

কবি যেদিন কানাডায় পৌঁছাইলেন, সেইদিনই সন্ধ্যায় তাঁহাকে কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা দিতে হইল। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল The Philosophy of Liesure. সভায় গভর্ণর লর্ড উইলিংডন ও তদীয় পত্নী উপস্থিত ছিলেন। এই উইলিংডন পরে ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। ভাঙ্কুভারের একখানি দৈনিকে বলেন কবির এই বক্তৃতা "at once a warning and a rebuke to western materialism. The Poet of India came half way across the world to make this single speech and into it he put the full power of a personality which has caught the imaginations of all nations."

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সমস্ত কাগজেরই সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয় ছিল এই যে মানুষ কর্মপ্রবাহে নিরন্তর শ্রম করিতেছে; উন্নতির জন্য এই চেষ্টা। কিন্তু এই উন্নতি জিনিষটা moral বা immoral কিছুই নয়; উন্নতির ফল সমভাবে জগতে দুঃখ ও সুখ আনিতেছে; প্রকৃতির শক্তিকে প্রকাশ করাই তাহার চরম লক্ষ্য। মানুষ কর্ম করিতেছে, বস্তুপুঞ্জ প্রস্তুত করিয়া চলিতেছে, সংগ্রহ করিবার দিকে তাহার ব্যস্ততার শেষ নাই। কিন্তু পশ্চিমের এই নিরবচ্ছিন্ন কর্মের মধ্যে নাই কেবল বিশ্রাম ও অবসর। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন পাশ্চাত্য আদর্শে Time is money, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না Liesure is wealth। কবির এক সমালোচক বলিলেন যে কবি যাহাই বলুন দুই পুরুষ পূর্বে সাধারণ লোকে যে পরিমাণ বিশ্রাম পাইত, বর্তমান মেশিনের কল্যাণে তাহার আরাম ও বিরাম অনেক বেশি। তাছাড়া কোনো কোনো লোক কবির কথার যতই প্রশংসা করুন, তাঁহারা কখনই ভারতের দারিদ্র্য, দুঃখ ও ব্যাধির সঙ্গে তাঁহাদের অদৃষ্টের বিনিময় করিবেন না। এরূপ অদ্ভুত ধরণের সমালোচনাও হইয়াছিল।

কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিন তিনি The Principles of Literature সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সাময়িক কাগজে লিখিতেছে, বক্তৃতার হল ত' পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বাহিরে লোকে প্রবেশের আশায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল—জনতা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

Vancouver Sun লেখেন, "They paid him the respect

due to intellect, and knew him as the living voice of an East of which the West has little understanding. . . . They saw in him a leader of thought who had the secret gift of the born artist. They found in him an intellectual who yet had the touch of human kindness which somehow linked him with his audience."

১৪ই এপ্রিল কবি তাঁহার বিদায় সম্ভাষণ দেন। এই সভায় উপস্থিত সভ্যরা অধিকাংশই আমেরিকান ও য়ুরোপীয়; এসিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি। তিনি বিদায়সভায় বলিলেন যে এই কন্‌ফারেন্সের কর্মকর্তারা তাঁহাকে সুদূর প্রাচ্য হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

I believe that my hosts did not expect only practical help from me but only a stimulation in the shape of a surprise, a shock of a contrast. In this feast you had your food materials supplied by your co-workers in the hemisphere described as the New World, but evidently you wanted some wine of an exotic flavour from a vintage which is old.

এই বক্তৃতার শেষে তিনি কানাডার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিলেন ; Canada being a young country is full of possibilities that are incalculable. * * Her creative youth is still before her, and the faith needed for building up a new world is still fresh and strong. * * Canada is too young to fall a victim to the malady of disillusionment and scepticism, and she must believe in great ideals in the face of contradiction.

১২ এপ্রিল ভাঙ্কুভারের শিখমন্দিরে কবির নিমন্ত্রণ হয়; বিদেশে এই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারায় তাঁহার খুবই ভাল লাগে; সঙ্গে

এণ্ড্রুস ছিলেন; কবির বক্তৃতাটির একটা চুম্বক তিনি গ্রহণ করেন। (Modern Review 1929 July)।

কানাডা ছাড়িবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুস ও অপূর্বকুমারকে লইয়া মহামহিম গভর্ণর লর্ড উইলিংডন ও তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে তাঁহারা ভাঙ্কুভার হইতে লস্ এঞ্জেলিস্ যাত্রা করেন। কানাডায় সবশুদ্ধ দিন দশ মাত্র ছিলেন।

লস্ এঞ্জেলিস্ মার্কিন রাজ্যের প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের একটি বন্দর। রবীন্দ্রনাথ মার্কিনরাজ্যে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া হার্ভাড, কলাম্বিয়া, ওয়াশিংটন, কালিফোর্ণিয়া ও ডেট্রয়েট বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ প্রেরণ করেন। ১৮ই এপ্রিল তাঁহারা লস্ এঞ্জেলিসে পৌছান; ১৯এ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাও দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মার্কিন রাজ্যে ঘুরিবার সমস্ত প্ল্যান বদলাইয়া গেল।

কবির পাস্‌পোর্টখানি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না, সেই কারণে লস্ এঞ্জেলিসে তাঁহার নূতন করিয়া পাস্‌পোর্ট সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইল। এণ্ড্রুস তাঁহাকে লইয়া পাস্‌পোর্ট অপিসে যান; সেখানে বহুক্ষণ তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে হয় ও পরে অপিসে উপস্থিত হইলে, তিনি লেখাপড়া জানেন কিনা, তাঁহার টাকা আছে কিনা, তিনি কতদিনের জন্য যাইবেন, ইত্যাদি যেসব প্রশ্নের উত্তর এশিয়াবাসীকে সাধারণ দিতে হয়, তাহা তাঁহাকে দিতে হয়।

এমিগ্রেশন অপিসের এই অদ্ভুত ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হন ও পরদিনই দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করেন। কবি এবিষয়ে কাহাকেও কিছু বলেন নাই; তবে অধ্যাপক রেভারেণ্ড টাকার এমিগ্রেশন অপিসের এই ব্যবহার সম্বন্ধে কাগজওয়ালাদের কাছে তীব্রভাষায় প্রতিবাদ করেন।

২০এ এপ্রিল কবি ও অপূর্বকুমার জাপান যাত্রা করিলেন; এণ্ড্রুস বৃটিশ গিনি (দঃ আমেরিকা) রওনা হইলেন। আমেরিকায় মোটে ১৬ দিন থাকা হয়। জাপানে আসিয়া কবি লস্ এঞ্জেলিসের ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া সংবাদপত্র সেবীদের কাছে বলেন; ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীময় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, এতদিন তাহার সঠিক জবাব দিবার সুযোগ পান নাই। তিনি জাপানে সাংবাদিককে বলিলেন, I am very glad

that the officer did not treat me differently because I might have some reputation but treated me as an Oriental and as a coloured men * * I am a representative of Asiatic peoples and I could not remain in a country where Asiatics were not wanted.

আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে হনলুলুতে জাহাজ থামে। পূর্ব্বে তিনি হাওইতে নামিয়া কয়েকদিন ছিলেন এবার তাহা হইল না। সেখানে Miss Mayoর Mother India গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি একটি interview দেন। তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার ফলে উভয় দেশের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত তীব্র হইয়াছে।

I do not feel any enthusiasm in contradicting this book, knowing that most of her readers are not interested in truth but in a piece of sensationalism that has the savour of rotten flesh. Now that this woman has discovered a mine of wealth in an unholy business of killing reputation, no appeal to truth will prevent her plying a practised hand in wielding her assassin's knife, carefully choosing for her victims those who are already down.

এবার সমুদ্রের মধ্যে কবির ২৫-এ বৈশাখ (১৩৩৬) পড়িল। জাপানী জাহাজের কাপ্তেন ও বহু যাত্রী কবির জন্মোৎসব জাহাজে সম্পন্ন করিলেন। ৩রা মে জাহাজে বসিয়া A Weary Pilgrim নামে একটি ইংরেজি কবিতা Asahi Shimbum নামক কাগজের জন্য রচনা করেন। (Mod. Rev. 1929 Aug).

১০ই মে কবি য়োকোহামা পৌঁছিলেন। জাপানে প্রায় একমাস থাকিলেন, ৮ই জুন ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। এই একমাস কবি টোকিওর নানা প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

টোকিও পৌঁছিবার পর দিনই (১২ই) Tagore Society-র সভ্যরা Zojoji মন্দিরে কবির সম্বর্ধনা করেন। সেই দিন সন্ধ্যায় Philosophy

of Liesure সম্বন্ধে বক্তৃতাটি পাঠ করেন। ইহার পর প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো জায়গায় বক্তৃতা করিতে হয়। ১৩ই মে জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা হইল; ১৫ই ভারত-জাপানী সমাজের তরফ হইতে অভ্যর্থনা হয়। তিনি সদস্যদের সম্মুখে On Oriental Culture and Japanese mission নামে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় কবি স্বদেশীযুগের পূর্বে কাউণ্ট ওকাকুরা বাঙলাদেশে আসিয়া কিভাবে বাঙালী যুবকদের অন্তরের মধ্যে একটি দেশপ্রীতি, অতীতের প্রতি একটি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। তারপর বলেন তিনি জাপানের গৌরবে খুবই গর্ব অনুভব করেন; জাপান প্রাচ্য দেশের নেতারূপে উঠুক। কিন্তু সেই জাপানকে যখন বাদশাহী মদে মত্ত অবস্থায় দেখা যায় তখন তাহা বড়ই পীড়ার কারণ হয়। কোরিয়া ও চীন জাপানের সমকক্ষ নহে; এই দুর্ভাগ্যের জন্য তাহারা যে জাপানের নিকট লাঞ্ছিত হয়, ইহা তিনি জাপানের নিকট হইতে আশা করেন না। I have ever wished that Japan, in behalf of all Eastern peoples, will reveal an aspect of civilization which is generally ignored in other parts of the world. It should be greatly rich in the wealth of human relationship, even in it politics. The generosity in human relationship I claim as something special to the East. হায় রে কবির স্বপ্ন!

পরদিন ১৬ই মিস্ ৎসুদা (Miss Tsuda)-র স্কুলে, ১৭ই মিটো (Mito) তে বক্তৃতা। ১৮ই মারকুইস্ ওকুমা কর্তৃক কবির সম্বর্ধনা। ২১-এ ও ২৪-এ 'অবকাশ' সম্বন্ধে বক্তৃতাটি দুইবার পাঠ করেন; ২৩-এ নিচি-নিচিতে একটি বক্তৃতা হয়, ২৫-এ মিঃ ফুজিয়ামার বাড়ীতে পার্টি। কবি অবকাশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন কিন্তু নিজের বিশ্রাম নাই। আমরা তালিকাটি দিলাম শুধু দেখাইবার জন্য বিদেশে তাঁহাকে কি ব্যস্ত থাকিতে হয়। এইভাবে খাটিতে খাটিতে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, তখন কবি চিকিৎসকদের আদেশে সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন। এক সপ্তাহ পরে শরীর সুস্থ হইলে Count Shibuswawaর বাড়ীতে পার্টিতে যান ও Concordiaতে

বক্তৃতা করেন। ৭ই ভারতীয়দের সহিত একত্র ভোজ হয়, ৮ই ফরাসী জাহাজ 'Angor'এ করিয়া ফরাসী হিন্দু-চীন রাজ্যের দিকে রওনা হইলেন।

ফরাসী হিন্দু-চীন রাজ্যের রাজধানী সাইগনে জাহাজ আসিল ২১এ জুন। ফরাসী গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী জাহাজে আসিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন। শহরের মেয়র ও প্রধান ব্যক্তিরা কবিকে সম্বর্ধিত করিলেন। সন্ধ্যায় পুনরায় ম্যুন্সিপাল অপিষে সভা হয়। পরদিন আনামের গবর্ণরের সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়; সেদিন ভারতীয় বণিকদের সভা পরিদর্শনে যান। অপরাহ্নে আনামের আর্ট সংগ্রহ (Ecole d'art) ও পরদিন সোমবার বিখ্যাত চীনা-প্যাগোডা, আনাম-প্যাগোডা ভারতীয় চেট্টিদের মন্দির প্রভৃতি দেখেন। সাইগন ত্যাগ করিবার পূর্বে হিন্দু-চীনের গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

২৪এ সাইগন ছাড়িয়া সিঙাপুরে আসিয়া জাহাজ বদল করিতে হইল; ইথিওপিয়া জাহাজ ২৭এ শিঙাপুর ছাড়ে ও ৩রা জুলাই মাদ্রাস পৌছায়। কবি ৫ই জুলাই ১৯২৯ (২১ আষাঢ় ১৩৩৬) কলিকাতা পৌছাইলেন। এবার বাহিরে চারিমাস সাতদিন ছিলেন।

কবি যখন কানাডায় সেই সময়ে বিশ্বভারতীর ইসলামীয় সভ্যতার অধ্যাপক-রূপে Dr. J. Garmanus শান্তিনিকেতনে আসেন (৭ই এপ্রিল ১৯২৯)। গত বৎসর হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর বিশ্বভারতীতে ইসলামীয় সভ্যতার অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য একলক্ষ টাকা দান করেন। সেই টাকায় এই একটি নূতন বিভাগ খোলা হয়। Dr. Garmanus জাতিতে হাঙ্গেরিয়ান, তুর্কী ও আবরী ভাষায় সুপণ্ডিত। ১৯২৬ সালে কবি যখন য়ুরোপে যান, সেই সময়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সহিত এই অধ্যাপকের বিশেষ পরিচয় হয়।

৩৬। 'তপতী'

কানাডা হইতে কবি যখন আশ্রমে ফিরিলেন তখন আশ্রমের প্রান্তরে বর্ষার মেঘ জমিয়া বর্ষণ সুরু হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রাঙ্গন, ইহার ঋতু-চক্রের আবর্তন কবির মনকে দোলায়িত করিল। আশ্রমে ফিরিয়া শ্রীনিকেতনে সীতাযজ্ঞ (২৫এ শ্রাবণ ১৩৩৬) ও পরদিন শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল (২৬এ) পালন করিলেন। বর্ষামঙ্গলের সহিত বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়। কয়েক বৎসর এই বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তিত হইয়াছে। এই দিন তিনি 'চিত্রকর' নামে গল্পটি পাঠ করেন। (প্রবাসী ১৩৩৬ কার্তিক পৃঃ ৯৭ গল্পগুচ্ছ ৩য় ভাগ ২য় সং পৃঃ ১১৩০)।

এমন সময়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা' হইতে কবির আহ্বান আসিল; সেখানে সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করিবার জন্য। কবি ২রা ভাদ্র 'সাহিত্যের স্বরূপ' ও ৫ই ভাদ্র 'সাহিত্য বিচার' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শেষোক্ত বক্তৃতাটি পরে নিজে 'প্রবাসী'র জন্য লিখিয়া দেন। (১৩৩৬ কার্তিক পৃঃ ১৬১; দ্রঃ বিচিত্রা ১৩৩৬ ভাদ্র পৃঃ ৪৯০, আশ্বিন পৃঃ ৬৪৯)

বর্ষা উৎসবের পর স্থির হইল কলিকাতায় একটি নাটক পূজার পূর্বে অভিনীত হইবে। কোন্ নাটক হইবে ইত্যাদি লইয়া আলোচনা চলিতেছে; কবি লিখিতে বসিয়া গেলেন; 'রাজা ও রাণী'র গল্পাংশ রাখিয়া তিনি 'তপতী' নামে একটি নাটক অল্প কয়দিনের মধ্যে রচনা করিয়া দিলেন।

এই বইএর ভূমিকায় কবি যাহা লেখেন (১৯এ ভাদ্র ১৩৩৬) তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলে ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাসটি পাওয়া যাইবে।

"রাজা ও রাণী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

"সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে-প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে

সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হ'লো, এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ ক'রেচে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েচে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম নয়।

"অনেক দিন ধরে 'রাজা ও রাণী'র ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েচে। কিছু দিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত ক'রে এ'কে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখ্‌লুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির ক'রেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নূতন ক'রে না লিখ্‌লে এর সদ্‌গতি হ'তে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্য-মতো দায়িত্ব শোধ ক'রেচি।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু বইটাকে লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাকে অভিনয় করিয়া দেখাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন; শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক, ছাত্র ছাত্রী লইয়া রিহর্শাল সুরু হইল। কবি স্বয়ং হইলেন বিক্রম—তখন তাঁহার বয়স হইয়াছে সাতষট্টির উপর। অজীনেন্দ্রনাথের স্ত্রী (৺অজিত কুমার চক্রবর্ত্তীর কন্যা) অমিতা দেবী লইয়াছিলেন তপতীর অংশ।

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে চারিদিন এই নাটক অভিনীত হয় (১০ই—১৫ই আশ্বিন। ২৬, ২৮, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর)। অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল; নাট্যমঞ্চও অপরূপ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বিক্রমের ভূমিকায় নামিতে দর্শকদের বিস্ময়ের অন্ত থাকিল না; যৌবনের অন্তে রবীন্দ্রনাথের যে রূপ ছিল তাহাই যেন সেদিন দেখা গেল।

দৃশ্যপটের মধ্যে এবার বিশেষত্ব ছিল; অর্থাৎ সেটার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। এ জন্য রবীন্দ্রনাথ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন,

"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ ক'রেচে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা।" (ভূমিকা)

কার্তিক মাসে নূতন রচনা বেশি চোখে পড়ে না ; এই সময়ে শচীন্দ্রনাথ সেন **The political philosophy of Rabindranath** নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই বইখানির সমালোচনা স্বয়ং করেন। (প্রবাসী ১৩৩৬ অগ্রঃ পৃঃ১৭১)। এই প্রবন্ধে কবি তাঁহার জীবনে রাষ্ট্রিক সাধনা কিভাবে কাজ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে-কাজ নিজে করতে পারি সে-কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই, অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করিনে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তি হ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি।" রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে তাঁহার নিজ আদর্শকে খুব সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সময়ে রচিত আর একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহার 'রাজনৈতিক দর্শন' সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া লেখেন। কনাডায় তাঁহার সহিত এক কোরীয় যুবকের সাক্ষাৎ হয়। যুবকটির রাষ্ট্রীক মত কি তাহা কবি কথা প্রসঙ্গে জানিতে চাহেন। তিনি এক স্থানে জানিতে চাহিতেছেন "দেশের শিক্ষা বিস্তার এতটা হয়েচে কিনা যাতে দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবী করতে পারে। যদি তা না হয়ে থাকে তবে ত সেখানে বিদেশী নিরস্ত হলেও সর্বসাধারণের যোগে আত্ম-শাসন ঘটবে না, ঘটবে কয়েকজনের দৌরাত্ম্যে আত্মবিপ্লব। এই স্বল্প লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে সংযত করবাব একমাত্র উপায় বহুলোকে সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উদ্বোধন।" (প্রবাসী ১৩৩৬ পৌষ, পৃঃ ৩২২)।

এই কার্তিক মাসে জাপান হইতে জুজুৎসু-বীর মিঃ টাকাগাকি শান্তিনিকেতনে আসিলেন। কানাডা হইতে ফিরিবার পথে কবি জাপানে বাসকালে সেখানকার

জুজুৎসু ও 'জুডো' ব্যায়াম বিশেষভাবে দেখিবার সুযোগ হয়। সেই সময়ে একজন ব্যায়ামবীরকে বিশ্বভারতীতে আসিবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বাঙলার ছেলেমেয়েরা এই আত্মরক্ষা বিদ্যাটি আয়ত্ত করে; তাঁহার ভরসা ছিল দেশবাসীরা ইহা শিখিবে। বাঙলাদেশে নারী নির্যাতন ও অপমান দৈনন্দিন ঘটনার মত হইয়াছে, সেই দুঃখ হইতে উদ্ধারের উপায়রূপে নারীরা আত্মরক্ষার এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করিবে এই ছিল-তাঁহার মনের ইচ্ছা। টাকাগাকি আসিলেন; জুজুৎসু ও জুডো শিখাইবার সকল ব্যবস্থা হইল; প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলেই যে এখন সব জিনিষ সম্ভব হয় তা নয়; কারণ তাঁহার শরীর বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে কাজকর্ম ব্যবস্থায় অন্যের সহায়তা ও পরামর্শ ছাড়া চলিতে পারেন না। ফলে জুজুৎসু যে-উৎসাহে আরম্ভ হইয়াছিল, তেমনি নিরুৎসাহের মধ্যে ইহার যবনিকা পতন হইল। দুই বৎসর টাকাগাকি থাকিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু এমন একজন ব্যক্তিকে এই বিদ্যাটি শিখাইয়া লওয়া হয় নাই যিনি পরে উহা চালাইতে পারিতেন। একজন কর্মী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যে সিংহসদনে জুজুৎসুর আখড়া হইয়াছিল, দুই বৎসর প্রায় এমনি পড়িয়া থাকিল। পরে তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া সেখানে বক্তৃতাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চ হইয়াছে।

টাকাগাকির জন্য প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু বর্তমানে তাহার চিহ্ন কোথায়ও নাই। টাকাগাকি যে দুই বৎসর ছিলেন কাজ ভালই চলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের ক্রীড়া প্রদর্শনীতে প্রায় উপস্থিত হইতেন, কারণ তাঁহার interest সকল বিষয়েই।

কবি আশ্রমেই আছেন; পৌষ উৎসবাদি যথানিয়মে সম্পন্ন হইল। ইতিমধ্যে বড়োদা হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য। রবীন্দ্রসাহিত্য গুজরাটে বহুকাল হইতে প্রচারিত হয়। বড়োদা রাজকলেজের অধ্যাপক Soaresকে টাকা দিয়া রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখা হইতে একটি চয়নগ্রন্থে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী করাইয়া লয়। মোটকথা রবীন্দ্রসাহিত্য সেখানে সুপরিচিত। এবার গয়াকবাড় দেশে থাকা কালে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিল। জানুয়ারী (১৯৩০) মাসের মাঝামাঝি সময়ে কবি, অমিয়কুমার চক্রবর্তী ও ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে লইয়া পশ্চিমভারত যাত্রা করেন।

প্রথমে কবি আমেদাবাদে যান ও সেখান হইতে ২৬এ জানুয়ারী ১৯৩০ বড়োদা আসিলেন।

বড়োদা আসেন মহারাজ গায়কাবাড়ের নিমন্ত্রণে; ২৭এ বড়োদা কলেজে কবি বক্তৃতা করেন; স্বয়ং মহারাজ বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল Man the artist। ৩০এ জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ বড়োদা ট্রেণিং কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট শিক্ষাবিষয়ে কথাবার্তা বলেন।

রবীন্দ্রনাথ ত' বড়োদায়; এদিকে কলিকাতায় তাঁহাকে লইয়া একটা ভয়ানক গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছে।

ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে সম্মেলন সভাপতি নির্বাচন করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ সম্মেলনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন না, সম্মেলনের কর্মকর্তারা রবীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, রথীন্দ্রনাথের নামে অনেক টেলিগ্রাম করিয়াও শেষ পর্যন্ত ঠিক করিয়া জানিতে পারিলেন না যে তিনি কোথায় আছেন এবং তিনি আসিতে পারিবেন কি না। কবি একটি অভিভাষণ লিখিয়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়া যান। লোকে শেষ পর্যন্ত কবির জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল এবং তাঁহার উপর একদল লোক বিরক্তও হইয়াছিল। অথচ তখন তিনি বড়োদা আহ্মদাবাদ করিয়া বেড়াইতেছেন; যেসব টেলিগ্রাম গিয়াছিল, তাহার খবর তাঁহার কাছে পৌঁছায় নাই শুনিয়াছি। যাই হোক রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে সভানেত্রীর পদে বরণ করা হইল।

কয়েকদিনের মধ্যে কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন। এই সময়ে মিঃ এলম্‌হার্ষ্ট তাঁহার পত্নী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিনিকেতন দেখিতে আসেন। শ্রীমতী এলম্‌হার্ষ্ট বহুকাল হইতে শ্রীনিকেতনের ব্যয় বহন করিয়া আসিতেছেন সে-কথা পাঠক জানেন। তাঁহাদের অর্থে চালিত কাজ কিভাবে চলিতেছে হয়ত তাহাই দেখিবার জন্য তাঁহাদের আসা। তাঁহারা আসিয়াছিলেন শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের মুখে। উৎসবের বিরাট আয়োজন পূর্বাহ্নেই হইয়াছিল। এ ছাড়া নানা কৌতুক, আমোদ, ভোজ, পার্টি হইল।

১০ই ফেব্রুয়ারী সুরুলে সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের লইয়া এক বিরাট

কন্‌ফারেন্স্‌ হয়। বাঙলার গভর্ণর স্যর স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন ইহা উন্মোচন করেন ও এলম্‌হার্স্ট সভাপতিত্ব করেন। চারিদিক হইতে ২৭০ জন প্রতিনিধি আসেন।

বিশ্বভারতীর কাজের জন্য গভর্ণরকে আহ্বান এই প্রথম। ইতিপূর্বে তাঁহারা বেড়াইতে আসিয়াছেন মাত্র ; কোনো অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। এই ব্যাপার লইয়া কাগজেপত্রে একটু সমালোচনা হয়। তখন অসহযোগ আন্দোলন নবধারায় চলিয়াছে, মহাত্মাজী দেশময় লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন ; বয়কট আন্দোলন পুরামাত্রায় চলিতেছে। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গবর্ণরকে আহ্বান করিয়া আনা অশোভন হইয়াছিল—ইহাই একশ্রেণীর লোকের মত। এই আয়োজনের কারণও ছিল ; শ্রীনিকেতন গবর্মেণ্ট হইতে কিছু অর্থের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। সরকারী সাহায্য গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বে যেপ্রকার বিরুদ্ধ মত কর্তৃপক্ষ পোষণ করিতেন, তাহার তীব্রতা ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ব্যয়ভার এতই বাড়িয়া উঠিতেছিল যে প্রাইভেট্‌ বা ব্যক্তিগত দান সাহায্যের দ্বারা আয়তন দুটির ব্যয় সঙ্কুলান করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই কর্তৃপক্ষ সরকারী সাহায্যলাভের জন্য একটু উৎসুক হন। সভায় লাটসাহেব ঘোষণা করিলেন যে দেশের আর্থিক অবস্থা মন্দ, তাই তিনি এককালীন পাঁচ হাজার টাকা ও তিন বৎসরের জন্য তিন হাজার করিয়া টাকা দান করিলেন। এই দান ঘোষিত হইলে সকলে বুঝিলেন 'জাতও গেল, পেট ভরিল না।' লোকে রবীন্দ্রনাথকেই দুষিতে থাকিল। কিন্তু এসব ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বেশি ছিল না।

এই বিচিত্র কাজের মধ্যে কবিকে কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করিতে হয়, নিজের 'ইংরেজি সোপান' প্রভৃতির সংস্কার করেন, ও 'সহজ পাঠ' (১ম, ২য়) নামে দুইখানি বই রচনা করিয়া দেন। এই শেষ দুইখানি বই শিশু-সাহিত্যের অপরূপ সৃষ্টি। ইহার কবিতাগুলি শিশুরা কি পরিমাণ পছন্দ করে, তাহা যাঁহারা ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। বই দুখানির ছবি কলাভবন হইতে অঙ্কিত হয় ; সেইজন্য উপসত্ব কবি কলাভবনকে দান করেন।

৩৭। য়ুরোপ যাত্রা

কিছুকাল হইতে রবীন্দ্রনাথের মন বিলাত যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে; প্রথমত Oxfordএ তাঁহার Hibbert বক্তৃতাগুলি এবার দিবেন; দ্বিতীয়ত তাঁহার ছবির একটি প্রদর্শনী বিলাতে করিতে চান; তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথের শরীর খুব খারাপ হইয়াছে, তাঁহার পরিবর্তন প্রয়োজন।

ছবি আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি নূতন বিদ্যা সম্প্রতি আয়ত্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসরমাত্র ইহার সূত্রপাত। নিজের লেখা কাটাকাটি করিতে করিতে প্রথম প্রথম এক একটা অদ্ভুত আকার গ্রহণ করিত; দেখিতে মন্দ হইত না, সবটা মিলিয়া বেশ একটা ছন্দ প্রকাশ করিত। এই হইতেছে সূচনা। তারপর হইতে রীতিমত ছবি আঁকা সুরু করেন। এখন কবিতা বা অন্য লেখা খুব কম। বাঙলা লেখা ত কমই; এমনকি Visva-Bharati Quarterly উঠিয়া যাইবার মত হওয়ায় ইংরেজি লেখারও আর তাগিদ নাই। তাই সময় কাটান সারাদিন ছবি আঁকিয়া। এবারকার বিলাত যাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য এই চিত্র-প্রদর্শনী করা। বিলাত যাইবার সময় অনেকগুলি ছবি সঙ্গে লইলেন।

* আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষাবিভাগের সহিত শ্রীমতী আশাদেবী যুক্ত ছিলেন। তিনি কিছুদিন মেয়েদের দেখাশুনা করিতেন ও পরে বিদ্যালয়ের প্রধানা হন। য়ুরোপযাত্রার দুইদিন পূর্বে মেয়েদের শিক্ষা ও শাসন সম্বন্ধে সবিস্তারে একখানি পত্র তাঁহাকে লেখেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমাদের স্বভাবের মধ্যে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই একথা বলা অত্যুক্তি, কিন্তু তাকে নিয়ে বাইরে থেকে যত অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধি করতে যাব ততই সেটা ব্যাধিতে এসে দাঁড়াবে। এই সংশয়কে অগ্রাহ্য করার দ্বারাই এ'কে বিনাশ করা যায়। পরস্পরকে বিশ্বাস করার দ্বারাই সমাজের হাওয়া নির্মল হয়। * * যাকে বিশ্বাস করিনে সে বিশ্বাসের অযোগ্য হয়; যতই অযোগ্য হয়, ততই বাঁধন আরো কড়াকড় করতে হয়। মানবচরিত্রের স্খলন প্রাচীরের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই আছে, ভিতরে তার উত্তেজনা আরো বেশি। বস্তুতঃ আচারের দ্বারা মানুষের মনকে বিশুদ্ধ করা যায় না, বরঞ্চ তার বাড়াবাড়িতে চরিত্রের মূলে দুর্বলতা ও নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা আসে। ভিতরের মানুষের পরেই দাবী রাখ্‌তে হবে, দারোয়ানের পরে নয়। * * সংসার-কণ্টকিত বেড়ার বাহুল্য করতে গেলেই ভিতরে ভিতরে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে পশুর কোঠায় ফেলা হয়। আমি মেয়েদের স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি; এইজন্য তাদের আমি সন্দেহের কারাকুঠরির মধ্যে পৃথক রাখতে দেখলে ব্যথা পাই। * * সংশয়ের চেয়ে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাই বেশি কাজে লাগে। এই কাজে চাই চিরসহিষ্ণু অনুকম্পা।"—প্রবাসী ১৩৩৭ অগ্রঃ, পৃঃ ২২৪।

২রা মার্চ ১৯৩০ (১৮ ফাল্গুন ১৩৩৬) রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করিলেন সঙ্গে সেক্রেটারীরূপে E. W. Arriam, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী ও কন্যা নন্দিনী। মাদ্রাসে গিয়া রথীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ হইয়া পড়ায় ডাক্তার সুহৃদ চৌধুরী তাঁহাদের সঙ্গে বিলাত গেলেন।

২৬এ মার্চ তাঁহারা মার্সেলস্ পৌঁছিলেন ও ফ্রান্সের দক্ষিণে Cap Martin নামক নিরালা সহরতলীতে বাস করিতে লাগিলেন; M. Kahnএর এখানে বাড়ী ছিল, ইঁহারা সেইখানে ছিলেন। Cap Martin বিখ্যাত Monte Carloর নিকট; নানাদেশের নানা লোক এখানে আসেন। চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট Masyrykএর সহিত এইখানেই কবির সাক্ষাৎ হয়।

প্যারিসে আসিবার পর ২রা মে কবি তাঁহার চিত্রের প্রদর্শনী খুলিলেন। পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানিত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মনের চোখে যাহা দেখেন তাহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করেন; কিন্তু আজ লোকে বিস্মিত হইয়া দেখিল কবির মনের চোখে রঙের খেলা, ছন্দের দোলাও তুলিতে রূপ পাইতে পারে।

প্যারিসের প্রদর্শনীতে তিনি ১২৫ খানি ছবি দিয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়ে প্রতিদিন ২।৩ খানি ছবি আঁকিতেছিলেন। প্যারিসের এই প্রদর্শনীর প্রধান সহায় ছিলেন ফরাসী মহিলা কবি Contesse de Noailles ও Victoria Ocampo। ভিক্‌টোরিয়া ছিলেন আর্জেণ্টাইনের এক ধনী নারী, ইনিই বুইনস আয়ারসে কবিকে যত্ন করিতেন এবং ইঁহাকেই কবি 'পূরবী' কাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইনিই 'পূরবী'র বিজয়া।

প্যারিসে এইবার তাঁহার জন্মদিনের উৎসব হয়, ভারতীয় সমিতি এই উপলক্ষ্যে একটি ভোজ দেন; গত বৎসর এই দিনে তিনি ছিলেন অতলান্তিক সাগর বক্ষে জাপানী জাহাজে।

প্যারিসের প্রদর্শনীর শেষে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১১ই মে লণ্ডন পৌঁছাইলেন। সেখানে বেশিদিন না থাকিয়া বার্মিংহামে চলিয়া যান। বার্মিংহামের নিকট Woodbrookeএ কোয়েকারদের কলেজ ও আয়তন; সেইখানে এবার থাকিবেন স্থির হইয়াছে। কোয়েকারদের সঙ্গে কবির ঘনিষ্টতার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কবির বিলাত যাত্রার কিছুদিন

পূর্বে তাঁহারা কবির সেক্রেটারী অমিয় চক্রবর্ত্তীকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতাদি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। অমিয়বাবু তখন সস্ত্রীক সেখানে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেখানে আসিলে (১৩ই মে) তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সমস্ত খবর পাইলেন। বিদেশে থাকিবার সময় দেশের খবর জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল প্রবল হয়। এখানে আসিয়া তিনি জানিতে পারিলেন দুই মাসের মধ্যে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

পাঠক জানেন মহাত্মাজীর সত্যগ্রহ আন্দোলন কিছুকাল হইতে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে। গবর্মেণ্টের আইন ভঙ্গ করিবার জন্য তিনি লবণ আইন বাছিয়া লইয়াছেন। মহাত্মাজী ঘোষণা করিয়াছিলেন জল ও বায়ুর ন্যায় সমুদ্রের লবণে মানুষের জন্মগত অধিকার আছে, প্রকৃতি মানুষকে ইহা আপনি দিতেছে, সরকারের ইহার উপর ট্যাক্স করিবার অধিকার নাই। এই যুক্তি দিয়া তিনি দেশবাসীকে উত্তেজিত করিলেন। ১২ই মার্চ সাবরমতী আশ্রম হইতে তিনি দাণ্ডী যাত্রা করেন। ৬ই এপ্রিল জালিনবালা দিবসে তিনি দাণ্ডীতে লবণ আইন ভঙ্গ করেন এবং তাহার পরেই বন্দী হইয়া অন্তরায়িত হন। দেশময় লবণ আইন ভঙ্গের ব্যাপার লইয়া বহু সহস্র লোক বন্দী হইল; তাছাড়া পুলিস সর্বত্র নিরুপদ্রব আন্দোলনকারীদিগকে মৃদুভাবে ব্যবহার করে নাই বলিয়া সাময়িক কাগজে অভিযোগ বাহির হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে আরও অঘটন ঘটে। ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে; ৮ই মে শোলাপুরে দাঙ্গা হয় ও 'মার্শাল ল' জারি হয়। ১৫ই মে গান্ধীজি ও জহরলালের জেল হয়; সেইদিন ঢাকায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হইল। ২৯এ আগষ্ট ঢাকায় লোমান্ সাহেব নিহত হইলেন। মোট কথা মাসখানেকের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা পর পর ঘটিয়া গেল যে দেশবাসী ও গবর্মেণ্ট সমভাবে বিভ্রান্ত হইয়া গেলেন। গবর্মেণ্ট শোলাপুরে 'মার্শল ল' জারি করিয়া তিন জন সম্ভ্রান্ত যুবককে ফাঁশি দিলেন। ৩০এ জুন কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল, মতিলাল নেহেরুর জেল হইল; ১৯এ এপ্রিল হইতে ৭ই জুলাইএর মধ্যে বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা-বলে ৬টি অর্ডিনান্স প্রচার করিলেন। আবার শান্তিস্থাপনের জন্য ৯ই জুলাই বড়লাট ঘোষণা করিলেন যে একটি গোলটেবিল বসিবে।

রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতি, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, পুলিশের সঙ্গে জনতার দাঙ্গা ও 'মার্শেল ল'র শাস্তি, অর্ডিনান্স ও সেই সঙ্গে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স সম্বন্ধে গবেষণা ভারতের চিন্তাকাশকে ভয়ে ভরসায় আশায় নিরাশায়, ক্ষোভে লোভে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। বিলাতে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ দেশের সকল খবরই পাইলেন, বিশেষভাবে শোলাপুরের ব্যাপার তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। Manchester Guardianএর সংবাদ প্রতিবেদকের কাছে তিনি বলেন (১৬ মে), "Those who are experienced in bureacratic irresponsible government can easily understand how repressive measures like those culminating in the martial law at Sholapur are bound to react. Though much suppressed, news is trickling through travellers from India telling how cruel and arbitrary punishment are meted out to entirely inoffensive persons. Though such actions were called by the high sounding names of law and order they are themselves the worst breaches of the law of humanity which I feel are greater than any other law."

গান্ধীটুপি পরার অপরাধে সোলাপুরবাসীদের নির্যাতনের তিনি ঘোর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি এই প্রতিবাদে নিঃশেষিত না করিয়া বলিলেন পূর্ব ও পশ্চিমের best mindsএর মধ্যে মিলনের প্রয়োজন; পূর্বদেশ এখনো পশ্চিমের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, কিন্তু the present complications cannot be dissipated by repression and a violent display of physical power.

ম্যানচেষ্টার গার্জেন এই inteviewএর সমালোচনায় বলিলেন, "India's best ambassador is not Mahatma Gandhi but the poet and thinker Tagore. It is obviously difficult to transact political business with Mr. Gandhi. * * For he (Tagore) is not a saint but a poet and thinker, and as such he understands and sympathises with us average men." (23 May, 1930).

Woodbrookeএর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আতিথ্য পাইয়া কবি সুখী; তিনি আয়তনবাসীদের নিকট প্রতিদিন কিছু না কিছু পড়িয়া শুনাইতেছেন; একদিন Selly Oak Collegeএ Civilisation and Progress নামে বক্তৃতাও করিলেন।

বার্মিংহামে দিন চার থাকিয়া ১৭ই মে কবি Oxford আসিলেন; সেখানে Dr. Drummondএর অতিথি হন, এণ্ড্রুস ও অমিয়কুমার কবির সঙ্গে ছিলেন। দুইদিন পরে ম্যানচেষ্টার কলেজে তাঁহার হিবার্ট বক্তৃতা। পাঠকের স্মরণ আছে দুই বৎসর পূর্বে এই বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি বিলাতযাত্রা করেন, কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়ায় সিংহল হইতে ফিরিয়া আসেন; তখন হিবার্ট ট্রাষ্টিরা অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনকে আহ্বান করেন।

১৯এ মে (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম হিবার্ট বক্তৃতা দেন; ম্যানচেষ্টার কলেজের অধ্যক্ষ দার্শনিক L. P. Jacks কবিকে পরিচিত করিয়া দেন; শ্রোতারা "thronged the hall to the doors" (M. G.)। এতদিন রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়া সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন, এবার পৃথিবীর মধ্যে দর্শনবিষয়ক অনুশীলনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে দার্শনিক অভিজ্ঞতা দিলেন; ভারতবর্ষে তিনি ইতিপূর্বেই 'দর্শন কংগ্রেসে' সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পরদিন ম্যানচেষ্টার কলেজে রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণনের অভ্যর্থনা হয়; এই সময় অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন অক্সফোর্ডে দুই টার্ম (Term) বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের দুইজন মনীষী—একজন কবিমনীষী অপরজন দার্শনিক—উভয়কে য়ুরোপ সম্মান দেখাইয়া জ্ঞানের প্রতি সম্মান দেখাইল।

রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি বক্তৃতা হয়; দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা সম্বন্ধে Manchester Guardian লিখিয়াছিলেন, যে একথা বেশ বলা যাইতে পারে যে 'No series of Hibbert lecture has aroused more public interest than the present one' (22 May). শেষ বক্তৃতা হয় ২৬এ মে।

বিলাতে বাসকালে কাজের অন্ত থাকে না। হিবার্ট লেকচারের মাঝে দুই দিন কবিকে লণ্ডনে আসিতে হয়। ২৪এ মে কোয়েকারদের বার্ষিক সভার

অধিবেশন। কোয়েকার সম্প্রদায় চিরদিন স্বাধীনতার সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, তাহারা কিছুকাল হইতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন ; ভারতের যথার্থ সমস্যা ও রাজনৈতিক অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে এই সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। কোয়েকার সম্প্রদায়ের ইতিহাসে গত ২৫২ বৎসরের মধ্যে কখনো তাহারা কোনো অ-কোয়েকারকে তাহাদের সভায় নিমন্ত্রণ করে নাই।

কবি তাঁহার বক্তৃতায় বেশ স্পষ্ট করিয়া বলেন যে যন্ত্ররাজ্যে হৃদয়ের স্থান নাই ; গবর্মেণ্ট সেই যন্ত্রের দ্বারা চালিত ; এত বেদনা, এত কাহিনী যাহা শোনা যাইতেছে, তাহা এই যন্ত্রচালিত শাসনের ফলে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা বা Independence চায় কি না, সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, There can be no absolute independence for man. Interdependence is in his nature and it is the highest goal. All that is best in humanity has been achieved by mutual exchange of minds among peoples that are far apart. * * Let the best minds of the East and West join hands and establish a truly human bond of interdependence between England and India in which their interests may never clash, and they may gain an abiding strength of life through a spirit of mutual service without having to bear a perpetual burden of slavery on one side and that of a diseased responsibility on the other, which is demoralising.

তিনি এই বক্তৃতার এক অংশে আরও বলিলেন, Life creates, machine constructs, জীবন সৃষ্টি করে, যন্ত্র গড়ে ; মানুষকে যখন যন্ত্র সাহায্য করে তখনই সে সার্থক ; বিজ্ঞান তখনই মহান যখন সে অজ্ঞানকে দূর করে ; কিন্তু যন্ত্র ও বিজ্ঞানের যখন অপবিত্র মিলন হয়, তখন ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনে। মানুষ যখন 'নেশনে'র দোহাই দিয়া কিছু করে বা বলে তখন সে এক মূর্তি ধরে ; কিন্তু 'I believe in the individuals in

the west; for on no account can I afford to lose my faith in Man.'

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার খুব প্রতিবাদ হয়; কোয়েকার সভায় এ প্রথা আছে। রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত প্রতিবাদের উত্তর দিতে হইয়াছিল। গ্রেহাম নামে একজন সভ্য বৃটীশ শাসনের স্বপক্ষে খুব জোর দিয়া বলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সব তর্ক বিতর্কের অন্তে বলিলেন যে শ্রোতাদের আঘাত দিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষর অবস্থা সম্বন্ধে কথাগুলি বলেন নাই; তিনি তাঁহাদিগকে মানবের বন্ধু বলিয়া জানেন এবং সেই বিশ্বাসে তিনি তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি অনুরোধ করেন তাঁহার কথা কেহ ভুল না বুঝেন। "I ask you for your co-operation and that you may realise yourselves in our place and recall the time when your own brothers in America wanted to secure their freedom with the blood. Will you realise we want the privilege of serving our own country in our own way and to solve our problems. Give us the right to serve our own country." (The Friend 30 May, 1930 p p 493-499).

কোয়েকাররা ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন; একটি ডেপুটেশন ভারতীয় সচিব মিঃ বেন (Benn)-এর নিকট যায় (৩০ মে); তাঁহাদের বিবৃতি প্রধান মন্ত্রী লর্ড আরুইন ও গান্ধীজির নিকট প্রেরণ করেন।

২৫এ মে কবি অক্সফোর্ডে ফিরিয়া গিয়াছেন; সেখানে ম্যানচেষ্টার কলেজের গির্জায় কবি উপদেশ দান করেন। Aberdeen Press Journal লেখেন (২৬এ) His appeal for understanding between Britain and India was profound and moving, blending as it did the wisdom of the East and West. His English is as beautiful to hear as to read. . . his words are music.

একখানি কাগজ লিখিলেন যে 'কবির বক্তৃতা শুনিবার জন্য যত লোক আসিয়াছিল, তাহাদের স্থান দিবার মত শক্তি চ্যাপেলের ছিল না।' কবির

শেষ হিবার্ট বক্তৃতা (The Religion of Man Appendix IV. p 231-237)। হইল ২৬এ ; ম্যানচেষ্টার গার্জেন বলেন সেদিনের মত ভিড় কোনো দিন হয় নাই। য়ুনিভার্সিটি কলেজের অধ্যক্ষ মাইকেল স্যাড্‌লার, কবিকে বলিলেন "We shall never forget in Oxford the gift you have given us and the inspiration you have brought to us." (27 May)

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয় তিনি The Religion of Man নামে গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন (সেপঃ ১৯৩০)। অক্সফোর্ডে যেভাবে বক্তৃতা দেন, ঠিক সেইভাবে বইটি করেন নাই, অনেকগুলি পরিচ্ছেদে সমস্ত বিষয়টিকে ভাগ করিয়া দেন। পরে এই বক্তৃতার বিষয়কে আরও প্রাঞ্জল করিয়া বাঙলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানবের ধর্ম' নাম দিয়া বক্তৃতা দেন।

অক্সফোর্ডে বক্তৃতার পর তিনি Woodbrooke এ ফিরিয়া আসেন। বক্তৃতার অবসরে অবসরে কবির নূতন প্রেম—তাঁহার চিত্রকলা তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া আছে। ২৯এ বার্মিহামে একটি বিরাট সভায় পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষা বিধির আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন ও পরদিন লণ্ডন যাত্রা করিলেন।

কোয়েকার সম্প্রদায় কবিকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদর দেখাইয়াছিলেন ; বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য হোরেস আলেক্‌জেণ্ডার বিশেষ চেষ্টা করেন। তা ছাড়া ৩০এ মে লণ্ডনে আসিয়াই তিনি স্যর অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে Wedgewood Bennএর সঙ্গে কথা বলেন। সেইদিন কোয়েকার বন্ধুদের একটি ডেপুটেশন ভারতের বিষয় আলোচনার জন্য সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এই আন্দোলনটি হইয়াছিল।

এবার রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে আর্যভবনে উঠিয়াছিলেন ; আর্য্যভবন ভারতীয়দের অতিথিশালা, ভারতের হৃদয়বান্ বণিক বিড়লার অর্থে পরিচালিত। লণ্ডনে কয়েকদিন থাকিতে হয়—কারণ ৪ঠা জুন Dr. Bake ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ; কবি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন সেখানে তাঁহার ছবিরও প্রদর্শনী হয়। স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড্ সভাপতি ছিলেন এবং কবির চিত্র সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন। কবি সভায়

বলেন যে অল্প কিছুকাল হইল তিনি ছবি আঁকিতে একটি আনন্দ পাইতেছেন ; কিন্তু ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না ; ফ্রান্সে কয়েকজন গুণী তাঁহাকে ভরসা দেওয়ায় তিনি প্রদর্শনীতে সেগুলি দেখানো স্থির করেন। শিশুকাল হইতে শব্দের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, রেখার সহিত নহে।

৫ই জুন কবি বার্মিংহাম যান্; সেখানে তাঁহার চিত্রের একটি বড় প্রদর্শনী ২রা জুন খোলা হইয়াছিল। বার্মিংহামে বাসকালে কবি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা লইয়া একটি পত্র ইংরেজি বিখ্যাত সাপ্তাহিক Spectatorএ (৭ জুন ১৯৩০) প্রকাশ করেন। তাহাতে বৃটীশের আদর্শবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতবর্ষ ও বৃটেনের সম্মিলন-সাধনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন, বর্তমানে আতঙ্ক ও স্পর্ধাপ্রকাশসূচক যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহার অনতিক্রমনীয় ফল বাদ দিলে, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজের কঠিন আদর্শ ও মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতার শিক্ষা পালন করিয়াছে।

তিনি বলেন, য়ুরোপ সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া তাহার সভ্যতা প্রদর্শনের জন্য এশিয়াতে যান নাই, পরন্তু অহমিকা ও ক্ষমতা প্রকাশের অসীমক্ষেত্রের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। কিন্তু এশিয়া কখনই ইহা স্বীকার করিবে না যে, মনুষ্যত্ববিহীন শক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে চিরদিনের জন্য সাফল্যলাভ করিবে।

তবে তিনি বৃটেনের প্রতি সুবিচার করিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে ধ্বংস সাধনে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি ও নিরস্ত্র জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যেরূপ নিগ্রহভোগের সম্ভাবনা, বৃটীশশাসনে আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই ; অন্য কোনো সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসনে ইহা অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইত তাহা নিশ্চিত।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে বলেন, ভারতবর্ষকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সে যেন বীরের ন্যায় আপনার ধর্ম রক্ষা করে এবং অত্যাচারের পরিবর্তে অনাচার যেন না করে। (প্রবাসী ১৩৩৭ শ্রাবণ, পৃঃ ৫৯১।)

মে, জুন দুই মাস নানাবিধ কাজকর্ম করিয়া কবি ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য এল্‌ম্‌হার্স্টের নিকট যান। এল্‌ম্‌হার্স্ট ডিভনশিয়ারে Totnes নামক স্থানে একটি

বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত করেন—Dartington Hall। এই বিদ্যায়তনটি ক্রমশ ইংলণ্ডের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; এল্‌ম্‌হার্ষ্টের শিক্ষা সম্বন্ধে আইডিয়া এখানে মূর্তি পাইয়াছে। কবি এখানে প্রায় দিন দশ থাকেন; সে সময়ে এই ডিভনশিয়রে Torquayর নিকট একটি স্থানে রথীন্দ্রনাথ সপরিবারে বাস করিতেছিলেন।

ইংলণ্ড হইতে কবি জার্মানী যাত্রা করিলেন, বার্লিন পৌঁছাইলেন ১১ই জুলাই। এখানে আবার কর্মস্রোতে ভাসিতে হইল। ১২ই দ্বিপ্রহরে রাইখ্‌ষ্টাগ (Reichstag) বা জারমেন পার্লামেণ্ট সভায় যান ও সেখানকার সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্ণে Gallery Moller চিত্রশালা দেখিতে যান; সন্ধ্যায় রেডিওতে বক্তৃতা করেন। পরদিন জারমেন ছাত্ররা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে। এইভাবে দিনের পর দিন সভা সমিতি, পার্টি চলিতে থাকিল। ১৪ই জুলাই কবি অধ্যাপক আইনষ্টানের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনাটি The Religion of Manএর পরিশিষ্টে আছে। ১৬ই জুলাই Gallery Mollerএ কবির চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হইল। পর দিন ড্রেস্‌ডেন যান। ১৭ই হইতে ১৯এ পর্যন্ত ড্রেস্‌ডেনে থাকিলেন, সেখানেও বক্তৃতা ছিল। ম্যুনিক জারমেন জাতির একটা বড় রকম intellectual কেন্দ্র; সেখানে (১৯—২৪) পাঁচ দিন থাকিলেন। এখান হইতে একদিন কবি Oberammergau নামক স্থানে যান; সেখানে বিখ্যাত Passion Play প্রতি দশ বৎসর অন্তর হয়; য়ুরোপের নানাস্থান হইতে এই উৎসব দেখিবার জন্য লোক আসে। কবি সমস্ত দিন বসিয়া এই যাত্রাভিনয় দেখিয়াছিলেন; ইহার ভাষা জার্মান। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক আর্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহা কবির ভাল লাগিয়াছিল। ম্যুনিকে কয়েকটি বক্তৃতা করিতে হয়—বিষয় ছিল Principles of Art। একদিন ম্যুনিকের বিখ্যাত Deutsch Museum দেখাইবার জন্য ইহার স্থাপয়িতা ও পরিচালক Oskar von Muller বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা রাজসম্মানে কবিকে সেখানে লইয়া যান। Planetarium দেখিয়া কবির খুব ভাল লাগিয়াছিল। এই সময় অধ্যাপক বিনয় সরকার ম্যুনিকে ছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে নগরীর টাউন হলে বিরাট সভায় কবির সম্বর্ধনা হয় এবং নগরীর

Town-registerএ তাঁহার নাম লেখা হয়, এ সম্মান তাহারা খুব কম লোককে দিয়াছে। ২৩এ Gallery Caspariতে কবির চিত্রপ্রদর্শনী হয়। কবি বলেন তাঁহার কবিতা তাঁহার মাতৃভাষায় লেখা, কবিতার যথাযথ তর্জমা হয় না; চিত্রের ভাষা সকলের বোধগম্য। আমি আমার কাব্য দেশবাসীকে দিয়াছি, আমার চিত্র পশ্চিমকে দিলাম।

ম্যুনিক ত্যাগ করিয়া ফাঙ্কফর্ট, মারবুর্গ, কোবলেনজ্এ বক্তৃতা করেন। (২৪এ জুলাই—৬ই আগষ্ট) এইসব ভ্রমণকালে তিনি জারমেনীর যুব আন্দোলন (Wondervogel) ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পান; কিভাবে তাহারা পায়ে হাঁটিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, কেমন তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত নিজ চক্ষে দেখিয়া আসেন। যুবকদের নিকট বক্তৃতাও দেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথের জারমেনী ভ্রমণের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সম্রাটের মত জারমেনী পরিভ্রমণ করচি—শ্রেষ্ঠ যা-কিছু আপনিই আমাদের কাছে এসে পড়চে, যেখানে যা কিছু সুন্দর স্মরণীয়; এদেশে মনীষী যাঁরা ভাবচেন, আঁকচেন, লিখচেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহজে সকলের পরিচয় ঘটচে, আমরাও ভাগ পাচ্চি। এমন গভীর ক'রে বিচিত্র ক'রে য়ুরোপকে জানবার শুভযোগ কখনো হবে ভাবেনি। * * পৃথিবীতে কোথাও রবীন্দ্রনাথকে এদের চেয়ে বেশী ভালবাসে ভাবতে পারি না;—'টাগোরে' শুনলেই হোটেলের কর্তৃপক্ষ, ট্রামগাড়ীর টিকিটক্লার্ক, কলেজের ছেলেমেয়ে, অধ্যাপক, বণিক, রাষ্ট্র-নেতা, রাজকুলপ্রতিনিধি—এমন কেউ নেই এ দেশে যার মুখ উজ্জ্বল হয়ে না ওঠে; যেখানেই আমরা যাই জয়ধ্বনি আনন্দ অভ্যর্থনায় এদের পক্ষে উৎসাহ সম্বরণ করা অসাধ্য হয়ে ওঠে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পথে পথে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে 'টাগোরে'কে দেখবে বলে—এ দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যাঁরা তাঁরা সভয়ে ক্ষণেকমাত্র ওঁর কাছে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে উৎফুল্লচিত্তে চলে যান। যার যা-কিছু আছে ফুলের বাগান, সুন্দর বাড়ী, বড় গাড়ী, সমাদর, আতিথ্য অজস্র হয়ে কবির কাছে ঝরে পড়ে; উনি অনাসক্তচিত্তে সকলের মধ্যে দিয়ে চলে যান, কিছুই ওঁকে বাধে না। সমস্তক্ষণই এত ইনস্পায়ার্ড থাকেন যে,

যখনই যা বলচেন তা কবিতার মত শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পায়। চিন্তার চরম ঐশ্বর্য পথে পথে ছড়িয়ে চলে যান।" (সোমনাথ মৈত্রকে লিখিত পত্র হইতে, প্রবাসী ১৩৩৭ কার্তিক পৃঃ ১৭)

জারমেনীর ভ্রমণ শেষ করিয়া কবি উত্তরে ডেনমার্ক যান; Elsinore নামক স্থানে শিক্ষার জন্য Scandinaviaর নানা স্থান হইতে ছাত্ররা সমবেত হয়; য়ুরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। এই প্রতিষ্ঠান হইতে রবীন্দ্রনাথেরও নিমন্ত্রণ আসে। এইখানে তাঁহার সহিত উত্তর য়ুরোপের বহু ছাত্রনেতা ও অধ্যাপকের সাক্ষাৎ হয়। ৯ই আগষ্ট কোপেনহেগেনে কবির ছবির প্রদর্শনী হয়।

এলসিনোর হইতে ফিরিবার পথে বার্লিনে এণ্ড্রুস্ আসিয়া কবির সহিত মিলিত হন; তাঁহারা জেনেভায় যান ও সেখানে ১৫।১৬ দিন থাকেন। জেনেভাতে Miss Storey নাম্নী এক ইংরেজ মহিলা কবিকে বিশেষ যত্ন করেন, তাঁহার বাড়ীতেই কবি অতিথি হন। *

জেনেভা আন্তর্জাতিক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র; কবিকে প্রায়ই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতার জন্য আহ্বান আসিত। ছাত্রদের নিকট তিনি সর্বদাই কথাবার্তা বলিতেন, তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে তিনি কখনো ক্লান্তিবোধ করিতেন না।

এই জেনেভা বাসকালেই রাশিয়া যাওয়া স্থির হইল। রবীন্দ্রনাথ যখন জেনেভায় তখন 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ছাপান হইয়া তাঁহার হাতে পৌঁছায়। এই বইখানি সম্বন্ধে কবি একখানি পত্রে লিখিতেছেন :—

"ভানুসিংহের পত্রাবলী সেদিন আমার হাতে এসে পৌঁচেছে। পড়তে

* Although actively abstaining from politics, Tagore revealed, while resting in Geneva, that he is heart and soul for the Indian Nationalist movement. It is understood it was because of the impetus which his presence might give to pro-Gandhi sentiment in the U.S.A. and Russia that the coterie of Englishmen who surrounded him while here continually counselled against his trips "for reasons of health." (New York World, 5 Sep 1930)

পড়তে শান্তিনিকেতন আমার চারিদিকে মূর্তিমান হয়ে উঠল। ভুলে গেলুম যে আছি পশ্চিম সমুদ্রের পারে। আমার কোনো লেখাতেই শান্তিনিকেতনের রূপ এমন রসপূর্ণ হয়ে জাগেনি। * * এই চিঠিগুলির পরিধি দুই ডাক-ঘরের দুই কিনারার মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়, আর-কালের যে-সীমানা আমার আকস্মিক সাতাশ বছর বয়সের মধ্যেই কিছুদিনের জন্যে আবদ্ধ ছিল পত্রাবলী তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। রাণুকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলুম, বঙ্গবাণীর নিত্য ঠিকানায় সেগুলি পৌঁচেছে।" (৫ সেপ ১৯৩৫ ; প্রবাসী ১৩৩৭, ভাদ্র পৃঃ ২২৪)। এ বইখানি কতকগুলি পত্রের সমষ্টি, লেখা 'রাণু'কে। এই রাণু হইতেছেন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারীর কন্যা। ১৩২৪ হইতে ১৩৩০ সালের মধ্যে সেই বালিকাকে লিখিত পত্রগুলি এই সময়ে প্রকাশিত হয় (১৩৩৬, চৈত্র)। কবি বইখানিকে পূর্বে দেখেন নাই ; কারণ তিনি বিলাত যাত্রা করেন ১৮ই ফাল্গুন।

ভারতবর্ষের অনেক খবরই বিলাতের কাগজে প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ-ভাবে প্রকাশিত হয়। ঢাকার হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার কথা তিনি এই সময়ে জানিতে পারেন, কিন্তু বিলাতী কাগজে সে খবরটা উপেক্ষিত হইয়াছিল ; রবীন্দ্রনাথ ৩০এ আগষ্ট Spectatorএ এই অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত একখানি পত্র দেন। পত্রখানি লেখেন জারমেনী হইতে, দেশের বিস্তৃত খবর পাইয়া মন খুবই চঞ্চল হইয়াছিল ; তিনি লিখিতেছেন :—

"A fact of very grave significance at the present crisis in the British rule in India has sorely puzzled my mind. * * * At Dacca in Eastern Bengal, there have been communal riots in which men of vicious character have been brought in, so as to increase the mischief and unspeakable atrocities have occurred. * * * these crying evils continuing from day to day in the capital city of East Bengal have hardly found any mention in English journals. If a single Englishman were injured * * such silence would hardly be kept."

৩৮। রাশিয়ায়

রাশিয়া দেখিবার স্বপ্ন কবির বহুকালের ; এই জাতি নূতন প্রাণ পাইয়া কি ভাবে তাহাদের বিচিত্র ভাষাভাষী অধিবাসীদের আশা আকাঙ্খা মিটাইতেছে, বিবিধ ধর্ম অনুসরণ করিয়াও কি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছে,—ইত্যাদি জানিবার জন্য তাঁহার বিশেষ ব্যাকুলতা হয়। ১৯২৬ সালে কবি যখন বিয়েনায়, তখন একবার তাঁহার নিমন্ত্রণ আসে, শরীরের অসুস্থতাবশত সেবার সোভিএটদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; ১৯২৯ সালে কানাডা হইতে ফিরিয়া, ট্রান্স-সাইবেরিয়ান্ রেল দিয়া রাশিয়া আসিবার কল্পনাও একবার করেন ; শেষ পর্যন্ত তাহাও ঘটে নাই। যাই হৌক এবার চলিলেন। সঙ্গে ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী ও মিঃ এরিয়াম্ উইলিয়ামস ও ডাঃ হ্যারি টিম্বার্স। ডাঃ টিম্বার্স পূর্বে রাশিয়ায় গিয়াছিলেন—১৯১৭ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ে সেবার কার্য করিতেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন জারমেনীতে, তিনিও কবির সঙ্গী হন।

১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথ মস্কো পৌঁছিলেন। ষ্টেশনে কবিকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য অনেকগুলি লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে প্রথমে হোটেলে থাকিতে হয় সেই হোটেলের নাম ছিল গ্রাণ্ড হোটেল ; "বাড়ীটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র।" পরদিন Voks অর্থাৎ সংস্কৃতিগত মিলনের যে সমিতি আছে সেখানে কবির সম্বর্ধনা হয়। এই সমিতির সভাপতি অধ্যাপক Petroff ; তিনি কবিকে সোভিএটের মর্মকথা সমঝাইবার চেষ্টা করেন ; কবিও শুনিয়া ভাবিয়া ও প্রচুর পড়িয়া সোভিএটের স্বরূপটি বুঝিতেছিলেন।

এবং সেই কথাই 'পত্রধারা'য় লিখিতে থাকেন, পরে সেগুলি একত্র করিয়া 'রাশিয়ার চিঠি' নামে বইতে প্রকাশিত হয় (২৫এ বৈশাখ, ১৩৩৮)।

সন্ধ্যায় মস্কোর লেখকসঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য সমবেত হন। সভায় Petroff যে ভূমিকা করিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন, সেই বক্তৃতার একটি স্থানে আছে—

"Rabindranath Tagore is one of those men who have followed with the closest attention and interest the great events developing during the last ten years in the history of humanity. It is obvious that one so gifted with spiritual and poetic insight could not have gone away without seeing this most inportant page of human hi꞉tory, that page which bears the name of the great October Revolution".

"We who have taken part in the October Revolution and assisted at the construction of new forms of human culture, extend a warm welcome to one who has come amongst us, as a profound thinker, to study our culture, study our strivings for the renewal of human society, and thus of human personality itself."

পেট্রোফের বক্তৃতার পর অধ্যাপক Kogan, Pinkevitch ও সোভিএট লেখক Shaklar কিছু কিছু বলেন, কবি ও তদুত্তরে কিছু বলিয়াছিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর কবি মস্কো-এর প্রথম Pioneer Commune দেখিতে যান। এখানে পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকারা বাস করে, তাহাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র হইতেছে কম্যুনিজম শিক্ষা এবং হাতেকলমে সেই জীবন যাপন করা। কবির সঙ্গে তাহাদের অনেক কথা হয় সেগুলি তিনি তাঁহার 'রাশিয়ার চিঠি'র মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। দুইদিন পরে কবি রাশিয়ার বিখ্যাত Peasant Home চাষীদের ঘর—দেখিতে যান। এই ধরণের বাড়ী দেশময়—সহরে-গ্রামে নির্মিত হইয়াছে ; এগুলি চাষীদের সামাজিক, মিলনের ক্ষেত্র—এইখানেই

তাহারা শিক্ষা, সংস্কৃতি সব পায়। চাষ সম্বন্ধে, সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য এইখান হইতে তাহাদের মধ্যে দেওয়া হয়। এই আবাসের অধ্যক্ষ কবিকে অভ্যর্থনা করেন ও চাষীদের নিকট কবি সম্বন্ধে বলেন। কবি চাষীদের অনেক প্রশ্ন করেন এবং তাহারা উত্তর দেন। তাহারা কবিকে বলে যে পূর্বের ব্যক্তি-গত চাষকাজ হইতে সঙ্ঘবদ্ধ চাষের কাজ অনেক লাভজনক; কিভাবে ধীরে ধীরে লোকে এই প্রণালীর সুবিধা বুঝিয়া Commune Farmএর সভ্য হইতেছে সে কথা তাহারা কবিকে বলে।

কবি মস্কৌতে তাঁহার ছবি লইয়া গিয়াছিলেন, ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহার ছবির প্রদর্শনী হইল। বহুলোক উহা দেখিতে আসিয়াছিল। রাশিয়ায় আর্টের নব জন্ম হইয়াছে; বিপ্লবের সময় অধ্যাপক ও ছাত্ররা ধনীর গৃহ হইতে আর্ট-সামগ্রী লইয়া ম্যুজিয়মে রাখিয়াছিল, ধ্বংস হইতে দেয় নাই।

মস্কৌ ত্যাগ করিবার পূর্বে কবি স্থানীয় থিএটার দেখিতে যান; প্রথম দিন যান Frist State Operaতে; পরদিন রবিবারে যান Moscow Art Theatreএ; সেখানে টলষ্টয়ের Resurrection উপন্যাসটির অভিনয় হইতেছিল। এই অভিনয় সম্বন্ধে কবির মত কি তাহা তিনি পত্রধারায় প্রকাশ করিয়াছেন। শেষ কয় দিন কবি নানাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। এইসব ছাত্রদের অনেকেই কবির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলী। কবি তাহাদের কাছে তাঁহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবেই বলেন।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছেন, সুতরাং আমাদের পক্ষে তাহার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক। তবে একথা সত্য যে কবির মনকে সোভিএট খুব একটা নাড়া দিয়াছিল, কিন্তু এবার তিনি সে-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ বিষয়ে সাবধান ছিলেন, যাহা বলেন তাহা Cultural।

২৫এ সেপ্টেম্বর তিনি মস্কৌ ত্যাগ করেন ও বার্লিনে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া ৩রা অক্টোবর 'ব্রেমেন' জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করিলেন; টিঘার্স ও ও আরিয়াম সঙ্গে চলিলেন। রথীন্দ্রনাথরা য়ুরোপেই থাকিলেন।

রাশিয়া থেকে লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই তিনি দেশের অশান্তির জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ; ঢাকার দাঙ্গার ব্যাপারটা কাঁটার মত বিঁধিতেছে (দ্রঃ রাশিয়ার চিঠি পৃঃ ২১)।

স্পেক্‌টেটরে যে পত্রখানিতে কবি ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে দেশবাসীর ধৈর্য ও সৎসাহসের কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন সেটি বার্মিংহামের Council for Indian Freedom সমিতি মুদ্রিত করিয়া ঐ দেশে বিতরণ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে জুলাইমাসে ভারতের বড়লাট লর্ড আরুইন্ ঘোষণা করেন যে ভারতের এই রাজনৈতিক অশান্তি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বিলাতে একটি গোলটেবল বৈঠক বসিবে। ইংলণ্ডের তিনটি প্রবল পার্টির সদস্য ও ভারত হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের লইয়া এই বৈঠক হইবে। প্রস্তাব সাধু ; কিন্তু ভারতীয় সদস্য কাহারা হইবে তাহা স্থির করিলেন ভারত গবর্মেণ্ট, ভারতীয় জনমত নহে ; ভারতীয় জনমত ত' অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স জারী হওয়ায় মূক হইয়া গিয়াছে ; কংগ্রেসের কাজ বন্ধ ; সুতরাং ভারতের প্রতিনিধিরা গোলটেবল্ বৈঠকে স্থান পাইল না, স্থান পাইল গবর্মেণ্টের মনোনীত লোক ; সুতরাং দেশের লোকের এ জিনিষের উপর শ্রদ্ধা হইল না। মহাত্মাজীকে গবর্মেণ্ট এই সভায় যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু তিনি এমন কতকগুলি সর্ত দাবী করেন যে তাহা সরকারের পক্ষে স্বীকার করিতে গেলে রাজকীয় মহিমা নষ্ট হয়। এই অবস্থায় দূর হইতে দেশের সকল খবর পাওয়া কঠিন, তথাচ রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত পত্র লেখেন ; পত্রখানি ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০ স্পেক্‌টেটরে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ গোলটেবিল সম্বন্ধে লিখিলেন, "The gesture inspired not merely by the political necessity, but the necessity of a world sanction." মহাত্মাজীর এই গোলটেবিলে যোগদান করা উচিত কি না সে সম্বন্ধে বলিলেন, "I believe that it would have been worthy of Mahatma Gandhi if he could have accepted unhesitatingly the seat offered to him, even though the conditions were not fully acceptable to himself. To come

there without any absolute assurance of political success would all the more enhance the significance of his moral mission. * * *

"And now he has had the opportunity to introduce the moral spirit of the (non-violent resistance) movement into a Conference which only he has made compelling possible and which only could have been used as a platform wherefrom to send his voice to all those all over the world who truly represent the future history of man. * * It waits for a man of genius, as he surely is, to turn it into an instrument for giving expression to the spirit of the age in the field of political intercommunication. I feel sad that such an opportunity has been lost for the moment for India and for all the world. For today is the age of co-operation in all departments of life, including politics...."

মহাত্মাজীর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ববলে ভারতের মুক মুখে যে ভাষা আসিয়াছে,ক্ষীণ হস্তে যে বল আসিয়াছে, দুর্বল চিত্তে যে সাহস আসিয়াছে তাহার কথা স্মরণ করিয়া কবি পত্র শেষে বলিতেছেন "I hesitate to doubt his wisdom when he holds himself aloof from the invitation." "Let me believe in his firmness, and not in my doubts."

Spectator এর সম্পাদক মন্তব্যে লিখিলেন যে তাঁহারা কবির সকল মতের সঙ্গে একমত নহেন, কিন্তু "We welcome his outspoken letter."

৩৯। আমেরিকায়

রবীন্দ্রনাথের মার্কিনযাত্রার দিন দশ পূর্বে মিঃ এণ্ড্রুস আমেরিকায় যান তাঁহার অগ্রদূত হইয়া (২৪ সেপ)। নিউইয়র্কে কবির অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ভালই ছিল। এবার কবির সঙ্গে আছেন ডাঃ টিম্বার্স ও মিঃ এরিয়াম।

কবি নিউইয়র্ক হইতে বষ্টন আসিলেন ; সেখানে Bishop Paddock এর বাড়িতে কয়েকদিন থাকেন ; পরে কয়েক দিনের জন্য New Haven এ যান। সেখানে তাঁহার শরীর খুব খারাপ হয় এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আমেরিকার বক্তৃতা পালা বন্ধ করিতে হয়। কবির শরীর খারাপের খবর পাইয়া প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড উদ্‌গ্রীব হইয়া তার করেন, পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইল কবি অসুস্থ। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা লইয়া এমন কাণ্ড সকলে করিতে লাগিলেন যে একটু বাড়াবাড়ি মনে হয় ; মোট কথা বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ হইল, অথবা বক্তৃতা বন্ধ করিবার জন্য কবি খুব অসুস্থ এই রবটি তোলা হইল। আমাদের সন্দেহ হয় যে কবি যে বক্তৃতা দেন নাই, তাহার কারণ কেবলমাত্র স্বাস্থ্য নহে তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই, এবং তিনি খুব অসুস্থ ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে বক্তৃতা হইতে নিবৃত্ত করা হয়। রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা, দ্বিতীয়ত ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা পাছে তিনি বলেন—এ বিষয়ে বোধহয় পূর্বাহ্নেই সকলেই সতর্ক হন। মিঃ এণ্ড্রুস পূর্বে আসিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই।

কবি যখন অসুস্থ তখন হাঙ্গেরি Balaton Fured এর লোকেরা খবর পাইয়া, চারি বৎসর পূর্বে কবি সেখানে যে-গাছটি পোঁতেন সেটিকে দেখিতে যায় ; তাহারা গাছটিকে সজীব দেখে ; তাহাদের বিশ্বাস যে গাছ যখন বাঁচিয়া আছে তখন কবি নিরাময় হইবেনই,—এই বলিয়া তাহারা কেব্‌ল্ করে।

নিউ হাভেন্ হইতে ২৬এ অক্টোবর ফিলাডেলফিয়া যান ও ১৬ই নভেম্বর নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে তিনি পরিশেষের 'তুমি' কবিতাটি

লেখেন। নিউইয়র্কে কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম বিরাট ব্যবস্থা প্রকাণ্ড Reception কমিটি। ২৫এ নভেম্বর তাঁহারা Biltmore হোটেলে প্রায় দুইহাজার লোকের এক ডিনার দিলেন! সে এক রাজসিক ব্যাপার! নিউইয়র্কের Saturday Review এই ভোজ সম্বন্ধে লিখিল (6 Dec) যে, 'নিমন্ত্রিতের তালিকাটিতে কারবারী লোক, ধনী লোকের নাম অনেক দেখা গেল, কিন্তু একজন কবির নাম পাইলাম না,—এমনকি একজন লেখকেরও নাম নয়। এরূপ ব্যাপার কি কখনো ফ্রান্সে হইতে পারিত!' কবিকে লইয়া তাহারা মাতামাতি করিতেছে, কিন্তু কবির কি বলিবার আছে, তাহা শুনিতে তাহাদের ইচ্ছা নাই! কবির সঙ্গে প্রায়ই দেখা করেন বৃটীশ দূত স্যর রোনাল্ড লিনড্‌সে—তিনিই তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট হুভারের সঙ্গে দেখা করিতে লইয়া গেলেন! হুভারের সঙ্গে কথাবার্তা হইল অত্যন্ত সাধারণ ধরণের; বৃটীশ রাজদূত খুবই ভদ্রতা করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন।

১লা ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ কার্নেগি হলে একটিমাত্র বক্তৃতা করেন শিক্ষা সম্বন্ধে, আর ৭ই তারিখে বাহাই সম্প্রদায়ের ব্যবস্থানুযায়ী The first and the last prophet of Persia সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি কি বলেন তাহা হেলেন কেলার শুনিতে ইচ্ছুক হন; কবি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; তখন কেলার কবির ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি রাখিলে কবি সংক্ষেপে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় বলেন; কেলার এই স্পর্শানুভূতির দ্বারা 'শ্রবণ' করিলেন।

Ruth St. Denis নামে একজন বিখ্যাত নর্তকী কবির কতকগুলি কবিতা নৃত্যে দেখাইয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ তুলিতে রাজি হন; শেষকালে কবি সেই টাকা নিউইয়র্কের বেকারদের জন্য দিয়া দিলেন। নিউইয়র্কে এই তাঁহার শেষ কাজ; তারপর দিন Europe নামে জাহাজে তিনি য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বেহালাবাদক Kreisler।

এবার আমেরিকা ভ্রমণের একটিমাত্র নূতনত্ব ছিল—সেটি হইতেছে Boston, New Yorkএ তাঁহার চিত্রের প্রদর্শনী। আনন্দকুমার স্বামী কবির ছবি সম্বন্ধে একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন।

আমেরিকা বাসকালে Will Durant-এর সঙ্গে কবির পরিচয়টি গভীর হইয়াছিল। Will Durant আমেরিকার একজন চিন্তাশীল লেখক। তিনি ভারতবর্ষে আসেন এখানকার দর্শনাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য, তারপর এখানকার অবস্থা দেখিয়া সেই বিষয়ে একখানি বই লেখেন; বইখানির নাম The Case for India। বইখানি তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন— উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল 'You alone are sufficient reason why India should be free'। দুঃখের বিষয় এই বইখানি বাঙলাদেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই, যত বই বিদেশ হইতে দোকানদাররা অর্ডার দিয়াছিল, তাহার একখানিও আসিয়া পৌঁছায় নাই (দ্রঃ, বঙ্গের পুস্তকালয় ও বঙ্গভাষা সম্বন্ধে রামানন্দ বাবুর বক্তৃতা, প্রবাসী ১৩৩৮ শ্রাবণ, পৃঃ ৫০৯)

বিলাতে ফিরিয়া কবি ভাবিয়াছিলেন বিশ্বভারতীর জন্য কিছু কাজ করিতে পারিবেন; সময়টা ছিল ভাল কারণ তখন প্রথম 'গোলবৈঠক' বসিয়াছে, ভারতের রাজা মহারাজা ও নানা শ্রেণীর নেতারা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনিকেতন হইতে কালীমোহন ঘোষ বিলাত যান এইসব বিষয়ে খাটিবার জন্য। টাকা তুলিবার জন্য ইতিপূর্বেই একটি কমিটি কোয়েকারদের দ্বারা গঠিত হয়। এবার লণ্ডনে একটি কমিটি গঠিত হইল। এই সমিতির সভ্য ছিলেন Lady Parmoor, ন্যাশনাল গ্যালোরির অধ্যক্ষ A. M. Daniel, Master of Balliol College A. B. Lindsay, M. Sadler, Rothenstein প্রভৃতি। আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর Spectator-এর সম্পাদক Mr. Evelyn Wrench কবিকে Hydepark Hotel-এ সম্বর্ধনা করেন। (কবির বক্তৃতা—দ্রঃ, Man. Guard. 9 Jan 1931) এই সভায় বার্ণাড শ'র সহিত কবির দীর্ঘ আলোচনা হয়। Major Yeats-Brown-এর সঙ্গেও পরিচয় হয়।

এদিকে গোলটেবিলে গোড়া হইতে গোল বাধিয়াছিল। ভারতীয় প্রতিনিধি, বিশেষভাবে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণ কোনো একটি নির্দিষ্ট মতে উপনীত হইতে পারিতে ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথকে মাঝে সালিশি করিবার জন্য সকলে ধরেন কিন্তু তিনি এইসব রাজনৈতিক রথীদের নিকট পরাভব মানিলেন।

২২এ ডিসেম্বর ১৯৩০ কবি য়ুরোপে ফিরিলেন এবং জানুয়ারী মাসে দেশের দিকে যাত্রা করেন, ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে ফিরিলেন।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। শান্তিনিকেতনে বগ্‌দনভ (Bogdonov) নামে এক রুশীয় পণ্ডিত পূর্বে পারসিক ভাষা পড়াইতেন ; পরে আফগানিস্থানে ভাল কাজ পাইয়া সেখানে চলিয়া যান ; আমানুল্লার পতনের পর বিপ্লবের সময় তিনি ভারতে চলিয়া আসেন ও শান্তিনিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন Dr. Garmanus ইস্‌লামীয় অধ্যাপক ; তবুও তাঁহাকে কয়েক মাস পোষণ করা হয় ; বিশ্বভারতী কোনো দিন তাঁহাকে বরাবর পোষণ করিবে এ আশ্বাস দেন নাই। যাই হোক তাঁহার এই আশাটা দাবীতে পরিণত হয় এবং তিনি খুব তিক্তভাবে Miss Storeyর কাছে বোধহয় এইসব সম্বন্ধে বলেন। Dr. Collinsও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়েন ও ভারতীয়দের উপর ভীষণভাবে অশ্রদ্ধাবান হন ; তিনিও তাঁহার মতামত সেই মহিলাটিকে বলেন। মিস্ ষ্টোরি তাঁহার নাম সার্থক করিয়া কবিকে এখানকার বিদেশী অধ্যাপকদের অকৃতজ্ঞতার কথা ব্যাখ্যা করেন। কবি ইহাতে অত্যন্ত ব্যথা পান এবং লেখেন যাঁহাদের এদেশের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদের পক্ষে আশ্রম বাস কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর নহে। কবির আসিবায় আগেই তাঁহাদের চলিয়া যাইতে হয়। বিশ্বভারতী হইতে Dr. Collinsকে একটা থোক টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ১৯৩১ সালের গোড়ায় এইটি ঘটে। জ্ঞানের দিক হইতে দুইজনই বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

৪০। রবীন্দ্র-জয়ন্তী

কবি দেশে ফিরিলেন মাঘের মাঝামাঝি, জানুয়ারীর শেষে (১৯৩১) এবার কবির বিদেশে কাটে প্রায় ১১ মাস। এবারকার ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দেওয়া ; দ্বিতীয়ত তাঁহার ছবির প্রদর্শনী করা ; ও তৃতীয়ত রুশিয়া পরিদর্শন। কবিকে লোকে জানিত কবি বলিয়া,

কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে এই একটি বিদ্যা আছে তাহা কেহ জানিত না। ১৯২৮ সাল হইতে তাঁহার ছবি আঁকার খেয়াল সুরু। গত কয়েক বৎসরে সহস্রাধিক ছবি আঁকিয়াছেন; এবং এখনো অবসর সময়ে ছবিই আঁকেন; ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি নাই। রবীন্দ্রনাথের ছবি ভাল কি মন্দ সেসব আলোচনা আমাদের কর্তব্য নহে, অন্যে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহাও আমাদের বিচার্য্য নয়; কারণ সার্টিফিকেট ভাল মন্দ দুইই হয়। ছবির দিক হইতে সেগুলি বিচারের সময় এখনো হয় নাই।

বিদেশ হইতে আসিবার পর (মাঘ ১৩৩৭) কবির মন পুনরায় কবিতা ও গানের নেশায় মাতিয়াছে। কবিতা কম—কিন্তু গান একের পর একটি করিয়া আসিতেছে। সেই গানগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিলেন। তবে পূর্বে 'বসন্ত' ও 'শেষ বর্ষণে' রাজা, কবিশেখর, কবি, মন্ত্রী প্রভৃতিকে আনিয়া তাহাদের মুখ দিয়া গানের যেভাবে ব্যাখ্যা ও রসের ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন 'নবীন' নামে এই গীতিগুচ্ছটিতে সে-শ্রেণীর অভিনেতা নাই, বক্তাও নাই। কবি স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন। তাহার পরে হইতেছে গান ও নৃত্য। দোলের জন্যই ইহা প্রথমে লেখেন ও শান্তিনিকেতনে প্রথমে অভিনীত হয় (৪ঠা মার্চ ১৯৩১ ২০এ ফাল্গুন)।

কিছুকাল কলিকাতায় ইহার অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় ও সেই সঙ্গে জুজুৎসু খেলাও দেখানো হইবে স্থির হয়। পাঠকের স্মরণ আছে বৎসর একের উপর শান্তিনিকেতনে কবি একজন জুজুৎসু মল্লকে জাপান হইতে আনেন। ভাবিয়াছিলেন দেশের যুবকরা আগ্রহের সহিত ইহা শিক্ষা করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসিবে; অনেক বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়, কিন্তু দেশ সাড়া দেয় নাই। অথচ ইহার গুরুভার বহন করা কবির পক্ষে ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। কলিকাতার যুবমহলে এই বিষয়ে কৌতূহল জাগাইবার জন্য স্থির হইল কলিকাতায় প্রদর্শনী হইবে।

৩০এ ফাল্গুন (১৩৩৭) ১৪ই মার্চ নিউএম্পায়ার থিএটরে 'নবীন' নামে বসন্তোৎসবের নাট্যাভিনয় হয়। নবীনে ২১টি নূতন গান আছে। নবীন দুই পর্বে সম্পূর্ণ। প্রথম পর্ব ছিল বসন্তের আবির্ভাব ও পূর্ণ পরিণতি; কালের মধ্যে চিরপুরাতন নবীনের নানা রসরূপ এবং তারই প্রভাবে মানব মনে বিচিত্র

আনন্দলহরীর ধ্বনি। দ্বিতীয় পর্বে আরম্ভ হইল বসন্তের বিদায়ের পালা। কবির ছুটির দিন। 'নবীনের' কতকগুলি গান চির অমর হইয়া থাকিবে যেমন তাহার সুর তেমনি তাহার imagery ; 'নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হলো জোয়ার স্রোতে শুক্লারাতে চাঁদের তরণী'—ইহার তুলনা কোথাও কি আছে, জানিনা।

এই সময়ে দিলীপকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন "বয়স সত্তর হোলো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায় বাকি নেই। * * * এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও সংখ্যাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোনখানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং অব্যক্তে।

"বহুকাল আগে 'কড়ি' ও কোমল'-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম— 'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

"তার মানে হচ্চে এই, মানুষ যেখানে অমর সেখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যেই মোটামোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারি নে। স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠল না—কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হ'য়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।" (অনামী পৃঃ ৩৪৬)

শুধু দিলীপকে পত্র নয়, এই সময়ের আরও কতকগুলি পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; 'পত্রধারা' নাম দিয়া প্রবাসীতে (১৩৩৮ অগ্র, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র) প্রকাশিত হয়। কোনো আচারনিষ্ঠা মহিলা কবিকে ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কবি তাহার উত্তর দেন অনেকগুলি চিঠিতে। ধর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বর সম্বন্ধে যেসব মত তিনি প্রবন্ধাকারে লিখিয়াছেন, এখানেও সেই কথা বলিয়াছেন, তবে পত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ থাকে বলিয়া সেগুলি খুব স্পষ্ট হয়, সেদিক থেকে ইহাদের মূল্য খুবই বেশি। বাহিরের তাগিদে 'পত্র-ধারা' লিখিতে গিয়া মনের সঙ্গে অনেক বুঝাপড়া হয়।

কিন্তু অন্তরের অন্তরাল হইতে আসিতেছে কাব্য লক্ষ্মীর প্রেরণা ; 'পরিশেষে'র অনেকগুলি কবিতা এই সময়ে লিখিত 'নীহারিকা' 'প্রণাম' 'আদি', 'বৈশাখেতে তপ্তবাতাস মাঝে', 'জন্মদিন', 'পান্থ', 'পরিণয়', 'বালক বয়স ছিল যখন' ইত্যাদি। সবগুলিই লিখিত ২৫এ বৈশাখের পূর্বেই।

২৫এ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইল ; এই উপলক্ষে আশ্রমে বিশেষভাবে জন্মোৎসব হয়। কলিকাতার ছাত্রসমাজ 'কবি পরিচিতি' নামে বইখানি এই দিনের স্মরণার্থ প্রকাশ করেন। শান্তিনিকেতনের এই উৎসবে অনেক গুণী ও ভক্ত, পূর্বতন ছাত্র যোগ দিয়াছিলেন। এই জন্মদিনকে স্মরণ করিয়া 'প্রণাম' ও 'জন্মদিন' কবিতা দুটি লেখেন।

'কবি পরিচিতি'র এই 'প্রণাম' কবিতাটির মধ্যে কবির জীবনের আশা আকাঙ্খার কথাটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটির এক প্রকার ব্যাখ্যা করেন তিনি জন্মদিনের অভিভাষণে। ২৫এ বৈশাখ যা কিছু অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তার বিস্তৃত বর্ণনা 'প্রবাসী'তে ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ)।

এই দিন 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হয় ; এই গ্রন্থখানি সুরেন্দ্রনাথ করকে কবি উৎসর্গ করেন ; ঐ দিন সুরেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীমতী রমা দেবীর বিবাহ হয়। রমা দেবী ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা ও ৺সন্তোষচন্দ্রের ভগ্নী। (দ্রঃ পরিশেষ, পৃঃ ৪৮)

জন্মোৎসবের পর কবির শরীর খারাপ হওয়ায় রথীন্দ্রনাথ পিতাকে লইয়া দার্জিলিঙে গেলেন ; সেখানে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের কিয়দংশ থাকেন। সেখানে বসিয়া চলিতেছে 'পত্রধারা' মাসে মাসে (প্রবাসী দ্রষ্টব্য)। এই সময়ের একটি কবিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই। বাঙলা দেশের বহু যুবক ভুটান সীমান্তের নিকটস্থ বক্সা দুর্গে অন্তরায়িত আছে ; তাহাদের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসিক। তাহারা সেখানে ২৫এ বৈশাখ কবির 'জন্মোৎসব' করে ; প্রথমে তাহারা কবির উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পাঠ করে, 'জনগন মন' গানটি করে, শেষকালে 'শেষবর্ষণ' অভিনয় করে। তাহারা যে অভিনন্দনটি কবিকে পাঠায় তিনি সেটি দার্জিলিঙে পান ও তাদের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লেখেন, (১৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)।

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন,
ফোয়ারার রন্ধ্র হ'তে
উন্মুখর ঊর্দ্ধ স্রোতে
বন্দি বারি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন।

এদিকে দেশময় রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে জয়ন্তী করিবার জন্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ২রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে বিরাট সভা হয় ও স্থির হয় যে খৃষ্টমাসে সপ্তাহব্যাপী বিরাট উৎসব কলিকাতায় হইবে।

কবি দার্জিলিঙ হইতে ফিরিয়াছেন। শরীর খুব ভাল নয়। কিন্তু শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না; বিশ্বভারতীর টাকার অভাব ঘোচে না—অথচ টাকা সংগ্রহের ভার মাত্র একজনের উপর। স্থির হইল কবি একবার ভুপালের নবাবের কাছে যাইবেন। তখন ডাঃ মহম্মদ আলি নামে একজন কর্ম্মিষ্ঠ যুবক শ্রীনিকেতনে (কৃষি অর্থনীতিজ্ঞ Agricultural Economist) বাস করিতেন। ইনি হায়দ্রাবাদের মুসলমান এবং আশা করিয়াছিলেন ভুপালও নিজামের ন্যায় উদারহস্তে দান করিবেন এবং সেই মধ্যবর্ত্তিতার গৌরব তিনি অর্জন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কবির আসা-যাওয়ার দুর্ভোগই সার হইল; রাজ্যের রাজকোষে অর্থাভাব এবং সুদিন হইলে নবাবসাহেব কবিকে যথোচিত সম্মান দেখাইবেন ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দিয়া ও আড়ম্বরপূর্ণ অতিথি সৎকার করিয়া বিদায় করিলেন। কবি একখানি পত্রে লিখিতেছেন * 'ভুপাল থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেচি। * * রাজপ্রাসাদে ছিলুম দুটো দিন মাত্র। আরও দুই এক জায়গায় যাবার সঙ্কল্প ছিল। আমার এবং তাঁদের সৌভাগ্যক্রমে, যাঁদের লক্ষ্য করে যাওয়া, তাঁরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সেটা উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে ক্ষতিজনক, কিন্তু মনের শান্তির পক্ষে অনুকূল।'

উদ্দেশ্য সাধন হইল না; শুধু হাতে ফিরিতে হইল। এইভাবে অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিকর, মনের পক্ষেও আরামপ্রদ

---

* (১০ই শ্রাবণ ১৩৩৮; প্রাবসী ১৩৩৮ আশ্বিন পৃঃ ৭৪১)

নহে। অথচ উপায় নাই; সময় তখন খুব খারাপ। বিশ্বভারতীরও যেমন, নিজেদেরও তেমনি। সমস্ত শান্তভাবে সহ্য করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকালে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। দেশের অবস্থা নানাদিক হইতে অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে; কিছুকাল পূর্বে কাণপুরে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে; কলিকাতায় 'প্রাচীন কাহিনী' নামক একখানি বইতে ১৫শ শতাব্দীর কোনো মুসলমান চিত্রকরের অঙ্কিত পয়গম্বর হজরত মহম্মদের একখানি চিত্র দেওয়ার অপরাধে প্রকাশককে দুইজন পাঞ্জাবী মুসলমান যুবক হত্যা করে।

রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দুঃখই বাঙলার একমাত্র দুঃখ নয়। প্রকৃতির রুদ্রলীলা আসিয়া বাঙালীর দুঃখের পসরা পূর্ণ করিল। আসিল বন্যা, প্লাবন দুর্ভিক্ষ। কবি এইসব অশান্তির কথা উল্লেখ করিয়া একখানি পত্রে লিখিতেছেন (২০ ভাদ্র ১৩৩৮) "চিত্ত নিরতিশয় পীড়িত ক'রে তোলে অত্যাচারের কথা। আমার বেদনাবহ নাড়ী এই রকম কোনও সংবাদের নাড়া খেয়ে যখন ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে, তখন সে যেন কিছুতেই থামতে চায় না। সম্প্রতি দেহমনের উপর সেই উপদ্রব দেখা দিয়েচে।

"এতদিন বন্যা প্লাবনের দুঃখ দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল; তার উপরে চটগ্রামের বিবরণটা সাইক্লোনের মত এসে 'তার সমস্ত বাসাটা যেন নাড়া দিয়েচে।" (প্রবাসী ১৩৩৮ আশ্বিন, পৃ: ৮৫৪)।

এই সময়ে চট্টগ্রামের হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক যে অত্যাচার চলে তাহার কাহিনী বাঙালীমাত্রেই জানেন। কবির মন এইসব ঘটনাশ্রবণে অত্যন্ত বিচলিত হয়।

মোট কথা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মতভেদ চারিদিকে বিসদৃশ আকার ধারণ করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা লইয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন (হিন্দু মুসলমান, প্রবাসী ১৩৩৮ শ্রাবণ পৃ: ৪৫১-৫৫)। প্রবন্ধে তিনি বলেন ভারতের সামনে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দিবার সময় আসিতেছে; সুতরাং না-দিবার যুক্তি একদল চাকুরে সংগ্রহ করিবেনই নিজেদের স্বার্থ ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই অসদ্ভাব ও দাঙ্গার ব্যাপার তাহাদের ইন্ধন জোগায়; ফলে তাহাদের পক্ষে 'দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে

দেগে দেওয়া' খুব স্বাভাবিক হইবে—"ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবামাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারিদিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকেরদেরকে দিয়েও একথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভাল। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয় বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই-সেইখানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে-পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।"

সময়টা ভারতের পক্ষে পরীক্ষারই বটে; বিলাতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বসিতেছে, মহাত্মা গান্ধীকে এবার লইবার জন্য খুবই চেষ্টা হইতেছে। গান্ধীজির সহিত লর্ড আরুইনের একটা চুক্তি হইয়া উভয়পক্ষ হইতে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। মুসলমান পক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ, তাঁহারা পৃথক নির্বাচনাদি বিষয় একমত; জাতীয়তাবাদী হিন্দুরাই সমস্ত সমস্যাকে ভারতের দিক হইতে দেখিতেছিলেন।

সাহিত্যিক রচনার মধ্যে এই সময়ে দেখি তাঁহাকে কতকগুলি গল্প ও উপন্যাসের সমালোচনা করিতে। 'পরিচয়'* একখানি নূতন পত্রিকা। তাহার সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তর অনুরোধে কবিকে লেখনী লইতে হইল।

'পরিচয়ে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক) কবি একখানি পত্রে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লেখেন; সেই সংখ্যায় জগদীশচন্দ্র গুপ্তর 'লঘু ও গুরু' গল্পের বইএর সমালোচনা লেখেন। এই রচনায় রিয়ালিজম্ সাহিত্যে কি বস্তু কবি তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে কবির লিখিত অনেকগুলি গ্রন্থ-সমালোচনা চোখে পড়ে।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের ভক্তমহলে কিভাবে জয়ন্তী-উৎসব সম্পন্ন করা যায়

* ১৩৩৮ শ্রাবণে 'পরিচয়'নামে একখানি নূতন ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত 'রাশিয়ার চিঠি'র বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হয়। ১৩৪৩ শ্রাবণ হইতে মাসিকপত্র হইয়াছে।

তাহা লইয়া জল্পনা চলিতেছে। সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথকে অর্ঘ্য দিবার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার কথা ভাবিতেছিলেন। কিন্তু সময়টা ছিল দেশের পক্ষে অত্যন্ত মন্দ; রবীন্দ্রনাথ আয়োজনকারীদের মুখপাত্র শরৎচন্দ্রকে লিখিলেন,—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অর্ঘ্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সঙ্কল্প করেচ। দেশে এখন দারুণ দুর্দিন, এসময়ে অন্য কোনো ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবী করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখ হরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে সেজন্য চেষ্টা করচি—কলকাতায় এই উদ্দেশে একটা কিছু পালাগানের কথা চল্‌চে—এই উপায়ে কিছু কুড়োনো যাবে আশা করি। তোমরা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অল্প স্বল্প যা কিছু একত্র করতে পারবে আমার হাতে দিলে এই পুণ্য কর্মে আমার সহায়তা করা হবে। নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারি এই বন্যাতে সে উপায় রাখে নি। ইতি ১২ ভাদ্র ১৩৩৮।

উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত দুর্গতদের সাহায্যার্থে অর্থ তুলিবার জন্য কবি বিশ্ব-ভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া কলিকাতায় একটি জলশা করিলেন। জলশার জন্য গান ও আবৃত্তি ছাড়া 'শিশুতীর্থ' নামে একটি ক্ষুদ্র রূপক-নাটিকা লিখিলেন। সেটিকে নৃত্যে ভাবব্যঞ্জনায় গীতে ভরিয়া দিলেন। গল্পটি অনবদ্যভাষায় লিখিত, এবং অপরূপ নৃত্যছন্দে ঝঙ্কৃত। *

'শিশুতীর্থ'র ইংরেজি The Child লেখেন কিছুদিন পূর্বে; শিশুতীর্থ ইংরেজি হইতে অনুবাদ (শ্রাবণ ১৩৩৮ পুনশ্চ পৃঃ ১০১-১১১)। তার বিষয়টা ছিল শিশুর জন্ম। কবি একটি ছবিও আঁকিয়া এই বিষয়টাকে দেখাইবার চেষ্টা করেন। (দ্রঃ প্রবাসী ১৩৩৮, মাঘ)

ভাদ্র (১৩৩৮) মাসের শেষে কবি বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী লইয়া কলিকাতায় গেলেন। সেখানে ম্যাডান থিএটরে ও প্যালেস্ অব ভ্যারাইটিজে

(সনাতনম্ এ নবঃ আহুর্ উতাভস্তাৎ পুনর্ণব······· বিচিত্রা : ৩৩৮ ভাদ্র, ১৪৩–১৫০)।

দুই দিন (২৮, ২৯, ভাদ্র) অভিনয় হয়। এই গীতাভিনয় রসবেত্তার চিত্তকে সত্যই সৌন্দর্যের অপরূপ লাবণ্যে বিভোর করিয়াছিল।

৩১এ ভাদ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৬তম জন্মোৎসব হয়। তদুপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি রচনা পাঠাইয়া দেন। তাহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তাহার বর্তমান পরিণতি নির্দেশ করেন। †

গীতোৎসবের পর কলিকাতায় একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হয়। ৩রা আশ্বিন (৩০এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তথাকার অধ্যাপকবর্গ রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করিয়া অতিশয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাসহকারে 'কবি সার্বভৌম' উপাধি দান করিয়াছিলেন। §

কবি বলেন, "এই বিদ্যামন্দির থেকে সম্মানলাভের কল্পনা কোনো দিন আমি করি নি, এ আমার আশার অতীত। একদিন ছিল যখন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের বিরোধ ছিল। তখন বাংলা অপরিণত, সাহিত্যের অনুপযোগী। এর দৈন্যকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল। কিন্তু যে শক্তি তখন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে শক্তি এ কোথা থেকে পেয়েছে? সংস্কৃত ভাষারই অমৃত উৎস থেকে।"

* আরও দুই দিন য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ৩১এ ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন অভিনয় হয়। 'বিচিত্রা' লিখিতেছেন,"অভিনয়ের এ এক অভিনবরূপ ; অভিনয় বলিতে এতদিন বুঝিতাম কোনো নাটক বা নাটকের আকারে গদ্যে বা ছন্দে লিখিত কোনো পুস্তকের সঙ্গীত ও নৃত্য-সহযোগে বা বিনা সঙ্গীতেও বিনা নৃত্যে অভিনয়। কিন্তু সেদিন গীতোৎসবে যাহা অভিনীত হইয়াছিল তাহা নাটক বা নাটকাকারে লিখিত কোনো পুস্তিকা নয়। সেটিকে দর্শকদের সম্মুখে রঙ্গমঞ্চের উপর রূপায়িত করা হইয়াছিল নৃত্যসহযোগে আবৃত্তির ভিতর দিয়া। সুদীর্ঘ গদ্য-কবিতার, প্রত্যেকটি ভাবই" নৃত্যের দ্বারা প্রতিফলিত হইয়াছিল। "ইহা অভিনয়েরই একটি রূপান্তর বটে কিন্তু এ ধরণের অভিনয় পূর্বে কখনো দেখি নাই।" (১৩৩৮ কার্তিক, পৃঃ ৫৬১)।

† এই প্রবন্ধটি প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎসমিতির অনুরোধে লেখা (২৭এ শ্রাবণ) এবং তাঁহারা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার আসন্ন জন্মদিনে যে পুস্তিকাখানি বাহির করিতেছেন তাঁহাতে প্রকাশিত হইবে (প্রবাসী ১৩৩৮ আশ্বিন, পৃঃ ৫০৬-৮)।

§ অভিভাষণ 'বিচিত্রা' ১৩৩৮ কার্তিক, পৃঃ ৪২১-২২ ; সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর অভিনন্দন ঐ পৃঃ ৪২৫-২৮।

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষার দানকে স্বীকার করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্যশ্রেণী হইতে বাদ দিবার কথা হয়, তখন তিনি প্রতিবাদ করেন। শান্তিনিকেতনে যত কিছু উৎসব হয়, তার জন্য প্রাচীন সংস্কৃত থেকে ভাল ভাল অংশের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা হয়; কবি সেগুলি নিজে অনুমোদন করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সত্বেও তিনি বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের অনুগ করেন নাই।

এই কয়দিনের পরিশ্রমে উত্তেজনায় কবির শরীর খুব খারাপ হয় এবং তিনি দার্জিলিঙ যাইবেন স্থির করেন। ইতিমধ্যে বাংলায় এমন একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, যাহা পুনরায় কবিকে পাবলিকের সম্মুখে আসিতে বাধ্য করিল। ঘটনাটি এই।

এই সময়ে হিজলি জেলে অনেক যুবক অন্তরায়িত অবস্থায় আছে। ১৬ই আশ্বিন, (৩০এ অক্টোবর) সেখানে কয়েকজন বন্দীকে সিপাহীরা সামান্য কারণে গুলি করে এবং অনেককে নির্মমভাবে প্রহার করে। নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা ও প্রহার—ইহা ইংরেজ ইতিহাসে অশ্রুত। এই ঘটনায় দেশ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, কাগজে পত্রে কৌন্সিলে তীব্র সমালোচনা হয়। তখন প্রেস আইন সম্বন্ধে নূতন আইনের খশড়া তৈয়ারী হইতেছে সুতরাং লোকে তখনো তাহাদের মনোব্যথা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইত। সমগ্র বাংলাদেশ পুলিশের এই ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল; টাউনহলে বিরাট সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ মনুমেণ্টের তলায় দাঁড়াইয়া এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিলেন; তাঁহার শরীর তখন খুব দুর্বল, তিনি তখন দার্জিলিঙ যাইতেছেন; কিন্তু দেশের এই বেদনায় তিনি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

'সমগ্র বাঙালী জাতির প্রতিভূরূপে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ টাউনহলের সভায় বাঙালীর মর্মন্তুদ বেদনার কথা বিশ্বসকাশে নিবেদন করিয়াছেন। লক্ষাধিক বাঙালীর সেদিন টাউনহলে সঙ্কুলান হয় নাই, তাই মাঠে রবীন্দ্রনাথকে সভা করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাণস্পর্শিনীভাষায় বলিয়াছিলেন :—

"প্রথমে ব'লে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাহিরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোন অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে

আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলিচালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

"এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক ; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে।

"যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধ'রে নিতেই হবে যে, ভারতে বৃটীশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতীকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাঁদের 'পরে, সেইসব শাসনকর্তা এবং তাঁহাদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই, এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

"এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই ব'লে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী-রাজা যত পরাক্রমশালী হোক্ না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার ক'রে নিত্য বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে ; কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাহাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি! এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

"আমি আজ উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই

যে, তাঁরা যেন একথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্ক-লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যত উচ্চে ধ'রে আছে, তত উর্ধ্বে আমাদের ধিক্কার-বাক্য পূর্ণ-বেগে পৌছিতে পারবে না। একথাও মনে রাখতে হবে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গভীর শান্তি যেন রক্ষা করি, যাতে ক'রে পাপের মূলগত প্রতীকারের কথা চিন্তা করার স্থৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

"উপসংহারে শোকসন্তপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।" (দ্রঃ মাসিক বসুমতী ১৩৩৮ আশ্বিন)।

এই ঘটনার সরকারী অনুসন্ধান প্রকাশিত হইবার পর ষ্টেটস্‌ম্যান রক্ষীদের সম্বন্ধে নানাকথা অবতারণ করেন ও খৃষ্টানোচিত আদর্শে ক্ষমা করিবার জন্য বলেন। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে যাহা লেখেন তাহাও আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"হিজ্‌লী-কারার যে-রক্ষীরা সেখানকার দুজন রাজবন্দীকে খুন ক'রেচে তাদের প্রতি কোনো একটি এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খৃষ্টোপদিষ্ট মানব প্রেমের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেচেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এত বেশী অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসঙ্গত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এইসব অত্যন্ত চড়া নাড়ীওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ ক'রে থাকে, এদের বাসা আরামের, আহার-বিহার স্বাস্থ্যকর।—এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেইসব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্ট-কালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করচে। সম্পাদক তাঁর সকরুণ প্যারাগ্রাফের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ ক'রে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেচেন। * * *

"সুকুমার মাতৃতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচার পদ্ধতি মঞ্জুর হতে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েচে তাকে অপমানিত করা হবে, এবং সর্বসাধারণের মনে এর যে ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহ প্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না। * * *

"বেআইনী অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে এবং তার ন্যায়সঙ্গত পরিণাম যেন অনিবার্য হয় এইটেই বাঞ্ছনীয়। অথচ একথাও ইতিহাস বিখ্যাত যে যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ ক'রে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ততার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

"পরিশেষে আমি গবর্মেণ্টকে এবং সেই সঙ্গে আমার দেশবাসিগণকে অনুরোধ করি যে অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডব নৃত্য এখনি শান্ত হোক্। ক্রোধ ও বিরক্তিপ্রকাশকে বাধামুক্ত ক'রে দেওয়া সাধারণ মানবপ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা শাসক শাসয়িতা কারও পক্ষেই সুবিজ্ঞতার লক্ষণ নয়। এ রকম উভয়পক্ষে ক্রোধমত্ততা নিরতিশয় ক্ষতিজনক—এর ফলে আমাদের দুঃখ ও ব্যর্থতা বেড়েই চল্‌বে এবং এতে শাসনকর্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘট্‌বে, লোকসমাজে এই পৌরুষের প্রতিষ্ঠা তার উদার্যের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।" (প্রবাসী ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ পৃঃ ৩০৪-৩০৫)।

আশ্বিন-কার্তিক বা অক্টোবর মাসটা দার্জিলিঙে আছেন। কবিতা লেখা পুস্তক সমালোচনা,* চিঠিপত্র লেখা, ছবি আঁকা এই সব লইয়া আছেন। পরিশেষের 'অপূর্ণ' 'মিলন' কবিতা দার্জিলিঙে লেখা। 'মিলন' কবিতাটি ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দিরার বিবাহোপলক্ষ্যে লিখিত (১৭ কার্তিক ৩৮)।

এই সময়ে বাংলাদেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল—বাঙলার লোক বাঙালীর বা বাঙলাদেশের কলে প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করিবে—এই

* মাটির স্বর্গ, প্রবাসী ১৩৩৮ অগ্রঃ পৃঃ ২১০।

ছিল আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা হবার কারণ জুটিয়াছিল; বোম্বাইএর মিলমালিকরা এই সময়ে সস্তায় দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়লা কিনিতেছিলেন ও বাংলার কয়লা বাদ দিয়া। ফলে বোম্বাইএর কাপড় ব্যবহার করা হবে না বলিয়া আন্দোলন ওঠে—আন্দোলনের নেতা ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনে যোগ দেন ও 'বাংলার তাঁতি' নামে একটি প্রবন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। কবি প্রবন্ধের একস্থানে লেখেন, "বাংলার মিল থেকে যে-কাপড় উৎপন্ন হচ্চে যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালী ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। এ'কে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা।" কবি দেশবাসীকে প্রথমে তাঁতের তৈরী কাপড় পরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন ও যেখানে লোকের অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইবে না সেখানে যাহাতে তাহারা বাংলার মিলের কাপড় ব্যবহার করে সে বিষয়ে বলিলেন। (বিচিত্রা ১৩৩৮ কার্তিক পৃঃ ৪২৭)।

দার্জিলিঙ হইতে কবি ফিরিয়াছেন। রাসপূর্ণিমার দিন নন্দলাল বসুর ৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি কবিতা রচনা করিয়া শিল্পীর সম্বর্ধনা কবি করিলেন। তখন দেশময় রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজন চলিতেছে; সেক্রেটারী অমল হোম। তিনি রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তীর জন্য অক্লান্ত শ্রম করেন। টাউন হলে সভা—সভায় যাঁহারা যাবেন, তাঁদের টিকিটের দক্ষিণা পাঁচ, পঁচিশ, একশ ইত্যাদি। এই সময়ে বাঙলার নানাস্থানে বন্যা হয়, কবি ঘোষণা করিয়াছিলেন উৎসবের উদ্বৃত্ত অর্থ দুর্গতদের জন্য দেওয়া হউক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। বিশ্বভারতীর জন্যও একটা তহবিল গড়িয়া উঠিতে পারে এ আশাও অনেকে করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় আয়োজনকারীরা বাহ্যাড়ম্বরে বিজ্ঞাপনীতে এত অধিক ব্যয় করেন যে, শেষ পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকে নাই বলিয়া শুনিয়াছি: কারণ বন্যাপীড়িত দুর্গত বা বিশ্বভারতীর তহবিলে দিবার মত কিছুই ছিল না।

শান্তিনিকেতনে পৌষোৎসব (১৩৩৮) করিয়া কবি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। টাউন হলে সপ্তাহব্যাপী উৎসব। ৯ই পৌষ (২৫এ ডিসেম্বর ১৯৩১) জয়ন্তী উপলক্ষ্যে টাউন হলে চিত্র ও কলা প্রদর্শনী হয়। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ছবি, তাঁহার নানা বয়সের চিত্র, শান্তিনিকেতনে নানা অনুষ্ঠানের ফটো দেখানো

হয়। ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীযুক্ত বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য বাহাদুর প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। রবীন্দ্রনাথ মহারাজার সহিত সভায় আসেন ও বক্তৃতায় ত্রিপুরা পরিবারের সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কথা সংক্ষেপে বলেন। উৎসবের ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান।

সেই দিন সন্ধ্যায় ও পরদিন (৯ই ও ১০ই) জয়ন্তী উপলক্ষ্যে য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে গীত-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীত জলশায় ৬৫টি গান গীত হয়।

১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর ৩১) রবিবার অপরাহ্ণকালে টাউনহলের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহার সংবর্দ্ধন করা হয়। পঞ্চমুদ্রার নিম্নে দক্ষিণা না থাকা সত্ত্বেও সভাক্ষেত্রে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে মেয়র শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ও জয়ন্তীপরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় কবিকে লইয়া টাউন হলে প্রবেশ করেন।

প্রথমে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মেয়র অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে বলেন, "একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবি কীর্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

"আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণীজন অখ্যাত-রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবি সম্বর্ধনার ভার লইয়াছেন।"

কবির প্রতিভাষণের পর জয়ন্তী-পরিষদের পক্ষ হইতে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিধুশেখর ভট্টাচার্য স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিয়া কবিকে অর্ঘ্যদান করিলেন ও পরে প্রশস্তি পাঠ, শান্তি পাঠ প্রভৃতি হইল।

অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কবিকে একটি প্রশস্তি দান করেন। সাহিত্যপরিষদ কবির ৫০ ও ৬০তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূর্বে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন সে-কথার উল্লেখ ইহাতে

আছে। "বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদিগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সাদরে ও সগৌরবে" তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরে শ্রদ্ধার সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয়দ্বয়ের নাম করিয়া বলিলেন, "আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে—যাঁহাদের হস্ত অদ্য স্তব্ধ, যাঁহাদের বাণী নীরব।" * * *

তৎপরে পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের তরফ কবিকে অভিনন্দনের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করেন ও কবি হিন্দীভাষায় তাহা প্রতিভাষণ করেন। ইহার পর প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে শ্রীমতী প্রতিভাদেবী কবিকে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন ও একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হেকিন্স্ আমেরিকাবাসীর পক্ষ হইতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অতঃপর জয়ন্তী উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীমতী কামিনী রায় অর্ঘ্যপত্র পাঠ করেন; পরিষদের সভাপতি জগদীশচন্দ্র বসু শারীরিক অসুস্থতাবশত উপস্থিত ছিলেন না। কবি তাঁহার প্রতিভাষণে যাহা বলেন, তাহার শেষাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষের মতই, উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূতদান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অদ্যকার এই দিন সার্থক হইত না। আমার আঘাত-প্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই বিধাতার মহৎ দান —দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।"

অতঃপর 'গোল্ডেন বুক অব্ ঠাকুর কমিটি'র পক্ষ হইতে শ্রীরামানন্দ

চট্টোপাধ্যায় কবিকে উক্ত গ্রন্থ ও শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনস্থ 'রবীন্দ্র পরিচয় সমিতি'র দ্বারা প্রকাশিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামক গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন।

'বংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। (বিস্তৃত বিবরণ—প্রবাসী ১৩৩৮, মাঘ দ্রষ্টব্য)।

ইহার পর একদিন সিনেট হাউসে ছাত্রসমাজ রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধিত করেন। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রতিভাষণ দেন; এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা সেই অভিভাষণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ হইতে যে উৎসব হয়, তারই অঙ্গস্বরূপ অভিনীত হয় 'শাপমোচন' নামে বাক্যহীন নাটিকা। কোনো দর্শক লিখিয়াছিলেন,

"একাধিক দিক থেকে 'শাপ-মোচন' একটি সত্যকার নূতন সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলির অভিনয় দেখেছি তাদের থেকে 'শাপমোচনে'র একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথম নাটকখানির কথোপকথনের অংশ বাণীহীন; অর্থাৎ তার সমস্তটুকুই tableau দ্বারা সাধিত হয়। যে কথিকাকে অবলম্বন ক'রে শাপমোচনের সৃষ্টি, সে কাহিনীটি কবি নিজে আবৃত্তি করেন এবং তাঁর সেই আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে অভিনেতৃবর্গ মূকাভিনয় ক'রে যান। মধ্যে মধ্যে গীত রচনা চলে। দ্বিতীয়ত 'শাপমোচন' নাটকের প্রথম কথাটি থেকে আরম্ভ ক'রে শেষ কথাটি পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন নৃত্যের ছন্দে গাঁথা, অভিনেতৃবৃন্দের ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিমায় অভিনয় কালের সমস্তক্ষণটুকু স্পন্দিত হতে থাকে। সেইজন্য কবি একে নৃত্যাভিনয় আখ্যা দিয়েছেন।" (নবশক্তি, ২৩এ পৌষ ১৩৩৮, ৩য় বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা)।

এই ধরণের নৃত্যাভিনয়ের প্রথম পরীক্ষা করিয়া ছিলেন 'শিশুতীর্থ', গীতোৎসবে (ভাদ্র ১৩৩৮)। শাপমোচনে ইহার অপরূপ আর্ট পরিণতি।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর উৎসবে নানা শিল্পকলার নিদর্শন ছিল; তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী। ১৯৩০ সালে তিনি য়ুরোপের নানাস্থানে যথা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জারমেনী, রুশিয়া, আমেরিকায় চিত্র প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙলাদেশে এই প্রথম। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে সাধারণ ছবি হইতে তফাৎ তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। আর্টিষ্টদের মধ্যে

ইহার মূল্য লইয়া মতভেদ আছে। কবি স্বয়ং এগুলিকে কি চোখে দেখেন, তাহা আমরা জানিতে পারি তাঁহার একটি ভূমিকা হইতে। প্রদর্শনীর ছবিতে কবি নাম দেন নাই কেন, সে কথায় কৈফিয়তে তিনি (রামানন্দ বাবুকে) লিখিয়াছিলেন ; "ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি ; আমি কোন বিষয় ভেবে আঁকিনে—দৈবক্রমে কোনো অজ্ঞাত কুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনকরাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটিমাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল—বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহূত এসে হাজির—রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন, তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন,—নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন। * * রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ, তারপরে নামবৃষ্টি অপরের।" (প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ, পৃঃ ৬০২)। এ কৈফিয়তে সকল শ্রেণীর আর্টিষ্টকে খুসী করা যায় কিনা জানি না।

জয়ন্তীর শেষ অনুষ্ঠান হয় ৫ই জানুয়ারী (২০ পৌষ ৩৮)। ইণ্ডিয়া সোসাইটি অব্ ওরিএন্টাল আর্টের সদস্যগণ দ্বারা ঐদিন কবির নিজভবনে অর্ঘ্যপ্রশস্তি দান হয়। এই দিনের জন্য কবি "তোমাদের দান যশের ডালায় সবশেষ সঞ্চয়"—এই কবিতাটি রচনা করিয়া প্রত্যুত্তর দেন। সত্যই কবি আখ্যাতেই তাঁহার যশসৌরভ নিঃশেষিত হয় নাই, আজ রূপশিল্পীরাও তাঁহাকে তাহাদের মধ্যে স্রষ্টারূপে পাইল। (বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ)।

এই অনুষ্ঠানটি পাবলিকভাবে না হইবার কারণ ছিল ; জয়ন্তী-উৎসব ৪ঠা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সংবাদ আসিল মহাত্মা গান্ধী ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩২ কারারুদ্ধ হইলেন। ইহার ইতিহাস এই :—

গত শরৎকালে গান্ধীজি দ্বিতীয় গোলবৈঠকে যোগদান করিবার জন্য গিয়াছিলেন ; সেখানে তিনি ভারতের জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় নাই। দেশে ফিরিলেন ২৮এ ডিসেম্বর। আসিয়া দেখেন নূতন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিংডন উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে, সংযুক্ত-প্রদেশে ও বাঙলাদেশে কড়াভাবে

শাসন করিতেছেন। মহাত্মাজী ভারতের এই অবস্থা সম্বন্ধে বড়লাটের সহিত আলোচনা করিবার জন্য অনুমতি চান; তাঁহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় নাই এবং অবশেষে ৪ঠা জানুয়ারী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। এসব সম্বন্ধে সমালোচনা আমাদের আলোচনার বাহিরে। এই সংবাদ পৌঁছাইলে জয়ন্তী উৎসবের প্রদর্শনী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; রবীন্দ্রনাথও এই সংবাদে বিচলিত হন ও ফ্রী প্রেসে এই বাণীটি প্রেরণ করেন—

"Mahatmaji has been arrested without having been given a chance of coming to a mutual understanding with the Government. It only shows that of the two partners in the building of the history of India, the people of India can superciliously be ignored according to our rulers. However the fact has to be accepted as a fact, and we must prove to the world that we are important, more important than the other factor which is merely an accident. But if we lose our head and give vent to a sudden fit of political insanity, blindly suicidal, a great opportunity will be missed. * * * This is a kind of catastrophe which rarely comes to a people, with a shock that brings to a focus our scattered forces and shortens the difficulties of our creative endeavour in the building of our freedom.

"The primitive lawlessness of the law-makers should forcibly awaken us to our own ultimate salvation in a love which own no defeat in the face of a power which baricades itself with an indiscriminate suspicion that its blind panic can not define. This is the time when we must never forget our responsibility to prove ourselves morally superior to those who are physically powerful in a measure that can defy its own humanity. (বাঙলা অনুবাদ প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ, পৃঃ ৬০২)।

রবীন্দ্রনাথের মনে ভরসা ছিল মহাত্মাজি এই পীড়িত দেশে মুক্তি আনিবেন কিন্তু তাহার যে বাধা কত তাহা কেহই জানিতেন না। মহাত্মাজির এই অপ্রত্যাশিত বন্ধন কবিকে খুবই বিচলিত করিয়াছিল দেশের নানা অশান্তির ব্যাপার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ; সেই সময়ে লেখেন 'প্রশ্ন'।
(পরিশেষ পৃঃ ২৪০)।

"ভগবান তুমি যুগেযুগে দূত পাঠায়েছ বারেবারে
　　　　দয়াহীন সংসারে।
তারা গেল বলে ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালবেসো—
　　অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।—
ধরণীর তারা স্মরনীয় তারা, তবুত বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।"

মনের অত্যন্ত তীব্রতায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো।

কী বেদনায় এ সন্দেহ আজ আসিয়াছে! মহাত্মাজির বন্ধনের পর জহরলাল প্রভৃতি অনেক নেতাই কারারুদ্ধ হন। এইসব ব্যাপারে কবির মন উত্তেজিত। তিনি প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডকে এই কেব্‌লটি করেন।

"The sensational policy of indiscriminate repression being followed by Indian Government starting with imprisonment of Mahatmaji is most unfortunate in causing permanent alienation of our people from yours making it extremely difficult for us to co-operate with your representations for peaceful political adjustment."

জয়ন্তীর পর কবি কলিকাতার নিকটবর্তী খড়দহ নামক স্থানে গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাড়ীতে আছেন। ২২এ জানুয়ারী হিজ্‌লী বন্দীশালায় বন্দীদের 'রবীন্দ্র জয়ন্তী'র অভিনন্দন পাইয়া তাহাদের আশীর্বাদ প্রেরণ করেন। (বিচিত্রা ১৩৩৮ চৈত্র, পৃঃ ৪২৩)। ২৫এ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসের দিন ছাত্রদের

অনুরোধে একটি বাণী লিখিয়া দেন ; সরকারী সেন্সর তার অনেকগুলি কথা বাদ দিয়া লেখাটি মুদ্রিত করিতে দেন।

বাহিরের রাজনৈতিক চঞ্চলতা স্পর্শ করে মনকে, কিন্তু গভীরভাবে রেখা রাখিয়া যায় না, তাঁহার কবি-মন আবার কাব্য হিন্দোলে দুলিয়া ওঠে। 'পরিশেষে'র অনেকগুলি কবিতা লিখিলেন এই সময়ে। 'তমিস্রা' 'অপ্রকাশ', 'নির্বাক' 'দীপশিখা' 'মালী' 'রাজপুত্র' 'প্রতীক্ষা' 'অগ্রদূত' 'শূন্যঘর' 'ছায়া', 'শ্যামলা', 'ধর্মমূঢ়তা' 'বসন্ত উৎসব' সবগুলি লেখেন ফাল্গুন ও চৈত্রের মধ্যে পারস্য যাইবার পূর্বে।

সমস্ত গম্ভীর কবিতার মধ্যে গুটিকয়েক কবিতা তীব্র পরিহাসভরে লিখিত —যেমন: 'শূন্যঘর', 'ভোজনবীর' গৌড়ীরীতি (পরিচয় ১৩৩৯ বৈশাখ 'খাপ-ছাড়া' নামে আবোলতাবোল কাব্য দ্রঃ)।

এই সময়ে বাংলা সাময়িক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। এই বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পৌষ (১৩৩৮) মাসের 'বিচিত্রা'য় ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তার পর বৎসরের শেষদিকে তাঁহার বাড়ীতে একদিন ছন্দ লইয়া আলোচনা হয়। প্রবোধবাবু এই আলোচনার একটি বিবৃত 'বিচিত্রা'য় (১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' সম্বন্ধে রচনাগুলি বিশ্বভারতী প্রকাশ করিয়াছেন (১৩৪৩)।

ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় কবি খড়দহ হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন ; শ্রীনিকেতনের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন (৬ই) ও দেশের কাজ বলিতে কি বুঝায় তাহা খুব সহজ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন—দেশের কাজ কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, উহা বিলাতের সহিত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টামাত্র নয়, শুধু চোখ বুজিয়া তুচ্ছ বিষয়ে বিদেশীর নকল করা নয়। "আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড় বিষয়ে ওদের অনুবর্তন করতে হবে,— কোমর বেঁধে বল্‌তে চাই কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হ'লেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব। * * দেশকে আপন ক'রে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা।" (দেশের কাজ, প্রবাসী ১৩৩৮ চৈত্র পৃঃ [৭৫৯-৬১)। স্বদেশী যুগে যেকথা বলিয়াছিলেন, এযে দেখি সেই কথারই

পুনরাবৃত্তি। মনোরাজ্যে তিনি আন্তর্জাতিক কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তিনি পরিপূর্ণ স্বাদেশিক—লোকে অনেক সময়ে এই কথাটি ভুলিয়া যান।

এই সময়ে সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে কবিবরের চিত্রের একটি প্রদর্শনী খোলেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রদর্শনীতে যেসব ছবি ছিল সেগুলি এসময়ে ফিরিয়া আসে ও অধ্যক্ষ দে সরকারী কলাশালায় একজিবিশন করেন। (২০এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ ৭ই ফাল্গুন)। কবি পুনরায় কলিকাতায় যান ও কলাশালায় উদ্বোধনের দিনে উপস্থিত ছিলেন। * প্রদর্শনীর চিত্রতালিকায় কবির নামের পূর্বে 'স্যর' উপাধি ও ছবির নামকরণ হওয়ায় কবি ক্ষুব্ধ হন।

কিছুকাল হইতে কবির পারস্য যাইবার কথা হইতেছিল ; সমুদ্রপথে অনেক ওঠানামা, তাই স্থির হয় এরোপ্লেনে যাইবেন। কবির বয়স সত্তরের উপর, এরোপ্লেনে যাইতে পারিবেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী (৮ ফাল্গুন) বৈকালে ডাচ্ এরোপ্লেনে চড়েন। ডাচ্ কন্সাল-জেনারেল ও তাঁহার স্ত্রী কবির সঙ্গে যান। আধ ঘণ্টা ঘুরিয়া দিব্য হৃষ্টদেহে নামিলেন ; বোঝা গেল পারস্য যাত্রাকালে এরোপ্লেনে কষ্ট হইবে না। ইহার কয়েকদিন পর (২৫ ফাল্গুন) 'পক্ষী মানব' কবিতাটি লেখেন—"যন্ত্রদানব, মানবে করিল পাখী" (বিচিত্রা ১৩৩৯)।

রাজনৈতিক ব্যাপার ভারতে যতই কুজ্ঝটিকাবৃত হউক কবির মন হইতে ইংলণ্ডের মনীষিদের সহিত সহযোগ করিবার আশা এখনো দূর হয় নাই, বিদেশী বন্ধুদের অনুকূলতায় বৃটীশ শাসনের মধ্যে নৈতিক পরিবর্তন আসিবে ইহার আশা এখনো করেন। বিলাতে Archbishop of York, Master of Balliol, Prof. Gilbert Murray, Sir Francis Younghusband প্রভৃতি মনীষিগণ কিছুকাল হইতে ভারতের সহিত মিত্রতা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ভারতের অবস্থা জানিবার জন্য কয়েকজন ইংরেজ (Society of Friends) † এই সময়ে আসেন ও তাঁহারা শান্তিনিকেতনে

* দ্রষ্টব্য: The Englishman. Cal. 22 Feb. 1932 ; যামিনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার চিত্রকলা, বিচিত্রা ১৩৩৮ চৈত্র পৃঃ ৩০৩-৬।

† Miss Hilda Cashmore, Warden of Manchester Univ. settlement, Mr. Eric Hayman & Percy W. Bartlet of the Fellowship of Reconciliation (Society of Friends).

আসিলে তিনি তাঁহাদের নিকট তাঁহার আশা ও ভরসার কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন,—

We in India are ready for a fundamental change in our affairs which will bring harmony and understanding into our relationships with those who have inevitably been brought near to us. We are waiting for a gesture of good will from both sides, spontaneous and generous in its faith in humanity, which will create a future of moral federation, of constructive works of public good of the inner harmony of peace between the peoples of India and England.

The memory of the past, however painful it may have been for us all, should never obscure the vision of the perfect, of the future which it is for us jointly to create. (Visvabharati News, March 22, 1932).

৪১। পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ

পারস্যভ্রমণে (১৯৩২ এপ্রিল-মে), কবির সঙ্গী হইলেন প্রতিমা দেবী, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। একই প্লেনে সকলের জায়গা হইবে না বলিয়া কেদারনাথ এক সপ্তাহ পূর্বে যাত্রা করেন। কেদারনাথ হইতেছেন 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, শিল্প-সমঝদার ও পণ্ডিত।

১১ই এপ্রিল (২৯ চৈত্র, ৩৮) ভোর পাঁচটায় দমদমের এরো-ঘাঁটি হইতে

জাহাজ ছাড়িল। দ্বিপ্রহরে এলাহাবাদে কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ থামে তার পর অপরাহ্নে পৌছান যোধপুর; সেখানে মহারাজ কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার বিশ্রামের জন্য এরোড্রোমের হোটেলে বিশেষ ব্যবস্থা করেন। পরদিন প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িয়া মধ্যাহ্নে করাচী পৌছায়; সেখানে বহুলোক কবিকে সম্মান দর্শাইবার জন্য উপস্থিত হন।

১২ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে তাঁহারা পারস্য সীমানায় Jask এরোঘাঁটিতে পৌছাইলেন। এরোপ্লেন পারস্যসীমানায় পৌছাইবার পূর্বে বেতারে কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া খবর আসিল Jask ও বুশীয়র হইতে। একটি আসিল পারস্যোপ-সাগর ও দক্ষিণ-পারস্যের শাসনকর্তার নিকট হইতে, অপরটি আসিল জাস্কের বেতার ষ্টেশন হইতে। জাস্কে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন (১৩ই) প্রাতে যাত্রা করিয়া দ্বিপ্রহরে কবি বুশীয়ার পৌছিলেন। তখন খুব ঝড় তুফান চলিতেছে। এরোপ্লেনের পথ এখানেই শেষ। বুশীয়রে দুই দিন ছিলেন। রাজকীয় সমাদর এখান হইতে আরম্ভ হইল। কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয়েছিল শ্রীযুক্ত পুরেজা নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের বাড়ীতে। সেখানে স্বয়ং গবর্ণর-জেনরেল, সম্ভ্রান্ত কর্মচারী এবং শহরের যত গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে কবির রাজকীয় অভ্যর্থনা করিলেন। "আদর অভ্যর্থনা এবার 'রাজসিক' ভাবে আরম্ভ হল। চারিধারে বন্দুকে সঙীন চড়িয়ে সেপাইশান্ত্রী, বড় বড় রাজকর্মচারীর ছুটোছুটি এবং ক্রমাগত লোকজনের দরবার।" (কেদারনাথ, প্রবাসী ১৩৩৯ ভাদ্র, পৃঃ ৭০৪)। সেই দিন দিন্‌শ ইরাণী বোম্বাই হইতে জাহাজে আসিয়া বুশীয়রে পৌছিলেন; ইনি পারস্য ভ্রমণকালে কবির সঙ্গী হইলেন।

বুশীয়রে সর্বসাধারণ ও স্থানীয় গবর্ণর কবিকে অভিনন্দন উপলক্ষে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন; কবিও তাহার উত্তর দেন। গবর্ণরের ভাষণের অনুবাদ 'বিচিত্রা'য় (১৩৩৯ ভাদ্র পৃঃ ১৫৬) প্রকাশিত হয়; আমরা নিম্নে একটি প্যারা উদ্ধৃত করিতেছি। "আজ যে শ্রদ্ধেয় অতিথিকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করবার দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ আমাদের ঘটেছে, এঁর মোহিনীশক্তি অগ্রদূত হয়ে এসে কিছুকাল ধরে অমোদের অধীর আগ্রহান্বিত প্রতীক্ষাকে হর্ষোজ্জল করে রেখেছিল। এঁকে পৃথিবীর সকল জাতি কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে-বিষয়ে কোনো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; যেখানেই মনের উৎকর্ষ আছে, বিদ্যা

আছে, সেখানেই এঁর গ্রন্থাবলী যে সমাদর লাভ করছে, জনে জনে ইনি বিতরণ করেছেন যে-প্রেমের ও সমবেদনার বাণী তাই থেকেই এঁর গুণের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যাকাশে ইনি উজ্জ্বলতম তারকারাজির অন্যতম; মানুষের চিন্তার মধ্যে ইনি সঞ্চারিত করেছেন যে কল্যাণের শক্তি তা যেমনই পবিত্র তেমনই নিষ্কলঙ্ক।"

কবি লোকের আগ্রহ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছেন; য়ুরোপে লোকে তাঁহার কাব্য পাইয়াছিল; এখানে লোকে কাব্যপ্রতিভার কিই বা জানে, অথচ এই অহেতুকী প্রীতির কারণ কি? কবি লিখিতেছেন,"এদের কাছে আমি বিশেষ কবি নই, আমি কবি। কাব্য পারসিকদের নেশা, কবিদের সঙ্গে এদের আন্তরিক মৈত্রী। এদের কাছে শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য কবি। * * পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরো একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইণ্ডো-এরিয়ান।" কিছুকাল হইতে পারস্যে এই আর্যামির একটা চেতনা খুব স্পষ্ট হইয়াছে। মুসলমান হইয়াও আর্য গৌরব বোধ করে।

বুশীয়র হইতে ১৫ই এপ্রিল (২ বৈশাখ,৩৯) মোটর যোগে উত্তর পারস্যাভিমুখে চলিলেন,—গম্যস্থল শিরাজ। শিরাজের পথ দীর্ঘ; পথে কোনারূতাখ তে নামে এক জায়গায় প্রহরীদের মেটে আড্ডায় কবির গাড়ী থামিল মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য। কি বিচিত্র অনুভব জীবনে করিতেছেন! পথ অত্যন্ত বন্ধুর, আঁকাবাঁকা, চড়াই। এক জায়গায় দেখা গেল খাজরুনের গবর্ণর ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছেন কবিকে আগিয়ে নেবার জন্য। রাত্রে খাজরুনে বিশ্রাম করিলেন। পরদিন প্রাতে পুনরায় মোটরযানে শিরাজের পথে চলিলেন। দুর্গম চড়াই, রাস্তা তৃণতরুহীন পথ। দ্বিপ্রহরে শিরাজে আসিয়া মোটর পৌঁছিল। শিরাজকে লোকে বলে 'বেহস্ত' বা স্বর্গ। কেদারনাথ লিখিয়াছেন, "তৃণশস্পহীন মরুময় পাহাড় মাঠ দেখার পর শিরাজের সবুজ দৃশ্য সত্যসত্যই স্বর্গের মত দেখাচ্ছিল।"

রাজকীয়ভাবে শিরাজে কবির অভ্যর্থনা করিয়া একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় কবিকে লইয়া গেলেন। সেই দরবারে শিরাজের সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন; নাগরিকদের হইয়া একজন যে অভিবাদন পাঠ করিলেন তার মর্ম এইরূপ।

'শিরাজ সহর দুটি চিরজীবি মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি। যে-উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবি জীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত। যে-সা'দির দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহুশতাব্দী কাল চিরবিশ্রামে শয়ান, তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে উর্ধ্বে উত্থিত, এবং এখনি কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।' (বিচিত্র ১৩৩৯ আশ্বিন, পৃঃ ২৯৪)।

"Saadi! Behold! From near the Island, where our Great Ancestor transfered his residence from the Paradise, a great and aged man has today stepped into your land. But this time there is not the Descent from the Heavens to the earth, but a journeying from one Paradise to another. Thou hast said and well said, O Saadi! and we, too, in protestation of our good will, take the courage to repeat thy words to our Guest;—

'With such goodness and nicety, from whichever way thou enterest,

'That way is a way which thou openest to the world." (Shiraz, 27 Farvardin 1311 [16 Ap'. 32]).

প্রথম দিন গবর্ণরের বাড়ীতে থাকিলেন। পরদিন একটি ভদ্রলোকের সুসজ্জিত বাগান বাড়ীতে কবির থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। সেইদিন কবি সা'দির কবর দেখিতে গেলেন। সেখানে বিরাট জনসঙ্ঘ কবিকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সে কী আনন্দ উচ্ছ্বাসপূর্ণ অভ্যর্থনা! সা'দির কবরস্থান দেখিয়া আসিয়া কবি সভার লোকদিগকে তাঁহার সহিত পারসিক কবিদের পরিচয়ের কথা বলিলেন। তাঁহার পিতা হাফেজের অনুরাগীভক্ত ছিলেন; তাঁর মুখ হইতে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ বালককাল হইতে শোনেন। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।'

পরদিন (১৮ই এপ্রিল) শিরাজের শহরতলী খলিলাবাদে একটি বাগান-বাড়ীতে কবি গেলেন ; পথে হাফিজের কবর। সেখানে কবররক্ষীরা হাফেজের একখানি গ্রন্থ আনিয়া কবিকে খুলিতে অনুরোধ করিল। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, যে-কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে লইয়া চোখ বুজিয়া এই গ্রন্থ খুলিলে যে কবিতাটি বাহির হইবে, তাহা হইতে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হইবে। কবিও তাহাই করিলেন ; যে পাতা বাহির হইল তাহার দ্বিতীয় কবিতাটিতে অহঙ্কৃত ধার্মিকনামধারীদের সম্বন্ধে ছিল। কবি লিখিতেছেন,

"এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছিল, এখানকার এই বসন্ত প্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সঙ্কেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভর্তি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি ; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধ প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হোলো আজ কত শত বৎসর পরে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেচে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।" (বিচিত্রা ১৩৩৯ আশ্বিন পৃঃ ৩০১)।

নূতন বাগানবাড়ীতে আসিয়া কবি পারস্যের গুল-বেহস্তের শোভা ও সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছেন ; এইখানে পারসিক সঙ্গীত শুনিবার সুবিধা হইল ; এখানকার সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিতেছেন যে সঙ্গীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

শিরাজে কয়দিন বিশ্রাম করিয়া কবি ইস্‌পাহান যাত্রা করিলেন ২২এ এপ্রিল। যথাযথভাবে রাজকীয় কায়দায় সৈন্যশাস্ত্রীর শাস্ত্রমত অভিবাদনের মধ্যে কবির বিদায় হইল।

ইস্‌পাহানের পথে পড়ে প্রাচীন পার্সিপোলিস (পার্সিপুরী) যে মহানগরী মকিদানরাজ অলিক্সন্দর ধ্বংস করিয়াছিলেন। Hërzfeld নামে একজন জার্মান পণ্ডিত, তাঁহার এক যুবক সহকারীকে লইয়া এইখানে বাস করিতেছেন ও প্রাচীন পারসিক প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন বহু বৎসর ধরিয়া। রবীন্দ্রনাথ

আসিবেন বলিয়া Herzfeld খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তিনি কবিকে কতকগুলি দর্শনীয় জিনিষ দেখাইয়া অর্তখোহর্ষের (Artaxerkes) পুস্তকাগারে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। কবির জ্ঞান-পিপাসার অন্ত নাই; পার্সিপোলিসের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করেন।

পথে তাঁহার Adedah নামক স্থানে রাত্রিযাপন করিলেন। পথে শাহরেজা নামে এক গ্রামে কবির মোটর থামাইয়া সেই গণ্ডগ্রামের লোকেরা কবিকে অভিনন্দন করিল; অভিনন্দনটির অনুবাদের কয়েকছত্র তুলিয়া দিতেছি; সুদূর পল্লীর মধ্যে কবিকে গ্রহণ করিতে পারে এমন লোক সেই মরুর দেশে দুর্লভ নহে। কবিতাটির অর্থ এইরূপ :—

ভারতের কারাভানে শর্করা সর্বদাই থাকে, কিন্তু এইবার রহিয়াছে কল্পনার সৌরভ। ও কারাভান, ক্ষণেক দাঁড়াও, তৃষ্ণার্ত হৃদয়সকল তোমার পিছনে চলিয়াছে,—আলোকের পশ্চাতে প্রজাপতির মত; মলয় পবন, সা'দির সমাধি স্থলে স্নিগ্ধ স্পর্শে ও মৃদুশব্দে বহিয়া যাও, কবরের ভিতর সঙ্গী পুনর্জীবিত হইবেন; ঠাকুর! তিনি অপূর্ব, তিনি জ্ঞানী দার্শনিক ও ত্রিকালজ্ঞ; মহান্ কুরুষের দেশে তাঁহার আগমন শুভ ও সৌভাগ্যযুক্ত হউক, যেদেশে কুরুষের এক সন্তান এখন সৌভাগ্যক্রমে রাজমুকুট ধারণ করিতেছেন। (প্রবাসী ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ পৃঃ ২৯৪)।

২৩এ এপ্রিল মধ্যাহ্নে কবি ও যাত্রীদল ইস্‌পাহানে পৌছিলেন। বাগ্-ই-জেরেশক্ নাম উদ্যানবাটিকার দ্বারে ইসপাহানের গবর্ণর কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন। ছয়দিন ইসপাহানে অতিবাহিত হয়। নানা লোকের সহিত আলাপ আলোচনা, নানা প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন সম্বর্ধনার বন্যা চলিল। কবি ইসপাহানের বিখ্যাত মস্‌জিদ, প্রাসাদ প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। একদিন আর্মানীয় গির্জা দেখিতে যান, সেখানেও কবিকে ভক্তেরা বিশেষভাবে সম্মান দেখাইল। ২৭এ এপ্রিল স্থানীয় ম্যুন্সিপালটি কবিকে ও শ্রীদিন্‌শ ইরাণীকে সম্বর্ধিত করেন; দিন্‌শ ইরাণীর পারস্যপ্রীতি কবিকে যে পারস্যভ্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিল তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কবি ইহার জবাবে বলিলেন, 'আমি য়ুরোপ ও প্রাচ্যের বহু দেশ হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছি; সকলেই আমাকে কবি ও চিন্তাশীল মনে করিয়া আহ্বান

করিয়াছেন। কিন্তু আমি আশা করি নাই যে কোনো স্বাধীন দেশের রাজা নিমন্ত্রণ করিবেন। পুরাকালে গুণীর সমাদর ছিল রাজসভায়; এখন রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞরা এইসব কৃষ্টির ধার ধারেন না। সুতরাং শ্রীযুক্ত দিন্‌শ ইরাণী যখন আমাকে জানাইলেন যে পারস্যের শাহ আমাকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতেছেন তখন আমি খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম।' ইহা প্রাচ্যের প্রাচীন রীতির উপযুক্তই হইয়াছে।' ইস্‌পাহানের সঙ্গীত শুনিবার, সেখানকার কার্পেট শিল্প দেখিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল; কোনো জিনিষ কবির কাছে হেয় নয়।

২৯ এপ্রিল ইস্‌পাহান থেকে কবি তেহারাণ যাত্রা করিলেন। কেদারনাথ লিখিতেছেন, "কবির অভ্যর্থনা সম্বর্ধনা, লোকজনের দেখাশুনা আলাপ পরিচয় ইত্যাদি এবার যথার্থ রাজসিক ভাবে আরম্ভ হইল। বুশীরে, শিরাজে ও ইস্‌পাহানে এসব ব্যাপারের যা পরিচয় ও অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এখন দেখা গেল আসল ব্যাপারের কাছে সেটা যৎসামান্য মাত্র।"

তেহারনে কবি ছিলেন দুই সপ্তাহ। এই সময়ে তাঁহার দেখাশুনা করার জন্য সহায় ও কর্ণধার ছিলেন মহামান্য ফুরুঘি—বৈদেশিক মন্ত্রী, শিক্ষাসচিব কৈখস্‌রো শাহরোখ ও শ্রীযুক্ত ফুরুঘি মন্ত্রীর ভ্রাতা ও সাহিত্যিক। দুই সপ্তাহে তেহারনে আঠারোটি অনুষ্ঠান হয়; সকলগুলির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ২রা মে কবির সহিত পারস্যরাজের সাক্ষাৎ হয়। মহামহিম রিজা শাহ পহ্লবী প্রায় এক ঘণ্টা কবির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের খাসকামরায় আলাপ করেন। কবি শাহকে তাঁহার কতকগুলি বই ও সেই সঙ্গে একটি বাঙলা কবিতা ইংরেজি অনুবাদসহ উপহার দেন। কবিতাটি এই :—

আমার হৃদয়ে অতীত স্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।
তোমরা জ্বেলেচ নূতন কালের
উদার প্রাণের আলো,
এসেচি, হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো।

৫ই মে কবিকে নাগরিকদের তরফ হইতে সম্বর্ধনা করা হয়। কবি তাহার উত্তরে যাহা ইংরেজিতে বলেন, দোভাষী পারসিকে তর্জমা করিয়া দেন।

"প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের দ্বার য়ুরোপ উদ্‌ঘাটন করে প্রাণযাত্রাকে নানাদিক থেকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেচে। এই শক্তি প্রভাবে আজকের দিনে তারা দিগ্বিজয়ী। আমরা প্রাচ্য জাতিরা বস্তুজগতে এই শক্তিসাধনায় শৈথিল্য করেচি, তার ফলে আমাদের দুর্বলতা সমাজের সকল বিভাগেই ব্যাপ্ত। এই সাধনার দীক্ষা য়ুরোপের কাছ থেকে আমাদের নিতান্তই নেওয়া চাই।

"এসিয়াকে আজ ভার নিতে হবে মানুষের মধ্যে এই দেবত্বকে সম্পূর্ণ করে তুলতে, কর্মশক্তিকে ও ধর্মশক্তিকে এক করে দিয়ে।

"পারস্তে আজ নূতন করে জাতি-রচনার কাজ আরম্ভ হয়েচে। আমার সৌভাগ্য এই যে, এই নবসৃষ্টির যুগে অতিথিরূপে আমি পারস্তে উপস্থিত, আমি আশা করে এসেচি এখানে সৃষ্টির যে সংকল্পন দেখব তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণ মিলনের রূপ আছে।

"অতীতকালে একদা এসিয়ায় সৃষ্টির যুগ প্রবল শক্তিতে দেখা দিয়েছিল। তখন পারস্ত ভারত চীন নিজ নিজ জ্যোতিতে দীপ্যমান হয়ে একটি সম্মিলিত মহাদেশীয় সভ্যতার বিস্তার করেছিল। তখন এসিয়ায় মহতী বাণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং মহতী কীর্তির। তখন মাঝে মাঝে এসিয়ার চিত্তে যেন কোটালের বাণ ডেকে এসেচে, তখন তার বিস্তার ঐশ্বর্য বহু বাধা অতিক্রম করে বহু বহুদূর দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।"

"তারপর এল দুর্দিন * * * সেই প্রাচীন যুগের গৌরবকাহিনীর স্বপ্নমাত্র নিয়ে অতি দীর্ঘকাল আমাদের দীনভাবে কাটল। আজ এই মহাদেশের নাড়ীতে নাড়ীতে পুনর্যৌবনের বেগ যেন আবার স্পন্দিত হয়ে উঠেচে। ভারতবর্ষের কবিকে আজ ইরাণ যে আহ্বান করেচে এ একটি সুলক্ষণ; এতে প্রমাণ হয় যে এসিয়ার আত্মপ্রকাশের দায়িত্ববোধ দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে দূরে বিস্তীর্ণ হচ্চে।"

"একথা বলা বাহুল্য যে, এসিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি, প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যা স্বয়ং সমাধান করবে, কিন্তু

আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ নিয়ে চলবে, তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সমাধান করবে। * * তাই আজ আমি এই কামনা ঘোষণা করি যে আমাদের মধ্যে সাধনার মিলন ঘটুক। এবং সেই মিলনে প্রাচ্য মহাদেশে মহতী শক্তিতে জেগে উঠুক তার সাহিত্য, তার কলা, তার নূতন নিরাময় সমাজনীতি, তার অন্ধ-সংস্কার-মুক্ত বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি, তার আত্মশক্তিতে অবসাদহীন শ্রদ্ধা।" (বিচিত্রা ১৩৩৯)

'৬ই মে কবির জন্মদিন উপলক্ষে ইরাণরাজের আদেশে বাগ নেয়েরে-দৌলেহ্‌তে সমস্ত দিন উৎসব হয়। সমস্ত দিন লোকজন খাওয়ান, কয়েক হাজার লোকের অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ ও দেশ বিদেশে থেকে টেলিগ্রাম রাশি পাওয়া, প্রাসাদের সমস্ত ফুল দিয়ে সাজান এবং বহুলোকের অভিনন্দনপত্র ফুলের ডালি এবং অসংখ্য উপহার গ্রহণে সমস্ত দিন সকলের অবিশ্রান্ত খাটুনি চলে।' (কেদারনাথ) পারস্যরাজ কবিকে বিজ্ঞান সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর রাজকীয় পদক ও সনন্দ দেন। জন্মদিনে কবি ইরাণের নামে একটি কবিতা লিখিয়া দেন; 'পরিশেষে' এই কবিতাটি আছে—

"ইরাণ, তোমার যত বুলবুল, তোমার কাননে যত আছে ফুল" ইত্যাদি

দিনের পর দিন সম্বর্ধনা, অভিনন্দন চলিতেছে। আফগান, মিশরীয়, বৃটীশ রাজদূতাবাসে কবির সম্বর্ধনা হইল। ১৫ই মে কবি তেহারণ ত্যাগ করিলেন। ইহার পূর্বেই কবি ইরাণরাজের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে বিশ্বভারতীর জন্য শাহ পারসিক অধ্যাপক পাঠাইবেন।

ইতিমধ্যে একদিন ইরাকের রাজদূত আসিয়া কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কবি তেহারণ হইতে মোটর যোগে বোগদাদ যাত্রা করিলেন।

তেহারণ হইতে বোগদাদের পথ পাহাড়, মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিয়াছে; পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর। প্রথম দিন কবি ও তাহার সঙ্গীরা কাজবিন নামক একটি সহরে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন ভোরে হামদান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হামদানে বিশ্রাম করিয়া রওনা হইলেন কির্মানশার দিকে; পথে দরাবুসের বিখ্যাত শিলালিপি বেহিস্থান দেখিলেন; অদূরে তাকিবুস্তানের পর্বত গাত্রে সাসনীয় যুগের খোদাই-চিত্র দেখিবার সুযোগও হইল।

কির্মানাশায় রাত্রি কাটাইয়া সকালে যাত্রা করিলেন কাস্‌রিশিরিনের দিকে ; এইস্থানে পারস্তের সীমানা শেষ। তারপর কালিকিন, ইরাকের রেল ষ্টেশন।

ইরাকরাজ্যের সীমানায় কবির যথোচিত সমাদর করিবার জন্য রাজ কর্মচারীরা ছিলেন। এখান হইতে রেলপথে বোগদাদ যাইতে হয়।

বোগদাদ ষ্টেশনে খুবই ভিড় কবিকে দেখিবার জন্য। কবি উঠিলেন গিয়া একটি হোটেলে। রাজা ফৈজাল তখন জীবিত ; কবিকে তিনি একদিন নিমন্ত্রণ করেন। রাজা ভারতে হিন্দুমুসলমানে যে দ্বন্দ্ব বেঁধেচে সে-সম্বন্ধে বলিলেন 'যখন কোনো দেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বোধন আসে, তখন প্রথম অবস্থায় তারা নিজেদের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেইটাকে রক্ষা করবার জন্য তাদের প্রবল চেষ্টা হয়। এই আকস্মিক বেগটা কমে গেলে মন আবার সহজ হয়ে আসে।' রাজা ফৈজলের সাদাসিধা ব্যবহার অনাড়ম্বর নিরহঙ্কার সৌজন্য কবিকে খুবই প্রীত করিয়াছিল।

বোগদাদে নানাবিধ আদর আপ্যায়ন চলিল। বিশেষভাবে উদল্লখযোগ্য পৌরজনপদের অভ্যর্থনা। কবি তাহার যে জবাব দেন 'বিচিত্রায়' তাহার অনুবাদ প্রকাশিত হয় (১৩৩৯ চৈত্র, পৃঃ ৩০৫)। ভারতের ধর্মগত বিদ্বেষের ব্যাপার কবির মনকে পীড়িত করিতেছে ; এই স্বাধীন দেশে আসিয়া বার বার ভারতের দুর্গতির কথা মনে পড়িতেছে। তাই কবি উত্তরে বলিলেন, "আমার প্রাণের গোপন কথাটি আজ আপনাদের বলি, যে গোপন উদ্দেশ্য গভীরতম অন্তরে পোষণ করে আজ আপনাদের দেশে বেড়াতে এসেচি। আমার আহ্বান এই—আসুন আমরা পরস্পর মিলিত হয়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের মূল ছিন্ন করে দিই, মানুষে মানুষে সহজ বিশ্বাসের নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করি। * * আজ আরব সাগর পার হয়ে আসুক আপনাদের বাণী বিশ্বজনীন আদর্শ নিয়ে ; আপনাদের পুরোহিতরা আসুন তাঁদের বিশ্বাসের আলো নিয়ে ; জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও ধর্মভেদ প্রেমের মধ্যে অতিক্রম করে সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সখ্যের সংযোগিতায় মিলিয়ে দিন তাঁরা। * * আপনাদের সমধর্মী ভারতবাসীরা আজ প্রতীক্ষা করে আছে আপনাদের

কাছে থেকেই নূতন বাণী শুনবে, বীর্যের বাণী, মিলনের বাণী, সকল ধর্মকে কল্যাণের যোগে শ্রদ্ধা করবার মানবোচিত শুভবুদ্ধির বাণী।"

এই বোগদাদে থাকিতে থাকিতে কবির যৌবনের স্বপ্ন "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন"—সেই বেদুইনদের শিবির একদিন দেখিতে গেলেন। বেদুইন সর্দারের তাঁবু মরুভূমির মধ্যে; কবি সেখানে গেলেন, তাহাদের রণনৃত্য দেখিলেন। বেদুইন সর্দার বলিলেন, "ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চলচে এ পাপের মূল রয়েচে সেখানকার শিক্ষিত লোকদের মনে। এখানে অল্পকাল পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে কোনো কোনো শিক্ষিত মুসলমান গিয়ে ইসলামের নামে হিংসা ভেদবুদ্ধি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন।" তিনি বলিলেন "আমি তাঁদের ভোজের নিমন্ত্রণে যেতে অস্বীকার করেছিলাম। অন্তত আরব দেশে তাঁরা শ্রদ্ধা পাননি।" সমসাময়িক ইতিহাস পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন আরব সর্দার কোন আন্দোলনের উল্লেখ করিতেছেন।

কবির পারস্য ইরাক ভ্রমণের পালা শেষ হইল; প্রাচ্যের দুইটি মুসলমান রাজ্য তিনি দেখিলেন।

বোগদাদ হইতে ডাচ্ এরোপ্লেনে ফিরিলেন; প্রতিমাদেবী সঙ্গে আসিলেন; অমিয়চন্দ্র ও কেদারনাথ ইরাক দেখিবার জন্য থাকিয়া গেলেন। *

৪২। 'পরিশেষ' ও 'পুনশ্চ'

৩রা জুন ১৯৩২ রবীন্দ্রনাথ পারস্য হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, বাহিরে একমাস বাইশ (১৩৩৮, ২৯ চৈত্র হইতে ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯) দিন মাত্র ছিলেন। কয়েক দিন খড়দহে থাকিয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

পারস্যযাত্রার পূর্বে আমরা দেখিয়াছি কবি বহু কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পারস্যে থাকিতে কবিতা বেশি নাই; অন্যদিনের দিন প্রবাসসঙ্গী

---

* পারস্য ভ্রমণ এককিস্তি প্রবাসীতে ও অবশিষ্টাংশ সচিত্র ধারাবাহিক 'বিচিত্রা'র প্রকাশিত হয়; ১৯৩৬ সেপ্টেম্বর 'জাপানে ও পারস্যে' নামে গ্রন্থে উহা মুদ্রিত হইয়াছে।

কেদারনাথ ও অমিয়চন্দ্রকে দুটি টুক্‌রা কবিতা উপহার দেন, ইরান সম্বন্ধে একটি লেখেন। (পরিশেষ পৃঃ ৭৩—৭৪ ; ১৬০)। দেশে আসিবার কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার পুরানো সুর ফিরাইয়া পাইয়াছেন ; জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে ধারাবাহিক কবিতা দিনের পরদিন লিখিয়া যাইতেছেন ; প্রথম কবিতা 'স্পাই'—কি দরদ দিয়া লিখিয়াছেন, তাহা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। ১১ই শ্রাবণ পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই লিখিয়াছেন—৩০।৩৫টি কবিতা দেড় মাসে জমিয়াছে।

এগুলির সবই কবিতা বলিতে যা বুঝায় তা নয় : কবি নূতন পরীক্ষা সুরু করিয়াছেন ছন্দের ; অসমছন্দে, মিল না রাখিয়া গদ্যকাব্য লেখার পরীক্ষা। মিলন, খ্যাতি, বাঁশি প্রভৃতি সবই এই গদ্যকাব্যের ঢঙে লেখা। এই বইটাকে ছন্দের দিক থেকেও যেমন দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—তেমনি যায় ভাবের দিক থেকেও ; শেষকালের লেখাগুলি বেশির ভাগ বস্তুমূলক (objective) বা গল্পমূলক চিত্র ; অর্থাৎ গল্প বলার চিরন্তন ইচ্ছাটি প্রকাশ পাইয়াছে। গোড়ার গুলির মধ্যে কবির গভীর মনের চিত্র পাই ; শেষগুলিতে পাই তাঁর ছবির খোরাক।

এই সময়টায় মনের উপর দিয়া খুবই সংগ্রাম যাইতেছে। কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র জারমেনীতে মৃত্যুকবলে ; মীরাদেবী তাহাকে দেখিতে গেছেন। দ্বিতীয়ত আর্থিক অনটন বিশেষভাবে উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসর বন্যায় প্রজার সর্বনাশ হওয়ায় জমিদারী হইতে কোনো টাকা আসিতেছে না ; এমনকি সদর খাজনা পর্যন্ত নিজেদের যোগাড় করিয়া দিতে হইতেছে। আত্মীয়স্বজনের বরাদ্দ টাকা নিয়মিত দিবার জন্য তাগিদ আসে ! কবি খুবই বিভ্রান্ত। কিন্তু বাইরে এই ঝড় তাঁহাকে স্পর্শ করে না, তিনি কখনো কবিতা কখনো ছবি লইয়া আছেন।

অবসরকালে পত্রধারা লিখিতেছেন। কোনো এক নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলার প্রশ্নের জবাবে একখানি পত্রে কবি ধর্ম সম্বন্ধে নিজ মত খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। একটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"ধর্মবিলাসিতায় আমাদের মর্মে মর্মে মেরেছে। * * * কর্তব্যবিমুখ মূঢ় ভক্তি নিয়ে ঠাকুরঘরের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাকেই যারা পরমার্থ

বলে জানে—তারা যে কত বড় অকৃতার্থ তা বোঝবার শক্তিও তাদের নেই, কেননা তারা ভাবমদে অপ্রকৃতিস্থ।"

আর একখানি পত্রে ধর্মের এই ভাবোন্মত্ততা সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন; "এই রসোন্মত্ততায় বিশ্বসংসারকে ভুলে থাকাকেই তারা ধার্মিকতা বলে মনে করে। * * ভোজ্য আয়োজনে নিরন্তর ব্যাপৃত, ধূপে দীপে মাল্যে মণ্ডিত, কীর্তনে ভজনে নিত্যমুখরিত, আত্মবিস্মৃত এই এক একটি সঙ্কীর্ণ রসমণ্ডলীর বাইরে যে বিপুল সংসার পড়ে আছে, ভক্তিভাবাকুলদের পক্ষে সেখানে যেন দেবতার অরাজকতা,—সেখানে বিশ্ববিধাতার কোনো দাবী নেই, কোনো আহ্বান নেই। এই রকম মনোভাবটি মেয়েলি—সেই চিত্ত-বৃত্তির মধ্যে কর্মের প্রাধান্য নেই, বুদ্ধির সর্বদা গদ্‌গদ বাষ্পাবিলতা। এই প্রেমভক্তি নিজের মধ্যেই নিজে আবর্তিত।" (১২ই শ্রাবণ)।

১৯ শ্রাবণের একখানি পত্রেও শুচিতা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (দ্রঃ প্রবাসী ১৩৩৯ মাঘ, পৃঃ ৫৩৫—৫৩৭)।

কবির পত্রধারা নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। ইহা একটি বিরাট সাহিত্য। পত্রের মধ্য দিয়া তাঁহাকে খুব নিকটে পাওয়া যায়; যেকথা প্রবন্ধাকারে বক্তৃতাচ্ছলে বলা যায় না, যাহা খুব অন্তরতম বা আন্তরিক কথা তাহা পত্রের মধ্যে প্রাণ পায়। অল্পদিন হইল রুসোর (Rousseau) চিঠি-পত্র ছাপা হইয়াছে বিশ ভল্যুমে। হেভেলক এলিস্ তার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে যদি কোনো লোককে কোনো একটি বই লইয়া কোনো স্থানে নির্বাসনে যাইতে হয়, তবে আমি তাহাকে রুসোর পত্রগুচ্ছ লইয়া যাইতে বলিব। সেকথা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও খাটে। সামান্য লোকের যৎসামান্য প্রশ্নকেও তিনি অবজ্ঞা করেন নাই। এই পত্র লিখিবার সময় তিনি নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপাড়া করেন, যেটা অস্পষ্ট সেটা স্পষ্ট করেন। সুতরাং এগুলিকে তাঁহার সৃষ্টির অঙ্গীভূত বলিয়া আমরা মনে করি। দুঃখের বিষয় তাঁহার পত্রাবলী এখনও সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের মধ্যে টানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদ হইতে সম্প্রতি বিদায় লইয়াছেন। বহু প্রার্থী, বহু দলের মনোনীত ব্যক্তি এই

পদপ্রার্থী। সিণ্ডিকেটের কয়েকজন মেম্বর রবীন্দ্রনাথকে এই পদদানের কথা ভাবেন; জুলাই মাসেই এসব কথা লোকে জানিল। সিণ্ডিকেটে স্থির হইল যে কবি দুই বৎসরের জন্য ৫০০০৲ টাকা করিয়া পাইবেন এবং কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন। এই সঙ্গে ১৯৩২-৩৩ সালের জন্য তাঁহাকে 'কমলা বক্তৃতা' দিবার জন্যও আহ্বান করা হইল। আরও স্থির হইল যে ৬ই আগষ্ট কবিকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্বর্ধনা করা হইবে।

এই সম্বর্ধনার কথা ছিল তাঁহার জয়ন্তীর সময়ে। কিন্তু কবির শারীরিক অসুস্থতাবশত তখন তাহা করা সম্ভব হয় নাই। এইবার পারস্য হইতে ফিরিয়া আসিবার পর য়ুনিভার্সিটি এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ভাইস্-চানসেলার স্যর হাসান সুরবারদি কবির পারস্যযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। কবি যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আচার্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতেও সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কবির এই পদ গ্রহণ করায় তাঁহার গুণগ্রাহী একদল লোক খুবই আশ্চর্য হন; যিনি চিরজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া আসিয়াছেন তিনি শেষকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী গ্রহণ করিলেন, ইহাতে তাঁহারা খুবই মর্মাহত হন।

কবি খড়দহে আছেন; ৮ই আগষ্ট কেবল্ আসিল যে তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ জারমেনীতে *মারা গিয়াছেন। নীতীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবী ও ডাঃ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির পুত্র, কবির প্রিয় দৌহিত্র। জারমেনীতে মুদ্রাযন্ত্র বিজ্ঞান শিখিবার জন্য শ্রীমান্ গিয়াছিলেন; সেখানে অসুস্থ হন; একমাস পূর্বে মীরাদেবী তাঁকে দেখিবার জন্য য়ুরোপ যান।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মন ভারাক্রান্ত, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ নাই। একটি কথিকায় শোক সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাবটি ধরা পড়ে—

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।

* ২রা আগষ্ট (২১ শ্রাবণ ১৩৩৯) কবি Andrews এর রচিত What I owe to Christ পড়িয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছেন, পত্রখানি Visvabharati Newsএ প্রকাশিত হয় (Vol. I p 81)

সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না।

একখানি পত্রে (১৫ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট) লিখিতেছেন,"শরীর মন ও সংসারের উপর দিয়ে বিস্তর উৎপাত গেছে। সেজন্যে বিলাপ পরিতাপ করা আমার অভ্যাস নয়, করিও নি।" যে মহিলাটি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া নানারূপ ধর্মপ্রশ্ন করিতেন, তাঁহাকে আর একখানি পত্রে ২২ আশ্বিন লিখিতেছেন, "বারবার বলেচি গুরুর পদ আমার নয়। আমি কবি, নানাভাবে নানাদিকে আমার মন সঞ্চরণ করে—আমার স্বভাবের বৈচিত্র্যবশত নিজেকেও নিজে বুঝিনে, অন্যেও আমাকে বোঝেনা। আমার প্রধান সার্থকতা সব কিছু প্রকাশ করা— বাণীর দ্বারা করেচি, কর্মের দ্বারাও করেচি।" (প্রবাসী ১৩৩৯ ফাল্গুন পৃঃ ৬১৩)।

কিন্তু তাঁহাকে কেহই কোনো অবস্থায় ছাড়িতে চায় না; বাহিরের কাজে তাগিদ আসে। তখন Communal award ঘোষিত হইয়াছে; দেশময় আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে; হিন্দু অধিকার কম পাইয়াছে বলিয়া ক্রুদ্ধ, মুসলমান যথেষ্ট বেশি পায় নাই বলিয়া অতৃপ্ত। যাহারা সোহাগ পাইতেছে, তাহারা আরো সোহাগের জন্য লালায়িত, যাহারা প্রত্যাখ্যাত তাহারা ক্ষুব্ধ। মোটকথা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের যেসব কারণ ছিল, তাহার উপরেও এই ঈর্ষা-ইন্ধন সংযোজিত হইল।

এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি এই সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কবির মত জিজ্ঞাসা করিয়া তার করেন; তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "Things have come to such a state that I hate even to complain, knowing the determined attitude of our rulers and hopelessness of our situation. We cannot expect fair dealings from a power which, for its self interest, would

perpetuate differences amongst our people regardless of the ultimate consequeness, which cannot be good even for itself. I for my own part, would prefer to remain silent when no words of reason from us are likely to prevail. (Aug 22, 1932).

ইহারই দুই একদিন পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে একখানি পত্র লিখিয়া দেশবাসীকে এই কথাটি স্পষ্ট করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, "My advice to my countryman is they should ignore this award and focus all their forces for the united consideration of these new measures that will soon be inaugurated. The solution of the communal problem is in our own hands and we should take advantage of the new feeling of resentment that is sweeping intellectual circles in our country today against irrational communal and class differences, come to agreement between ourselves and thus remove one of the greatest obstacles in the path of our national self-expression.

"But let us not be side-tracked by emotional considerations and let us meet the real issues that will soon be revealed to us united amongst ourselves and prepared for any contingency."

দেশের বাহির হইতেও তাঁর কাছে 'বাণী দাও' 'সহি দাও'-এর তাগিদ আসে। দাসত্বরোধের শতবার্ষিকীর কথা পূর্বে বলিয়াছি। এবার আসিয়াছে The 'Save the children' International Union হইতে তাগিদ। কবি এই আন্তর্জাতিক humanitarian সমিতির উদ্দেশ্যর সঙ্গে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পত্র দিলেন।

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন ; 'পুনশ্চ'র কথিকা লিখিতেছেন। তারপর সেখানে পড়িল ছেদ ; ছেদের কারণ পরে বলিব।

'পরিশেষ' ও 'পুনশ্চ'র মধ্যে কবি গদ্যছন্দে এই যে পরীক্ষা করেন তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন 'পুনশ্চ'র ভূমিকায়। ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' প্রথম লেখেন এই ছন্দোময় গদ্যে; সেই অবধি তাঁহার মনে এই প্রশ্ন ছিল গদ্যে কবিতার রূপ দেওয়া যায় কিনা। কবি নিজেই পরীক্ষা করেন, 'লিপিকা'র কয়েকটি লেখায়; কিন্তু নিজেই স্বীকার করেন "ছাপাবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধকরি ভীরুতাই তার কারণ।" তারপর এইবার পুনরায় সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। ইহার লেখন-ভঙ্গী সম্বন্ধে বলেন, "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।"

'পুনশ্চ'র গদ্যকাব্য লেখার পালা যখন চলিতেছে, তখন কলিকাতায় শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে খুব একটা আন্দোলন চলিতেছিল। তবে জন্মোৎসব হইতেছিল ৫৭ বৎসরের, না ৫০ না ৬০। কেহ কেহ এ লইয়া সমালোচনাও করেন; কবিকে সভাপতি করা হইয়াছিল। কবি প্রথমে সভায় যাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানাকারণে যান নাই; সভা হইবার আগেই যবনিকা পড়ে; মহাত্মাজীর উপবাস উপলক্ষে একদল লোক এই উৎসবকে অত্যন্ত বেমানান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সভা যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা করেন। কবি শরৎচন্দ্রের এই শুভদিনকে স্মরণীয় করিবার জন্য 'কালের যাত্রা' নামে একখানি নাটিকা লিখিয়া উৎসর্গ করেন। (৩১ ভাদ্র ১৩৩৯)।

'কালের যাত্রা' এক হিসাবে নূতন নাটক নয়, কয়েক বৎসর পূর্বে 'রথযাত্রা' নামে যে একটি ক্ষুদ্রকায় নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই বৃহত্তর সংস্করণ, অবশ্য অদল বদল অনেক হইয়াছে। গ্রন্থে দুইখানি বই আছে—'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'।

বইখানি উৎসর্গ করিয়া শরৎচন্দ্রকে তিনি যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে—"মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথটানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসমান হয়ে গেছে, তাই চল্‌ছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল

যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চল্‌বে।" (বিচিত্রা ১৩৩৯ কার্তিক পৃঃ ৪৯২)

'রথের রশি' নাটিকাকাটি সময়োপযোগীই হইয়াছিল। সাময়িক ইতিহাসটি বলিলে বুঝা যাইবে কবি কেন এইসব সামাজিক দৃশ্য অত্যন্ত বাস্তবাকারে এই নাটিকার মধ্যে দিয়াছিলেন।

৪৩। মহাত্মাজীর অনশন

মহাত্মা গান্ধী জেলে গিয়াছেন ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৩২) প্রায় নয় মাস হইল ; দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থ অধিবেশনের পর দেখা গেল যে হিন্দু মুসলমান কিছুতেই একমত হইয়া একটা রাষ্ট্রকাঠামো খাড়া করিতে পারিবে না, তখন প্রধান সচিবকে এ বিষয়ে চরম নিষ্পত্তি করিবার জন্য অধিকার দেওয়া হয়। তিনি প্রস্তাবিত ভাবী প্রাদেশিক ব্যবস্থা-সভায় সদস্যদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ভেদ ত রাখিলেনই, উপরন্তু হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ হিন্দু ও 'অস্পৃশ্য' হিন্দুর শ্রেণী ভাগ করিয়া দিলেন। হিন্দু সমাজকে এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব মহাত্মাজী গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না ; অপর দিকে অনুন্নত জাতির নেতা ডাঃ আমবেদকর প্রভৃতি ইহারই পক্ষপাতী। মহাত্মাজী দেশের মধ্যে এই লইয়া আন্দোলন করিতে বলেন ; অবশেষে ঘোষণা করিলেন যে যদি হিন্দু সমাজকে এইভাবে দুর্বল করা হয় এবং বর্ণ হিন্দুরা তাঁহাদের গোঁড়ামি ত্যাগ না করেন, বা প্রধান সচিব এই ভেদনীতি বর্জন না করেন, তবে তিনি উপবাস করিয়া প্রাণ দিবেন। মহাত্মাজীর এই কঠিন সংকল্পে দেশ স্তম্ভিত হইল। সুখের বিষয় বর্ণ হিন্দু ও 'হরিজন' হিন্দুদের মধ্যে যে আপোষ হইবে তাহা প্রধান মন্ত্রী মানিয়া লইবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বহুদিনের বহু তর্ক বিতর্কের পর

তাঁহারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বিলাতে খবর দিলেন। এদিকে মহাত্মাজীর অনশন আরম্ভ হইল ৪ঠা আশ্বিন ১৩৩৯ (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২)।

সেদিন শান্তিনিকেতন বহু লোক উপবাসী থাকিলেন ও অপরাহ্নে বিরাট সভায় জাতিভেদ দূর করিবার জন্য বক্তৃতাদি হইল। কবি স্বয়ং অনশন সম্বন্ধে বলিলেন। পরদিন ৫ই আশ্বিন শান্তিনিকেতনে আহূত পল্লীবাসিদের নিকট কবি তাঁহার নিবেদন জানান। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর অনশনের পূর্বদিন একটি টেলিগ্রাম করিলেন, তাহাতে তিনি মহাত্মাজীকে দুর্বলভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইবার ব্যর্থ উপদেশ দেন নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'It is worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity. Though we cannot anticipate what effect it may have upon our rulers who may not understand its immense importance for our people, we feel certain that the supreme appeal of such self-offering to the conscience of our own countrymen will not callously allow such national tragedy to reach its extreme length. Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence and love'

মহাত্মাজী পর দিন টেলিগ্রাম করিলেন। 'Have always experienced God's mercy. Very early this morning I wrote seeking your blessing if you could approve action, and behold I have it in abundance in your message just received. Thank you.'

রবীন্দ্রনাথের মন খুবই চঞ্চল; শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার যে সভাপতি হইবার কথা ছিল তাহা তিনি রদ করিয়া দিয়াছেন। ২২ সেপ্টম্বর তিনি ফ্রী প্রেস প্রভৃতি মারফৎ দেশবাসীকে অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য আবেদন করিলেন। The movement should be universal and immediate, its expression clear and indubitable. All manner of humiliation and disabilities from which any clsss in India suffers should be removed by heroic efforts and self-sacrifice. * * *

এদিকে কবি ক্রমশই মহাত্মাজী সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন ; অবশেষে পুণা যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া প্রথমে Tucker-কে পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে ২৪ সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথ কর ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লইয়া বোম্বাই যাত্রা করিলেন।

২৬ এ প্রাতে কল্যাণ ষ্টেশনে নামিয়া মোটরযোগে তাঁহারা পুণা যাত্রা করিলেন ; এইখানে উর্মিলাদেবী ও বাসন্তীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কবি লেডি থাকারসের অতিথি হন। মহাত্মাজীর শরীরের অবস্থা খুবই আশঙ্কা-জনক বলিয়া শুনিলেন, অথচ প্রিমিয়ারের নিকট হইতে কোনো খবর আসে নাই। কবি ম্যাকডোনাল্ডকে এক জরুরী কেব্‌ল্ পাঠাইলেন ; কিন্তু তাহার প্রয়োজন ছিলনা, কারণ ইতিপূর্বেই তাঁহার অনুমোদন তার বড়লাটের কাছে আসিয়াছিল ; শোনা গেল দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয় লইয়া আলোচনাও হইয়াছে ; সাংবাদিকরাও খবরটা শুনিয়াছেন ; অথচ যাহার জীবন মরণ দোলায় দুলিতেছে, তাঁহার কাছে সংবাদ আসিল চারিটার সময়।

মীমাংসার সংবাদ পৌঁছাইলে মহাত্মাজী তাঁহার অনশন ভাঙিলেন ; কবি 'জীবন যখন শুকাইয়া যায়' এই গানটি গাহিলেন ; মহাদেব দেশাই বলিলেন, এই গানটি মহাত্মাজীর খুব প্রিয়। রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই ছিলেন ; রাজগোপালচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কুঞ্জরু, বল্লভভাই, সরোজিনী নাইডু, কমলা নেহেরু। (দ্রঃ পুণা ভ্রমণ, বিচিত্রা, ১৩৩৯ অগ্র পৃঃ ৬২০-৬২৩)

পরদিন মহাত্মাজীর জন্মদিন। শিবাজী মন্দির নামক বৃহৎ মুক্ত-অঙ্গনে জনসভা হয় ; মালব্যজী সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন, গোবিন্দ মালব্য তাহা পাঠ করিলেন। অন্যান্য বক্তাও ছিলেন।

মহাত্মাজীকে সুস্থ দেখিয়া ও রাজনৈতিক ব্যাপারের একটা মোটামুটি মীমাংসা হইতে দেখিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। হরিজনদের সহিত বর্ণ হিন্দুদের যে রফা হইল তাহা ইতিহাসে Poona pact নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির কূট ব্যাপার যে ভাল বোঝেন না, তাহা এই সিদ্ধান্ত লইয়া যে পরিমাণ গোলোযোগ পরে হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝা যাইবে।

মহাত্মাজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা (ইংরেজি ও বাঙলা) ও

টেলিগ্রামসমূহ এক করিয়া একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত হয়। পুস্তিকাখানি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে in appreciation of his self-sacrifice for his country and his students উৎসর্গ করা হয় (Mahatmaji and the Depressed Humanity)। এই গ্রন্থের উপসত্ব বিশ্বভারতীর সংস্কার সমিতির জন্য দেওয়া হয়।

মহাত্মাজীর অনশনাদি লইয়া য়ুরোপেও বেশ একটু সাড়া পড়িয়া ছিল। লণ্ডনের শান্তিস্থাপনের দল (Conciliation Group)-এর প্রেসিডেণ্ট Carl Health রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘ এক কেব্‌লে ভারতের সহিত সহযোগিতা সম্বন্ধে লেখেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দীর্ঘ একখানি পত্রে ইহার উত্তর দেন। শান্তিনিকেতন হইতে ১৪ই অক্টোবর ১৯৩২ উহা লিখিত।

পুণা হইতে ফিরিয়া কবি কয়েকদিন আছেন খড়দহের বাগান বাড়ীতে। আজকাল কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কম থাকেন। এই সময়ে (২ নভেম্বর ১৯৩২) জন্মশাসন সম্বন্ধে একখানি পত্র তিনি লেখেন (দ্রঃ বিচিত্রা ১৩৩৯ পৌষ ৭৬২-৬৩)। খুব স্পষ্টভাবে জন্মশাসনকে সমর্থন করিয়া তিনি পত্রখানি লেখেন। ইতিপূর্বে মার্গেট স্যাঙ্গার যখন এই আন্দোলন সম্বন্ধে লিখিতেছিলেন তখন কবি তাঁহার সপক্ষে মত প্রচার করেন। ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে সেই মহিলা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে শান্তিনিকেতনে আসেন। কোনো আন্দোলন কোনো সমস্যা যাহা মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে সে-সম্বন্ধে তিনি নীরব থাকিবেন তাহার উপায় নাই।

মহাত্মাজীর পুণা প্যাক্টোরের পর হিন্দুসমাজ সর্বত্র হরিজন * আন্দোলন সুরু করেন। সর্বত্রই মন্দির সর্বলোকের জন্য খুলিয়া দিবার আন্দোলন চলিল।

ইতিমধ্যে কোচিনে একটি গোল বাধিয়াছিল। গুরুবায়ুর নামক স্থানের একটি মন্দিরে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার দিবার জন্য মিঃ কেলাপ্পন নামে একজন দেশসেবক জিদ করিয়া বলেন যে মন্দির প্রবেশাধিকার না দিলে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন। দক্ষিণভারতে জাতিবিচার বড়ই কঠিন ও কঠোর এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব হইল। তিনি

* হরিজন নামে একখানি কাগজ ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে প্রকাশিত হয় মহাত্মাজী সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্দ্রনাথের মেথর কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রথম সংখ্যার জন্য পাঠাইয়াছেন।

কোচিনের জামোরিণের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন; কবি খুবই জোর দিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছিলেন। (২রা ডিসেম্বর ১৯৩২)।

সেইদিন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শান্তিনিকেতনে আসেন। কবি ও আশ্রমবাসিগণ পরদিন প্রাতে আম্রকুঞ্জে সমবেত হইয়া এই বিশিষ্ট অতিথির যথোপযুক্ত সংকার করেন। শান্তিনিকেতনের কাজকর্ম ও বিশেষ ভাবে সেখানকার ভারতীয় আচার অনুষ্ঠান মালব্যজিকে বিশেষভাবে ভাল লাগিয়াছিল।

কবির কর্ম ও চিন্তাধারার বিরাম নাই; পার্লামেণ্টের সদস্য, H. N. Brailsford ১৯৩০ সালে অসহযোগের সময় ভারত ভ্রমণ করিয়া Rebel India নামে একখানি বই লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সেই বইখানার সমালোচনা এই সময়ে লিখিয়া Modern Reviewতে পাঠাইয়া দেন (1933 Jan)। তিনি বইখানি সম্বন্ধে বলেন, 'Rebel India', I repeat is an honest book. Reading it I feel encouraged to hope that individual Englishman in our land will emulate his attitute of sober judgment and no matter how inconvenient it may be to do so, dare face facts as they really are today in India.

অগ্রহায়ণ (১৩৩৯) মাস হইতে 'বিচিত্রা'য় 'দুইবোন' নামে একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই উপন্যাসটি ভাদ্রমাসে খড়দহ বসিয়া প্রথমে লেখেন; তার পর অনেকটা কাটা ছাঁটা করিয়া এইবার পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন।

১১ই ডিসেম্বর ১৯৩২ (২৫ অগ্র ১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সত্তর বৎসর বয়সোপলক্ষে জয়ন্তীতে উপস্থিত হন ও সভাপতিত্ব করেন। Mahatmaji & Depressed Humanity বইখানি এই দিন আচার্য রায়কে উৎসর্গ করেন। কবি তাঁহার অনবদ্য ভাষায় আচার্য রায়কে অভিনন্দিত করিলেন। অভিনন্দনটি লিখিত হয় ২২ আগষ্ট ১৯৩২। (Liberty 12 Dec 1932 ; প্রবাসী ১৩৩৯ পৌষ পৃঃ ৪৫২)

কবি খড়দহে; বিশ্রাম খুব কমই; একদিন (১২ ডিসেম্বর) যাইতে হইল

জাপানী কন্সাল জেনারেলের বাড়ীতে, সেখানে আসিয়াছেন জাপানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কোশেৎসু নমু—সারনাথের মন্দিরে প্রাচীর চিত্র করিতে। জাপানী কন্সাল সেই উপলক্ষে কবিকে ও আরও কয়েকজন শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে কবিকে বৃহত্তর ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলিতেও হয়।

১৭ই ডিসেম্বর কবিকে কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীর শ্রাদ্ধসভায় সভাপতির কার্য করিতে হয়। সুনীতি দেবীর সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের পরিচয়ের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন সুনীতি দেবীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ দ্বিবিধ ; কেশবচন্দ্র সেন যখন তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসেন তখন কবি শিশু, এবং সুনীতি দেবীর পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার জননীর কোলে আশ্রয় পান। তারপর মহারাণীর বিবাহের পর তিনি বহুবার দার্জিলিঙ ও আলিপুরে তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়াছেন এবং নানা আখ্যান আখ্যায়িকা সে-সবের সঙ্গে জড়িত। আজ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কবি বলেন, তিনি স্বয়ং যে বয়সে আজ পৌছিয়াছেন সেখানে মৃত্যু আর মিথ্যা রূপ ধারণ করিতে পারে না ; মৃত্যুর জন্য দুঃখ করা তাঁহাকে আর সম্ভব নয়। ইহার পর মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি ব্যাখ্যান করেন।

এই সময়ে কবি একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়া দেন যে অতঃপর তিনি নামের পূর্বে 'শ্রী' ত্যাগ করিলেন, পূর্বে 'স্যর' ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবার গেল 'শ্রী'। (প্রবাসী ১৩৩৯ পৌষ পৃঃ ৪৫৩)।

কলিকাতার সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন পৌষ উৎসবের জন্য। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল ; অধ্যক্ষ নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলি কলেজের কর্মভার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার স্থানে সাময়িকভাবে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত I. C. S. (Retired) নামে-অধ্যক্ষতা করেন : ১৫ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যরূপে রবীন্দ্রনাথ কলেজের ভার শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেনের উপর অর্পণ করেন। শ্রীমান ধীরেন্দ্রমোহন শিশুকাল হইতে আশ্রমে পড়িয়াছিলেন ; দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করেন। তারপর কবির ইতালি-যাত্রার পরে বিলাত যান ও সেখানে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া লণ্ডন হইতে Ph. D উপাধি গ্রহণ করেন। মিঃ এলম্‌হার্ষ্ট তাঁহাকে গ্রামের শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য একটি বিশেষ বৃত্তি দেন।

শ্রীনিকেতনে তিনি শিক্ষাসত্রে সেই গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। এইবার তিনি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন; আশা দেবী স্কুলের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিলে (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩) স্কুল ও কলেজ উভয় বিভাগের ভার ধীরেন্দ্রমোহনের উপর অর্পিত হয়।

পৌষ উৎসবে কবি যথাযথভাবে উপাসনাদি করিলেন; ৯ই পৌষ বার্ষিক অধিবেশনে কবি বিদ্যালয়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বলেন (Visva-bharati News I. p. 60-64)। ৮ই পৌষ প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্দেশ্যেও তিনি এক ভাষণ দেন। (ঐ পৃঃ ৬৪—৬৫)।

১৯৩৩ সালের গোড়ায় পারস্যর শাহ্ রেজা শাহ্ পহ্লবী শান্তিনিকেতনের জন্য একজন খ্যাতনামা পারসিক অধ্যাপককে পাঠাইয়া দিলেন; এই অধ্যাপকের নাম আগা পুরে দাউদ; ইনি জারমেনী-প্রবাসী ও প্রাচীন ইরানের সাহিত্য ও ভাষায় সুপণ্ডিত; তা ছাড়া স্বয়ং একজন কবি। ইঁহার সঙ্গে বোম্বাই হইতে একজন শিক্ষিত পার্সী আসেন। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক পুরে দাউদকে অভিনন্দনকালে বলেন যে, বহু শতাব্দীর বিস্মৃতি ইরাণ ও ভারতের সম্বন্ধকে ছিন্ন করিয়াছে, But the memory of that ancient union still runs in our blood, and in this great age of Asia's awakening we are once more discovering our affinities, we are rescuing from the debris of vanished ages the undying memorials of our co-operation. (Jan 9, 1933).

এই সময়ে বার্ণাড শ (Shaw) পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে বোম্বাই আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া শান্তিনিকেতন হইতে টেলিগ্রাম করেন (১০ই জানুয়ারী ১৯৩৩); কিন্তু শ লেখেন তাঁহার বয়সের পক্ষে ঘোরাঘুরি আর সম্ভব নয়; তবে 'My only regret is that I shall be unable to visit you'.

পৌষ উৎসবের পর কবি কলিকাতায় যান। সেখান হইতে সুন্দরবনে স্যর ডানিয়েল হামিল্টনের গোসব পল্লীসংগঠন দেখিতে যান। হামিল্টন সাহেব ইতিপূর্বে শ্রীনিকেতনের কার্যাবলী দেখিয়া আসেন ও কবিকে তাঁহার কার্য দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ২৯এ ডিসেম্বর (১৯৩২) কবি গোসব যান; তথাকার কাজকর্ম দেখিয়া কবির খুবই ভাল লাগে।

৩১এ সেখান হইতে ফিরিয়া বিরলাদের অনুরোধে কেশোরাম কটন মিল্‌স্ দেখিতে যান; প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সমস্ত কাজকর্ম তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন; প্রায় ১২০০০ লোক সমবেত হইয়া কবিকে সম্বর্ধিত করেন। ইহারই কয়েকদিন পূর্বে (১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২) বিরলারা বেঙ্গল ষ্টোর্স খোলেন এবং তাহার উদ্বোধন রবীন্দ্রনাথকে দিয়া করাইয়া লন।

১৮ই জানুয়ারী ১৯৩৩ (৫ই মাঘ ১৩৩৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার কমলা বক্তৃতাবলীর দ্বিতীয় লেকচার দেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব; কলিকাতার মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই উপলক্ষে আসেন। ইহার কয়েক দিন পরে শান্তিনিকেতনে Tube-well ও জলের কলের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বঙ্গীয় শাসন পরিষদের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়; তিনি ইহার উদ্বোধন করিলেন; তদুপলক্ষে বিরাট সভা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয় (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩)। শান্তিনিকেতনের মধ্যে সরকারী লোকের দ্বারা কোনো অনুষ্ঠান উদ্বোধন এই প্রথম। এই নলকূপ খুলিবার চেষ্টা বহুকাল হইতে হইতেছিল, কৃতকার্য হয় নাই। অমূল্যচন্দ্র বিশ্বাস নামে এক ইঞ্জিনীয়ার এই নলকূপ খননে কৃতকার্য হন; কবি তাঁহাকে একদিন্ বিশেষ সভায় সম্বর্ধিত করিয়া এই জলের কলের নাম দেন 'অমূল্যউৎস।'

ইহার পরেই কবিকে কলিকাতায় যাইতে হয়। ১৮ই সিনেট হলে রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন সভা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে ভারতের নানা স্থানে সভা ও উৎসবের আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতি রূপে ঐ দিন এক ভাষণ দান করেন। (Mod. Rev. 1933 March p 319-21)

২৫ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্যা বিকীরণ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে তাঁহার দেয় বক্তৃতার অন্যতম।

এই সময়ে 'দুই বোন' গল্পের বইখানি বাহির হয় (ফাল্গুন ১৩৩৯)। বই-খানি শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়কে উৎসর্গ করেন; আলোচ্য সময়ে বসু মহাশয় বিশ্বভারতীর কাজে একটু উৎসাহ দেখাইতেছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন

যে কলেজের লাবোরেটরী গড়িয়া তুলিতে তাঁহার আনুকূল্য পাওয়া যাইবে। এমনকি তাঁহারা সেই আশায় লাবোরেটরির নাম পর্যন্ত দিয়াছিলেন 'রাজ-শেখর বিজ্ঞান মন্দির।' 'দুই বোন' 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। কবির মন পুনরায় 'বিচিত্রা'র দিকে ঝুঁকিয়াছে। পারস্য হইতে আসিয়া পারস্য ভ্রমণের একটি কিস্তি লেখা 'প্রবাসী'তে (১৩৩৯, আষাঢ়) বাহির হয়; তার পর শ্রাবণ মাস হইতে ধারাবাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হইতে থাকে (বিচিত্রা ১৩৩৯ শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৪০ বৈশাখ)। শ্রীমান্ কেদারনাথ কবির ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন, তাঁহার পারস্য ভ্রমণ সম্বন্ধে লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইতে লাগিল। 'বিচিত্রা'য় কবির 'পারস্য ভ্রমণ' ছাড়া 'দুইবোন'ও বাহির হয়।

ফাল্গুনের শেষদিকে লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটি কনফারেন্স হয়; সেই কন্ফারেন্সে শান্তিনিকেতনের নিমন্ত্রণ হয়। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী তখন স্বাস্থ্যের জন্য লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। তাঁহার ইতিপূর্বে চেষ্টায় 'নবীন' ও 'শাপমোচন' গীতিনাট্য দুটি তৈয়ারী হইয়াছিল ও তাঁহার উৎসাহে একটি দল সেখানে যায়। শান্তিনিকেতনের নৃত্যকলার উৎকর্ষতার জন্য কবি বহুদেশ হইতে নর্তক ও নর্তকী আনাইয়াছেন; কিন্তু তাহাদের শিক্ষাকে সফল করিয়াছেন প্রতিমা দেবী। তাঁহারই সৃজনী শক্তিবলে শান্তিনিকেতনের মেয়েরা নূতন নূতন নৃত্যভঙ্গী ও বিষয় পায়; এ সংবাদ ঘরের কথা বলিয়া বাহিরের কেহই জানেন না। প্রতিমা দেবীর নিরন্তর চেষ্টা না থাকিলে এ জিনিষ এভাবে হইত কিনা সন্দেহ। লক্ষ্ণৌতে ছাত্র ছাত্রীরা সুনাম অর্জন করিয়া আসে; কলিকাতার বাহিরে ছাত্রছাত্রীদের এই প্রথম অভিনয়; ইহার পর বহুবার তাহারা রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাহিরে গিয়াছে।

মার্চ্চ মাসে কবি কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। লক্ষ্ণৌতে 'নবীন' ও 'শাপমোচনের' গীতাভিনয় দর্শক ও শ্রোতার ভাল লাগিয়াছে এ সংবাদ পাইয়া কবি সেটিকে কলিকাতায় পুনরভিনয় করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাহার আয়োজন চলিল। ইতিমধ্যে ছোট একটি উৎসব আশ্রমে হইল। তখন পারসিক অধ্যাপক পুরে দাউদ আছেন; পারসিকদের নববর্ষের উৎসব হয় ২১ মার্চ অর্থাৎ বসন্তের আরম্ভ দিন। রবীন্দ্রনাথ এই

দিনটিতে উৎসব করিবার জন্য বলেন; উৎসব শেষে অধ্যাপক মহাশয় ইহার ইতিহাস বলেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পারস্যদেশের অন্ধকার নবীন পবিত্র প্রভাতকে আমাদের আনন্দিত হৃদয়ের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। অন্ধকার সূর্যালোক বীরপ্রসূ পারস্যভূমিকে পুনর্জাগরণের পথে অগ্রসর করাইবার জন্য আশীর্বাদ বহন করিয়া আসিতেছে ইহাতে আমরা ভারতবাসী বিশেষভাবে পুলকিত।"

কলিকাতায় নৃত্যাভিনয় করিবার জন্য পুরাতন কথিকা 'শাপমোচন'টিকে নূতন করিয়া গীতে, নৃত্যে ভরিয়া তুলিতেছেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি নৃত্যের ও গীতের নানা রূপ পরীক্ষা কবি করিতেছেন। আমাদের দেশের যেসব নৃত্য হয়, তাহা খণ্ড নৃত্য, সমস্ত জিনিষটা মিশাইয়া একটি অখণ্ড নৃত্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতে কথাকলি প্রভৃতি নৃত্য ভাবব্যঞ্জক; তাঁহারা একটি ভাবকে আশ্চর্য কলাকৌশলে দর্শক সমক্ষে প্রকাশ করেন। সেটি অনেকটা আমাদের দেশের প্রাচীন গানের মত, যার মধ্যে রস হইতে ব্যাকরণের প্রাচুর্য বেশি। রবীন্দ্রনাথ যেমন সঙ্গীতকে ওস্তাদ-বৈয়াকরণের হাত হইতে মুক্তি দিয়া রসজ্ঞের কাছে আনিয়াছেন, তেমনি নৃত্যকেও করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'শাপমোচন' ইহার প্রথম চেষ্টা। একটি আখ্যায়িকাকে লইয়া তাহাকে নৃত্যে গীতে ভরিয়া তোলা যায় কিনা তাহারই পরীক্ষা করিতেছেন; নাট্যর কথাবার্তা নাই, অভিনয় মূক, কেবল গানে ও ভঙ্গীতে ভাবের প্রকাশ হইতেছে। কথাকলিও সেই চেষ্টা করে। সেই হিসাবে এই অভিনয়কে আমরা বাঙলা দেশের নৃত্যকলায় বড় একটা স্থান দিতে পারি। ইতিপূর্বে গীতোৎসবের 'শিশুতীর্থে'ও জয়ন্তীর সময়ে 'শাপমোচনে' এই নৃত্য-কলার যে মূর্তি ছিল তাহা হইতে এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

আসলে 'যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে 'রাজা' নাটক রচিত তারই আভাসে 'শাপমোচন' কথিকাটি রচনা করা হয়; ইহার গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হইতে সঙ্কলিত। সুতরাং গীতিনাট্যর দিক হইতে ইহার বিশেষত্ব নাই; আসল বিশেষত্ব ইহার নৃত্যকলার নূতন ভঙ্গীর প্রেরণা। মার্চের শেষে এম্পায়ার থিএটরে দুইদিন অভিনয় হয়।

কবি কলিকাতায় আসিলেন; এপ্রিলের প্রথম দিকটা বরাহনগরে

প্রশান্ত বাবুর বাড়ীতে থাকেন। সেখানে একদিন মালব্যজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় (৮ই এপ্রিল)। এই সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশে খুব প্রচার কার্য চলিতেছিল ভারতের মধ্যে যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন আসিয়াছে, তাহাকে মিথ্যা ও ভারতীয়রা তাহা পাইবার উপযুক্ত নহে, এই কথাই নানা ভাবে ও ভাষায় বিদেশে প্রচারিত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পাটেল তখন য়ুরোপে; তিনি সেইসব অনিষ্টকর প্রচারকার্য দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য দেশে আন্দোলন করিতে বলেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে পাটেলজির সহিত সম্পূর্ণ এক মত হইয়া এক বিবৃতি প্রেসে প্রেরণ করেন। (এপ্রিল ১৩ই, শান্তিনিকেতন)। দেশের অপমান তিনি কখনো সহ্য করিতে পারেন না। এ জন্য বরাবর বিদেশে দেশের যা কিছু মহৎ যা কিছু সুন্দর তাহাকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন।

'দুইবোন' লিখিবার পর কবি 'মালঞ্চ' ও 'বাঁশরী' রচনা করেন। বাঁশরীর পূর্ব্বের নাম ছিল 'ললাটের লিখন'; ক্ষুদ্র নাটিকাটি লিখিয়া ২৩ এপ্রিল ১৯৩৩ শান্তিনিকেতনে পাঠ করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাধনার আর একটি নিদর্শন আমরা এই সময়ে পাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তিনি অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে দিয়া বাঙলা পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহে লাগাইয়াছিলেন; এজন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া তিনি ভারতের নানা স্থানে এই পরিভাষা প্রণয়ন সম্বন্ধে কি কাজ হইতেছে সেই তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রতিশব্দ নির্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার উৎসাহ চিরদিনের; বাঙলায় কত শব্দ যে তাঁহার দ্বারা চলিত হইয়াছে তাহার তালিকা এখনো হয় নাই।

২৭ এপ্রিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গ্রীষ্মের ছুটির জন্য বন্ধ হইল; কবি গেলেন দার্জিলিঙ।

এই সময়ে মহাত্মাজি দ্বিতীয়বার অনশন করিবার সংকল্প করেন; ইহার কারণ রাজনৈতিক নহে, ব্যক্তিগত। মহাত্মাজি এখনো জেলে—সেই যে বিলাত হইতে ফিরিবার পর ১৯৩২ সালে জানুয়ারী মাসে তাঁহাকে অন্তরীণাবদ্ধ করা হইয়াছিল, সেই হইতে পুণা যেরবাদা জেলে আছেন। পুণা প্যাক্টের পর তিনি যথাবিধ জেল আইন মানিয়া চলিতেছেন। তবে তাঁহার হরিজন

আন্দোলন সম্পর্কে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সর্ববিধ কাজ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। সবরমতী আশ্রমে এবং হরিজন সেবকদের মধ্যে কতকগুলি নৈতিক ব্যভিচার ঘটে, যাহার জন্য মহাত্মাজি সংকল্প করেন যে ২১ দিন উপবাস করিবেন। ২৯ এপ্রিল তিনি ইহা ঘোষণা করেন এবং এক সপ্তাহ পরে অনশন আরম্ভ করেন। অনশন আরম্ভের তিন দিন পরে গবর্মেট তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন; তিনি পুণায় 'পর্ণ কুটিরে' আসিয়া উঠিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া মহাত্মাকে একটি টেলিগ্রাম করেন; সে টেলিগ্রাম তিনি পান নাই। কবি মহাত্মাজীর এই অনশন গ্রহণ সম্বন্ধে এক মত হইতে পারেন নাই এবং উপর্য্যুপরি দুইখানি পত্র লেখেন (৯ই মে, ১১ই মে)। ১০ই মে তাঁহাকে একটি কবিতা ইংরেজিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; কবিতাটি রুইদাস সম্বন্ধে। (দ্রঃ Visva-bharati News II, No 1.)

মহাত্মাজি মুক্তি লাভ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ থাকুক, দেশের সমস্ত শক্তি অস্পৃশ্যতা বর্জনে নিয়োজিত হউক। দেশ শান্ত হইয়াছে; নানা শ্রেণীর নেতারা মিলিত হইয়া এখন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রার্থনা করিয়া গবর্মেণ্টকে এক পত্র দিলেন, এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রথম নামই রবীন্দ্রনাথের। * New Statesman একখানি প্রভাবশালী পত্রিকা; ঐ কাগজখানি লেখেন যে তাঁহারা আশা করেন যে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ লেখকের দ্বারা প্রেরিত 'remarkable telegram' এর প্রতি গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবেই।

অপর দিকে আন্দামানে রাজনৈতিক কয়েদীরা তাহাদের প্রতি অন্যায় হইতেছে এই অভিযোগ করিয়া অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশবাসী ও গবর্মেণ্টকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ হইতে বন্দীদিগকে অনশন ত্যাগ করিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন; এভাবে আত্মাহুতি দানের তিনি পক্ষপাতী নহেন, তাহা মহাত্মাজিকে লিখিত পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি।

* There are among them some of the most respected leaders in public life in India, the list being headed by the poet Rabindranath Tagore. T. B. Sapru Letter to the Editor Manchester Guardian 8 June 1933.

কবির কি শাস্তি আছে? ৬ই জুন পাঞ্জাব লায়ালপুরে শিখরা এক বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথের 'গুরুগোবিন্দ' কবিতার প্রতিবাদ করিল। তিনি গুরুর যে মৃত্যু আখ্যায়িকা দিয়াছেন তাহা ভুল; এবং তাহারা উত্তেজিত হইয়া নানাবিধ প্রস্তাব পেশ করিল। কবিতাটির একটি খুব খারাপ তর্জমা একখানি উর্দু কাগজে বাহির হয়; তাহা হইতে এইসব উত্তেজনার সূত্রপাত।

রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিঙে। তিনি খবর পাইয়া অধ্যাপক তেজা সিংহকে এ বিষয়ে একখানি দীর্ঘ পত্রে তাঁহার পক্ষের কথা লেখেন। তিনি বলেন গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে যে কবিতাটি তিনি লিখিয়াছিলেন তাহার মূল ঘটনাটি তাঁহার সৃষ্টি নহে; উহা McGregor-এর ইতিহাস (1846, p 99-100) ও Cunningham (2nd Ed. 1853, p 79-80)-এর বিখ্যাত শিখ ইতিহাস হইতে গৃহীত। তিনি যেভাবে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতে গুরুর প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা দেখানো হয় নাই। এ ঘটনা এখানেই শেষ হইল না; বহু দিন এই লইয়া পাঞ্জাবে লেখালেখি চলে। ১৯৩৫ সালে কবি যখন লাহোর যান, তখন তিনি শিখদের নিকট পুনরায় ইহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলেন।

দার্জিলিঙে এইসব পত্র লেখা ছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠানে বড় বেশি যাইতেন না; তবে একদিন (১১ই জুন) জিমখানা ক্লাবে তাঁহার ইংরেজি ও বাঙলা রচনা হইতে পাঠ করেন। 'কচ ও দেবযানী'র আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী হাতিসিং নৃত্যভঙ্গির দ্বারা তাহা দেখান।

৪৪। তাসের দেশ ও চণ্ডালিকা

দার্জিলিঙ হইতে কবি ফিরিয়াছেন। মহাত্মাজির অনশনের সময় যে pact হইয়াছিল তাহা লইয়া বাঙলা দেশে ঘোর অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙলার রাজনৈতিক নেতারা দেখিলেন যে যেসব সর্ত হইয়াছে তাহাতে বর্ণ হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইবে। কলিকাতা হইতে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক আসিয়া কবিকে সমস্ত বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন। এদিকে বিলাতে পার্লামেণ্টের Select Committeeর অধিবেশনে স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বাঙলার পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করিতে গেলে স্যর স্যামুয়েল হোর বলিলেন প্যাক্টের সময় সকলে এ বিষয়ে একমত হইয়া সহি করেন—এমন কি রবীন্দ্রনাথও। কিন্তু যথার্থ কথা বাঙলার রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় কেহই সেদিন সেখানে ছিলেন না; সুভাস নির্বাসিত, যতীন্দ্রমোহন অন্তরায়িত, এছাড়া উভয় দল বিভক্ত। এক্ষেত্রে পুণায় বাঙলার প্রতিনিধি কেহ ছিলেন একথা বলা যায় না; রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ নহেন। এই ব্যাপারের পর রবীন্দ্রনাথকে সংবাদপত্রে পুনরায় ঘোষণা করিতে হইল যে তিনি মহাত্মাজির জীবন সঙ্কট লইয়া এতই চিন্তিত ছিলেন যে প্যাক্টের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিবার মত সুযোগ পান নাই। তিনি বলিলেন, Never having experience in political dealings, while entertaining great love for Mahatmaji and complete faith in his wisdom in Indian politics, I dared not wait for further consideration. বাঙলাদেশের বর্ণহিন্দুর প্রতি যে অবিচার হইয়াছে তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। বৃটীশ পার্লামেণ্ট white paperএর সকল বিষয়ই আলোচনা করিতেছেন কেবল এই হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মীমাংসাটাই পাকা বলিয়া ধরিয়া লইবেন—ইহাতে কবি আশ্চর্যান্বিত হন নাই; তবে তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সদস্যগণের ব্যবহার। তাঁহারা শুধু উদাসীন নহেন, তাঁহারা বাঙলার ন্যায্য দাবীর বিরোধী। (actively take part in Bengal's misfortune, is terribly ominous. July 24, 1933).

এই উক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ হরিজন সম্প্রদায়ের নেতাদের নিকট হইতে ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন এবং অপর প্রদেশের বর্ণহিন্দুরা যাহাদের উপর সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির আঁচ লাগে নাই—তাহাদের নিকট হইতে তিরস্কৃত হইলেন।

২৯এ জুন (১৯৩৩) বিদ্যালয় খুলে; কবি তখন কলিকাতায়। বিদ্যালয় খুলিবার চারিদিন পূর্বে ২৫ জুন অধ্যাপক জগদানন্দ রায় হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন। জগদানন্দবাবু ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের গোড়া হইতে শান্তিনিকেতনে ছিলেন; নিজ শক্তিবলে তিনি বাঙলা সাহিত্যে নাম করিয়াছিলেন। মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বে তিনি কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ ছিল।

বাঙলাদেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া যখন উত্তেজনা চলিতেছে, তখন অকস্মাৎ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর মৃত্যু হইল। এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য দেশ প্রস্তুত ছিল না; তিনি বহুকাল অন্তরায়িত অবস্থায় বাস করিতেছিলেন এবং লোকের ভরসা ছিল একদিন তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। শান্তিনিকেতনে এই সংবাদ পৌঁছিলে (২৪ জুলাই) আশ্রমবাসীরা রবীন্দ্রনাথের নিকট সমবেত হন; তিনি সংক্ষেপে তাঁহার ত্যাগ ও মহত্ত্বের কথা বলিয়া বলিলেন, "দীর্ঘকাল রাজনৈতিক বন্দীরূপে আবদ্ধ থাকার জন্যই যে তাঁহার মৃত্যু এত ত্বরান্বিত এবং এত অসময়ে সঙ্ঘটিত হইল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (আনন্দবাজার ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪০)। দেশের দারুণ দুঃখের দিনে তিনি নিজ বাণী নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বিশ্বভারতীর কাজ, দেশের জন্য প্রয়োজন হইলে তাগিদ মিটানো ছাড়া বাহির হইতেও লেখার চাহিদা, বাণীর আহ্বান আসে। মহামতি Wilberforce (১৭৫৯—১৮৩৩) শতাব্দী পূর্বে পৃথিবী হইতে দাসপ্রথা বন্ধ করেন; তিনি জগতে অমর হইয়াছেন; তাঁহার সেই কর্মের শতবার্ষিকী হইবে ২৯এ জুলাই, ১৯৩৩ Hull নগরীতে। কবির কাছে তাঁহার বাণীর জন্য পত্র আসে; কবি যাহা লিখিয়া দেন তাহা ২৮এ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কবি উইলবারফোর্সের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিলেন,

But * * * the evil has not died with his own death, * * * in the dark corners of civilization slavery still lurks, hiding its name and nourishing its spirit. It is there in our plantations, in factories, in business offices, in the primitive department of Government where the primitive vindictiveness of man claims a special privilege to indulge in fierce barbarism. A considerable section of men still seems to have an innate sympathy for the strong seeking victims in its chase of profit and power and what is worse there are terrible movements of benevolent idealism relentlessly smothering freedom in their path of ruthless recruitment. Humanity ever waits for the voice of judgment against the uncontroled cultivation of slavery...... ....."
ইহা ১৮ই জুলাই লিখিত।

বিদ্যালয় খুলিবার পর রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে আসিয়াছেন ও বাঙলাছন্দ সম্বন্ধে সন্ধ্যার পর আলোচনা করিতেছেন। বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও (৮ই জুলাই ১৯৩৩) যথারীতি সম্পন্ন হইল। শ্রীমতী হাতিসিংহ এই বর্ষার উৎসবকে তাহার নৃত্যের দ্বারা সুন্দর করিয়া তোলেন।

কয়েকদিন পরেই (১২ই) নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর শান্তিনিকেতনে আসেন; কবি এই তরুণ শিল্পীকে যথাবিধ অভিনন্দন ও আশীর্বাদ করেন (২৮ আষাঢ়, ১৩৪০) উদয়শঙ্কর তাঁহার নৃত্যকলা দেখাইয়া সকলকে তৃপ্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ উদয়শঙ্করকে আশীর্বাদ করিয়া যাহা বলেন, তাহা হইতে নৃত্যসম্বন্ধে তাঁহার মত আমরা জানিতে পারিব। কবি লিখিয়াছেন,

"একদিন আমাদের দেশের চিত্তে নৃত্যের প্রবাহ ছিল উদ্বেল। সেই উৎসের পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ স্তব্ধ। তার শুষ্ক স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ আছে সে পঙ্কিল এবং ধারাবিহীন। তুমি নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উদ্বাহিত ক'রে আনন্দের এই বাণীকে আবার একবার জাগিয়ে তুলেছ।

"নৃতহারা দেশ অনেক সময় এ-কথা ভুলে যায় যে, নৃত্যকলা ভোগের উপকরণ মাত্র নয়। মানব সমাজে নৃত্য সেইখানে বেগবান্, গতিশীল, সেখানে বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বীর্য আছে। যে দেশে প্রাণের ঐশ্বর্য অপর্যাপ্ত, নৃত্যে সেখানে শৌর্যের বাণী পাওয়া যায়। শ্রাবণমেঘে নৃত্যের রূপ তড়িৎ-লতায়, তার নিত্যসহচর বজ্রাগ্নি। পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে, সেখানে নৃত্য অন্তর্ধান করে, কিংবা বিলাসব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে অনিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য হারায়, যেমন বাইজীর নাচ। এই পণ্যজীবিনী নৃত্যকলাকে তার দুর্বলতা থেকে তার সমলতা থেকে উদ্ধার করো। সে মন ভোলাবার জন্যে নয়, মন জাগাবার জন্যে। বসন্তের বাতাস অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্যে ও সফলতায় সমুৎসুক করে তোলে। তোমার নৃত্যে ম্লানপ্রাণ দেশে সেই বসন্তের বাতাস জাগুক, তার সুপ্ত শক্তি উৎসাহের উদ্দাম ভাষায় সতেজ আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে উঠুক, এই আমি কামনা করি।" (প্রবাসী ১৩৪০ ভাদ্র পৃঃ ৭২৫)।

বাহিরের কাজ তাঁহাকে যতই ব্যস্ত করুক তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। 'পরিশেষ' (১৩৩৯, আশ্বিন) নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর আবার কবিতা জমিয়াছে ; সেগুলি অন্য ধরণের ; অর্থাৎ কতকগুলি ছবি দেখিয়া কবির মনে যে ভাব আসিয়াছে, তাহাই লেখনীর সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩৪০ শ্রাবণ মাসে সেই কবিতা ও ছবি একত্র করিয়া 'বিচিত্রা' নামে কাব্য প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ৩১খানি ছবি আছে—সেইজন্যও বটে ইহার নাম হয় বিচিত্রিতা। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুনয়নী দেবী, নন্দলাল, সুরেন্দ্রকর, রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, গৌরীদেবী প্রভৃতির চিত্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ৭খানি ছবি ছিল। কাব্যখানি কবি নন্দলালবসুকে তাঁহার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ উপলক্ষে উৎসর্গ করেন। এই কাব্যখানির বিষয়বস্তু বহুদিন পূর্বেই প্রস্তুত ছিল, সুতরাং ছাপার সময় দেখিয়া ইহার কালনির্ণয় চলিবে না।

পূজাবকাশের পূর্বে কলিকাতার কোনো কিছু অভিনয় করা যায় কি না তাহার কথাবার্তা চলিতেছে। গত চৈত্র মাসে ১৩৩৯ 'শাপমোচন' অভিনীত হয়। সেটিতে গান ও নৃত্যই ছিল প্রধান—অভিনয় হয় মূক। এইবার

কলিকাতায় নূতন ধরণের কিছু দিবার জন্য কবির ইচ্ছা হইল। সেইজন্য 'গল্পগুচ্ছে'র 'আষাঢ়ে' গল্পটিকে একটি নাট্যে পরিণত করিলেন; নাম দিলেন 'তাসের দেশ।' এটী হইল হাস্যরসে ভরপুর শ্লেষাত্মক কৌতুক নাট্য। বলা যাইতে পারে—হল্লিসক। এই সময়েই আর একটি রচনা করেন—'চণ্ডালিকা'। এ গল্পটির উদ্ভব বৌদ্ধ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'নেপালে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য' সম্বন্ধে গ্রন্থে আখ্যানটি আছে;—আনন্দ বুদ্ধের শিষ্য, ভিক্ষা হইতে ফিরিবার সময় কূপের ধারে এক মাতঙ্গীকে (চণ্ডালকন্যা) জল তুলিতে দেখিয়া তৃষ্ণার্ত হইয়া জল চান। মাতঙ্গী বলিল, সে চণ্ডাল কন্যা। আনন্দ উত্তর করেন, তিনি তাহার জাতি জানিতে চান নাই তিনি জল চান। এই কথায় কন্যার বিস্ময় লাগে। সে আনন্দর প্রেমে আকৃষ্ট হয়। মায়ের সাহায্যে যাদুবলে আনন্দকে তাহার গৃহে আনে। বুদ্ধ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রতিমন্ত্র বলে রক্ষা করেন। অতি সংক্ষেপে গল্পটি এই। রবীন্দ্রনাথ এই বইখানিতে দুটি মাত্র চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন—একটি চণ্ডালিকা, অপরটি তাহার মাতা। শ্রব্যনাট্য হিসাবে ইহার রচনার চাতুর্য আশ্চর্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

১৭ই আগষ্ট (১লা ভাদ্র ১৩৪০) চণ্ডালিকা নাটিকাটি আশ্রমবাসীদের নিকট পড়িয়া শোনান। নাট্য দুইখানি লিখিয়া তাহা অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করিলেন ও কলিকাতায় গিয়া ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) ম্যাডান থিএটরে অভিনয় করাইলেন। 'চণ্ডালিকা'র উপাখ্যান হরিজন আন্দোলনের উপযুক্ত; কবি সেটি স্বয়ং আবৃত্তি করেন। 'তাসের দেশে'র অভিনয় লোকের খুব ভাল লাগিয়াছিল—এই জাত্যভিমানী দেশে এরূপ তীব্র ব্যঙ্গ যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছিলেন। তিন দিন অভিনয় হয়।

কবি খড়দহর বাসায় আছেন; ১৬ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকী। এই দিন ভারতের সর্বত্র বর্তমান যুগগুরুকে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই এই মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন—

---

* V. B. News. Vol. II Decm. Nov. 1933. Tasher Desh, a review by Krishna Kripalani.

আজও তিনি একটি কবিতা বিশেষভাবে লিখিয়া Forword (3 Oct. '33) -এর জন্য পাঠাইয়া দেন। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পংক্তি এইরূপ :—

Freedom from fear is the freedom I claim for you
my motherland.
Fear, the phanton demon,
Shaped by your own distorted dreams,
Freedom from the burden of ages,
Binding your head, breaking your back,
Binding your eyes to the beckoning call of future.

৪৫। বোম্বাই ভ্রমণ

কলিকাতার কাজকর্ম চুকাইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন ; নভেম্বরের শেষে পূজাবকাশ সেইখানেই কাটাইলেন। এদিকে বোম্বাইতে রবীন্দ্রনাথ-সপ্তাহ হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কবি সেখানে শান্তিনিকেতনের গায়ক ও অভিনেতৃ দল লইয়া যাইবেন, কলাভবনের শিল্প ও ছবি, কবির নিজের ছবি ও রথীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা' কারখানার শিল্প নিদর্শনের প্রদর্শনী হইবে। স্থির হইল 'শাপমোচন' ও 'তাসের দেশ' অভিনীত হইবে ; 'তাসের দেশে' গুজরাতী ভাষায় শ্রীমান পিনাকী অনুবাদ করিলেন ; গানগুলিও তিনি খুব সুন্দরভাবে তর্জমা করেন।

রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই যাইতেছেন,—তাঁহার যথোপযুক্ত সমাদর ও বিশ্বভারতীকে কিভাবে অর্থ সাহায্য করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় ; এই কমিটি সেখানকার ব্যবস্থা করেন ; শ্রীযুক্ত হরেনঘোষ এই ব্যাপারে বিশ্বভারতীকে বিশেষ সাহায্য করেন।

২৩ নভেম্বর (১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ সদলে বোম্বাই পৌছান। সরোজিনী-নাইডু, কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ জাভ্‌লে ও য়ুনিভার্সিটির ভাইস্‌-চানসেলার মিঃ চন্দ্রাভরকর কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে আসেন। সেইদিন অপরাহ্ণে তাঁহার ছবির প্রদর্শনী খোলা হয়।

বোম্বাইতে কবির বহু ও বিচিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হয়। ২৬ নভেম্বর ছাত্রদের নিকট The Challenge of Judgment নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই দীর্ঘ বক্তৃতায় কবি বলেন আজকাল চতুর্দিকে সকলে modern বা আধুনিক হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। সকল ব্যক্তি সকল জাতির একমাত্র সাধনা এই আধুনিকত্ব লাভের জন্য। য়ুরোপের এই যে অনুকরণ তাহা কিভাবে সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিতেছে তাহাই এই বক্তৃতায় কবি বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত ‘শাপমোচন’ বিশেষভাবে লোকের ভাল লাগে ; ‘তাসের দেশ’ বাঙলায় অভিনীত হয়। প্রদর্শনী দেখিতে গবর্ণর Sir M. Sykes একদিন আসিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এবার বোম্বাই যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল টাকা তুলিবার জন্য। সেকথা তিনি পূর্বেই অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইয়া দেন। এইবার বোম্বাই ও দক্ষিণভারতে অভিযান হইতে দানে, বক্তৃতায়, অভিনয়ে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা উঠিয়াছিল।

বোম্বাই হইতে কবি ৫ই ডিসেম্বর Waltair যাত্রা করেন। ববলীর রাজার অতিথিরূপে তাঁহার সমুদ্রতীরস্থ প্রাসাদে কবির থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ৮ই তারিখে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে ভাইস্‌ চ্যান্‌সেলার স্যর রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথের সম্মানের জন্য প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেন ও তৎপরে নবনির্মিত বিরাট মণ্ডপতলে প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন। ৯ই তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কবিকে অভিনন্দন প্রদান করে ও সেইদিন অপরাহ্ণে কবি তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। শহরের বাহিরে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর বক্তৃতার স্থান হয় ; তথাপি বহুদূর হইতে বিপুল জনস্রোত পর্বত শিখরে সমবেত হয়—কবিকে দেখিতে। ১০ই তারিখে তৃতীয় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল মানবের ধর্ম। টাউনহলে

ম্যুন্সিপালটি ও কবি-সমাজ কবিকে অভিনন্দন প্রদান করিয়া বলেন যে, তরুণ কবি ও সাহিত্যিকগণ সকলেই রবীন্দ্রসাহিত্য ও তাঁহার ভাব ও ভাষার নিকট বিশেষ ঋণী। অন্ধ্রদেশের অনেক সাহিত্যিক বাঙলা জানেন।

১২ই ডিসেম্বর কবি, কালীমোহন ঘোষ ও সেক্রেটারী অনিলকুমার চন্দর সহিত হায়দ্রাবাদে পৌঁছিলেন। কবির এই প্রথম হায়দ্রাবাদে আগমন; তাঁহার সম্বর্ধনা আদর যত্ন সবই রাজকীয় ভাবে হয়। ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি বক্তৃতা দিলেন; প্রধান মন্ত্রী রাজা কিষনপ্রসাদ ও স্যর অকবর হায়দারি কবি সম্বন্ধে সভায় বলেন। কবি প্রায় একসপ্তাহ হায়দ্রাবাদে থাকিলেন; বক্তৃতা, পার্টি, কথাবার্তা, আলোচনার অন্ত নাই; বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। বহু ধনী অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন, অনেকে অর্থদানও করেন। ১৮ই রাজা কিষনপ্রসাদ এক ভোজের আয়োজন করেন তাহাতে নিজাম বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। পাঠককে এইখানে স্মরণ করাইয়া দিই নিজাম বাহাদুর বিশ্বভারতীতে ইস্‌লামিক সংস্কৃতি অধ্যাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা কয়েক বৎসর পূর্বে দান করিয়াছিলেন; * ইহার পর কবির সঙ্গে তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন; পৌষ উৎসবে তিনি ছিলেন না; ভারতে থাকিয়া এই প্রথম তিনি ৭ই পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতন হইতে অনুপস্থিত।

কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার বিশ্রাম নাই। রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯এ ডিসেম্বর (১৯৩৩) সিনেটে 'ভারত পথিক রামমোহন' নামে বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করিলেন। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসে রামমোহনের স্থান কোথায় তাহাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

পরদিন কবিকে All India Women's Conference-এ একটি ভাষণ দিতে হয়। কবি বলেন যে অতীত যুগে পুরুষ তাহার দৈহিক শক্তি বলে ও জীবতত্ত্বের দিক হইতে কতকগুলি সুবিধার অধিকারী হওয়ায় তাহার অবসর

* পরে তিনি নিজাম অধ্যাপকের গৃহনির্মাণের জন্য উনিশ হাজার টাকা ও বিশ্বভারতীর সাধারণ তহবিলে পাঁচহাজার দান করেন। শান্তিনিকেতনে 'নিচুবাংলা' নিজাম হাউসের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে (১৯৩৬)।

সময়ে সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। ফলে বর্তমান যুগে সমাজ পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, নারী তাহার বন্দীদশায় থাকিয়া সমাজের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেছে, পুরুষের মনের রসের সামগ্রী হইয়া আছে। ফলে মানব সমাজ তাহার ছন্দ হারাইয়াছে এবং ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। অবশেষে নারী আসিয়া এই পুরুষপ্রধান মানব সমাজের জীবনে ছন্দ আনিয়াছে।*

কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ৩ জানুয়ারী (১৯৩৪) কবি ফিরিয়াছেন। সেই সময়ে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আসেন ও ১৯ জানুয়ারী আসেন জওহরলাল নেহেরু ও কমলা দেবী। শান্তিনিকেতনে আসিবার পূর্বে কলিকাতায় জওহরলাল যে বক্তৃতা করেন, তাহাই তাঁহার শেষ কারাগাররুদ্ধের কারণ। জহরলালের কন্যা ইন্দিরা তখন বিশ্বভারতীর ছাত্রী।

এই সময়ে মহাত্মাজির সহিত কবির একটি বিষয় লইয়া মতভেদ হয় ও কাগজে উভয়েই নিজ মত ব্যক্ত করেন। বিষয়টা এই—১৫ই জানুয়ারী (১লা মাঘ) বিহারে ভূমিকম্প হয়। এই বিষয়ে মহাত্মাজি একটি প্রবন্ধ লেখেন ও বলেন, লোকের অস্পৃশ্যতা পাপের এই শাস্তি বিধাতা দিয়াছেন। কবি এই অযৌক্তিক কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হন ও তাহার প্রতিবাদ লেখেন (৫ই ফেব্রুয়ারী)। মহাত্মাজী ইহার পরেও বলেন যে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিশ্বাস। সুতরাং এ কথার উপর তর্ক চলে না। রবীন্দ্রনাথ

* "Woman cannot be pushed back into the superficial region of the merely decorative by man's aggressive athleticism. It is not that woman is merely seeking today her freedom of livelihood * * but against man's monopoly of civilization. Woman must come into the bruised and maimed world. The world with its insulted individuals has sent its appeal to her.

"The union of man and woman will represent a perfect cooperation in the building up of human history on equal terms in every department of life. * * The rudely elbowing age of relentless rapacity will give way to that of a generous communion of minds and means, when individuals will not be allowed to be terrorised into abject submission by idealistic bullies compelled to lose their own physiognomy in a gigantic mask of a nebulous abstraction."

বিলাতে এণ্ড্রুসকে বিহারের নিদারুণ অবস্থার কথা জানাইয়া কেব্‌ল্ করেন। ২৩এ জানুয়ারী তিনি দেশ বিদেশে সংবাদ পাঠান যে বিহারের সাহায্যের জন্য সকলে মুক্তহস্ত হউন, "its calamity transcends geographical limits and makes its appeal to universal man".

ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীনিকেতনের উৎসব; কলিকাতার মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকারকে কর্তৃপক্ষ সভাপতি রূপে আহ্বান করেন। কবি উৎসবে উপস্থিত হইয়া যে বক্তৃতা দেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমরা কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াছি। *

এই সময়ে মহাত্মাজির বাঙলা দেশে সফরে আসিবার কথা হইতেছে; অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য তাঁহার এই অভিযান। মহাত্মাজির বাণীর বিরোধী কয়েকটি দল বাঙলায় ছিল; একদল মহাত্মাজিকে বয়কট করিবে বলিয়া আস্ফালন করিতেছিল; একটি দল বলিতেছিলেন বাঙলায় অস্পৃশ্যতা নাই; আবার অপর একটি দল সোৎসাহে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ গঠন করিতে সুরু করিলেন। বাঙলাদেশকে এরূপ বিচিত্র মতামত ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে

---

* "বর্তমান সভ্যতায় দেখি এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে, অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে; আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিঁকতেই পারে না।"

"পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থ-সঞ্চয়িতার মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন আসছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে—কেন না শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্চে তা নয়, শাস্তিও উঠচে জমা হয়ে।" (উপেক্ষিতা পল্লী, প্রবাসী ১৩৪০ চৈত্র; ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ শ্রীনিকেতনের বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতা)।

দেখিয়া কবি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ৭ই ফেব্রুয়ারী লিখিলেন, 'কিছুকাল হইতে মহাত্মাজির মতামত সম্বন্ধে বাঙলাদেশে বিরুদ্ধতা দেখা দিয়াছে; সমালোচনা দূষনীয় নহে; তবে সমালোচনা ও অপবাদ এক নহে।' I would be failing in my duty were I not to raise my voice of protest against the slanderous campaign that is being carried on against him. I have often disagreed with him in public and even quite recently criticised his belief, * * * but I have enough regard for the sincerity of his religious convictions and his abiding love for the poor to held his differences of opinion with me with respect. I offer him a hearty welcome to Bengal.

৮ই ফেব্রুয়ারী পুনরায় কলিকাতায় যাইতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার জন্য। একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে উপস্থিত হন। মাঝে একদিন লাহাদের ভারতী ফাউনটেনপেনের কারখানা দেখিতে যান ও এই জাতীয় কলমের নাম দেন ঝরণা কলম। ১৩ই ফেব্রুয়ারী বাঙালীর প্রধান জীবনবীমা কোম্পানী 'হিন্দুস্থান ইন্‌শিওরেন্সে'র ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় জুবিলি উৎসব হয়; এই উপলক্ষে কবি সভাপতিত্ব করেন ও ভাষণ দান করেন। স্বদেশীযুগে যখন এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, ইহার সহিত কবির যোগ ছিল, বিশেষভাবে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ইহার প্রধানতম স্রষ্টাদের অন্যতম। কলিকাতার বিচিত্র অনুষ্ঠান শেষ করিয়া ২৪ ফেব্রুয়ারী আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

৭ই এপ্রিল কলিকাতার International Relation club-এ কবিকে বক্তৃতা দিবার জন্য আবার রাজধানী যাত্রা করিতে হয়। সভা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে; ভাইস্‌চান্‌সেলার সুরবরদি উপস্থিত ছিলেন; এই প্রতিষ্ঠানটি Carnagie Endowment for International peace-এর জন্য দান হইতে স্থাপিত হয়।

———

৪৬। সিংহলে

বিশ্বভারতীর অর্থাভাবের জন্য পুনরায় কবিকে বাহিরে যাত্রা করিবার কথা উঠে। স্থির হইল বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী লইয়া কবি সিংহল দ্বীপে যাইবেন; ভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্য চিত্রকলার প্রদর্শনীই ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

কলোম্বো হইতেও কবির নিমন্ত্রণ আসিল। যাত্রার পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ কর ও অনিলকুমার চন্দ সেখানকার ব্যবস্থা দেখিবার জন্য সিংহলে গেলেন। 'ইনচাঙগা' নামে জাহাজে তাঁহারা ৬ই মে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন। এবার সমুদ্রের উপর জন্মদিন কাটিল।

৯ই মে কবি কলোম্বোতে পৌছিলেন। কলোম্বোর মেয়র স্যর ব্যারণ জয়তিলক কবিকে সম্বর্ধনা করিতে ঘাটে আসেন। ১০ই সন্ধ্যায় রোটারি ক্লাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। কলোম্বতে পাঁচরাত্রি 'শাপমোচন' অভিনীত হয়। একদিন কবি Y. M. C. A. তে কিছু পাঠ করেন; "আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা" এই আবেগপূর্ণ আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া সেখানকার কোনো কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ পার্শ্ববর্তী অনিল চন্দকে বলেন, "তুমি বলো, ইনি ৭২ বছর পেরিয়েছেন How absurd !"

১২ই মে হইতে ২৮শে মে পর্যন্ত কলোম্বোতে নৃতগীত, বক্তৃতা চিত্রপ্রদর্শনী চইল। ভারতীয় শিল্প কলা সঙ্গীতের সঙ্গে সিংহলের যোগ অতি অল্পই; সিংহলীরা এত বিদেশীভাবাপন্ন যে ভারতীয় কোন জিনিষ বুঝিবার মত শিক্ষা ইহারা হারাইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের এই নিদর্শনগুলি তাহাদের ভাবাইয়া তুলিয়াছে। "প্রদর্শনীর দিক থেকে সেদেশে এটাই খুব বড় কাজ বলে মনে হয়।"

১৯এ মে কলোম্বোর আঠারো মাইল দূরে সমুদ্রতীরে পানাদুরা নামে একটি সহরে কবি সদলে যান। তাঁরা যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছিলেন তিনি কিছুকালপূর্বে বিশ্বভারতীতে ছিলেন; তিনি দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার গ্রামে

হোরানায় শ্রীনিকেতনের আদর্শে একটি প্রতিষ্ঠান করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। ২০এ মে কবি সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়া শ্রীপল্লী নাম দেন। পানদুরা নামক স্থানে একদিন বিশ্রাম করিয়া ২২এ মে Galle গালে অভিমুখে যাত্রা করেন। এখানে 'শাপমোচন' অভিনয় হয়। ২৪এ মে আরও দক্ষিণে মাতারু নামে একটি জায়গায় আসিলেন; সেখানে কবি সমুদ্রের ধারে একটি বাঙলোয় থাকেন; এইখানে সিংহলের বিখ্যাত মুখোসনাচ দেখিবার সুযোগ ঘটে।

এখান থেকে ফিরিয়া দলবল ও কবি কলোম্বোয় আসিলেন; এবার আসিয়া পুনরায় তিনরাত্রি অভিনয় করিতে হইল; ২৭এ মে Indian Club কবিকে নিমন্ত্রণ করে।

৩রা জুন দল রওনা হইল কাণ্ডি প্রদেশের দিকে। সহরটি কলোম্বো থেকে ৮০ মাইল দূরে—মোটরযোগে যাইতে হইল। প্রায় সাত দিন কবি কাণ্ডিতে থাকিলেন ছাত্র ছাত্রীরা সিংহলের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে গেলেন। এইখানে 'চারঅধ্যায়' গল্পটি (৫ই জুন) লেখা শেষ করেন। এই বিচিত্র কাজকর্ম ঘোরাঘোরির মাঝে কবির মনে অতীন ও ইলার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। মনের কতখানি নির্লিপ্ততা থাকিলে এই ভাবে কাজ করা যায়, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

৯ই জুন কবি কাণ্ডি হইতে অনুরাধাপুর আসিলেন। একদিন বিশ্রাম করিয়া ট্রেনযোগে উত্তর সিংহল বা তামিল-সিংহলে যাত্রা করিলেন। সেখানেও কবির যথেষ্ঠ সম্বর্ধনা হয়। এখানে তিন রাত্রি অভিনয় হয়, কবির বক্তৃতা হয় একদিন।

১৫ই জুন ১৩৩৪ কবি সদলে জাফনা ত্যাগ করিলেন ও ধনুস্‌কোটি হইয়া মাদ্রাসের পথে ফিরিলেন, সমুদ্র পথে নয়।

সিংহলে যাত্রা বিশ্বভারতীর অর্থের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য নহে; যা কিছু দান সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল তাহা ভারতীয়দের নিকট হইতে, কোনো সিংহলী বিশ্বভারতীর জীবন সদস্য পর্য্যন্ত হন নাই। তাহারা সাহায্য করিয়াছিল টাকা দিয়া অভিনয়ের টিকিট কিনিয়া। ভারতের প্রতি তাহাদের যে ভালবাসা আছে তাহা মনে হয় না। তবে শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র ছাত্রীরা আশ্রমের সরল জীবন যাপনের আদর্শ ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি

শ্রদ্ধা তথায় বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কলোম্বোতে বিশ্বভারতীর এই নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট রেখা রাখিয়া আসিল। সাময়িক বহু কাগজে এ কথা স্বীকার করিয়াছিল যে রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সম্মুখে ভারতীয় আর্টের যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ করিয়াছেন। সিংহল সাধারণতই বিদেশীমুখ, সুতরাং ভারতের এই নৃত্যকলা, সঙ্গীত ও চিত্র তাহাদের চিত্তকে বিশেষভাবেই আলোড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদের নিজ জাতীয় জীবনে এই তরঙ্গ বিশেষ প্রেরণা জাগাইয়াছিল।

কবির এই অভিযান যে একেবারে ব্যর্থ হয় নাই, তার প্রমাণ সিংহলের পত্রিকা হইতে পাওয়া যায় ;

Here in Ceylon he has kindled a new enthusiasm, he has awakened a great yearning, he has held aloft a great idealism. It is not generation that will think him for his inspiration to Ceylon. Generation cannot measure the value of his services. It is not history that will record his actievements. Even history cannot give a niche to an impetus that has opened our eyes to a vision of the joy and grandeur of our song and our music, of our art and our culture." *

কলোম্বোতে কোনো বক্তৃতাকালে তিনি বলেন তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে কিছুই দেয় নাই। অন্যমনস্কভাবে বলা কথা। তাহার ফলে ভারতের অনেক কাগজ অত্যন্ত তীব্র সমালোচনা করেন। বোম্বাই হইতে কবি চারি মাস আগে ফিরিয়াছেন কিছু অর্থ লইয়া—অথচ এ কথা কেন বলিলেন, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই। তবে আমাদের মনে হয়, অন্য অন্য কাজের জন্য দেশের লোক যে ভাবে মুক্ত হস্তে টাকা দেয়, তাহার প্রতিষ্ঠানে সেরূপ দেয় না—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য।

২৮এ জুন কবি কলোম্বো হইতে শান্তিনিকেতন ফিরিলেন ইতিমধ্যে

* সিংহলে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, বিচিত্রা ১৩৪১ অগ্রঃ পৃঃ, ৬৫৫—৬৬৯।

আশ্রমের অভ্যন্তরে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে; শ্রীমতী হেমবালা সেন শ্রীভবনের অধিনেত্রীর কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও প্রতিমা দেবী ইহার ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে কবি নারীভবন সম্বন্ধে তাঁহার মত ও আদর্শ পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যান করেন। আশ্রমের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তিনি ইহার অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কারণ একমাত্র দায়িত্ব তাঁহারই; বাহিরের লোক যাহাদের সহিত ইহার ইষ্টানিষ্টর কোনো সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা কেবল সমালোচকভাবেই সমালোচনা করেন সমগ্রভাবে তাঁহারা দেখেন না ইহা দুঃখের বিষয়।

১৩৪০ সালের শেষ দিকে কবির দুইখানি নূতন বই প্রকাশিত হয়। একখানি নাটক—'বাঁশরী', ১৩৪০ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয়। অপরখানি গল্প—'মালঞ্চ', ১৩৪০ চৈত্রে প্রকাশিত হয়। 'চার অধ্যায়' সিংহলে লেখেন।

৪৭। মাদ্রাসে

১৩৪১ আষাঢ় হইতে কবি শান্তিনিকেতনে আছেন, নিয়মিত ছাত্রদের জন্য মন্দিরে উপদেশ দিতেছেন, সন্ধ্যার সময় সপ্তাহে একদিন করিয়া নানা সাহিত্য ও নিজ কাব্য হইতে পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। ১৫ই জুলাই কলিকাতায় যান পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাহিত্যের তাৎপর্য্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯এ জুলাই গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ হয়। পরদিন বোলপুর ফিরিয়া আসেন। ১১ই, ১২ই আগষ্ট (২৬, ২৭ শ্রাবণ ১৩৪১) 'শ্রাবণ গাথা' অভিনয় হয়। কলিকাতা হইতে অনেক অতিথি সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে এই সময় দুই জন চীনা ভদ্রলোক ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন মিঃ তান্ য়ুন্ সান্ কয়েক বৎসর পূর্বে চীনা ভাষার অধ্যাপকরূপে ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ভারতের সহিত চীনের একটি যোগ স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছিল। ১৯এ ও ২৬এ আগষ্ট এই হিন্দু-চীনা সংযোগ কিভাবে স্থাপিত হইতে পারে সে-বিষয়ে সভা হয়; রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। স্থির হইল শান্তিনিকেতনে তাঁহারা এই কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। অধ্যাপক তান্ য়ুনের চেষ্টায় চীন দেশ হইতে ত্রিশহাজার টাকা আসিয়াছে, এবং চীন ভবনের জন্য শান্তিনিকেতনে একটি অট্টালিকা নির্মিত হইতেছে। চীনা লাইব্রেরী ইতিপূর্বে বিশ্বভারতীতে ছিল; অধ্যাপকের চেষ্টায় বহু সহস্র গ্রন্থ আসিয়াছে এবং নিরন্তর আসিতেছে। আশা হয় কালে শান্তিনিকেতনে হিন্দু-চীনা সংস্কৃতির সাধনা স্থান হইবে। কবির স্বপ্ন সফল হইল। ১৯২৪এর চীন ভ্রমণ সার্থক হইবে।

৩১এ আগষ্ট খাঁ অবদুল গফর হাজিরাবাগ জেল হইতে মুক্তি পাইয়া শান্তিনিকেতনে আসেন। খাঁ সাহেবের পুত্র কলাভবনে কাজ শিখিতেন। কবি খাঁ সাহেবের যথাযথ সম্বর্ধনা করেন। ১লা সেপ্টেম্বর তিনি পাটনা হইয়া ওয়ার্দাভিমুখে যাত্রা করেন।

সেপ্টেম্বরের (১৯৩৪) গোড়ায় কবি বিলাতের বিখ্যাত অধ্যাপক গিল্‌বার্ট মারের (G. Murray) নিকট হইতে একখানি দীর্ঘ পত্র পান। মারে বহুকাল হইতে কবির আদর্শবাদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক এবং ভারতের প্রতি বৃটেনের সুবিচারের জন্য তিনি একাধিকবার মেমোরিয়ালে সহি করিয়াছিলেন। পৃথিবীর চারিদিকে অশান্তি ও জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ হিংসা দেখিয়া যে মুষ্টিমেয় মনীষী অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম অধ্যাপক মারে। অন্তর্জাতিক সমস্যা নিবারণের প্রশ্ন তুলিয়া অধ্যাপক মারের লিখিত পত্রের কবি এক দীর্ঘ উত্তর লেখেন। জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার যে মত তাহাই এই পত্রে স্পষ্ট করিয়া বলেন; মনুষ্যত্ব যদিও চারি দিক হইতে আঘাত পাইতেছে, তথাচ মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বিনষ্ট হয় নাই। When I read some of the outstanding modern books published after the war, I realize how the brighter spirits

of young Europe are now alive to the challenge of our times. কবির ভবিষ্যতের উপর অসীম বিশ্বাস; সেই বিশ্বাসবলে বলিতেছেন, I feel proud that I have been born in this great age.

বাঙলায় মারে ও কবির প্রবন্ধ দুটি অনূদিত হয় নাই। প্রবন্ধ দুটি একত্রে International Institute of Intellectual Co-operation, League of Nations হইতে প্রকাশিত। বইখানি ফ্রান্সে মুদ্রিত হয়, ১৯৩৫ জানুয়ারী মাসে।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতায় যাইতে হয়,—অত্যন্ত বাজে কাজে। পানিহাটিতে 'বাসন্তী কটন মিল্‌স্‌' খুলিবার জন্য যাওয়া। এই ধরণের কাজ কবিকে অধুনা মাঝে মাঝে করিতে হয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে অভিমত, প্রশংসাপত্র দিয়া থাকেন উপরোধ অনুরোধ প্রভৃতি এড়াইতে পারেন না।

ইতিমধ্যে মাদ্রাস হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিল; মাদ্রাস গবর্মেণ্টের মন্ত্রী বোবিলির রাজা রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান। কাগজে বাহির হইল মাদ্রাস কবিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবার জন্য আয়োজন করিতেছে! কবির তখন বিশ্বভারতীর জন্য টাকার প্রয়োজন তিনি সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

২১এ সেপ্টেম্বর কবি মাদ্রাস পৌঁছিলে বোবিলি রাজা যথোপযুক্ত সম্বর্ধনা করিলেন। পর দিন মাদ্রাস কর্পোরেশন হইতে কবিকে মানপত্র দান করা হইল; কবি তাহার উত্তরে যে বক্তৃতা দেন তাহা Visva-bharati News (IV. p 35-37) মুদ্রিত হইয়াছে। ২৬এ তারিখে Midland Theatre হলে ছাত্রদের সম্মুখে Myself and the Bengal Renaissance সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; সেই দিন ছাত্ররা বিশ্বভারতীর নামে এক সহস্র মুদ্রার তোড়া কবিকে উপহার দেন। মহিলাদের সভায় একদিন বক্তৃতা করেন। কবি ছিলেন আদৈরে থিওজোফিকল সোসাইটিতে।

২৫এ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও নন্দলাল বসু প্রভৃতি শিল্পীরা আসিলেন। চিত্র ও শিল্প নিদর্শনের প্রদর্শনী খোলা হইল। ২৭, ২৮, ৩০, ৩১ সেপ্টম্বর 'শাপমোচন' অভিনীত হইল।

মাদ্রাস অভিযানে বিশ্বভারতীর বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। প্রথম হইতে উদ্‌যোক্তারা ভুল করিয়াছিলেন। প্রথমত যে সময়টা তাঁহারা ধার্য করিয়াছিলেন, তাহা আদৌ অনুকূল নয়, তখন বোম্বাইতে কংগ্রেস, অনেকেই সেখানে। দ্বিতীয়ত তাঁহারা একটি দলের হাতে গিয়া পড়িলেন—বোবিলির রাজা 'জাষ্টিস' পার্টির নেতা অর্থাৎ অব্রাহ্মণ সমাজের। উদ্‌যোক্তারা রাজা ও মন্ত্রী দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহাদের প্রভাব মাদ্রাসে প্রচুর ; কিন্তু মাদ্রাসের নেতা ব্রাহ্মণরা, তাঁহাদের কাগজ 'হিন্দু'। 'হিন্দু' কবির আগমন, বক্তৃতা প্রভৃতি সম্বন্ধে একেবারে নীরব ছিল ; কোনো প্রচার কার্য এই শক্তিশালী কাগজের দ্বারা হয় নাই। Publicityর অভাবে কবির এই যাত্রা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দূরের কথা পাঁচ হাজার তুলিয়াও তাহারা দিতে পারেন নাই। Hindu পত্রিকা কোনো দিনই রবীন্দ্রনাথের তেমন ভক্ত নহেন ; তার প্রধানতম কারণ অবশ্য কবির সামাজিক মত ও ধর্ম বিশ্বাস ; 'হিন্দু' পত্রিকা হিসাবে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতে পারা যায়—কিন্তু মত হিসাবে উদার নহেন, যদিও সেসব মত তাঁহারা তেমনভাবে প্রচার করেন না, কারণ তাহাতে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় ; আবার বিরুদ্ধ মতকেও এমন স্থান দেন না, যাহাতে সেগুলি প্রচারিত হয়। মোট কথা এই Publicityর অভাবে এবারকার অভিযানটি নষ্ট হইয়াছিল।

২রা অক্টোবর কবি ওয়ালটেয়ার যাত্রা করেন। ছাত্র ছাত্রীরা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলে থাকেন, কবি ভিজিনাগ্রামের মহারাণীর অতিথিরূপে ছিলেন। মহারাণী কবিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিলেন। এরোপ্লেনযোগে মাদ্রাস হইতে পদ্ম ফুল আনাইয়া কবিকে কয়েক সহস্র টাকা দক্ষিণা দিয়া পাদপূজা করিলেন। ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর (১৯৩৫) ওয়ালটেয়ারে 'শাপমোচন' অভিনীত হয়। ৬ই সকালে কলিকাতা ফিরিলেন।

মাদ্রাস হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই কবিকে কাশী যাইতে হয়। কিছু দিন পূর্বে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ধ্রুবজী আশ্রম দেখিতে আসেন ; সেই সময়ে কবিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনে অভিভাষণ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কন্‌ভোকেশনের সময় ছিল ২৯এ নভেম্বর। ইতিমধ্যে মালব্যজী বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন বলিয়া কন্‌ভোকেশন

স্থগিত হয়। কিন্তু কবিকে কাশী যাইতেই হইল কারণ রাজঘাটে থিওজোফিষ্টদের যে একটি স্কুল খুলিতেছেন (Montessori School) কবিকে সেটি উদ্‌বোধন করিতে হইবে। এই বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষীয়েরা সুরেন্দ্রনাথ করকে তাঁহাদের গৃহাদির পরিকল্পনার ভার দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁহার প্রতিভা বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের ন্যায় সৌন্দর্যরসজ্ঞ ও পৃষ্ঠপোষক পাইয়া তিনি নীরবে এই সাধনা এতদিন করিয়াছেন। বাহির হইতে তাঁহার সমাদর আসিতেছে; বিশ্বভারতী যেমন সঙ্গীতে, নৃত্যে চিত্রকলায় ভারতের আর্টএর নবজন্মে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে —তেমনি সুরেন্দ্রনাথের স্থাপত্যরুচি বিশ্বভারতীর একটি বিশেষ দান বলিয়া একদিন স্বীকৃত হইবে।*

কবি দুদিন য়ুনিভার্সিটিতে ও পরে রাজঘাট স্কুলে গিয়া থাকেন। ২রা ডিসেম্বর মণ্টেসরি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিয়া ৪ঠা কাশী ত্যাগ করেন। কলিকাতায় কয়দিন থাকিয়া ৮ই ডিসেম্বর আশ্রমে ফেরেন।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তনের মধ্যে আবার পরিবর্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। পাঠকের স্মরণ আছে বিদ্যাভবনের (Research) ব্যয় চলিত গায়কবাড়ের দান হইতে; তিনি বৎসরে ৬০০০৲ টাকা দান করিতেন। ১৯৩৪ সাল হইতে সে-টাকা তিনি হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে থাকে; এইসব কারণে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বুঝিলেন, তাঁহার আশ্রমে থাকার অর্থ কবিকে টাকার উদ্বেগের মধ্যে ফেলা। তিনি এই বুঝিয়া ত্রিশ বৎসরের যোগ ছিন্ন করিয়া কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া গেলেন। পূজার ছুটির পর তিনি আশ্রম ত্যাগ করিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী শান্তিনিকেতনের তৈয়ারী মানুষ, ত্রিশ বৎসর পরে তিনি চলিয়া গেলেন, কবির ইহাতে মনে লাগিয়াছিল; কিন্তু তিনি কখনো কিছুই ধরিয়া রাখিবার

---

* ইতিপূর্বে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিস্তম্ভের পরিকল্পনার জন্য সুরেন্দ্রনাথের আহ্বান আসে। এই স্তম্ভ নির্মিত হইয়া গেলে লোকে জানিতে পারে ইহার পরিকল্পক (designers) সুরেন্দ্রনাথ। রাজঘাটের পর মাদ্রাসে থিওজোফিষ্টরা তাঁহাদের একটি বাড়ী সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা মত নির্মাণ করিয়াছেন। আহমাদাবাদ ওয়ার্দা হইতেও তাঁহার আহ্বান আসিয়াছে। বিশ্বভারতীর এই একটি সৃষ্টির দিক বিশেষভাবে পরিলক্ষ্যনীয়।

জন্য ব্যাকুল নহেন ; সুতরাং তাঁহার আঘাত লাগিলেও তাহার প্রকাশ দেখি নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের যাওয়াতে বিশ্বভারতীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার সহিত আশ্রমের অন্তরের যোগ ছিন্ন হয় নাই, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর জ্ঞানচর্চা চলিতেছে।

শান্তিনিকেতন পৌষ উৎসবে এবার কবি আছেন, গত বৎসর ছিলেন হায়দ্রাবাদে। উৎসব যথারীতি হইল (প্রবাসী ১৩৪১ মাঘ, পৃঃ ৪৪৯)। খৃষ্টমাস সপ্তাহে কবির নূতন বই 'চার অধ্যায়' প্রকাশিত হইল। বইখানি লেখা আরম্ভ হয় সিংহলে। তারপর দেশে ফিরিয়া তাহার উপর অনেকবার কলম চালান ; মাঝে কয় ফরমা ছাপাও হয় ; সেগুলি পছন্দ হয় না বলিয়া বাদ যায়। তারপর লিখিয়া কাটিয়া বই ছাপাইলেন ; গল্পের বিষয় বস্তু বাঙলার বিপ্লব-সংক্রান্ত ; লোকে বলিল, বই গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিবেন। বই ছাপাই পড়িয়া থাকিল কয়েকমাস। তারপর বন্ধুবান্ধব হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কবি বই প্রকাশ করিলেন। বই বাহির হওয়ামাত্র দেশের মধ্যে ভীষণ একটা আন্দোলন সৃষ্টি হইল। এই বই সম্বন্ধে আধুনিক যুগে যে পরিমাণ সমালোচনা হইয়াছে, তাহা 'ঘরে বাইরে'র পর কবির কোনো বই সম্বন্ধে হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যেই কপি বিক্রীত হইয়া যায়। লোকে বলিতে আরম্ভ করিল গবর্মেণ্ট এই বই কিনিয়া অন্তরীণাবদ্ধদের দিতেছেন, বিপ্লবদমনের জন্য এই বই সরকারের উপযুক্ত অস্ত্র হইয়াছে। কিছুদিন আগে শুনিলাম—ইহা 'নিষিদ্ধ' পুস্তক হইতে পারে, পরে শুনিলাম ইহা সরকারের বিপ্লবদমনের প্রচার-পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে! মোটকথা ইহা কোনোটিই নহে—ইহা গল্প। গল্প ও সাহিত্য হিসাবে ইহাকে বিচার করিলেই ভাল হয়। * এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কোনো কোনো পত্রিকায় বলা হইয়াছিল যে কবি স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দের একখানি বইএর ছায়াবলম্বে লিখিয়াছেন! এমন অদ্ভুত কথা আমাদের দেশেই হইতে পারে ; কবি কস্মিন্‌কালে এ বই চোখেও দেখেন নাই ; খুব নামজাদা বাঙলা লেখকের লেখা ছাড়া বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে তিনি প্রায় সাধারণ বই পড়িবার সময় পান না। ভূমিকায় ব্রাহ্মবান্ধদের নাম দেওয়ায় একটি বড় রকম ভুল করেন ; দ্বিতীয় সংস্করণে সেটি উঠাইয়া দেওয়া ভাল হইয়াছে।

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ প্রবাসী ১৩৪২ বৈশাখ, পৃঃ ১০৯।

গল্পটি বাহির হইলে শুনিয়াছিলাম, উহার ইংরেজি তর্জমা বিলাতে প্রকাশিত হইবে। অনুবাদের খশড়া হইয়াছিল।

পৌষ উৎসবের (১৩৪১) পরেই কবি কলিকাতায় যান। সেখানকার অনেকগুলি অনুষ্ঠান ও সভাসমিতিতে যোগদান করিতে হয়। ২৭এ ডিসেম্বর প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন * করিয়া, সিনেট হাউসে বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৎসর খানেক পূর্বে তিনি শান্তিনিকেতনের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ চুকাইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় সঙ্গীতের দিকটার খুবই ক্ষতি হয়, কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার হইতেছিল।

জানুয়ারী (১৯৩৫) মাসে কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। ৬ই জানুয়ারী কলিকাতায় Indian Science Congress এ আগত সদস্যগণ আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। কবি যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ একটি শোকের আঘাত পান। কলিকাতায় 'নুটু' শ্রীমতী রমার মৃত্যু হয় (১৯ জানুয়ারী)। রমার বিবাহ হয় সুরেন্দ্রনাথ করের সঙ্গে। সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণপ্রতিভা ছিল। শিশুকাল হইতে আশ্রমে লালিত ; ইনি ছিলেন কবির আযৌবন বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের কন্যা ও স্বর্গগত সন্তোষচন্দ্রের ভগ্নী। কবির এই বেদনা একটি অপূর্ব কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। বসন্তের উৎসব সময়ে তাহার অভাব অনুভব করিয়া কবি কবিতাটি লিখিলেন (V. B. News III. p. 58.; বীথিকা)।

৪৮। উত্তর ভারতে

কবির ডাক আসিয়াছে কাশী, এলাহাবাদ, লাহোর হইতে। ইতিমধ্যে বাঙলার গবর্ণর স্যর জন আণ্ডারসন বাহাদুর—৬ই ফেব্রুয়ারী (সুরুল উৎসবের দিন) শান্তিনিকেতনে আসিলেন। গবর্ণরের আশ্রম পরিদর্শন

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ—দেশ ২য় বর্ষ ১৩ই পৌষ ১৩৪১ পৃঃ ১৩।

এক স্মরণীয় ব্যাপার হইয়াছিল ; স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ বহু পূর্ব হইতে সাবধানতা সম্বন্ধে এতই কড়াক্কড় করিতে লাগিলেন যে অবশেষে কবি আশ্রমবাসী ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে বলিয়া দিলেন আশ্রমে কেহ থাকিবে না—সবাই শ্রীনিকেতনের উৎসবে (৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫) যাইবে কেবল বিভাগীয় কর্তারা থাকিবেন। গবর্ণর আসিয়া জনশূন্য পুরী দেখিলেন —বিদ্যালয়ের আলয়গুলি দেখিলেন আর কিছুই নয়। দেশের রাজনীতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন হইয়াছে। ১৯২০এ বর্তমান ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড তখনকার গভর্ণর আর্ল অব রোনাল্ডসে,—তিনি আসেন আশ্রম দর্শনে। বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া তিনি হাঁটিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'আমি আশ্রমে যাইতেছি, দেশের রীতি অনুসারে পদব্রজে যাইব।' কবির এভাবে লাটকে অভ্যর্থনা করা সমীচীন হয় নাই বলিয়া সাময়িক কাগজে সমালোচনা করে। ইতিপূর্বে এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই।

সেই দিন অপরাহ্ণে (৬ই) কবি কাশী যাত্রা করেন। ইতিপূর্বে মালব্যজি কবিকে দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে সভায় সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন ; কাশীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কবিকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন ; কবি রাজনৈতিক বিসম্বাদের মধ্যে থাকিতে অস্বীকৃত হন। কাশীতে ৮ই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন হয়। এই অনুষ্ঠানে কবিকে 'ডক্টর' উপাধি দেওয়া হয়।

কাশী হইতে ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) এলাহাবাদ যান। সেখানে ১৩ই পর্যন্ত থাকেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ই বক্তৃতা করেন।

এলাহাবাদ হইতে ১৩ই রওনা হইয়া ১৪ই প্রাতে লাহোরে পৌঁছাইলেন। লাহোরে Punjab Students' Conferenceএ কবির নিমন্ত্রণ। ১৫ই কবির অভিভাষণ হইল। সেইদিন কবির জ্বর ; তাহার মধ্যে দেখি তাঁহাকে লিখিতে একখানি চিঠি কবিতায়—পত্রখানি শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীকে লেখা। (দ্রঃ বীথিকা পৃঃ ১৯১-৯৯)। পরদিন Y M C Aতে তাঁহার কাব্য আবৃত্তি ও পাঠ হয়। কনফারেন্সের শেষ দিনে ১৭ই কবির শেষ মন্তব্য বলেন।

কবির সহিত এইবার শিখদের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং 'গুরু গোবিন্দ' কবিতা লইয়া তাহাদের যে ক্ষোভ ছিল তাহা এইবার নিরাকৃত হয়।

কথা ছিল কবি দিল্লী যাইবেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেলেন না। এই সময়ে শ্রীমান্ সুধাকান্ত রায় চৌধুরী বিশ্বভারতীর তরফ হইতে দিল্লীতে অর্থাদি সংগ্রহের জন্য বাস করিতেছিলেন।

কবি লাহোর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় আছেন। শান্তিনিকেতনে, তাঁহার মাটির বাড়ী হইতেছে ; সখ হইয়াছে বাড়ীটির দেয়াল ছাদ সব হইবে মাটির। চৈত্রর মাঝামাঝি ফিরিলেন, বাড়ী উঠিতেছে, প্রতিদিন সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলালের সহিত জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ২০এ মার্চ (১৯৩৫) কবি আশ্রমের বসন্তোৎসবে উপস্থিত ছিলেন ও নিজে 'বসন্ত' আবৃত্তি করেন ও দুটি নূতন সঙ্গীত গান করেন।

২৬এ মার্চ বিশ্বভারতীর নিজাম বক্তৃতার জন্য অধ্যাপক কাজি অবদুল ওদুদ ঢাকা হইতে আসিয়া বক্তৃতা করেন। কবি তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে উপস্থিত ছিলেন। কবির জন্মদিন ২৫এ বৈশাখ (১৩৪২)—৭৪ পূরিয়া ৭৫এ পড়িলেন ; সেইদিন তাঁহার নূতন বাড়ীতে প্রবেশ হইল।

এইদিন কবির নূতন বই 'শেষ সপ্তক' প্রকাশিত হইল। 'শেষ সপ্তক' গদ্য কাব্য। ইহাতে ৪৬টি রচনা আছে ; এগুলি চৈত্রর মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের ২০।২২ এর মধ্যে। সামান্য বিষয়, অতীতের ক্ষুদ্র স্মৃতি, এই সব লইয়া লেখা এই কাব্যটি অপরূপ হইয়াছে তাঁহার লেখন তুলিতে।

জন্মদিনের পর কবি কলিকাতায় যান ; তৎপূর্বে সাঁওতাল গ্রামের এক সমবায় দোকান খোলা হয় ; কবি তথায় উপস্থিত ছিলেন ও তাহাদের উৎসাহ দিয়া বক্তৃতা করেন। কিন্তু দোকানটি চলে নাই।

গ্রীষ্মের ছুটিতে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী বিলাত গিয়াছেন। কবি স্থির করিলেন গ্রীষ্মকালটা নৌকায় থাকিবেন চন্দননগরের কাছে। কলিকাতায় ১২ই মে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবির জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব ও সম্বর্ধনা হইল। ১৮ই মে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবোধি সোসাইটিতে বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে সভা হয় ; কবি একটি বিশেষ ভাষণ দান করেন ; ভাষণটি সোসাইটি মুদ্রণ করিয়া প্রচার করেন। এই উপলক্ষে লিখিত একটি কবিতা লেখেন ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ করেন। দিনগুলি নৌকায় অতিবাহিত হয়। অনিলকুমার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

গ্রীষ্মের ছুটির অবসানে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন; এবার উঠিলেন গিয়া তাঁর নূতন মাটির বাড়ী 'শ্যামলী'তে। 'শেষ সপ্তকে'র একটি রচনা লেখা এই 'শ্যামলী'র উদ্দেশ্যে—

"আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী। পৃঃ ১৬০

১৩৪২ বর্ষাকাল হইতে কবি শান্তিনিকেতনে আছেন; ছবি আঁকা, পত্র লেখা, মাঝে মাঝে দুই একটা গান রচনা করেন; কবিতা লিখিয়াছেন ছন্দে, জমিয়াছে অনেকগুলি। সবগুলি একত্র করিয়া 'বীথিকা' নামে বই প্রকাশ করিলেন।

কবির সব কথা বলা হয় না যদি না বলি যে এখনো এই পঁচাত্তর বৎসর বয়সে অধ্যাপকদের 'হৈ হৈ সঙ্ঘে'র জন্য হাসির গান লিখিয়া দিয়াছিলেন সেদিন। আশ্রমের প্রত্যেকটি আনন্দ উৎসবের সঙ্গে তাঁর যোগ নিবিড়। সারাদিন লেখা পড়া ছবি আঁকা লইয়া আছেন। পড়েন এখনো প্রচুর। সেদিন নন্দলাল বসুর সঙ্গে Epsteinএর Artএর উপর অত্যন্ত আধুনিক একখানি বই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। আর একদিন দেখি Architecture of the Universe নামে বই রহিয়াছে কাছে; আর একদিন দেখি Eskimosদের সম্বন্ধে খুব আধুনিক বই পড়িতেছেন; যখনই ঘরে গিয়াছি দেখি নূতনতম কোনো বই টেবিলের উপর।

সমস্তদিন এইভাবে কাটে; সন্ধ্যার পর ছেলেদের লইয়া 'শারদোৎসবে'র মহড়া দেন—নিজেই সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নামিলেন। শরীর অশক্ত হইয়া আসিতেছে হাঁটিতে চলিতে কষ্ট পান—কিন্তু মন এখনো সম্পূর্ণ উজ্জলতা রক্ষা করিয়া আছে। নাটকটিকে হাস্যোজ্জ্বল করিবার জন্য সাময়িকভাবে কয়েকটি দৃশ্য বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

২১এ জুলাই কলিকাতা হইতে অকস্মাৎ টেলিগ্রাম আসিল যে দিনেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন। এই সংবাদের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। দিনেন্দ্রনাথের সহিত আশ্রমের যোগ অল্পকাল হইল ছিন্ন হইলেও তিনি সকলের মনের মধ্যে একটি বড় রকমের আসন দখল করিয়া ছিলেন। আশ্রমের সহিত

ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ ; এ ছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তিনি ছিলেন ভাণ্ডারী। তাঁহার অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় বাঙলাদেশের হিন্দু সমাজের সমক্ষে একটি সমস্যা উপস্থিত হয়। জয়পুরের একটি ব্রাহ্মণ যুবক কিছুকাল হইতে দেবতার নামে জীববলি রদ করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন। বাঙলাদেশে দেবতার নামে অসংখ্য জীববলি হয়, তিনি ইহা রোধ করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন ও কালীঘাটে ছাগবলি বন্ধের জন্য শেষ পর্যন্ত অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। দেশের মধ্যে এই যুবক কোনো সহানুভূতি পান নাই। যাহারা ধর্মকে তাহার বিশুদ্ধিতার দিক হইতে দেখেন তাহারা জীববলির বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলেন, যে সত্যের জন্য আত্মাহুতি করিতেছে তাহাকে তিনি নিষেধ করিতে পারেন না। ইহাতে পত্রিকাওয়ালারা বলেন রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কথা বলিবার অধিকারী নহেন ; তিনি অন্য ধর্মমত বিশ্বাসী, তিনি ত চিরদিনই এবিষয়ে আপত্তি করিয়া আসিতেছেন ; তা ছাড়া তাঁরা বলেন জয়পুরী ব্রাহ্মণের নৈতিক জুলুম বাঙলা-দেশ মানিবে না। কবি নৈতিক জুলুমের বিরোধী হইয়া কেন সে-পক্ষ সমর্থন করিলেন। এইভাবে তর্ক বিতর্ক চলে।

অগ্রহায়ণ মাসে কবি শান্তিনিকেতনে 'রাজা' নাটক অভিনয় করেন। 'রাজা'র নাটকীয় সংস্করণের নাম 'অরূপরতন'। এইবার বইখানিকে অনেক বদল করিলেন। কলিকাতায় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি (১১ই, ১২ই) 'রাজা'র অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঠাকুর্দা সাজিয়াছিলেন।

এই বয়সে এভাবে পরিশ্রম তাঁহার সহ্য হইল না ; তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ১৯এ আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। উৎকল সঙ্গীত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে যাইবার কথা ছিল—কিন্তু শরীরের জন্য তিনি যাইতে পারিলেন না।

২৯এ নভেম্বর জাপানের কবি য়োন্ নোগুচি আশ্রমে আসেন ; কবি ও আশ্রমবাসীরা যথোচিত তাঁহার সম্বর্ধনা করেন। কবির ভাষণ ও নোগুচির বক্তৃতা V. B. Newsএ প্রকাশিত হয় (Vol. IV. 1935, Dec. p 44-47)।

১৯৩৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় Bengal Education Week হয়; সেই সঙ্গে New Education Fellowship এর সভা হয়। এই সমিতির স্থানিক সম্পাদক হইতেছেন ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ। রবীন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি। সম্পাদকদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ইহার পৌরহিত্য করেন ও 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (Education Naturalized, V. B. Bulletin No 20)। এই প্রবন্ধে কবি বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়া জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে পুনরায় বলেন। তিনি স্বীকার করেন এই প্রবন্ধের মধ্যে নূতন কথা নাই—তবে বলিবার ভঙ্গীটি ছিল অনবদ্য। এই কথা তিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে বলিয়াছিলেন, এমনকি তাহারও পূর্বে তাঁহার রচনার মধ্যে দেখা যায়। সেদিন সিনেট হাউসে অভূতপূর্ব ভিড় হয়; সহস্র সহস্র লোক কবিকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য রুদ্ধদ্বারে বৃথায় আঘাত করিয়া ফিরিয়া যায়। রেডিওর সাহায্যে বক্তৃতা প্রচারিত হয়।

কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে তিনি বর্ধমানে থামেন; শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাসায় উঠেন; বর্ধমানের মহারাজা, জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতি পাবলিক অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আশ্রমে ফিরিয়া দোল উৎসবের দিন কমলা নেহেরুর মৃত্যুদিনকে স্মরণ করা হয় (৮ই মার্চ)। কবি ঐ দিন আশ্রমবাসীদের নিকট এই মহীয়সী নারীর কথা বলেন। (V. B. News IV. 10. 1936 Ap. p. 75-6)

এমন সময়ে কলিকাতায় একটা কিছু অভিনয় করিবার কথা উঠিল। 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যকে নৃত্যছন্দে রূপ দিবেন স্থির করিলেন। নৃত্যছন্দে উহা রচনা করিয়া প্রথমে আশ্রমে অভিনীত হয়। কলিকাতায় ১১, ১২, ১৩ই মার্চ নিউ এম্পায়ারে দেখাইলেন।

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' গ্রন্থ এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়; গ্রন্থের অধিকাংশই গান এবং সে-গান নাচের উপযোগী বলিয়া কবি তাহার বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে

প্রাণীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়”

কলিকাতায় দেখাইয়া কর্তৃপক্ষের তৃপ্তি হইল না, তাঁহারা স্থির করিলেন উত্তর ভারতে প্রধান প্রধান নগরীতে নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন করিবেন ; সুন্দর আর্ট প্রচার ও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ দুইই হইবে।

কলিকাতা হইতে কবি ও ছাত্রছাত্রীরা উত্তরভারতে বিরাট অভিনয় অভিযানে বাহির হইলেন। ১৬ই মার্চ তাঁহারা পাটনা পৌছান। দুই দিন পাটনায় অভিনয় হয়। সেখান হইতে সদলে কবি এলাহাবাদে যান ; এখানেও অভিনয় হয় ও কবির যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হয়। ২১এ মার্চ তাঁহারা লাহোর আসেন ও চার দিন পরে দিল্লী পৌছান। দিল্লীতে মডার্ণ স্কুলের অন্তর্গত উপাসনা মন্দির কবি উন্মোচন করেন। এখানে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটে। দিল্লী মুনিসিপালটির সরকারী সাহেব চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথের মুন্সিপাল অভ্যর্থনা দিবার বিরোধিতা করেন; ইহাতে অনেক সদস্য সভা ত্যাগ করেন ও কুইনস্ গার্ডেনে বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া কবির যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। দিল্লী হইতে কবির এবার বহুদূর যাওয়ার কথা ছিল— এমন কি বোম্বাই পর্যন্ত। কিন্তু দিল্লীতে তাঁহার কয়েকজন ভক্ত বিশ্বভারতীর ঋণভার মুক্তির জন্য ৬০,০০০৲ টাকা দান করিয়া বলেন কবির এ বয়সে এভাবে চিন্তাকুল হইয়া অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো বন্ধ করা প্রয়োজন। তাঁহারা বিশ্বভারতীর ঋণভার শোধ 'করিবার' জন্য এই টাকা দান করিলেন ও বলিলেন কবি যেন ভবিষ্যতে অর্থের জন্য আর বাহির না হন। এই অপ্রত্যাশিত উদার দানে কবি নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন ও বিরাট ছাড়া অন্য সর্বত্র যাওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিলেন। কবি ১লা এপ্রিল দিল্লী ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।

শান্তিনিকেতন হইতে কবিকে নানা কাজের জন্য ৮ই এপ্রিল কলিকাতা যাইতে হয়—১৫ই ফিরিয়া আসেন ; ইহার দশদিন পরে তাঁহার দৌহিত্রী নন্দিতা (মীরাদেবীর কন্যা) দেবীর সহিত বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সিন্ধুদেশীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনীর বিবাহ হয়।

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কবির ৭৬তম জন্মোৎসব আশ্রমে অতিশান্তভাবে

অনুষ্ঠিত হয় ; কবি ঐ দিন বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার জীবন কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার কথা আশ্রমবাসীদিগকে বলেন। পরদিন কলিকাতায় যান ; সেখানে P. E. N (Poet. Essayist. Novelist) ক্লাবের যে বঙ্গীয় শাখা কলিকাতায় আছে, তাহার সদস্যগণ কবির আয়ুবৃদ্ধি কামনা করিয়া সভা আহ্বান করেন। পক্ষকাল সেখানে থাকিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। দারুণ গরমও তাঁহাকে পীড়িত করে না দেখি। আশ্রমে এইভাবে দিন কাটাইতেছেন ; ছবি আঁকা পত্রলেখা চলিতেছে। রচনার মধ্যে 'পত্রপুটে'র লেখাগুলি জমিয়াছিল। 'পত্রপুট' গদ্যকাব্য।

এই গ্রন্থের পৃথিবীকে নমস্কার (তিন) রচনাটি কবির মনের আকুতি কী নিবিড় বেদনায় অনিন্দিত ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে! কবির শ্রেষ্ঠ রচনাসৃষ্টির মধ্যে এটি স্থান পাইবে। এই গ্রন্থখানি কবি কৃষ্ণ কৃপালনী ও নন্দিতার বিবাহ দিনে (১২ই বৈশাখ, ১৩৪৩) তাঁহাদিগকে উৎসর্গ করেন।

কবির লেখনী এখনো চলিতেছে, নব নব সৃষ্টির বিরাম নাই। ইহার সঙ্গে আছে চিত্রকলা, কিন্তু কবি যদি তাঁহার লেখা ও রেখা লইয়া থাকিতে পারিতেন ভালই হইত ; শান্তিনিকেতনের আভ্যন্তরীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য তাঁহাকে নিরন্তর টানে, আবার বাহিরের বড় বড় কাজ তাঁহাকে ছাড়ে না। জুলাই এর মাঝামাঝি কলিকাতা হইতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলসী গোস্বামী, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে আসেন কবির কাছে। বাঙলার হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বরাবরই প্রতিবাদ করিতেছিলেন ; কিছুকাল পূর্বে তাহারা জাতীয়তাধর্ম-বিরোধী সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ আবেদন বা মেমোরিয়াল ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন ; রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বপ্রথম স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিল।

১৫ জুলাই কলিকাতায় হিন্দুদের বিরাটসভা হইল ; রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতিত্ব করিলেন। টাউনহলের সেই ভিড়ে কবির খুবই কষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ওকালতী করিতে যান নাই, যদিও জিনিসটা দেখাইল সেই রকমের। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করিবার জন্য নামিয়াছিলেন—কারণ ভারত সচিবের ব্যবস্থানুসারে সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙালীর জাতীয় জীবনের যে সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে, তাহার

মূল্য সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধা হইতে অনেক বেশি। কবি সেইসকল বিচার করিয়া বাঙালীর কল্যাণের দিকে তাকাইয়া বাহির হইতে প্রদত্ত এই বাঁটো-য়ারাকে অস্বীকার করিতে বলেন। তাঁহার বাণী সাম্প্রদায়িকতায় অনেক উর্ধ্বে। ঠিক সেইজন্যই তিনি মুসলমান পত্রিকাওয়ালাদের দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন। তবে কবির ইহাতে যোগ দান করা সম্বন্ধে আরও একটি মত আছে; তাঁহারা বলেন কবির বক্তব্য বিষয় যথার্থ সত্য, কিন্তু যিনি চিরজীবন আবেদন ও নিবেদনের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কেন সেই মেমোরিয়লে সহি করিতে গেলেন। কবির সাহিত্যিক ভক্তরা মেমোরিয়লে যোগদান করিবার জন্যই দুঃখিত; মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতার জন্য কবির প্রতি বিরূপ। কবি ২০এ আশ্রমে ক্লান্তদেহে ফিরিয়া আসিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের বাৎসরিক কনভোকেশনে ২৯ জুলাই কবিকে D. Litt. উপাধি সম্মানের জন্য দান করেন। কবি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ১৯২৬এ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন।

কবি আপনার সাধনালোকে আছেন, আপন মনে কাব্যসৃষ্টি করিতেছেন। 'শ্যামলী' নামে গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহাও গদ্যকাব্য। গ্রন্থখানিকে তিনি শ্রীমতী রাণী মহলানবীশকে উৎসর্গ করিয়াছেন; ইদানীং কয়েকবৎসর রবীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় যাইতেন প্রায়ই অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রের বরাহনগরে বাসা বাড়ীতে গিয়া উঠিতেন। অধুনা সেই বাড়ী অধ্যাপক মহাশয় ছাড়িয়া দিয়াছেন; সেই কথাটি উৎসর্গ পত্রে উল্লিখিত আছে। (১ ভাদ্র ১৩৪৩)।

পূজার পূর্বে কলিকাতায় কিছু অভিনয়ের জন্য অনেকে অনুরোধ করেন; কবি তাঁহার 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত "পরিশোধ' নামে কবিতাটিকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন (প্রবাসী ১৩৪৩ কার্তিক)। কলিকাতায় আশুতোষ কলেজের হলে এই নৃত্যনাট্য অভিনীত হয় আশ্বিনের শেষ দিকে।

সৃষ্টির নব নব প্রেরণা ও বিকাশ এখনো চলিতেছে। লেখনী বন্ধ হয় নাই, চিন্তাধারা সচল। কবির বিচিত্র দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইল; ইহা সত্যই বিচিত্র—রূপে, রসে, বর্ণে, অনুভূতিতে, কর্মে বিচিত্র। গত পঞ্চাশবৎসরের বাঙলার সমস্ত বৃহৎ আন্দোলনের সহিত তাঁহার জীবনে-

ইতিহাস যুক্ত ; গত পঁচিশ বৎসর বাঙলার কবির জীবন বিশ্বের ইতিহাসের সহিত যুক্ত হইয়াছে। বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি এমনভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে জয়যাত্রার গৌরব অর্জন করিতে পারেন নাই। মানবের সূক্ষ্মতম হৃদয়বৃত্তিকে সুকোমল ছন্দে জাগ্রত করিয়া মানবের গভীরতম চিন্তাধারাকে,আলোড়িত করিয়া, নিখিল মানবের কল্যাণের কথা প্রচার করিয়া, এমনভাবে এযুগে আর কোনো একজনও করিতে সক্ষম হন নাই। বাঙালী আজ বিশ্বসভায় আসন পাইয়াছে, সেই বিশ্বসভার সুরসংযোগ করিয়াছেন বাঙলার কবি ; তাঁহার বাণী ও বীণা আজও ধ্বনিত হইতেছে ; ধন্য হইয়াছে এইযুগ, ধন্য হইয়াছে বাঙলাদেশ।

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই,
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
নিত্য বহে নদীর ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-আসা কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভ ক্ষতি কান্না হাসি ;

*　　　*　　　*　　　*

রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহ মিলন গ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

পরিশিষ্ট

১

অভিনয়, গানের জলশা ও নৃত্যাভিনয়

সময়	নাটক	স্থান	রবীন্দ্রনাথের অংশ	পৃষ্ঠা
১৩২০ চৈত্র	অচলায়তন	শান্তিনিকেতন	আচার্য	৫০
১৩২১ চৈত্র	ফাল্গুনী	শান্তিনিকেতন	অন্ধ বাউল	৭৬
১৩২২ মাঘ	ফাল্গুনী ও বৈরাগ্যসাধন	কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাটী	কবিশেখর, অন্ধ বাউল	৮৪
১৩২৪ আশ্বিন	ডাকঘর	জোড়াসাঁকো	ঠাকুর্দা	১২৪
১৩২৬ আশ্বিন	শারদোৎসব	শান্তিনিকেতন	সন্ন্যাসী	১৬২
১৩২৮ ভাদ্র	বর্ষামঙ্গল	জোড়াসাঁকো	আবৃত্তি	২১৭
১৩২৮ আশ্বিন	ঋণশোধ	শান্তিনিকেতন	কবিশেখর	২২০
১৩২৯ শ্রা-ভাদ্র	বর্ষামঙ্গল	কলিকাতা এলফ্রেড ও ম্যাডান থিএটরে		২৩৩
১৩২৯ ভাদ্র	শারদোৎসব	ঐ	সন্ন্যাসী	২৩৫
১৩২৯ ফাল্গুন	বসন্ত	ম্যাডান		
১৩৩০ ভাদ্র	বিসর্জন	কলিকাতা এম্পায়ার থিএটরে	জয়সিংহ	২৪৯
১৩৩১ ভাদ্র	অরূপরতন মূকাভিনয়	এলফ্রেড থিএটরে	আবৃত্তি	২৫৪
১৩৩১ ফাল্গুন	সুন্দর বসন্তোৎসব	শান্তিনিকেতন		
১৩৩২ শ্রাবণ	বর্ষামঙ্গল	শান্তিনিকেতন		২৭৭
১৩৩২ ভাদ্র	শেষবর্ষণ	কলিকাতা		
১৩৩৩ বৈশাখ	নটীর পূজা	শান্তিনিকেতন	উপালি	২৯৭
১৩৩৩ মাঘ	নটীর পূজা	জোড়াসাঁকো	উপালি	৩২১
১৩৩৩ ফাল্গুন দোলপূর্ণিমা	নটরাজ	শান্তিনিকেতন		৩৬৫

১৩৩৪ অগ্র,	ঋতুরঙ্গ	জোড়াসাঁকো		৩৪৩
১৩৩৫মাঘ	সুন্দর	জোড়াসাঁকো		
১৩৩৬শ্রাবণ	বর্ষামঙ্গল	শান্তিনিকেতন		
১৩৩৬ আশ্বিন	তপতী	জোড়াসাঁকো	বিক্রম	৩৬৪
১৩৩৭ ফাল্গুন	নবীন	নিউ এম্পায়ার		৩৯১
১৩৩৮ ভাদ্র-আশ্বিন	গীতোৎসব, শিশুতীর্থ	ম্যাডান প্যালেস অব ভ্যারাইটিজ, য়ু-ই	আবৃত্তি	৩৯৮
১৩৩৮ পৌষ	গীত-উৎসব	য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট		
ঐ	শাপমোচন, নটীরপূজা	জোড়াসাঁকো	উপালি	৪০৬
১৩৩৯ ফাল্গুন	নবীন ও শাপমোচন,	লক্ষ্মৌ	[কবি যান নাই]	৪৩৭
১৩৩৯ চৈত্র	শাপমোচন তাসের দেশ	এম্পায়ার থিএটর		৪৩৮
১৩৪০ ভাদ্র	চণ্ডালিকা, তাসের দেশ	ম্যাডান থিএটর		৪৪৬
১৩৪০ অগ্রহায়ণ	শাপমোচন, তাসের দেশ	বোম্বাই		
১৩৪১ বৈশাখ	শাপমোচন	সিংহল		৪৫৩
১৩৪১ শ্রাবণ	শ্রাবণ-গাথা	শান্তিনিকেতন	নটরাজ	৪৫৬
১৩৪১ আশ্বিন	শাপমোচন	মাদ্রাস, ওয়ালটেয়ার		৪৫৮
১৩৪১ চৈত্র	বসন্তোৎসব	শান্তিনিকেতন		•
১৩৪১ মাঘ	অরূপরতন	শান্তিনিকেতন		
ঐ	(রাজা)	কলিকাতা	ঠাকুদা	৪৬১
১৩৪২ শ্রাবণ	বর্ষামঙ্গল	কলিকাতা, শান্তিনিকেতন		
১৩৪২ আশ্বিন	শারদোৎসব	শান্তিনিকেতন	সন্ন্যাসী	
১৩৪২ চৈত্র	নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	কলিকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর, দিল্লী, মিরাট।		৪৬৮
১৩৪৩ আশ্বিন	পরিশোধ	কলিকাতা, আশুতোষ কলেজ হল		৪৭০

২
সভাপতি
সময়ানুযায়ী

ফিলজোফিক্যাল কংগ্রেস,
(১৯২৫ ডিসেম্বর)
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী-সভা—
(১৯৩৬)
রামমোহন শত বার্ষিকী—১৯৩৩
ব্রাহ্মসমাজ শত বার্ষিকী—১৯২৮
বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন (কাশী)
সভাপতি—(১৯২৩)
হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলন
(ভরতপুর—১৯২৭)
(বিশিষ্ট অতিথিরূপে নিমন্ত্রিত)
গুজরাট সাহিত্য সভা
(আমেদাবাদ—১৯২০)
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী
(কলিকাতা সাময়িক ভাবে—১৯১৭)
লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলন (১৯২৬)

হিজলী হত্যা প্রতিবাদ সভা—
(১৯৩১)
নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন
(লাহোর অধিবেশন—১৯৩৫)
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১৯শতম
(ভবানীপুর, ১৯৩০)—অনুপস্থিত
অভয় আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক
অধিবেশনের সভাপতি—১৯২৬
প্রবর্তক সঙ্ঘ চন্দননগর, মন্দির প্রতিষ্ঠা—
সভাপতি (স্থায়ী) ১৯২৮
বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য(১৯২১)
বৃহত্তর ভারত পরিষদ
চান্সেলার, ন্যাশানাল য়ুনির্ভাসিটি
(শ্রীমতী বেশান্ত প্রবর্তিত – ১৯১৭)
ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, নিউ এডুকেশন
ফেলোশিপ, লণ্ডন ১৯৩৫।
(ভারতীয় কেন্দ্র, শান্তিনিকেতন)

৩
সম্মান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি ও
বক্তৃতা D. Lit উপাধি দান—১৯১৩
জগত্তারিনী পদক—১৯২১
কমলা বক্তৃতা—মানবের ধর্ম,১৯৩২
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক—
১৯৩২-৩৪

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ালটেয়ার—

'স্যর অল্লাদি কৃষ্ণস্বামী লেকচার'—
১৯৩৩, ডিসেম্বর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বক্তৃতা—The Philosophy of
Art ১৯২৬ ফেব্রুয়ারী।

'ডক্টর' উপাধি ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারী,
[কবি সভায় যাইতে পারে নাই]

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
'ডক্টর' উপাধি—১৯৩৫

গ্রীস গবর্ণেণ্ট—Commander of the order of the Redeemer ১৯২৬ নভেম্বর

চীন—চেন্ তান্ (Thundering morning) ১৯২৪ মে

সংস্কৃত কলেজ—
কবি সার্বভৌম ১৯৩১, সেপ্টেম্বর

বৃটীশ গভর্মেণ্ট
স্যর উপাধি—১৯১৫, জুন

সুইডিশ একাডেমি
নোবেল পুরস্কার—১৯১৩

৪

কবি যেসব গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহার কতকগুলি—

আবদুল ওদুদ,—হিন্দুমুসলমান বিরোধ —১৩৪২, মাঘ।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—ছেলেদের মহাভারত ("পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া") দিয়াছিলেন।

আবদুল করিম—Islam's Contribution to Science and Civilization, 1935, Aug 19.

কেদার দাসগুপ্ত—Kalidasa's Sakuntala।

ক্ষিতিমোহন সেন—দাদু, ১২৩৪
(প্রবাসী, ১৩৩২, ভাদ্র)।

ঐ Medieval Mysticism 1935.

গুরুসদয় দত্ত I. C. S. Woman of India, 1928.

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কাদম্বরী (কবির 'কাদম্বরী চিত্র' "স্বয়ং পরিবর্তিত করিয়া" "ভূমিকা-স্বরূপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন" (৩য় সং)]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র—ঠাকুরমার ঝুলি

দীনেশচন্দ্র সেন, রামায়ণী কথা—১৩১০ পৌষ ৫।

পশুপতি ভট্টাচার্য, ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা—১৩৪৩

পল রিশার (Paul Richard), To the Nations, 1916.

পিয়ার্সন, (W. W. Pearson) Shantiniketan.

প্রেমচাঁদ লাল, Rural Reconstruction in India

রঘুনাথ, কালিদাসের গল্প।

রাণী দে Leno-cut.

রাধাকৃষ্ণণ, The Philosophy of the Upanishads.

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, কাঠের কাজ ১৩৩২, অগ্র ৯।

শরৎকুমার রায়, শিখগুরু ও শিখজাতি, ১৩১৭

সতীশচন্দ্র রায়, গুরুদক্ষিণা, ১৩১১

সন্তোষবিহারী বসু,
সরল কৃষিশিক্ষা ১৩৩৪ বৈশাখ ৪।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সংস্কৃত শিক্ষা ১ম ভাগ।

এ ছাড়া বহু গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত দিয়াছেন তাহার তালিকা সম্পূর্ণ করিতে বহু সময় লাগিবে; উপরের তালিকাও সম্পূর্ণ নহে।

নির্ঘণ্ট